ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.

ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস

ভূমিকা : আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন অনূদিত



ইহুদি ও খ্রিষ্টান। বিশ্বইতিহাসের প্রাচীন দুই জাতি। বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতার চাকায় যাদের আজ নিয়ন্ত্রণ। মুসলিমদের সঙ্গে সংঘাতে যারা আছে সর্বাগ্রে। এসব আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হলেও আড়ালে রয়ে গেছে এ দুই জাতির প্রকৃত ইতিহাস। নিরেট সত্যকে আড়ালে রেখে নিজেদের মনগড়া বিকৃত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় সদা লিপ্ত।

সেই প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন এ গ্রন্থের লেখক। হয়েছেন ধর্মীয় ইতিহাসের উৎস ও আদি মূল অন্বেষণের কষ্টসাধ্য দীর্ঘ যাত্রার মুসাফির। প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাস, ধর্মীয় দল-উপদল প্রধানদের গ্রন্থনা, ইউরোপিয়ান ধর্মীয় ঐতিহাসিক দিকপালদের লেখনীর আলোকে সেসব উপস্থাপন করেছেন সুচারুরূপে। তিনি গবেষণা চালিয়েছেন ইহুদি ও খ্রিষ্টাধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, এর ওপর আপতিত রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতিগত ও সভ্যতাকেন্দ্রিক সন্ধিক্ষণ নিয়ে। আজকের ফিলিস্তিন নিয়ে তাদের যে চক্রান্ত, পাঠক হবেন এর গোড়ার অধ্যায়ের সাক্ষী।

লেখক শুধু ইতিহাস বর্ণনা করেই শেষ করেননি। কুরআন-হাদিসের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে উন্মোচিত করেছেন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রকৃত চিত্র। প্রমাণ করেছেন তাদের বিভ্রান্তি এবং দাবিসমূহের অসারতা। শেকড়সন্ধানী লেখক পাঠককে নিয়ে যাত্রা করবেন ইহুদিদের প্রাচীন সময়ে। প্রায় ৩০০০ বছর আগে তাদের আদি নিবাস এবং উৎপত্তিস্থলে। ঐতিহাসিক উত্থান-পতন থেকে কীভাবে এলো আজকের ইসরাইল? সেটিও তিনি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন।

ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের একেবারে সূচনা থেকে ধীরে ধীরে আজকের ইসরাইলে রূপান্তরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের গ্রন্থিত রূপই—‘ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস’।







বই	**ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস**
লেখক	ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি رحمه الله
ভূমিকা	সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি رحمه الله
ভাষান্তর	মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
সম্পাদনা	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
নামলিপি	কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ﷺ



মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং # ১২২,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com & wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৬০০, US $ 30, UK £ 20

IHUDI O KHRISTAN JATIR ETIHAS

Writer : Dr. Ziaur Rahmaan Azmi
Translated : Mohammad Rokan Uddin

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, 2nd Floor, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95222-0-1

প্রকাশকের কথা

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

'আপনি মুমিনদের জন্য মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে পাবেন ইহুদিদেরকে। অতঃপর মুশরিকদেরকে।' [সুরা মায়িদা : আয়াত : ৮২]

বিশ্বের বুকে জাতি হিসেবে ইহুদিদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও অপকর্মের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কুরআনে কারিমে তাদের অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কারা এই ইহুদি জাতি? কি তাদের গোড়ার ইতিহাস? কীভাবে তাওরাত লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয়, এর ওপর কি কি দুর্বিপাক নেমে আসে এবং হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কীভাবে তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় ও অনূদিত হয়?

এসকল বিষয় আমরা কি জানি? যাদেরকে মুসলিমদের প্রধান শত্রু হিসেবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিলেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি?

ফিলিস্তিন কাদের? প্রথম কারা আবাদ করেছিল এই পবিত্র ভূমি? ইহুদিরাই নাকি অন্য কেউ? ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হিজরত। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্বপরিবারে মিশর গমন। বনি ইসরাইলকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের মিশর ত্যাগ। হেক্সোস কারা? ফিরআউন কারা? ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন দল উপদল। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ধর্মগ্রন্থ : তালমুদ, মিশনা, গিমারা।

যবিহুল্লাহ কে? ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কুরআনের দর্পণে ইহুদি জাতি, জায়নবাদ, জায়নবাদী প্রটোকল। ইহুদিদের আদি উৎস, বাসস্থান, স্বভাব-চরিত্র, যুদ্ধ-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি...

এককথায় ইহুদিদের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানার একটি সমৃদ্ধ সমগ্রই—'ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস'

দুই.

মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ রচিত এ গ্রন্থ আপনাকে ইহুদিদের সাথে সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে—মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত। তার দাওয়াতি কার্যক্রম। মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধারোহণের পর খ্রিষ্টানদের অবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস।

শিষ্যবৃন্দের তালিকা। বাইবেলে বর্ণিত বংশতালিকা কতটুকু বাস্তব?

কাকে করা হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ? ক্রুশের ঘটনায় খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিরোধপূর্ণ বক্তব্য।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থগুলোর বর্ণনার মাঝে বৈপরিত্য। খ্রিষ্টবাদের মুখোশ উন্মোচনকারী বরনাবার সুসমাচার।

খ্রিষ্টধর্ম কী বৈশ্বিক ধর্ম? তাদের ধর্মগ্রন্থই বা কি বলে?

আল-কুরআনে মসিহ আলাইহিস সালামের বর্ণনা।

খ্রিষ্টধর্মকে নতুন রূপ দেওয়া কে এই পোল? খ্রিষ্টধর্মে তার প্রভাব।

খ্রিষ্টানদের দল-উপদল। নীতিনির্ধারণী মহাসভাসমূহ।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিন.

চারিদিকে যখন মুসলিমনিধনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের চক্রান্তের সয়লাভ ঠিক তখনই মুসলিমদের জন্য এরকম একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ততটাই, যতটা জীবনের জন্য পানির প্রয়োজন।

এ সময় এমন একটি গ্রন্থে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর বেশুমার শোকর আদায় করছি। ফালিল্লাহি হামদ!

পরিশেষে আনন্দের বিষয়—বইটির সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন।

অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো তার বেশ কয়েকটি পরিচয় থাকলেও এখানে কোনো পরিচয় উল্লেখ করছি না। কারণ, তার অনুবাদেই তাকে আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। কোনোভাবেই মনে হবে না এটি তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ।

নিরীক্ষণ এর কঠিক কাজটি করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন মাহদি হাসান। এতদিন তিনি অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এবার ঐতিহাসিক এসব তথ্য-উপাত্ত যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমেও পাঠকহৃদয়ে জায়গা করে নেবেন আশা করি।

সবশেষে ভাষা সম্পাদনা করে আমাদের সবাইকে ঋণী করেছেন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। আশা করি, তার হাতের ছোঁয়ায় বইটির সৌন্দর্য পূর্ণতা পেয়েছে।

চার.

ইতিহাসের কাজ এটিই আমাদের প্রথম নয়। এর আগে আমরা ইতিহাসের বড় বড় বেশ কয়েকটি কাজ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেগুলোর চেয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইতিহাসকেন্দ্রিক বই। বইটির অনুবাদ করা যেমন কঠিন ছিল; বিভিন্ন গ্রন্থ, ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার নামের সঠিক উচ্চারণ লেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ের নিরীক্ষণ তার চেয়েও কঠিক ছিল। আমরা শতভাগ নির্ভুল করতে চেষ্টায় কোনো রূপ ত্রুটি করিনি। তথাপি যেকোনো অসংগতি বা ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর; তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা অসুন্দর তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতারই ফল। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

১৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد...

ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে মুসলিমরা অন্যান্য জাতি-ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আসছেন। ওলামায়ে কেরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলম ধরেছেন। রচনা করেছেন কালজয়ী বহু গ্রন্থ। এসব রচনা ও গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সামনে অন্যান্য ধর্মের ভ্রান্তি, অসৌন্দর্য ও আঁধারির ধুম্রজাল সম্পর্কে অবগত করা এবং ইসলামের যুগান্তকারী সোনালি শ্রেষ্ঠত্বগুলি তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তাআলা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিশেষ করে আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করবে। [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬]

এই আয়াতের আলোকে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অবগতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কারণ, এতে করে আন্তধর্মীয় বোঝাপড়ার পথ সুগম হয় এবং হক-বাতিলেল পার্থক্যরেখা সুস্পষ্ট হয়। তাই তো সে যুগের আবু বকর আল-বাকিল্লানি, ইবনে তাইমিয়া থেকে নিয়ে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, শাহ আতাউল্লাহ বুখারি হয়ে হাল জমানার আহমদ দিদাত, জাকির নায়েকরা অমুসলিমদের সাথে বিতর্কের ধারা প্রবর্তন করেছেন এবং কেউ কেউ এ অঙ্গনে বাজিমাতও করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ.

আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের অধিক শত্রু ইহুদি ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ৮২]

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইহুদি এবং পৌত্তলিকরা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর খ্রিষ্টানরা সার্বিকভাবে মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী হলেও তাদের অনেকেই শত্রুতায় ইহুদি-মুশরিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিশেষ করে ইহুদিদের প্ররোচনায় বর্তমান সময়ের খ্রিষ্টানরা জেনে না জেনে মুসলিমদের চরম বিরোধিতা করে থাকে। এককথায় ইসলামের বিরোধিতার কাতারে সকল কুফরি শক্তি একতাবদ্ধ। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

"অচিরেই জাতিসমূহ তোমাদেরকে ধ্বংসের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে পিপাসার্ত খাদ্যগ্রহণকারীরা খাবারের দস্তরখানের প্রতি উদগ্রীব হয়ে পড়ে।।" একজন জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এমন হবে? তিনি বললেন, "তোমরা বরং সেদিন সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। এবং তোমাদের অন্তরে "ওয়াহন" ঢেলে দেবেন।" এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওয়াহন কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।"[১]

[১] *সুনানু আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৪২৯৭, *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস নং : ২২৪৫০

কিয়ামতের আগে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো দাজ্জালের ফিতনা। সেই দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের বড় অংশ হবে ইহুদি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"দাজ্জাল আসফাহানের ইহুদিদের মধ্য থেকে বের হবে। তার সাথে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে যাদের মাথায় মুকুট থাকবে।"[২] অপর বর্ণনায় এসেছে, "আসফাহান নগরির সত্তর হাজার তায়লাসান (এক প্রকার চাদর) পরিহিত ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে।"[৩]

শত্রুর মোকাবিলার জন্য চাই যথার্থ প্রস্তুতি। আর সেই প্রস্তুতির অন্যতম অংশ হলো শত্রু সম্পর্কে সর্বোচ্চ অবগতি। সুতরাং এদিক থেকেও অন্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

দুই.

বংলা ভাষায় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বিশদ গবেষণা ও অধ্যয়ন অনেকটা কম বললেই চলে। সাধারণ মুসলিম তো পরের কথা, খোদ ধর্মীয় বিশিষ্ট মহলেও এই বিষয়টি অনেকটা উপেক্ষিত। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ মাদরাসাতেও এ বিষয়ে সিলেবাসভুক্ত পাঠদান হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে থিওলজি ডিপার্টমেন্টে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় খুবই অবহেলিত।

প্রথমে জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ায় আমার অ্যাকাডেমিকভাবে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়। অতঃপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত হয়ে বিষয়টি আবার সামনে আসে। সে সময় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরবি ভাষায় যথেষ্ট বই-পুস্তক থাকলেও বাংলা ভাষায় খুব একটা নেই। মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন, ড. ইবরাহিম খলিলসহ আরও কেউ কেউ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু এই গ্রন্থগুলোর কোনটিই বিস্তারিত নয়। কেননা, তারা এক মলাটেই পৃথিবীর অনেকগুলো ধর্ম কিংবা মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে এসেছেন। যদ্দরুণ আলোচনা হয়েছে একেবারেই সংক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে প্রতিপাদ্য করে সে ধর্মের আদ্যোপান্ত আলোচনাসমৃদ্ধ বই আমার নজরে পড়েনি।

[২] *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস নং : ১২৮৬৫

[৩] *মুসলিম*, হাদিস নং : ২৯৪৪

বাংলা ভাষায় প্রতিটি ধর্ম নিয়ে বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তখন থেকেই অনুভব করতে থাকি। মৌলিক না হলেও আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অনুবাদ করেও এই শূন্যতা ঘোচানো সম্ভব বলে মনে হতে থাকে।

তিন.

দারুল মাআরিফ পড়াশোনাকালীনে লেখালিখি ও সাহিত্যচর্চার প্রতি মোটামুটি ঝোঁক ছিল। ইসলামি ম্যাগাজিনে লেখালিখি করা হতো। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বেশ কিছু পুরস্কারও প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে শিক্ষকতায় আসার পর সেই চর্চায় ভাটা পড়ে। করোনার প্রাদুর্ভাবে দেশময় অনাকাঙ্ক্ষিত লকডাউন শুরু হওয়ার পর লেখালিখির সেই সুপ্ত বাসনাটি আবার জেগে উঠে। অবসরকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জাতিয় দৈনিকে নিবন্ধ লিখতে শুরু করি। প্রকাশিত এসব নিবন্ধ দেখে রমজানের শেষের দিকে প্রিয় আরশাদ ইলিয়াস ভাইয়ের মাধ্যমে *মুহাম্মদ পাবলিকেশন* এর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অনুবাদের দায়িত্ব কাঁধে আসে। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আমাকে অনুবাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

পরিশেষে আরও দুজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়; **এক.** মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। যার হাতের ছোঁয়া না পেলে হয়তো বইটি অপূর্ণ থেকে যেত। বইটির ভাষা সম্পাদনা করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। **দুই.** মাহদি হাসান। নিরীক্ষণের কঠিন কাজটিই তিনি করেছেন। তাদের উভয়ের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

চার.

আমাদের এ গ্রন্থটি মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত। লেখক হিন্দুস্থানের এক সাধারণ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাপক অধ্যয়ন করে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের তাওফিক দান

করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গ্রন্থ রচনার প্রেরণা অনুভব করতে থাকেন। সেই প্রেরণার ফসল হিসেবে তিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্ম নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিয়ে লিখিত বইটিই আমরা অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। আরবি ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও যেসব কারণে আমরা এই গ্রন্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছি।

এক. বইটিতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাদের আদি উৎস, বাসস্থান, স্বভাব-চরিত্র, যুদ্ধ-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই. বইটির শুরুতেই গত এক শতাব্দী যাবৎ বিশ্বের সবচেয়ে জটিল রাজনৈতিক সমস্যা তথা ইহুদি জাতি কর্তৃক ফিলিস্তিনকে নিজেদের ভূমি দাবি করার বিষয়টি তথ্য-উপাত্ত দ্বারা খণ্ডণ করা হয়েছে। এমনকি ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকেই লেখক ইহুদিদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

তিন. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবির রহ. মতো ব্যক্তিত্ব বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি বইটির শুরুতে তিনি সারগর্ভ একটি ভূমিকাও লিখেছেন।

চার. ধর্মতত্ত্বে বইগুলোর আলোচনা সাধারণত খুব জটিল হয়ে থাকে যা সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকে। এদিক থেকে বইটি স্বতন্ত্র। গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরাও অনুবাদের সময় সেই সাবলীলতা বজায় রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

পাঁচ. সমৃদ্ধ রেফারেন্স। বইটি গতানুগতিক ধারায় লিখিত হয়নি। বরং প্রতিটি দাবির পক্ষে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের মহলে সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকগণের রচনা থেকে রেফারেন্স দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রয়োজনে মুসলিম মনীষীদেরও রেফারেন্সও টেনেছেন।

পাঁচ.

বয়স ও যোগ্যতার বিবেচনায় আমার মতো একজন ব্যক্তির জন্য এমন একটি বইয়ের অনুবাদে হাত দেওয়া রীতিমতো দুঃসাহসই বলা চলে। সার্থক

অনুবাদের জন্য ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক পড়াশোনা ও জ্ঞান থকা জরুরি। আর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পরিভাষাগত জটিলতা তো থাকছেই। তারপরও আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করে কাজে হাত দিই। অনুবাদকালীন পুরো সময়টাজুড়ে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে কাজটি সমাপ্ত করার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম প্রতিদান দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে পাঠকের যাতে বিরক্তি না আসে তাই আমরা পুরোপুরি শাব্দিক অনুবাদ এড়িয়ে গেছি। আবার মূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয়ে পুরোপুরি ভাবানুবাদও করা হয়নি। এককথায়, বইটি পাঠকের জন্য সুখপাঠ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মূল আরবি বইটির মধ্যে কিছু প্রিন্টিং মিসটেক রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মিসটেক উদ্ধৃতির মধ্যেও দেখা গেছে। তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি উদ্ধৃতিগুলো মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখার। উদাহরণস্বরূপ লেখক বিভিন্ন স্থানে ড. মরিস বুকাইলির The Bible, The Quran And Science এর আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উদ্ধৃতিটি আরবির সাথে মিলিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি নিশ্চয়তার জন্য মূল ইংরেজির সাথেও মিলিয়ে দেখেছি।

লেখক বইটিতে প্রচুর পরিমাণে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মূল আরবি বাইবেলের সাথে উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখেছি। অতঃপর অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বাইবেল (কেরি ভার্সন) থেকে উদ্ধৃত করেছি। মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমরা কয়েকটি স্থানে অনুচ্ছেদ নম্বরে গরমিল দেখতে পেয়েছি। এগুলোর অধিকাংশই আমার কাছে মুদ্রণজনিত ভুল বলে মনে হয়েছে। তথাপি অনুচ্ছেদ নম্বর এদিক-সেদিক হলেও মূল উদ্ধৃতি যথার্থভাবেই দেওয়া হয়েছে। এসব স্থানে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক অনুচ্ছেদ নম্বরটি উল্লেখ করেছি যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ চাইলেই বাইবেলের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

ছয়.

ইমাম শাফেয়ি রহ. তার *আর-রিসালাহ* নামক গ্রন্থটি আশিবার পর্যালোচনার পর তার শিষ্য মুজানিকে বললেন, "আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কিতাব ছাড়া আর

কোনো কিতাব বিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ রাখেননি।”[৪] মহান ইমামের এই মন্তব্যের জের ধরে বলতে চাই, আমরাও এই অনুবাদটিকে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তারপরেও কিছু ভুল থেকেই যেতে পারে। সচেতন পাঠকের কাছে অনুরোধ— এমন কোনো ভুল নজরে পড়লে সরাসরি আমাকে অথবা মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে অবহিত করবেন। আপনার পর্যালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

এই কাজের যা কিছু কল্যাণকর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুল তা শয়তানের ধোঁকা ও আমাদেরই দুর্বলতা। আল্লাহ তাআলা ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে কাজটিকে কবুল করে নিন। আমিন!

—মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

---

[৪] *হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি সর্দার ও শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি বিশ্বস্ত ও উম্মি, যাকে এমন এক কিতাব দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়েছে, যে কিতাব বিকৃতিকারী ও অসাধুর কবল থেকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিজের হাতে নিয়েছেন এবং যিনি এমন এক দ্বীনের ধারক যে দ্বীনের মৌলিকত্ব ও পরিচ্ছন্নতা সীমালঙ্ঘনকারীর বিকৃতি, বাতেলপন্থীর চক্রান্ত ও মূর্খের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত অবস্থায় কেয়ামত অবধি নিরবিচ্ছিন্ন থাকার নিশ্চয়তা আল্লাহ নিজের দায়িত্বে রেখেছেন।

হামদ ও সালাতের পর...

পৃথিবীতে নানা জাতি, মানবগোষ্ঠী, সমাজ, সভ্যতা, দর্শন ও সংবিধান রয়েছে। সেগুলো সুদূর-সুবিস্তৃত যাত্রায় পথের বাঁকে বাঁকে যখনই কোনো দুর্বিপাক কিংবা বিশাল শক্তির মুখোমুখি হয়েছে সাথে সাথে এর স্থানকালপাত্রের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কখনো নেতৃত্ব কিংবা সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে এর সাথে আপস করে নিয়েছে। এদের ওপর দিয়ে কখনও আবার সূক্ষ্ম চক্রান্ত এমনভাবে কুহেলিকার দেয়াল তুলেছে যার ফলে ইতিহাস গবেষকরাও এর প্রথম স্থপতি, মূল পরিকল্পনাকারী কিংবা প্রকৃত চিন্তকের হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে এমন কিছু ঘোলাটে ও তালগোলপাকানো তথ্য আমাদের হাতে পৌঁছেছে, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ কিংবা চুলচেরা বিশ্লেষণ না কোনো বিশ্বস্ত রাসায়নিক গবেষণাগারে সম্পাদন করা সম্ভব, না কোনো দক্ষ সুচারু অপারেশনের মাধ্যমে ফলাফলে পৌঁছা সহজ। এগুলোকে আমরা চিনে থাকি বহুজাতিক উপাখ্যান, সামাজিক নিয়মনীতি, দার্শনিক মতবাদের ক্রমধারা, উৎকর্ষমণ্ডিত সভ্যতা ও আত্মনির্ভর দর্শন

হিসেবে। প্রকৃত বিচারে এগুলো হচ্ছে পরিত্যক্ত প্রাচীন উপাখ্যান ও কথকতা। এগুলোর মধ্যে আবার কিছু আছে চরম পরস্পরবিরোধী, কিছু তালগোলপাকানো-এলোমেলো। এসবের পেছনে কাজ করেছে কোনো রাজনীতি, জুলুম-নীপিড়ন, বিজয় কিংবা পরাজয়।

মানববংশের ইতিহাসে, প্রসিদ্ধ সভ্যতার নথিপত্রে, প্রচলিত দর্শনে, জাতিগোত্রের চরিত্রে কিংবা জনপদের আচরণে পর্যবেক্ষক দৃষ্টি দিলেই আমাদের এই দাবির সত্যতা বেরিয়ে আসবে।

একইভাবে, সময়ের কোনো এক বিন্দুতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কিংবা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে স্বীয় বার্তা প্রচার করেছে এমন ধর্মগুলোরও এমন দশা। এগুলো না হতে পেরেছে বৈশ্বিক না হয়েছে চিরস্থায়ী আর না হতে পেরেছে সর্বশেষ আসমানি বার্তাও। এগুলোর যাত্রা কখনো হয়তো অন্যান্য সব সভ্যতা, সমাজ, সংবিধান কিংবা দর্শন থেকেও দীর্ঘতর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। আর ফলপ্রসূ হওয়ার পেছনে কাজ করেছেন : বিশ্বাস ও অনুভূতির সাথে নিবিড় সংযুক্তি, সার্বজনীনতা, বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিকতা, ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম শক্তি, মানবীয় বর্ণের পার্থক্য এড়িয়ে যেতে পারার কৌশল ইত্যাদি।

এ ছাড়াও ধর্মগুলো আয়ত্ত করতে পেরেছে— সর্বোত সমর্থন ও দৃঢ়ায়নের শক্তি, বুদ্ধি ও মননে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা, নিষ্ঠা ও চেতনা জাগ্রত করার কৌশল, বিশ্বাস ও মূলনীতির জন্যে নিষ্ঠা ও জীবন বাজি রাখার উপকরণ।

সঙ্গত কারণেই এসবের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃহৎ সামরিক শক্তি, কার্যকর সমরাস্ত্র, জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সফল কেন্দ্র, মানবগোষ্ঠীকে দিশা দেওয়ার উৎকৃষ্ট উপাদান। ফলে বিভিন্ন শাসকযন্ত্র ও বুদ্ধিজীবিরা – যারা লাভ লোকসানের নিক্তিতেই সবকিছুর বিবেচনা করে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক শক্তির নিরিখে হিসেব কষে—এই সমীহ জাগানিয়া বিপুল শক্তিকে ব্যবহার করতে লোভাতুর হয়ে উঠে। কারণ এই শক্তির শেকড় ও স্থায়িত্ব সমেত কাজে লাগানো সহজতর। অতঃপর তারা সেই ধর্মে দীক্ষিত হয় ও আবেগতাড়িত হতে শুরু করে। এরপর শুরু হয় ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে আদানপ্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিংবা সিংহাসন ও গির্জার মধ্যেও এমনটা চলতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই প্রভাব প্রতিপত্তির দোলাচলে সঠিক সিদ্ধান্ত বের করে আনা দুরূহ হয়ে উঠে, কার উপকার হচ্ছে কার ক্ষতি হচ্ছে সেটা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হয়ে যায়। বস্তুবাদ ও

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বোঝাপড়া দরকষাকষিতে আকিদা ও প্রধান লক্ষ্য থেকে সরে যাবার কারণ ঠিক করাও মুশকিল।

অনুরূপভাবে, সেই ধর্মগুলো এর উত্তরসূরিদের চেতনা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী ও তাদের আমানত ও বিশুদ্ধতা, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা, মৌলিকত্ব, তাদের কুরবানি এবং ধর্মকে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বিশুদ্ধতায় ধরে রাখতে তাদের সচেষ্টতার মাত্রার ওপর পুরোদমে নির্ভর করে। এভাবে ধর্মগুলি প্রভাব ফেলতে ফেলতে প্রবাহিত হয় জনপদ থেকে জনপদে, লোকালয় থেকে লোকালয়ে, কখনো সেই যাত্রা হয় জোর খাটিয়ে, কখনো দ্রবীভূত হয়ে। একেক সময় এদের সাথে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠে প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের, আবার কখনো নব্য আধুনিক পৌত্তলিকতার সাথে। এরই মধ্য দিয়ে এসব ধর্মের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও জীবনাচারে গভীর ছাপ পড়ে। পথের বাঁকে বাঁকে ধর্মগুলো অনেক কিছুই কুড়িয়ে নেয়, কখনো প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়, কখনোওবা পরোক্ষভাবে আন্দোলিত হয়। এরপরে আসে এসবের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার মুহূর্ত, প্রাথমিক সময়ের বার্তাবাহক ও আহ্বায়কের রেখে যাওয়া মূলের দিকে এসব বিকৃত ও সংক্রমিত ধর্মগুলোকে ফিরিয়ে আনতে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। যদি এদের কোনো সংরক্ষিত ইতিহাস কিংবা সুরক্ষিত জ্ঞানভান্ডার থেকে থাকে তাহলে সেই সব ধর্মের আত্মমর্যাদাশীল সংস্কারক, প্রাজ্ঞ সংশোধনকারী, প্রথম সময়ের প্রকৃষ্ট আকিদা ও মৌলিক নবুয়তি শিক্ষার অস্তিত্বের দিকে এর প্রত্যাবর্তন নির্ভর করে। কিন্তু এমন নজির ধর্ম ও জাতির ইতিহাসে বিরল, আর অন্যান্য বিষয়ের ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এমনটা আরও বেশি বিরল।

বিভিন্ন জাতি, উম্মত, সমাজ, সভ্যতা, সংবিধান ও দর্শনের যাত্রার গল্পগুলি যারা লিখার কাজ করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক। যেমন : 'হিস্টোরি অফ দ্য ইউরোপিয়ান মোরালস' এর লেখক লেকি, 'হিন্দুস্থানের সভ্যতার ইতিহাস' ও 'আরব সভ্যতা' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক গুস্তাভ লি বোন, 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থের লেখক গিব্বন, 'দ্যা মেকিং অফ হিউম্যানিটি' বইয়ের লেখক ব্রিফল্টসহ অসংখ্য লেখক উদাহরণ স্বরূপ এই বিষয়ের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন।

কিন্তু গতিশীল ধর্মের ইতিহাস, এর স্থানকালব্যাপী ভ্রমণ এবং আকিদাগত ও প্রয়োগিক যাত্রার গল্প, এর নিজের অস্থিমজ্জার সাথে ঐকান্তিক কাহিনি, বাহ্যিক খোলসের সাথে ঐতিহাসিক উপাখ্যান-এসব কিছু খুবই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, জটিল এবং ঠনঠনে। যদি শুধু প্রথম বিষয়টিই তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এর গবেষককে হতে হবে একাধিক ভাষায় দক্ষ, বিপুল

ধর্মীয় কিতাবাদি ও যুক্তিবিদ্যার গবেষণা পাঠের জন্য চরম ধৈর্যের অধিকারী। তাই দেখা যায়, এই প্রকল্পে সময় দিতে ও গবেষণা করতে খুব কম লোকই আগ্রহী, বিশেষ করে এই যুগে খুবই অপ্রতুল যে সময়ে চিন্তার দিগন্ত প্রস্তত, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তুলনামূলক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত, দীর্ঘকাল যাবৎ আলোর মুখ দেখতে না পাওয়া ধর্মীয় ইতিহাসের উৎসগুলো প্রকাশ হতে উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু যেমনটা আমরা বলেছি, এর জন্যে দরকার রকমারি সাংস্কৃতিক অভিরুচি, দরাজ দিল, কঠোর অধ্যবসায় ও দৃষ্টি-আত্মার পরিশ্রম।

খুশির উপলক্ষ্য এই যে, আমার প্রিয় সম্মানিত ভাই, মদিনা মুনাওয়ারার জামেয়া ইসলামিয়ার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আযমি এই কঠিন দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধর্মীয় ইতিহাসের উৎস ও আদি মূল অন্বেষণের কষ্টসাধ্য দীর্ঘ যাত্রায় মুসাফির হয়েছেন, প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাস, ধর্মীয় দল-উপদল প্রধানদের গ্রন্থনা, ইউরোপিয়ান ধর্মীয় ঐতিহাসিক দিকপালদের লেখনীর আলোকে সেসব সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন। বইয়ের এই অংশে –আমি যে অংশটির জন্যে ভূমিকা লিখছি- তিনি গবেষণা চালিয়েছেন "ইহুদি ও খ্রিস্টান" ধর্ম, এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস, এর ওপর আপতিত রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতিগত ও সভ্যতাকেন্দ্রিক সন্ধিক্ষণ নিয়ে। এবং এর প্রতিধ্বনিতে এই ধর্মদুটি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে। গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে নবীদের পিতা সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নিয়ে, এরপর তাঁর ইলমি ও উদ্ঘাটন যাত্রা পৌঁছেছে খ্রিষ্টবাদের সূচনার ইতিহাসে, এর ক্রমবিকাশ ও পরবর্তীতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা, আকিদা ও রীতিনীতির ভিন্নতার ইতিকথা, এর গর্ভে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন সংস্কারবাদী ও সমালোচনা নির্ভর তৎপরতার ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির একটি বড় অংশে আলোচিত হয়েছে সেমেটিক গোত্রের রাজ্যত্যাগের প্রবাহ থেকে নিয়ে অন্যান্য মানবগোত্রের অঞ্চল নিয়ে। এ ছাড়া সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গমনপথ ও তাঁর সময়ে মিশরের ভিত্তি স্থাপন, প্রকৃত "যবিহুল্লাহ", সায়্যিদুনা ইয়াকুব ও তার সন্তানদের মিশর অভিমুখে হিজরত, সেখানে তাদের অবস্থান ব্যাপ্তিসহ মুসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব ইত্যাদি আলোচনাও তিনি করেছেন।

এরপর দীর্ঘ পুরুস্থ আলোচনা শুধু "পুরাতন নিয়ম" (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও নবীদের অধ্যায় নিয়ে, কীভাবে তাওরাত লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয়, এর ওপর কি কি দুর্বিপাক নেমে আসে এবং হারিয়ে যাওয়ার পর আবার

কীভাবে তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় ও অনূদিত হয় তা নিয়ে। এছাড়াও আছে তালমুদ ও এর শিক্ষা এবং জায়নবাদি প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা।

এরপর তিনি উপনীত হন মসিহ আলাইহিস সালামের যুগে। লেখনীর জলটলটল গতিতে একের পর এক লিখে গেছেন—

মসিহ আলাইহিস সালামে দাওয়াতি কার্যক্রম ও উপকরণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্ত, তাঁর ওপর বাস্তবায়িত আদালতি প্রহসন নিয়ে, তার ঊর্ধ্বারোহণের পর তার অনুসারীদের কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কীভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও পদ্ধতির মূলে নোংরা পরিবর্তন সাধিত হয়?

সায়্যিদুন ইসা মসিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমাদের কুরআনের বক্তব্য, মসিহ পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সেন্ট পল নিয়ে আলোচনা, পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টবাদকে রোমান ও ইউনানী ছাঁচে ঢেলে সাজানো কনস্টানটাইনের আলোচনা, বাইবেলের চারটি সংস্করণ নিয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলাপ, পরিত্যাক্ত বাইবেল নিয়ে আলোকপাত, বাইবেল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বরনাবার বাইবেল নিয়ে পর্যালোচনা, এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ও পরস্পরবিরোধী নথি পরিবেশন, উপরন্তু তিনি পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'আরিয়ুস' ও তাঁর সংস্কারপন্থী বিপ্লবী ভূমিকার সাথেও।

এভাবে লেখক বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়কে বিন্যাস করেছেন নানা অমূল্য তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে।

প্রাচীন ধর্মসমূহের ইতিহাস, গঠন ও বিকাশ নিয়ে যে তুলনামূলক পর্যালোচনা হতে পারে, এ গ্রন্থটি তারই একটি প্রশংসাযোগ্য শুভসূচনামাত্র। গবেষণা যতই জ্ঞানগর্ভ ও আন্তরিক হোক, তাতে প্রান্ত বা চূড়ান্ত বলতে কিছু নেই। বরং গবেষণায় নিয়তই সমালোচনা ও সংযোজনের অবকাশ ও আবশ্যিকতা থেকে যায়। তবু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই নতুন সূচনাগুলোও বড়রকমের প্রেরণা জোগায়।

ফাঁকহীন ব্যস্ততা, মনোঃবিক্ষিপ্ততা ও মুহুর্মুহু বিদেশ-সফরের ভেতরেই গ্রন্থটির ওপর হালকা নজর বুলিয়ে এ অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ায় আমি উপনীত হয়েছি।

যেহেতু এই গ্রন্থের লেখক হিন্দুস্থানে –প্রাচীন ধর্ম ও গভীর দর্শনের লালনক্ষেত্র—জন্ম নেওয়া ও বেড়ে-উঠা হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমানদের

একজন, যার হৃদয়কে আল্লাহ ইসলামের জন্য সুপ্রশস্ত করেছেন, ঈমানের শিখা জ্বেলেছেন, তাঁর কাছে আমরা আশা করতেই পারি, তিনি যেন প্রাচীন হিন্দুধর্মের গবেষণার জন্যেও সময় বের করেন। আরবি ভাষায় হিন্দুধর্মের গবেষণা ও ঐতিহাসিক উৎস অপ্রতুল হওয়ায় এই ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচনকারী বিশাল এক তথ্যভান্ডারে পরিণত হবে। আর এ কাজের মাধ্যমে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি মিশনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যা উনার আগেও আরেক নওমুসলিম শায়খ উবায়দুল্লাহ আল-ফা'ইলী (মৃত্যু- ১৩১০ হিজরি) তাঁর গ্রন্থ "তুহফাতুল হিন্দ" এর মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে উসিলায় আল্লাহ তাআলা অসংখ্য বান্দা ও হিন্দুস্থানের উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালী পৌত্তলিকদের হিদায়াতর আলো দান করেছেন। তাঁর মতো তারই মিতা শায়খ উবায়দুল্লাহ আস-সিন্ধিও একই ভূমিকা রেখেছিলেন। এতে করে কল্যাণের বিশাল একটা ধারা জারি হবে। আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ডটি শুধু হিন্দুধর্ম বিষয়ে হবে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি ব্যক্ত করেছেন এই গ্রন্থের ভূমিকায়।

আল্লাহ লেখকের ইচ্ছা-আশা, স্বপ্ন ও সংকল্পকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করুন। তিনি যাকে কল্যাণে ভরিয়ে দিতে চান, এ গ্রন্থ দ্বারা তার সমূহ উপকার সাধন করুন! জটিল-বেপথু দর্শন ও পঙ্কিল পৌত্তলিকায় ক্লেদাক্ত ভারত উপমহাদেশকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আলোকিত করে দিন! আল্লাহ যাকেই চান তাঁকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা দেন।

—আবুল হাসান আলি আল-হাসানি আন-নদবি
রায়বেরেলী, হিন্দুস্থান
২৬ রবিউল আওয়াল, ১৪০৫ হিজরি
২০/১২/১৯৮৪ খ্রি.

সম্পাদকের কথা

ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বিশ্বজয়ী বার্তা নিয়ে এসেছিল যে কুরআন, সে কুরআনই বলছে—'তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু'। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৫১]

প্রশ্ন জাগে—তারা পরস্পর বন্ধু হলে তো তারা খুবই ভালো মানুষ। সহজ উত্তর—তাদের গুমোট আঁধারি ও ঘুটঘুটে গুমর অন্য জায়গায়। তাদের এই আপাত বন্ধুত্ব ও বন্ধন ইসলামের আলোকে এক ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার স্বার্থে। অথচ তাদের পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে একেবারে রক্তচোখ ও খড়গহস্ত। তখন পরস্পরকে নোংরাভাবে নাকচ করে এই বলে—'ইহুদিরা বলে, খ্রিষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই। (সব বাজে বকোয়াস)। খ্রিষ্টানরা বলে, ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই (সব বাজে বকোয়াস)।' [বাকারা : ১১৩] এরকম কদর্য কাদা ছোড়াছুড়ি তাদের নিত্তনৈমত্তিক ব্যাপার।

জাতদুষ্ট এ দুটি জাতির জীবন ও ইতিহাসে যে কিছুই নেই, এমন নয়; বরং তাদের রয়েছে ঐতিহাসিক পরিচয়, প্রতিভা, বুদ্ধি, সম্পদ এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু তাদের নেই একটি পরসহনশীল পরিচ্ছন্ন হৃদয়, বিশেষ করে ইসলামকে সহ্য করার মানসিকতা।

ইসলামের বিরুদ্ধে করতে গিয়ে তারা পুরো পৃথিবীর স্বপ্নের বীজতলায় ঢেলে দিয়েছে সর্বধ্বংসী বিষ। এ জন্য তারা শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু নয়, তারা প্রতিটি সুন্দর-সম্পন্ন-সুখী পৃথিবীরই চরম শত্রু।

সুন্দর পৃথিবী আর সুস্থ-সুখী মানবতার প্রত্যাশী প্রতিজন মানুষেরই নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, তাদের রক্তখেকো কালো থাবা থেকে চিরমুক্তির জন্য সফল প্রকল্প হাতে নেওয়া। বহু শতাব্দী ধরে এ প্রকল্প হাতে নিয়ে পুরো পৃথিবী ও মানবতাকে ঋণী করেছেন বহু বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সেই গৌরবটা অর্জন করতে যাচ্ছে

উঠতি ও উদ্দমী প্রকাশনা 'মুহাম্মাদ পাবলিকেশন'। ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য বলেই তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় আরও বহু গুরুত্বগভীর, গর্বিত ও সময়োপযোগী কাজের জন্য।

বাংলা ভাষায় ইহুদি-খ্রিষ্টান নিয়ে একেবারে কাজ হয়নি এমন নয়, তবে তুলনামূলক খুবই কম হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আশুরু-শেষ দেখার সুযোগ হয়েছে। যতই পড়েছি ততই এর গুরুত্বগভীরতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সত্যিই বাংলা ইসলামি গবেষণা-ভান্ডারে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন।

অনুবাদক সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছেন। শুভযাত্রায় তাকে সু-স্বাগত। তিনি কতটুকু যত্ন ও কষ্ট করে পাঠকদের অনুবাদটি উপহার দিচ্ছেন, সেটা তিনি তার 'কথায়' জানিয়েছেন। আমিও তা স্বীকার করি। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ঠিক এখনই অনেক কিছু বলে তাকে আমি 'ভাসিয়ে' আর 'বসিয়ে' দিতে চাই না। বরং তাকে মৃদু 'কলমি খোঁচা' দিয়ে বলতে চাই—তাকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, পথের বাঁক-মোড় সম্পর্কে আরও ওয়াকিব ও সচেতন হতে হবে। তাহলেই,—আমার দৃঢ় আশা—তিনি চমকে দিতে পারবেন।

সর্বোত শুকরিয়া আল্লাহর জন্য। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য রইল ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। উম্মাহর কল্যাণের জন্যই এ কর্ম কবুল করুন দয়ালু আল্লাহ!

—মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
২০/১২/২০২০

এই বইয়ের গল্প

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর।

এই বইটির একটি গল্প আছে; আমার মনে হয় পাঠকের তা সংক্ষেপে জানা উচিত। আল্লাহ যখন আমাকে তাঁর বিশুদ্ধ ইসলামে জায়গা করে দিলেন, আমার এই নব নির্বাচিত ধর্ম নিয়ে হিন্দুধর্মের পণ্ডিতদের একটি দলের সাথে আমার নিয়মিত বিতর্ক ও আলোচনা চলতে থাকে। এ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সাথেও ইসলামের তুলনা চলত। সেই তর্ক-বিতর্ক কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তাদের জোর প্রচেষ্টা ছিল, আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা যেভাবে আমাকে ইসলামের দিশা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন সেভাবে এই বিপদসংকুল ঝড়ের সামনেও ইসলামের ওপর অটল থাকার শক্তি দিয়েছেন। সেই পণ্ডিতদের বিতর্ক ও সমালোচনা আমার ঈমান ও আকিদাকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য মুষ্ঠিকে শাণিত করেছে। আমার জীবনে প্রশান্তির ছায়া দান করেছে। সর্বোপরি আমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বাড়িয়েছে।

তখন থেকেই আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আমি এসব অসার ধর্ম ও বিশ্বাসের অসারতা সম্বন্ধে এমন একটি সন্তোষজনক গ্রন্থ প্রণয়ন করব, যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে, যদিও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এত কাঠখড় পুড়াতে হয় না।

সেই থেকেই আমার মনে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা অপরকে জানানোর আগ্রহ গেঁথে যায়। এগুলোর সাথে ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঝোঁকও পেয়ে বসে। এই চিন্তা আমার মন-মগজ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বরং এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এই চিন্তা থেকে আমার জীবনের একটি মুহূর্তও মুক্ত ছিল না। সুতরাং আমি আহলে কিতাব ও অগ্নি উপাসকদের বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে তথ্য ও উপাত্ত আহরণে

ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেসবে নিজের উদ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ি। আমি আশা করি, এই ময়দানে অবদান রাখা মানুষগুলোর কাতারে আমিও অংশীদার হব। সেই সাথে আমি এও কামনা করি যে, সম্পূর্ণ কাজটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য উপকারী হবে, বিশেষ করে ওইসব নওমুসলিমের জন্য সহায়িকা হবে যারা আমার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে অহরহ।

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমার হৃদয়কে ইসলামের ওপর দৃঢ় রেখেছেন, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পার হওয়ার পর এ বিষয়ে আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া তিনি যেন এই কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই কবুল করেন। তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম সহযোগী।

সালাত ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল নবি-রাসুলগণের ওপর।

—গ্রন্থকার
মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত
১০ই রমজান, ১৪০৪ হিজরি
আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে কখনো সংক্ষিপ্তাকারে আবার কখনো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা সংক্ষিপ্তাকারে বলেন—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। [সুরা ফাতির, আয়াত : ২৪]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.

আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসুল রয়েছেন। যখন তাদের কাছে তাদের রাসুল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হলো, তখন আর তাদের ওপর জুলুম হয় না। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৪৭]

আরেক স্থানে তিনি ইরশাদ করেন—

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً .

যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দিই না। [সুরা ইসরা, আয়াত : ১৫]

এভাবেই কুরআনের বহু আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে দ্বীন-ধর্ম ও বুদ্ধিহীন ছেড়ে দেননি। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তার রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান করাকে মানুষের স্বভাবগত বিষয় বানিয়ে দিয়েছেন। যখনই মানুষ সিরাতে মুসতাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, দ্বীনের চাদরকে নিজেদের দেহ থেকে ছুড়ে ফেলেছে তখনই আল্লাহ তাআলা একের পর এক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন যাতে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘায়িত না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

এরপর আমি একের পর এক রাসুল প্রেরণ করেছি। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৪৪]

এই হলো সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কিছু নমুনা। আর বিশদ আলোচনার কথা বলতে গেলে কুরআনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আলোচনাই বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ধর্ম এবং সিরাতে মুসতাকিম থেকে তাদের বিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ে। এই বর্ণনার মাঝে আমরা দেখতে পাই কুরআন আলোচনা করেছে পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ পুস্তকসমূহ, কাফির-মুশরিককর্তৃক নবিগণের বিরুদ্ধাচরণ, হক-বাতিল ও কল্যাণ-অকল্যাণের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে।

কুরআনুল কারিম এক আয়াতে ছয়টি ধর্মের আলোচনা করেছে। যেমন বলা হচ্ছে—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে। [সুরা হজ, আয়াত : ১৭]

একইভাবে আল্লাহ তাআলা আন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে মূলনীতিগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই মূলনীতিগুলো হলো :

প্রথম : কুরআনুল কারিম এ কথা সাব্যস্ত করেছে যে আল্লাহ তাআলা সকল জাতির কাছে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

দ্বিতীয় : সকল নবি-রাসুল ও তাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা সকল মুসলমানের ওপর ওয়াজিব।

তৃতীয় : ইসলামপূর্ব সকল ধর্মে বিকৃতি ঘটেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

(হে মুসলমানগণ) তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং এ বিষয়ে তারা তা অবগতও ছিল। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৫]

অন্য স্থানে তিনি বলেন—

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ .

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৯]

চতুর্থ : কুরআন তাওহিদ ও বহু ঈশ্বরবাদের মাঝে তুলনা করে দেখিয়েছে। অতঃপর বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসারতা বর্ণনা করেছে এবং এটিকে জগৎ ধ্বংসের কারণ হিসেবে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ·

যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২২]

পঞ্চম : কুরআন আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের আহ্বান করে। কুরআনের এই আহ্বান থেকে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অবগতি ও ধর্মগুলোর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনার জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কেননা, এতে করে বিতর্ক হবে জ্ঞানগর্ভ, বুনিয়াদি ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থাতেই বিতর্ক করবে।" [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬]

ষষ্ঠ : কুরআনুল কারিম খালিক ও মাখলুকের মাঝে তুলনা করে দেখিয়েছে এবং যারা খালিক ও মাখলুককে সমজ্ঞান করে তাদেরকে অবজ্ঞা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

যিনি সৃষ্টি করে, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? [সুরা নাহল, আয়াত : ১৭]

সপ্তম : কুরআনুল কারিম ঘোষণা করে ইসলামই হলো একমাত্র সত্য ধর্ম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান, আযাত : ১৯]

এবং কুরআন এও বর্ণনা করে যে আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। কেউই এতে বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে না। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا.

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩]

পক্ষান্তরে ইসলামপূর্ব প্রতিটি আসমানি ধর্ম বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এই হলো ইসলামের কিছু বিশেষত্ব। এই ঐশী দিকনির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মগুলো নিয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা চালিয়ে আসছে।

ধর্মতত্ত্ব :

ধর্মতত্ত্বে সাধারণত তিন ধরনের বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে :

এক : ধর্মের ইতিহাস। এই অংশে ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মানবসমাজে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে এদিক থেকে আলাদা যে, মুসলমানরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিশ্চিত ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত বিধিবিধান ও শরিয়তের ক্ষেত্রে একবারে সূচনালগ্ন থেকে সনদ তথা ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রের প্রয়োগ করেছে। তাই সাহিবুশ শরিয়াহ তথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে ইসলাম ছিল আকিদা ও আহকামসহ সর্বক্ষেত্রে হুবহু সেই ইসলামই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অপরদিকে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর প্রধান ব্যক্তি পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। যেমন ইহুদিদের কিতাব তাওরাত। বুখতে নসরের আক্রমণের পর হারিয়ে যাওয়া তাওরাতকে পুনঃসংকলনকারী যাজক ইয্রা থেকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কোন ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র নেই। অথচ তাদের উভয়ের মাঝে প্রায় সাত শতাব্দীর ব্যবধান। খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত করেছেন যে, যাজক ইয্রা ছিলেন ৪৫৮ খ্রিষ্টপূর্বের। আর মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন দ্বাদশ খ্রিষ্টপূর্বের।

এ ছাড়াও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তাদের কিতাবগুলো প্রসিদ্ধ কিছু ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ যুগে রচনা করেছেন। মসিহের যুগের সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ে রচিত কিতাব মার্কের

সুসমাচার লেখা হয়েছে ৬৫ থেকে ৭০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে। তাদের এই গ্রন্থগুলো দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের আগে পরিচিত ছিল না। ২০০ খ্রিষ্টাব্দে আরিনুস এবং ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লেমেন এই কিতাবগুলোর আলোচনা সামনে আনেন। প্রথমে মসিহের জীবনি সংক্রান্ত গ্রন্থের আলোচনা করেছেন প্যাপিয়াস। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর ইতিহাসবিদ। উইল ডুরান্ট তার *কিসসাতুল হাদারাহ* গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, প্রথম শতাব্দীর শেষাংশের লেখকগণ বর্তমান সময়ে প্রচলিত এসব সুসমাচার থেকে কখনোই উদ্ধৃতি দিতেন না।

এ ছাড়াও মসিহ আলাইহিস সালামের ভাষা এসমস্ত লেখকদের আয়ত্বে ছিল না। মসিহ আলাইহিস সালামের ভাষা ছিল সুরিয়ানি। অথচ এদের অধিকাংশই সুসমাচার রচনা করেছেন গ্রিক ভাষায়। সেখান থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। অতপর ল্যাটিন ভাষা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদকগণের পরিচিতি আজও অজানা। এই হলো আহলে কিতাবগণের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অবস্থা।

পক্ষান্তরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারস্যের অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অবস্থা আরও নাজুক।

আমাদের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাগুলো দীর্ঘ তিন শতাব্দী যাবৎ মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকে শিলাতে লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করার নির্দেশ দেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খোঁড়াখুঁড়ির মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পেরেছি বুদ্ধ কে? কী ছিল তার শিক্ষা?

সংক্ষেপে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা এ কথা বলতে পারি—এই সমস্ত প্রবক্তাগণ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে ধর্মগুলো ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি, যেভাবে ইসলাম আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

দুই : ধর্মদর্শন। এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, যেগুলোর উপর দ্বীনের ভিত্তি, যেমন আকিদা, শরিয়ত, আখলাক ও লেনদেন। এ প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে রয়েছে অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলি যেটাকে ধর্মের ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হয়।

তিন : তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। এ অংশে ধর্মগুলোর পারস্পরিক তুলনার উদ্দেশ্যে এগুলো বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ধর্ম সম্পর্কিত রচনাবলি :

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে লেখালেখি করার ক্ষেত্রে গবেষক ও পণ্ডিতগণ দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

প্রথম পদ্ধতি : প্রবর্তন বিবেচনায়

তারা বলেন : ধর্মগুলো দুধরনের। আসমানি ধর্ম যেমন : ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম প্রভৃতি। মানবরচিত ধর্ম যেমন : হিন্দু, বৌদ্ধ, জরাথ্রুস্ট, চৈনিক প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ভৌগলিক বিবেচনায়

তারা ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে বৈশ্বিক ধর্মের কাতারে রাখেন। আর ইহুদি, হিন্দু ও প্রাচ্যের ধর্মগুলোকে জাতিগত বা গোষ্ঠিগত ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন।

খ্রিষ্টধর্মকে বৈশ্বিক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি রয়েছে। কেননা, মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ছিল শুধু ইহুদি জাতিকেন্দ্রিক। মসিহ আলাইহিস সালাম এসেছেন মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। যেমন মথি তার সুসমাচারে মসিহের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন : "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"[৫]

সপ্তম হিজরির ইহুদি ব্যক্তিত্ব সাদ ইবনে মনসুর কিমুনি তার *তানকিহুল আবহাস লিল মিলালিস সালাস* নামক গ্রন্থে বলেন, "তাওরাতের বিভিন্ন বিধানের পরিবর্তন যেমন শুকরের মাংসের বৈধতা, খতনা ত্যাগ করা, গোসল প্রভৃতি হাওয়ারিগণ থেকে বর্ণিত, মসিহ থেকে বর্ণিত নয়। কেননা, তিনি ইহুদি কর্তৃক ধৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওরাতের বিধানাবলি আঁকড়ে ছিলেন।" এরপর তিনি বলেন, "এই বিধানগুলোর অধিকাংশই ছিল পোলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।"

ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে খ্রিষ্টানদেরকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে পোল উত্তর-পশ্চিমের এলাকাগুলোর অভিমুখী হন। প্রথমে সিরিয়ার উত্তরে এন্টিয়ক, সেখান থেকে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের মেসা হয়ে মেসিডোনিয়া। পোল খ্রিষ্টানদের মাঝে নতুন একটি চিন্তাধারার জন্ম দেন। আর তা হলো খ্রিষ্টধর্মের বৈশ্বিক হওয়া। অথচ মসিহ আলাইহিস সালামের

[৫] মথি, ৫/১৭

দাওয়াত শুধু ইহুদি পরিমণ্ডলে সীমিত ছিল। এজন্যই দেখা যায়, ইহুদিরা যখন খ্রিষ্টানদেরকে এই মসিহি তথা খ্রিষ্টান বলে কটুক্তি করত তখন তারা অসন্তুষ্ট হতো। কেননা তারা নিজেদেরকে ইহুদি হিসেবেই বিবেচনা করতো।

পিতার তার প্রথম পত্রে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "মসিহের নামে তোমাদেরকে কটুক্তি করা হলে সেটা তো তোমাদের জন্য খুশির বিষয়।"[৬] অনেক বিজ্ঞজনই দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেছেন যে, সত্তর খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদিদের একটি উপদল বিবেচনা করা হতো। তাদের নাম ছিল নাসারা।

চার্লস গিজেনবার্ট তার *আলমসিহিয়্যাহ নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা* নামক গ্রন্থে বলেন, "খ্রিষ্টবাদ হলো একটি ইহুদি আন্দোলন।" সুনির্দিষ্টভাবে এটি প্রথম ইহুদিদের ধর্মীয় জীবনের সমস্যা নিয়ে শুরু হয়েছিল। ইহুদি পরিমণ্ডলের বাইরে এটিকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মথির সুসমাচারের ভাষ্য অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালাম বলেন, "ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[৭]

বরনাবার সুসমাচারে এসেছে : আল্লাহ আমাকে ইসরাইল কুলে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন দুর্বলদেরকে সুস্থ করার জন্য।

কুরআন অনেক আয়াতে খ্রিষ্টানদের এই হাকিকত তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

আর বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন : নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শন নিয়ে... [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

[৬] পিতর ১ম, ৪/১৬

[৭] মথি, ১৫/২৪

স্মরণ করুন, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বললেন : হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য জাদু। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

আদইয়ানুল আলাম গ্রন্থে কট্টর খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ হাবিব সাইদের বক্তব্যটি দেখুন। তিনি বলেন, "সুসমাচার হলো মৌলিকভাবে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত রিসালাত। এটি এককভাবে কোনো জাতি, গোষ্ঠী কিংবা দলের মানুষের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথম দিকের শিষ্যগণ শুরুতে বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেননি যে, ইহুদিবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি দূর হয়ে গেছে। কিন্তু মহাত্মন পোল এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এই রিসালাত ইহুদি, অ-ইহুদি, বর্বর, গ্রিক, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য।"

আদইয়ানুল আলামিল কুবরা গ্রন্থে উলিয়াম ব্যাটনও এই মত প্রকাশ করেছেন। সবাই একথা স্বীকার করেছেন যে, ইহুদি পোলই প্রথম খ্রিষ্টধর্মকে বৈশ্বিক ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন এবং ইহুদিদের একক কোনো দল হওয়া থেকে বের করে নিয়েছেন, যাতে তাদের ঐক্যে ফাটল না ধরে। এ কারণেই পোল তার রায়ের স্বপক্ষে মসিহের বক্তব্য থেকে অকাট্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তাই আমাদের এ কথা বলার অধিকার আছে যে, খ্রিষ্টধর্মের বৈশ্বিকতা পোলের উদ্ভাবিত একটি বিদআত ও কুসংস্কার। কেননা, তিনি ভেতর থেকে ধ্বংস করার উদ্দেশেই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ধর্মের উৎস

ধর্মের উৎসজ্ঞান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের দুটো মত রয়েছে।

প্রথম মত : ধর্মের উৎস হলো মানুষ নিজেই। যেমন বুদ্ধ দাবি করেছিলেন, তিনি নিজের সত্তার মাঝে চিন্তা করে জগতের রহস্য, জীবন-মৃত্যুর হাকিকত উন্মোচন করেছেন। বর্তমান সময়ে মহর্ষি[৮] ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে

---

[৮] মহর্ষি = তার নাম মহেশ যোগী। আমেরিকাতে বসবাস করেন। তিনি একটি নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেন ক্রিয়েটিভ ইন্টিলিজেন্স সাইন্স। তার প্রখর বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানকে তার পাশে জড়ো করতে সক্ষম হন। তার ধ্বংসাত্মক আদর্শের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় মহর্ষি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন আরবি ও ইসলামি রাষ্ট্রে

এই মতাদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদার সবচেয়ে প্রাচীন উৎস বৈদান্তিক চিন্তাধারা দ্বারা মোটাদাগে প্রভাবিত। আকিদাটি হলো, এই জগৎই একমাত্র সত্য। ঈশ্বর হলেন তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি। তিনি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। যেহেতু উভয়ের মৌল একই। আর আমরা যে মানবসত্তা দেখি তা শুধু দৃষ্টির বিভ্রম। হিন্দু দর্শনে এর নাম হলো মায়া।

এখানে স্বল্প পরিসরে আমরা বেদান্ত গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই গ্রন্থটি হিন্দুদের নিকট নীতি ও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। আকারে ছোট হলেও হিন্দুদর্শনে এই গ্রন্থটির বিরাট প্রভাব রয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে গবেষকগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে জন্ম নেওয়া গৌতম বুদ্ধ ও মসিহ আলাইহিস সালামের মাঝামাঝি সময়ে এটি রচিত হয়েছে। কেননা, এর লেখক গৌতম বুদ্ধের অধর্মীয় শিক্ষার সমালোচনা করেছেন।

গ্রন্থটিতে চারটি অধ্যায় ও ষোলটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ব্রহ্মা তথা সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ও উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ওয়াহদাতুল উজুদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মবিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে মুক্তিলাভের উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, পূর্ণ দাসত্ব যেটাকে সুফিদের ভাষায় পূর্ণ বিলোপ বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে উপাসনায় সচেষ্ট ব্যক্তির প্রতিদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো, সুমহান আত্মার সাথে একীভূত হওয়া। কেননা, বেদান্ত তিনটি মূলনীতির স্বীকৃতি দেয়। সেগুলো হলো :

১। আত্মা অবিনশ্বর।

তিনি মহর্ষি ইউনিভার্সিটি খোলার প্রস্তাব দেন। রাবেতাতুল আলামিল ইসলামিতে সম্পৃক্ত থাকাকালিন আমাকে তার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আরবি ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে তার দাওয়াতি কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এই ব্যক্তিটি বলেন : প্রকৃতি নিয়ে গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় যা সীমিত দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় না। ধোঁকা ও প্রতারণার দায়ে এই ব্যক্তিটিকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল তা আজও অজানা।

২। জগৎই ঈশ্বর।

৩। সকল হাকিকতের পেছনে প্রতারণা লুক্কায়িত।

আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস (৫৫১-৪৭৯) আত্মিক ধ্যানের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি তার সাথিগণকে ধর্মীয় কিতাবাদিতে নজর দিতে নিষেধ করেন। তার চিন্তাধারা মানবদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করত। তার শিক্ষার ভিত্তি উচ্চমার্গীয় কিছু ছিল না। কথিত আছে, তিনি তার এক শিষ্যকে মৃত্যুচিন্তা করার কারণে তিরস্কার করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন : জীবন সম্পর্কেই যখন তোমার জ্ঞান নেই মৃত্যু সম্পর্কে কীভাবে জানবে?

এজন্যই এই সম্প্রদায়গুলোর সদস্যদেরকে অনেক অনেক কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ যেসব সমাজ জগতের পরিণতি ও জীবনের হাকিকত জানার জন্য শুধু বুদ্ধি ও চিন্তার উপর নির্ভর করে তাদের মাঝে পৌত্তলিকতা প্রকাশ পায়। অতঃপর লোকেরা প্রাকৃতিক বস্তু যেমন গাছ-গাছালি, নদ-নদী, পাথর এবং রহস্যময় শক্তি যেমন আত্মা, ফেরেশতা, জিন প্রভৃতির পূজা করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় মত : দ্বীনের উৎস হলো ওহি। এই মতাদর্শীরা দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে দ্বীন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। আর প্রথম মানব দ্বীন সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন ওহির মাধ্যমে। ওহির মাধ্যমে তিনি তাওহিদের দ্বীন গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির হাকিকত বা তাৎপর্য সীমিত বুদ্ধি দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়।

সকল আসমানি ধর্মের অনুসারীগণ এই মতকে গ্রহণ করেছেন। মুসলমানদের একটি জামাত তথা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, বিবেক দ্বারাই কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। ওহির প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তারা মানবসমাজের ব্যবস্থাপনার জন্য বিবেকান্দ্রীয়গুলোকে যথেষ্ট বলে না। বরং বিবেকান্দ্রীয়গুলোর শুদ্ধতার জন্য তারা ওহির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

এটিই হচ্ছে তাওহিদের আদিম সূত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে,তাওহিদই হলো মানবসমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস। পৌত্তলিকতা হলো আহুত ঘটনা ও পশ্চাদপদ বোধের অসুস্থতা।

হুইট এবং টি এইচ ম্যান কর্তৃক সম্পাদিত এন্ট্রোলজি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ল্যাং (Lange) বুশম্যান, জুলু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো আফ্রিকার

বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কতেক গোত্র এবং আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান কিছু গোত্রের মাঝে বড় ঈশ্বর আকিদার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই গোত্রগুলো হলো পরিবেশ ও সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত মানবজাতির সবচেয়ে আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একইভাবে শ্রোডিয়ার (Schroeder) প্রাচীন আর্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ব্রোকালম্যান (Brochelman) ইসলামপুর্ব সেমেটিকদের মাঝে তাওহিদের প্রমাণ দেখিয়েছেন। শেমিডেট (Schemidet) দাবি করেছেন মহান প্রভুর আকিদাটি পৃথিবীর সবগুলো প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে প্রচলিত ছিল।

মুসলিম সমাজে ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণা

ইবনে নদিমের *ফিহরাসত* গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত আরব উপদ্বীপ থেকে প্রথম গবেষক প্রতিনিধিদল বের হয়েছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে আব্বাসি খিলাফতের উজির ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকি এর সময়ে। তিনি এক ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন সেখানকার ধর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান লিখে পাঠানোর জন্য। লোকটি একটি কিতাব রচনা করে ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকির কাছে উপস্থাপন করেন। ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিনদির (মৃত : ২৫২হিজরি) হস্তাক্ষরে লিখিত হুবহু কিতাবটি ইবনে নদিমের হাতে পৌঁছায়। সেখানে হিন্দুস্থানের অবস্থা, হিন্দুদের অভ্যাস, উপাস্য সংখ্যা, পূজা-আর্চনার পদ্ধতি, উপাসনালয়ের পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ছিল।

ইবনে নদিম তার *ফিহরিসত* গ্রন্থের নবম প্রবন্ধে বলেন : "আমি একটি কিতাব থেকে এই লেখাটি অনুলিপি করেছি ২৪৯ হিজরির মুহাররাম মাসের তিন তারিখ জুমাবারে। এই কিতাবের ঘটনা সম্পর্কে আমি অবগত নই যে কিতাবটি কার রচনা? তবে আমি পুরো কিতাবটি ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দিরি হস্তলিপিতে দেখতে পেয়েছি। এই তরজমার অধীনে কিতাবটির ঘটনা লেখকের ভাষায় এভাবে লেখা রয়েছে : কোনো কোনো ধর্মতত্ত্ববিদ বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকি এক ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়েছিলেন সে দেশে পাওয়া যায় এমন কিছু ওষুধ নিয়ে আসার জন্য। পাশাপাশি সেখানকার ধর্ম সম্পর্কেও তাকে লিখিতআকারে জানাতে বলেন। তখন ব্যক্তিটি এই কিতাব লিখেন।"

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন :"আরবে যারা হিন্দুস্তানকে গুরুত্ব দিয়েছেন তারা হলেন বারামেকাগণ, বিশেষ করে ইয়াহইয়া বিন খালিদ।"[৯] এরপর তিনি উপাসনালয়গুলোর অবস্থা, মূর্তির নাম, হিন্দুদের দেবদেবীর পুজা-আর্চনা, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কল্পনা প্রভৃতি বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ হলো হিন্দুস্থানের ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের নিয়ে আলোচনা।

এরপর তিনি মুতাকাল্লিমিন ও মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখিত পঞ্চম প্রবন্ধে হাসান ইবনে আইয়ুব সম্পর্কে আলাচনা করেছেন। তার সম্পর্কে বলেন : তার ভাই আলি ইবনে আইয়ুবের কাছে লিখিত একটি পত্র আছে। সেখানে তিনি খ্রিষ্টানদের জবাবি আলোচনা ও তাদের বক্তব্যের অসাড়তা বর্ণনা করেছেন।[১০]

এ থেকেই সুইস বিজ্ঞানী এডাম ম্যাটের দাবির ভুল উন্মোচিত হয়। তিনি তার *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়া ফিল করনির রাবে* (চতুর্থ শতাব্দীতে ইসলামি সভ্যতা) নামক গ্রন্থে বলেন : "মুসলমানরা চতুর্থ শতাব্দীতে এসেই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে।"[১১] এটি মুসলমানদের ওপর জুলুম ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। কোনো কোনো মুসলিম লেখকও তার এই বক্তব্যের অনুসরণ করেছেন। তারা মুসলমানদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞদের কাতারে ফেলে দিয়েছেন। বাস্তবতা হলো, তারাই বরং ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ।

চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলমানদের মাঝে জ্ঞানের এই শাখাটি উন্নতি লাভ করে। এ বিষয়ে অনেক লেখকেরও আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম আমরা মৃত্যুসন অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি।

১। নবুখতি (মৃত্যু : ৩১০ হিজরি)

তার নাম হাসান ইবনু মুসা ইবনু হাসান আন-নবুখতি। *ফিরাকুশ শিয়া* গ্রন্থের লেখক। পারস্য বংশদ্ভূত। বাগদাদে থিতু হয়েছিলেন। শিয়া ও

[৯] আল-ফিহরাসত, পৃষ্ঠা : ৪৮৪। হিন্দুস্থান নিয়ে বরমকিদের এই গুরুত্বারোপের কারণ সম্ভবত তাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারনে। বরং বলতে গেলে তারা ছিলেন তুর্কিস্তানে বৌদ্ধদের উপসনালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। বরমকি শব্দের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ দাঁড়ায় উপাসনালয়ের প্রধান।
[১০] পৃষ্ঠা : ২৪৬
[১১] আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা পোষণ করতেন। *আল-আরা ওয়াদ-দিয়ানাত* নামে তার আরেকটি কিতাব আছে। তবে তিনি কিতাবটি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তার আরেকটি কিতাবের নাম হলো *আররদ্দু আলা আসহাবিত তানাসুখ*।

২। মাসউদি (মৃত্যু : ৩৪৬ হিজরি)

তার পুরো নাম আলি ইবনুল হুসাইন ইবনু আলি। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বংশধর। তিনি একাধারে ইতিহাসবেত্তা, পরিব্রাজক ও গবেষক। বাগদাদের অধিবাসী মাসউদি ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোক। তার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *আল-মাকালাত ফি উসুলিদ দিয়ানাত* ও *আলমাসাইলু ওয়াল মিলাল ফিল মাযাহিবি ওয়ান নিহাল*।

৩। আল-মাসবাহি (মৃত্যু : ৪২০ হিজরি)

তার নাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মাসবাহি। হারান প্রদেশের অধিবাসী। সাহিত্য ও ইতিহাসের পণ্ডিত। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তার লিখিত গ্রন্থের নাম *দরকুল বুগইয়া ফি ওয়াসফিল আদইয়ান ওয়াল ইবাদাত*।

৪। আবু মনসুর আল-বাগদাদি (মৃত্যু : ৪২৯ হিজরি)

তিনি আব্দুল কাহের আল-বাগদাদি আল-ইসফারাইনি। তিনি উসুলের ইমাম ছিলেন। তার গ্রন্থ *আল-ফরকু বাইনাল ফিরাক* (মুদ্রিত)। ধর্ম সম্পর্কে তার কিতাব *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*। তবে কিতাবটি সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না।

৫। আল-বেরুনি (মৃত্যু : ৪৪০ হিজরি)

তার নাম মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আবু রাইহান আল-খাওয়ারেজমি। কয়েক বছর হিন্দুস্থানে ছিলেন। এ সময়ে তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ, আকিদা-বিশ্বাস ও চাল-চলন সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *তাহকিকু মা লিল হিন্দি মিন মকুলাতিন মকবুলাতিন ফিল আকল আও মরযুলাহ* রচনা করেন। এটি মুদ্রিত পাওয়া যায়।

এডাম ম্যাট বলেন : তিনি তার কিতাবে হিন্দুস্থানের সঠিক বর্ণনা বিবৃত করেছেন। এটি কোন বিতর্কের কিতাব নয়। তাই প্রতিপক্ষ এর বিরোধীতা করেনি। ...[১২]

৬। ইবনে হাযম (মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরি)

তার নাম আলি ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ ইবনে হাযম। জাহেরি মাজহাবের ইমাম এবং আন্দালুসের মুহাদ্দিস। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে লিখিত প্রচুর কিতাব সম্পর্কে তার অবগতি ছিল। তিনি দেখলেন সেগুলোর কতেক অতি দীর্ঘ আর কতেক অতি সংক্ষিপ্ত। কতেক প্রয়োজনীয় আলোচনামুক্ত আর কতেক অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় ভরপুর। এগুলোতে রয়েছে ভুল ও অহেতুক আলোচনা। তাই তিনি এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলেন। এবং ইসলামের ইতিহাসে ইহুদি, খ্রিষ্টান, তারকাপুজারি ও পৌত্তলিকদের সম্পর্কে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবটির নাম হলো *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান-নিহাল*। এটি বাজারে মুদ্রিত পাওয়া যায়।

৭। শাহরাসতানি (মৃত্যু : ৫৪৮)

তার নাম মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম আবুল ফাতাহ। তিনি শাহরাসতানি নামে পরিচিত। একজন মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বের ইমাম। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক গ্রন্থ সম্পর্কে অবগতির পরই রচনা করেছিলেন। তার কিতাবের ভূমিকা থেকে এটাই বুঝা যায়। তিনি সেখানে বলেন : "যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের রচনা ও মনোবৃত্তির অনুগামী ব্যক্তিবর্গের আলোচনা অধ্যয়ন, এগুলোর উৎস সম্পর্কে অবগতি, প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিষয়সমূহ আহরণ করার তাওফিক দিলেন, তখন আমি এগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশ করতে মনস্থ করলাম যেখানে সকল ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ সংকলিত হবে। ফলে শিক্ষা অর্জনে আগ্রহীদের জন্য এতে খোরাক থাকবে।" বাস্তবেই তার কিতাবটিকে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে জানার বিশ্বকোষ বিবেচনা করা হয়। ইবনে হাযমের কিতাবটির সাথে

---

১২ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৫

সাথে তার কিতাবটিও মুদ্রিত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এটি মুহাম্মদ সাইয়িদ কিলানির তাহকিকসহও ছাপা হয়েছে।

৮। আবু উবাইদা আল খাযরাজি (মৃত্যু : ৫৮২ হিজিরি)

তার নাম আবু জাফর আহমদ বিন আবদুস সামাদ বিন আবু উবাইদা আল-আনসারি আল-খাযরাজি। তিনি আন্দালুসের ফকিহ ও *বাইনাল মসিহিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম* গ্রন্থের লেখক।

আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের হাতে কর্ডোভার পতন ঘটালেন, সেখানকার রাজত্ব যখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, অধিবাসীরা যখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল তখন কিছু খ্রিষ্টান পাদরি মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসে সন্দেহের বীজ বপন করার হীন চেষ্টা শুরু করে। পাদরি হান্না মাক্কার দুঃসাহস দেখিয়ে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিত্ব আবু উবাইদা আল-খাযরাজিকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানায়। তখন আবু উবাইদা তার ধারণাগুলোর অপনোদন করে এবং আল্লাহর দীনে সে কী কী বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ব্যাখ্যাসমেত গ্রন্থ রচনা করেন। তার এই গ্রন্থটি ড. মুহাম্মদ শামার তাহকিকসহ প্রকাশিত হয়েছে।

কিতাবটিতে যেসব বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে তন্মধ্যে ছিল—

খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, মসিহের ক্রুশারোহণ, আদিপাপ, মসিহ আলাইহিস সালামের মুজিযা, হাওয়ারিগণের মুজিযা, মসিহের প্রকৃতি, চার্চসমূহে প্রকাশিত অতিপ্রাকৃত বিষয়, তাওরাত ও ইনজিলের বিধিবিধান, খ্রিষ্টধর্মের তালাক, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে একাধিক স্ত্রী, তিন ধর্মে যুদ্ধের বিধান, তাওরাত ও ইনজিলের বিকৃতি, তিন ধর্মে আখিরাতের প্রতিদানের ধারণা প্রভৃতি।

৯। ইবনু তাইমিয়া (মৃত্যু : ৭২৮ হিজরি)

শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনু আবদুল হালিম বিন আবদুস সালাম আল-হাররানি *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ* গ্রন্থের লেখক। এই কিতাবটি মসিহ আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীনে নাসারাদের মিথ্যা রটনার খণ্ডনে রচিত একটি সমৃদ্ধ কিতাব। এটিও প্রকাশ পেয়েছে।

১০। ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি)

তিনি ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আদ-দামেশকি। ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি *হিদায়াতুল হিয়ারা ফি আজবিবাতিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই কিতাবটি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাপা হয়।

এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধর্ম ও দল-উপদল সম্পর্কে রচনা চলতে থাকে। পাশাপাশি ইসলামের শত্রু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডনে হিন্দুস্থানের ওলামাগণের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা রয়েছে। খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে শায়খ রহমতুল্লাহ বিন খলিলুল্লাহ কিরানবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ইযহারুল হক লিবায়ানি তাহরিফিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা ফিল কুতুবিল মুনাযযালাহ* রচনা করেন। এই কিতাবটি ইসলামি গ্রন্থজগতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজিরবিহীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কিতাবটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

ড. আহমদ হিজাযি আসসাকা ইযহারুল হকের ভূমিকায় বলেন : "শায়খ রহমতুল্লাহ ১২৮১ হিজরিতে তুরস্কের কনস্টান্টিনোপোলে আরবি ভাষায় কিতাবটি রচনা করেন। এরপর ইবরাযুল হক নামে এটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়। এরপর উসমানি হুকুমত ইংরেজি, ফরাসিসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনুবাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। এ সব সংস্করণের মধ্যে রয়েছে ১২৯৪ হিজরি, ১৩০৫ হিজরি, ১৩১৬ হিজরি, ১৩০৯ হিজরি ও ১৩১৭ হিজরির সংস্করণ। প্রফেসর সলিমুল্লাহ এটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু অদ্যবদি এটি ছাপা হয়নি। শায়খ গোলাম রায়নদিরি এটিকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। একইভাবে একজন গুজরাটি আলেম এটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

সর্বশেষ এই কিতাবটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়। শায়খ (মুফতি) মুহাম্মদ শফি রহ. এর সন্তান শায়খ মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা. বা. এর টিকা লিখেন।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এই কিতাবের বিষয়বস্তুকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হিন্দুস্থানের আরও অনেক ওলামায়ে কেরামের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে উপযুক্ত ও সফল উদ্যোগ রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ

কিছু হিন্দু ও শিখ রাজন্যবর্গের সহায়তায় হিন্দুস্থানে মুসলিম মুগল শাসনের বিপরীতে তাদের উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম সেখানে অভিযুক্তের কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ে। একদিক থেকে হিন্দুদের আক্রমণ। অপর দিক থেকে ইংরেজদের আক্রমণ। এ সময়ে হিন্দুদের মধ্য থেকে- তাদের ভাষ্য অনুযায়ী- কিছু সংস্কামনস্ক নেতৃবর্গের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিলেন দয়ানন্দ শাস্ত্রী (১৮৩৪-১৮৭৭)। তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যথার্থ প্রকাশ নামে তিনি বিপজ্জনক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও তীব্রভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করেন। আর্যসমাজ গ্রন্থটির পক্ষে একপেশে নীতি অবলম্বন করে। তারা গ্রন্থটিকে হিন্দুস্থান ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে। উল্লেখ্য এককভাবে হিন্দুস্থানে চৌদ্দটিরও বেশি ভাষা আছে। অতঃপর এই বিষাক্ত গ্রন্থটি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে মুসলমানরা অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তাআলা আহলে হাদিসের নেতা সানাউল্লাহ অমৃতসরিকে প্রস্তুত করে দিলেন। তিনি তার কলমকে প্রসারিত করলেন। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে লাগলেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'হক প্রকাশ', যা তিনি দয়ানন্দের গ্রন্থের খণ্ডনে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দয়ানন্দের অজ্ঞতা, আল্লাহ কিতাবের বিকৃতকরণ ও আর্যসংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। একইভাবে তিনি খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন পুস্তক যেমন, আল-ইসলাম ওয়াল মসিহিয়্যাহ, তাকাবুলে সালাসা প্রভৃতি গ্রন্থেরও খণ্ডন করেছেন। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে বিতর্কের আহ্বান জানান। মৃত্যু পর্যন্ত তার এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান ছিল। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

সবকিছু ভুলে গেলেও শায়খ ইমামুদ্দিন রামনগরি রহ. এর কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়। তিনি সারাটা জীবন উর্দু ও হিন্দি ভাষায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন। তার গ্রন্থগুলো দ্বারা অনেক হিন্দু যুবক প্রভাবিত হয়। তাদের অনেককেই আল্লাহ তাআলা ইসলামের হিদায়াত দান করেন। শায়খ রামনগরি ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বিভিন্ন বাতিল ধর্মের খণ্ডনে তিনি বিশটিরও বেশি গ্রন্থ রেখে যান।

এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে আমি ইঙ্গিত করতে চাই। তা হলো হিন্দু লেখকদের ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণার কিছু কারণ আছে। মুসলমানরা দীর্ঘ আট শতাব্দী যাবৎ শাসন করা সত্ত্বেও তারা ইসলামি গ্রন্থগুলোকে হিন্দুস্থানের ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নেননি। সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, যে সংস্কৃতকে একটি প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো এ ভাষাতেই রচিত। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যবিদদের লিখিত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেন যে প্রাচ্যবিদরা ইসলামের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করত না। এর পর তারা নির্ভর করত শিয়াদের রচনার ওপর। হিন্দুস্থানে ইসলাম সম্পর্কে ভীনদেশি ভাষা যেমন ইংরেজি ইত্যাদিতে লেখালেখির কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের অধিকাংশই শিয়া।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করি। আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য হিন্দি ভাষায় লিখিত সবচেয়ে বড় কলেবরের গ্রন্থটির নাম *বিশ্ব ধর্ম*। এর লেখক বিহারি লাল বরমা। এই গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায় ইসলাম সম্পর্কে। লেখক যেসব রেফারেন্স বই থেকে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করেছেন সেগুলোতে নজর বুলিয়ে আমি মুসলিম লেখকদের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ তালিকাতে পাইনি। এখানে বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য পাঠক সমীপে রেফারেন্স বইগুলোর তালিকা উপস্থাপন করা উচিত মনে করছি।

প্রথম : *ইসলাম ধর্ম কি রুপরেখা*। লেখক রাহুল সেন চক্রবর্তী হিন্দু।

দ্বিতীয় : *আইয়াদুল ইসলাম*। লেখক মহেষ প্রসাদ হিন্দু।

তৃতীয় : *যথার্থ প্রকাশ*। লেখক দয়ানন্দ। তার আলোচনা আগে করা হয়েছে।

চতুর্থ : *তরজমাতু মাআনিল কুরআন*। লেখক মুহাম্মদ আলি কাদিয়ানি (লাহোরি)।

পঞ্চম : *Mohammad The Prophet Of Desert*। লেখক কে এল কাব্য।

ষষ্ঠ : *Philachfi Of Qura-an*। লেখক জি সরওয়ার।

সপ্তম : *Nation Of Islam*। লেখক মির্জা নাদের বেগ শিয়া।

অষ্টম : *আলইসলাম*। লেখক এনি বাসন্তি।

নবম : *Islamic Culture*। লেখক এ ফয়েজ শিয়া।

এইগুলো হচ্ছে রেফারেন্স বই। ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক যেগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন। এই হতভাগা ইসলাম সম্পর্কে আর কিই বা লিখবে বলে আশা করা যায়? অথচ তার এই গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত বহুবার ছাপা হয়েছে এবং এটি বিশিষ্ট-সাধারণ নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ।

তাই সেসময় থেকে নিয়ে অদ্যবধি মুসলমানদের জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বকোষ রচনা করা জরুরি, যাতে এটি ব্যাপকভাবে সমস্ত অমুসলিমদের এবং বিশেষভাবে অমুসলিম লেখকদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলাই উত্তম অভিভাবক এবং সাহায্যকারী।

—লেখক

মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত
১০ রমজান ১৪০৪ হিজরি
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. অবিভক্ত ভারতের আজমগড়ের একটি সাধারণ হিন্দু পরিবারে ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তিনি সেখানেই লেখা-পড়া করেন। এ সময়ে তিনি ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়নের পর তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি শায়খ আবুল আলা মওদুদি রহ. এর *দ্বীনে হক* পুস্তিকাটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড় শিবলি কলেজে পড়াকালীন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল বঙ্কেরাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নাম পাল্টে রাখেন ইমামুদ্দিন। পরবর্তীতে হিন্দুদের নির্যাতনের ভয়ে তিনি পুনরায় নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাখেন। প্রথম দিকে গোপনে সালাত ও সাধ্যমতো ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করলেও একসময় তা পরিবারে জানাজানি হয়ে যায়। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনরা মেনে নিতে পারেনি। তাকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা পুরোদমে চেষ্টা করতে থাকেন। তারা তার হাতখরচ ও লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেয়। প্রাণনাশের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন।

পাকিস্তানে তিনি শায়খ আবুল আলা মওদুদি রহ. এর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামি কর্তৃক পরিচালিত একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদরাসার ন্যায় উক্ত মাদরাসায়ও ফিকহে হানাফি অনুযায়ী পাঠদান করা হতো। কিন্তু তিনি ফিকহি ও ফিকরি দিক থেকে এই

জামাতের সাথে একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত আলোচনা তিনি তার *আবু হুরাইরা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি সৌদি আরবে হিজরত করেন। সেখানে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে হাদিস নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি হাদিস, তাফসির, ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতি তার ঝোঁক ছিল প্রবল।

কর্মজীবনে ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. প্রথমে মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির জেনারেল সেক্রেটারির অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সেখানকার হাইআতুত তাদরিসের (শিক্ষক পরিষদ) সদস্য মনোনীত হন। ধীরে ধীরে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি সেখানকার কুল্লিয়াতুল হাদিসের (হাদিস ফ্যাকাল্টি) প্রধান মনোনীত হন। এ সময়ে তিনি ছাত্রদের গবেষণাপত্রের সুপারভিশনের পাশাপাশি সহিহুল বুখারি, সহিহু মুসলিমসহ বিভিন্ন বিষয়ে দরস দিতেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমিকে সৌদি সরকার অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করে। তৎকালীন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির সেক্রেটারি শায়খ মুহাম্মদ বিন আলি আল-হারাকানের সুপারিশে তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে নববির খেদমতে ব্যয় করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আরবি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি অনেকগুলো কিতাবের তাহকিকও (সম্পাদনা) তার কলমে সম্পন্ন হয়।

হিজরত করে সৌদি আরবে থিতু হলেও ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ভারতে নিজ পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পিতা-

মাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও যোগান দিতেন। তিনি সর্বদা পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু সামাজিক লজ্জার অজুহাতে তারা সবসময় তা এড়িয়ে যেতেন। এতদসত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতিসদাচারে তিনি কোনরূপ ত্রুটি করতেন না।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা, তাহকিক ও টিকা সংযোজন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আলজামেউল কামিল ফিল আহাদিসিস সহিহিশ শামিল (১২ খণ্ড)।
২. ইবনে তাল্লা কর্তৃক রচিত আকজিয়াতু রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাহকিক ও টিকা সংযোজন)।
৩. আবু হুরাইরা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি।
৪. আল-ইয়াহুদিয়্যা ওয়াল মসিহিয়্যা।
৫. ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ।
৬. আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা (তাহকিক)।
৭. আলমিন্নাতুল কুবরা শরহু ও তাখারিজুস সুনানিস সুগরা।
৮. দিরাসাতুন ফিল জরহি ওয়াত তাদিল।
৯. আমালি ইবনু মারদুয়াই (তাহকিক)।
১০. মুজামু মুসতালাহিল হাদিস ওয় লাতাইফুল আসানিদ।
১১. আততামাসসুক বিস সুন্নাহ ফিল আকাইদি ওয়াল আহকাম।
১২. দাওয়াতুল কুরআন।
১৩. কুরআন এনসাইক্লোপিডিয়া।
১৪. কুরআন কি শিতল ছায়া।

এছাড়াও তার বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ মদিনা ইউনিভার্সিটি জার্নালসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি বিগত ৯ ই জিলহজ ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ৩০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার আরাফার দিনে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও বরেন্য ব্যক্তিবর্গ শোক প্রকাশ করেন।



সূচিপত্র

তৃতীয় অংশ

গীতপুস্তক-১৮২

নবিগণের পুস্তক-১৮৯

পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-২০২

পুরাতন নিয়মের অনুলিপি-২১৭

পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি-২১৯

আলোচনার সারনির্যাস-২২৯

ইহুদিদের দল-উপদল-২৩২

তালমুদ (TALMUD)-২৪৪

তালমুদের কয়েকটি বাণী-২৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

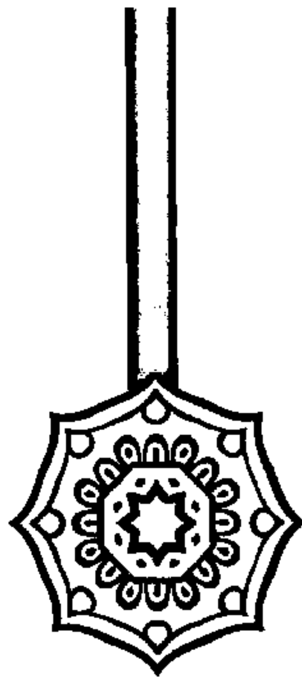
পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ-৪২৭

নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ-৪৪২

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ-৪৬৩

প্রথম অধ্যায়

ইহুদি জাতির ইতিহাস



ইতিহাসের দর্পণে ইহুদি জাতি

প্রাচীনকাল থেকে ফিলিস্তিন এবং তার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলোকে কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই উর্বরতার কথা বিবেচনা করে ইংরেজরা এ অঞ্চলের নাম দিয়েছিল 'উর্বর বাঁকা চাঁদ' (fertile crescent)। ভূখণ্ডটির ভৌগোলিক প্রকৃতি ও গুরুত্বের কারণেই এই নামকরণ করা হয়। সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডানের পশ্চিমাঞ্চল, ইরাক এবং নীলনদ সংলগ্ন কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল এই 'উর্বর বাঁকা চাঁদ'।

প্রাচীনকালে মরু-অঞ্চলগুলোতে শুষ্কতা বাড়তে থাকলে মানুষ ও জীবজন্তু স্থায়ী পানির উৎসের কাছাকাছি স্থানে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক তথ্যমতে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন আবাসপরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল আরব উপদ্বীপের কানানিদের (Canan) মাধ্যমে।

কানানিদের (Canan) আদি উৎস

কানানিরা মূলত নুহ আলাইহিস সালাম-এর পৌত্র কানান ইবনে হাম এর বংশধর। আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদেরকে তার দিকে সম্বন্ধ করে কানানি বলা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তারা হিজরত করে মধ্য ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। তাদের নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় কানান, যার কথা তাওরাতে বারংবার

এসেছে। প্রাচীন ফিলিস্তিন সভ্যতার গোড়াপত্তনে তাদের ভূমিকাই ছিল সর্বাগ্রে। দক্ষিণ ইরাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় কানানিদের বসতিগুলোও ছিল ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো সর্বদা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের একটা অংশ লেবানন পর্বতমালার পাদদেশে গিয়ে সংঘবদ্ধ নিবাস গড়তে বাধ্য হয়। পাহাড়ের পাদদেশে কাননিদের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর গোড়াপত্তন এভাবেই হয়েছিল। কানানিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন অঞ্চলে বসতি গড়া এই লোকগুলো গ্রিকদের ভাষায় ফিনিশিয় (Phoenicia) নামে পরিচিত।[১] যার অর্থ—লাল রক্তবর্ণের অধিকারী।

রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এই ফিনিশিয়রা কানানিদের সাথে একীভূত ছিল। সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাব লি বোন (Gustav Le Bon) মনে করেন, ফিলিস্তিন নামক একটি অসেমিটিক গোত্র গ্রিসের ক্রিট (Crete) দ্বীপ থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে রাজত্ব স্থাপন করে।[২]

খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপ থেকে দলে দলে মানুষ বিশেষ করে কানানিরা এ অঞ্চলে হিজরত করে। এই কানানিদের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো জেবুসি (Jebusite)। এদের হাতেই প্রথম ঐতিহাসিক নগর আল-কুদস তথা জেরুজালেম (Jerusalem) এর গোড়াপত্তন হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ শহরের দুর্গগুলোতে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণার পর এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, এই দুর্গগুলো খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। অর্থ্যাৎ ইবরানিদের[৩] এ অঞ্চলে আক্রমণের আটশ বছর পূর্বে।

তাওরাতে বর্ণিত গোত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম গোত্র হলো আমালেকা। এরা একদম খাঁটি আরব জনগোষ্ঠী। ইবরানিদের (Hebrews) আগমনের পূর্বে এরা ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করত। ইসরাইলি প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মত হলো এরা ইসহাক ও তার সহধর্মিণী রেবেকা এর পুত্র এষৌ (Esau) এর বংশধর। ইউশা[৪] ইবনে নুনের তিরোধানের পর ফিলিস্তিনে আগমনকারী বহিরাগত ইসরাইলিরা গাজা ও ইকরোন (Ekron) এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।[৫] কিন্তু তাদের

---

[১] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত-তারিখ*, পৃ. ১৯

[২] *আল-ইয়াহুদ ফি তারিখিল হাদারাতিল উলা*, পৃষ্ঠা : ২১

[৩] ইবরানি একটি ব্যাপক শব্দ। বনি ইসরাইল ও অন্যান্য অনেক জাতির জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো রূপক অর্থে শুধু ইসরাইলিদের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসবে। এখানে ইবরানি বলতে ইসরাইলিদেরকে বুঝানো হয়েছে।—অনুবাদক

[৪] ইসরাইলি গ্রন্থগুলোতে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যিহোশুয়। ইসলামি গ্রন্থগুলোতে ইনি ইউশা ইবনে নুন নামে পরিচিত। হাদিসেও তার নাম উল্লিখিত হয়েছে।—অনুবাদক

[৫] বিচারকগণের পুস্তক, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৮।

এই কর্তৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিচারকদের যুগের (The Era of Judges) শেষের দিকে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলিদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাবুত (Ark of the covenant) দখল করে নেয়। তখন থেকে নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের শাসনাধীনে ছিল। এ সময়ে স্যামসন (Samson) এর আগমন ঘটে এবং তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্যামুয়েলের যুগে ইসরাইলিরা উপকূলীয় শহরগুলোতে প্রত্যাবর্তন করে, যেগুলো এতদিন ফিলিস্তিনিদের দখলে ছিল।

ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত এই যুদ্ধগুলোতে জয়-পরাজয়ের পাল্লা উঠানামা করত। কখনো ফিলিস্তিনিরা জয়ী হতো আবার কখনো ইসরাইলিরা। একপর্যায়ে বাদশাহ শৌল (Saul)-এর পর আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম শাসন ক্ষমতায় আসেন এবং ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে তাবুত (Ark of the covenant)[৬] উদ্ধার করেন।[৭]

প্রাচীন অ্যাসেরিয়ান (Assyrian) ও মিশরীয় লিপিতে ফিলিস্তিনিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ লিপিগুলোতে তাদের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে (Palastu) কিংবা (Pilistu) নামে। ইউনানি পরিভাষায় যেটা Philistia নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। আমুন (Amun) দেবতা-র উপাসনাগৃহের দেয়ালে তৃতীয় র‍্যামেসিস (Third Ramesses) কর্তৃক খোদাইকৃত এ সংক্রান্ত বহু তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।[৮]

ফুরাত (Eufrates) নদীর অববাহিকা থেকে উঠে আসা আরামীয়দের (Arameaus) কয়েকটি গোত্র জর্ডান নদীর উত্তর-পূর্বে বসবাস করতো। তন্মধ্যে উত্তরাংশে আম্মুন (Ammon), মধ্যবর্তী এলাকায় মোয়াবি (Moabite) এবং দক্ষিণাংশে ইদম (Edom) সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old testament) এর আদি-পুস্তক (Book of Genesis) এর দশম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদে এদেরকে আরাম ইবনে সাম ইবনে নুহ এর বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ তথ্যমতে কুরআনে বর্ণিত ইরাম (إرم) শব্দটি মূলত এদের নাম থেকেই

[৬] বনি ইসরাইলের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী একটি পবিত্র সিন্দুক। সিনাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এটি নির্মাণ করা হয়। এরপর এতে দশ আজ্ঞা বিশিষ্ট ফলকদ্বয়, মান্না-সালওয়া ভরতি একটি পাত্র এবং মুসা আ. এর লাঠি সংরক্ষণ করা হয়। ইসারাইলিরা যেখানেই যেত এই সিন্দুকটি বহন করে নিয়ে যেত। ইবাদতগৃহের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে তারা এটিকে স্থাপন করত। পরবর্তিতে সুলাইমান আ. এর যুগে এটি খোলা হয়। কিন্তু ভেতরে ফলকদ্বয় ব্যতিত আর কিছুই পাওয়া যায়নি।—অনুবাদক

[৭] এখানে তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও ইসলামি গ্রন্থগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী বাদশাহর নাম ছিল তালুত। তার সময়েই ইসরাইলিরা তাদের লুণ্ঠিত তাবুত ফিরে পায়। দাউদ আ. ছিলেন তালুতের বাহিনীর একজন সদস্য। তালুতের পর তিনি বাদশাহ হন।—অনুবাদক

[৮] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ১০৫

উৎকলিত। এই গোত্রগুলো খুব স্বল্প সময়ে যাযাবর জীবন থেকে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তাদের বর্তমান অবস্থানস্থলের উর্বরতা এই পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই ছিল প্রাচীন ফিলিস্তিন ও প্রতিবেশী গোত্রগুলোর বিবরণ।[৯]

হাইকলে সুলাইমানি ও মসজিদে আকসা

১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইল জেরুজালেম ও এর আশেপাশে সুড়ঙ্গসহ নানা ধরনের খননকার্য শুরু করে। বিশেষ করে কুব্বাতুস সাখরা (Dome of The Rock) এবং মসজিদে আকসার নিচে তারা তাদের কল্পিত হাইকেলে সুলাইমানির[১০] অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু তাদেরকে নিরাশ হতে হয়। কল্পিত হাইকেলে সুলাইমানির অস্তিত্ব পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো সেখানে এমন কিছু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো এই শহর আরব্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং ইবরানিদের সাথে এই শহরের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। ব্যাবিলনীয় এবং ইরানিদের আক্রমণের পর সেখানে ইসরাইলিদের কোনো ধরনের চিহ্ন আর অবশিষ্ট ছিল না। বিশেষ করে সম্রাট টাইটাস (Titus) আক্রমণের পর তার কোনো এক দেবতার নামে সেখানে বিশাল এক উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। এমনকি জেরুজালেম নাম পাল্টে দিয়ে ইলিয়া নামকরণ করেন।

---

[৯] এ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে সাইয়েদ সুলাইমান নদভি কর্তৃক রচিত তারিখু আরদিল কুরআন, ড. আহমাদ সওসা রচিত *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, গুস্তাব লি বোন কর্তৃক রচিত *তারিখুল হাদারাতিল উলা* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে।

[১০] ইহুদিদের বিশ্বাস মতে দাউদ আ. একটি ইবাদতগৃহ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তার সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর তার পুত্র সুলাইমান আ. সেটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এটিই ইহুদিদের কাছে হাইকলে সুলাইমান (Solomon's Temple) নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে ইহুদিদের কাছে এই হাইকলের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুলাইমান আ. এর ইন্তেকালের পর ইহুদিরা অভ্যন্তরীণ কলহে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বহিঃশক্তির আগ্রাসনের শিকার হয়। এসব অভিযানে হাইকলও বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি একাধিকবার সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাঙা-গড়ার এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। সর্বশেষ ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হেরোড ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তারা আর কখনোই একত্র হতে পারেনি। ফলে হাইকলের পুনর্নির্মাণ করতে পারেনি।

এই হলো হাইকল সম্পর্কে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের এই হাইকল কাহিনির নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ তারা এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। সুলাইমান আ. কর্তৃক আদৌ এমন কিছু নির্মাণের বিবরণ সুপ্রমাণিত নয়।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসেল নগরীতে থিওডর হারজেলের সভাপতিত্বে জায়নবাদীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারা দাবি করে—বর্তমান মসজিদে আকসার স্থানেই ছিল তাদের হাইকলে সুলাইমান। সুতরাং তাদের দাবিমতে মসজিদে আকসাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তদস্থলে তাদের হাইকলের পুনর্নির্মাণ করতে হবে। দাবি করলেও দাবির স্বপক্ষে তারা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। এমনকি মসজিদে আকসার নিচে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি করেও হাইকলের অস্তিত্ব প্রমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো নিদর্শনও তারা পেশ করতে পারেনি। হাইকলের গল্প যেন আজও রূপকথারই গল্প।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদে আকসার নির্মাণ সম্পর্কে *সহিহুল বুখারিতে* আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম—

أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلا؟ قَالَ: «اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «اَلْمَسْجِدُ الأَقْصَىٰ» قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً».

পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, "মসজিদে হারাম।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, "মসজিদে আকসা।" আমি বললাম উভয় মসজিদের নির্মাণের মাঝে কতদিন ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন "চল্লিশ বছর।"[১১]

ইমাম আযরাকিসহ আরও অনেকেই মসজিদে হারাম নির্মাণসংক্রান্ত বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। এসব রেওয়ায়াতের সারমর্ম হলো, মসজিদে হারামের প্রথম নির্মাতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম। সুতরাং এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মসজিদে হারাম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর তারই কোনো পুত্র মসজিদে আকসার ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রশ্ন আসতে পারে—তাহলে কাবাঘরের নির্মাতা হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নাম সবার আগে আসে কেন? সে ক্ষেত্রে আমরা বলব, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মসজিদে হারামের প্রথম নির্মাতা নন। বরং তিনি হলেন পুনর্নির্মাতা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

যখন আমি ইবরাহিমকে বাইতুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। [সুরা হজ, আয়াত : ২৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১১] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৬ পৃষ্ঠা : ৪০৭

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাঘরের ভিত তুলছিলেন। তারা দুআ করলেন, হে আমাদের রব, আমাদেরকে কবুল করুন। নিশ্চই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৭]

এই দুটি আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে স্থানে কাবা নির্মাণ করেছেন সেটি পূর্ব থেকে বাইতুল্লাহর জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল।

আল্লামা ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরগ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহর আগের ভিতের ওপরই তার নির্মাণকাজ করেছিলেন।

এ ছাড়া বাইতুল্লাহর পূর্ব অস্তিত্বের বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সেই বিখ্যাত দুআ থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .

হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার পরিবারের কতেককে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে তরুলতাহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭]

এই দুআটি তিনি করেছিলেন প্রথমবারের মতো শিশুপুত্র ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহর নির্দেশে এই মরুপ্রান্তরে রেখে যাওয়ার সময়। আর তিনি বাইতুল্লাহর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছিলেন পরবর্তী সফরে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্মাণের পূর্বেই বাইতুল্লাহর নির্মাণ সংঘটিত হয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ .

নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ঘর যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৯৬]

আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবিরই ইবাদতগৃহ ছিল। বাইতুল্লাহই যেহেতু প্রথম নির্মিত ঘর তাই নিঃসন্দেহে এটি অন্যান্য নবিদের ইবাদতগৃহ নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। আর হাদিসের ভাষ্যমতে বাইতুল্লাহর প্রথম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর মসজিদে আকসা প্রথমবারের মতো নির্মিত হয়েছিল। আর সেটা আদম আলাইহিস সালামের সময়কালে হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। দাউদ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মসজিদে আকসার যে নির্মাণের কথা বলা হয় সেটাও ছিল পুনর্নির্মাণ। প্রথম নির্মাণ অন্য কারও হাতে সম্পাদিত হয়। অতঃপর, কালের আবর্তনে মাটিতে মিশে গিয়ে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়। এরপর সে ভূমিতে নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠে। তাদের কাছ থেকে স্থানটি ক্রয় করে দাউদ আলাইহিস সালাম মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করেন। আর তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। অতঃপর আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি হিসেবে সকল নবির ওয়ারিশ। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসাতে তাকে রাত্রিকালীন সফর করানো হয়েছে। সুতরাং, তাঁর অবর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতই উত্তরাধিকারসূত্রে এই মসজিদে আকসার মালিক হওয়ার অধিক উপযুক্ত। 'মসজিদে আকসা' এর শাব্দিক অর্থ হলো দূরপ্রান্তের মসজিদ। এটি কুরআন-প্রদত্ত নাম। ইসরাইলি গ্রন্থগুলোতে এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা মসজিদে নববির তুলনায় দূরে বিধায় এ নামকরণ করা হয়েছে। নবিজির ইসরা যখন সংঘটিত হয় তখনো মসজিদে নববি নির্মাণ হয়নি। এতৎসত্ত্বেও এ নামকরণের পেছনে এই ইঙ্গিত ছিল যে অচিরেই আরেকটি পবিত্র মসজিদ নির্মিত হবে যা মসজিদে আকসার তুলনায় মসজিদে হারামের নিকটবর্তী।

মোদ্দাকথা, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে মসজিদে আকসা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোর ওপর মুসলমানদের অধিকারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মসজিদে আকসা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

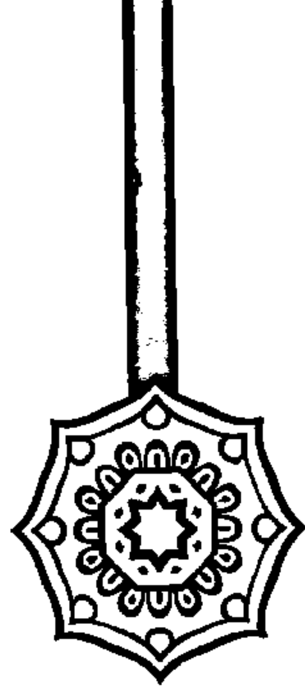
> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১]

বিশুদ্ধ হাদিসে যে তিনটি মসজিদকে উদ্দেশ্য করে সফরের বৈধতা দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো মসজিদে আকসা। মসজিদে আকসার বর্তমান কাঠামো নির্মাণের

কৃতিত্বও মুসলিম খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের। ৬৬ হিজরিতে তার নির্দেশে কুব্বাতুসসাখরা ও মসজিদে আকসার বর্তমান ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। শুভকর্মটি সুসম্পন্ন হয় ৭৩ হিজরিতে।

ওপরের পুরো আলোচনা থেকে জেরুজালেম নগরের আরব্য হওয়া এবং মসজিদে আকসায় মুসলিমদের অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হাইকলে সুলাইমানির ওপর মসজিদে আকসা নির্মাণের যে মিথ্যা দাবি ইহুদিরা করে থাকে শত খোঁড়াখুঁড়ির পরও তারা সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি।





খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

নবিগণের পিতা খলিলুল্লাহ্ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম 'উলুল আযম' তথা দৃঢ়চেতা রাসুলগণের অন্যতম। কুরআনুল কারিমের বহু জায়গায় তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। তার দাওয়াতের পদ্ধতি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা, কাবাঘর বিনির্মাণ প্রভৃতি মহান মহান অবদানের সবিশদ আলোচনা কুরআনের বিভিন্ন সুরায় আলোচিত হয়েছে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে *আদিপুস্তক*কে (Book of Geneses) ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনীর জন্য সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম উর (Ur) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১২]

উর হলো ব্যাবিলন (Babylon) এর দক্ষিণে দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ক্যালডিয়ান (Chaldean) নগরীর নাম, যা বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত। এ নগরীটির গোড়াপত্তন হয় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার সালে। প্রথমে সুমেরিয়রা (Sumerian)

[১২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২৮। তাঁর জন্ম-সংক্রান্ত এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা। অনেকের মতে তিনি উরুক (Uruk) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তার জন্মস্থান হলো কুশা (Kutha)। সেখানেই তিনি জালিম শাসক কর্তৃক আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কুশা নগরীর টিলাগুলো এখনো ইবরাহিমি টিলা (Tell Ibrahim) নামে পরিচিত। এর পাদদেশে মাকামে ইবরাহিম নামক একটি দর্শনীয় স্থানও রয়েছে।

এখানে বসবাস করে। এদের পর আসে ইলামিতরা (Elamite)। এরপর পর্যায়ক্রমে ব্যাবিলনিয়নরা ও সর্বশেষ ক্যালডিয়ানরা এখানে বসতি স্থাপন করে।[১৩]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ:

ইবরাহিম ইবনে নাহোর ইবনে সরুগ ইবনে রিয়ু ইবনে পেলগ ইবনে এবর ইবনে শেলহ ইবনে অর্ফকশদ ইবনে শেম ইবনে নুহ। নুহ আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো ৯৯২ বছর।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জাতি ছিল পৌত্তলিক। তারা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। নুনার (Nunar) নামক তাদের এক চন্দ্রদেবতা ছিল। এমনকি তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, এই দেবতার নিনহাল নামক একজন স্ত্রীও আছেন। পরিণত বয়সে পৌঁছার পর আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নবি হিসেবে মনোনীত করলেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি নিজ জাতিকে তাওহিদের দাওয়াত ও মূর্তিপূজার নিন্দা করতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন ইবরাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করছেন? আমি আপনাকে এবং আপনার জাতিকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। [সুরা আনআম, আয়াত : ৭৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.

আর আমি ইতিপূর্বে ইবরাহিমকে দিশা দান করেছি। আর তার সম্পর্কে আমি অবগত যখন তিনি তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই প্রতিমাগুলো কী যেগুলোর তোমরা পূজা করছ? [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৫১-৫২]

[১৩] *আল-ইয়াহুদ*, পৃষ্ঠা : ৩

ব্যাবিলনের বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। নিজেকে উপাস্য দাবি করতেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তাওহিদ প্রচারের কথা জানতে পেরে বাদশাহ তাকে বিতর্কের জন্য ডেকে পাঠান। কুরআনে এই বিতর্কের ঘটনাটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

সে লোকের কথা কি তোমার জানা নেই, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহিমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজত্ব দান করেছিলেন? ইবরাহিম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহিম বললেন, নিশ্চয় তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৮]

এ ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। স্বীয় জাতি কর্তৃক তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন—

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৯]

আত্মীয়স্বজনের সাথে উরে অবস্থান করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাররান (Harran) নগরীতে হিজরত করেন। এটি ছিল ফুরাতের একটি শাখানদীর তীরে অবস্থিত আরামীয়দের একটি শহর। এর ভৌগোলিক অবস্থান হলো, পশ্চিমে লেবানন পর্বতমালা থেকে নিয়ে ফুরাতের তীর পর্যন্ত, উত্তরে তারোস পর্বতমালা (Taurus Mountains) থেকে নিয়ে দক্ষিণে দামেস্ক পর্যন্ত। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাররানে হিজরত করলেও সেখানে বেশিদিন অবস্থান করতে

পারেননি। কেননা, হাররানের অধিবাসীরাও ছিল পৌত্তলিক। ফলে তারাও তার সাথে শত্রুতা শুরু করে এবং নানাভাবে তাকে উৎপীড়ন করতে থাকে। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারা, ভ্রাতুষ্পুত্র লুত, নিজের গোলাম এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো নিয়ে কানানের উদ্দেশ্যে হাররান ত্যাগ করেন।

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র লুতকে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য হাররানে রেখে গিয়েছিলেন। কারণ, হাররানের নগরপ্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতেই লুত আলাইহিস সালাম সেখানে থেকে যান। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারাকে নিয়ে কানান অভিমুখে চলে যান এবং শিকম নগরীতে (Shikm city) অবস্থান করেন। এ নগরীটি বর্তমানে নাবলুস (Nablus) নামে পরিচিত। তিনি কানানের নানা শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। ইত্যবসরে ওই এলাকায় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। জমি শুকিয়ে ফসল উৎপাদনও থেমে যায়।[১৪] ফলে কানানের অধিকাংশ অধিবাসী হিজরত করতে বাধ্য হয়। এ সময় অনেক কানানি পরিবারের মতো ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও স্বপরিবারে মিশরে হিজরত করেন। সে সময়ে মিশর শাসন করত হেক্সোসরা (Hyksos)। তাদের বাদশাহ ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী ও অত্যাচারী। বিবাহিত রমণীদেরকে সে জোরপূর্বক ভোগ করত। তাই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সামনে স্ত্রী সারাকে নিজের বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।[১৫]

বুখারি ও *মুসলিম* শরিফে আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু এর সূত্রে এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন, 'ইবরাহিম (আ.) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। তন্মধ্যে দুবার ছিল আল্লাহর ব্যাপারে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ" [আস্‌সাফফাত, আয়াত : ৮৯] এবং তাঁর অন্য এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি" [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৩]। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম) এবং সারা এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছালেন। তখন তাকে খবর দেওয়া হলো, এ এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সঙ্গে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা আছে। তখন বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠাল। সে জিজ্ঞেস করল, এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট এসে বললেন, হে সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর ওপর আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি

[১৪] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ১০।
[১৫] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ১৩।

আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর বাদশাহ সারাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তিনি যখন তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং রাজা তার দিকে হাত বাড়াল তখনই তার হাত অবশ হয়ে গেল। সে মুহূর্তে অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইল। এবারও তার হাত পূর্বের মতো বা তার চেয়েও কঠিনভাবে অবশ হলো। এবারও সে বলল, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দুআ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার এক দারোয়ানকে ডেকে বলল, তুমি তো আমার নিকট কোনো মানুষ আনোনি। বরং এনেছ এক শয়তান। অতঃপর রাজা সারার খিদমতের জন্য হাজেরাকে দান করল। সারা যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট এলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাজেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।' আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আরব জাতি! হাজেরাই হলেন তোমাদের আদি মাতা।[১৬]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সারাকে বোন পরিচয় দিয়েছিলেন সম্ভবত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা তখন পর্যন্ত লুত এবং সারা ব্যতীত আর কোনো ঈমানদার ছিল না। অথবা সারা ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চাচাতো বোন। সেদিক থেকে বোন পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, "এই তিনটি বাক্যকে মিথ্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে শ্রোতার বিশ্বাস বিবেচনায়। নতুবা এগুলোর একটিও নিরেট কোনো মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলো এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্য যার উভয় দিক সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"[১৭]

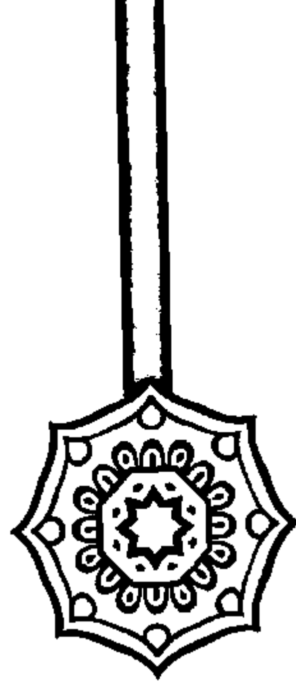
এর পর ঘটনা পাল্টে যায় সম্পূর্ণ উল্টো দিকে—বাদশাহ সারার উচ্চ মর্যাদায় প্রভাবিত হয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সম্মান করেন এবং সারার সেবিকা হিসেবে হাজেরাকে উপহার দেয়। সারা হাজেরাকে নিজের জন্য না রেখে স্বামীর জন্য দিয়ে দেন।

---

[১৬] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮৮, হাদিস নং : ৩৩৫৮
[১৭] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯১

তাঁর সাথে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহবাস হয় এবং সেখান থেকে আরব জাতির পিতা ইসমাইল আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্মের চৌদ্দ বছর পর সারার গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনিই হলেন বনি ইসরাইলের পূর্বপুরুষ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের আগ পর্যন্ত এ বংশেই নবুওয়তের ধারা অব্যহত ছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের প্রথম এবং সর্বকালের জন্য শেষ নবি।





ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গ

হাজেরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। ইসমাইল ইবরানি (Hebrew) শব্দ। এর অর্থ হলো (يسمع الله) আল্লাহ শোনেন, সাড়া দেন। যেহেতু ৮৬ বছর বয়সে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে সন্তান কামনা করে দুআ করেছিলেন এবং সেই দুআয় সাড়া দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন তাই এ নামে নামকরণ করা হয়।[১৮] ইসমাইল আলাইহিস সালাম হলেন সেমেটিকদের আদিপিতা। তার মাধ্যমে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল।

বাইবেলের *আদিপুস্তকে* বর্ণিত হয়েছে, 'আর ইশমায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখো আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।'[১৯] তার বংশের সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ :

---

[১৮] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৬।

[১৯] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ২০। ইসমাইল আ. এর বার পুত্রের নাম : ১। নবায়েৎ, ২। কেদর, ৩। অদবেখ, ৪। মিবসম, ৫। মিশম, ৬। দুমা, ৭। মসা, ৮। হদদ, ৯। তেমা, ১০। যিটুর, ১১। নাফিশ, ১২। কেদমা।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর[২০] ইবনে মালেক ইবনে নজর ইবনে কানানা ইবনে খোজাইমা ইবনে মুদরাকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুজার ইবনে নিজার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

বংশবিশারদ, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনগণ নবিজির বংশ পরম্পরার এ পর্যন্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত। আর এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে '*মানাকিবুল আনসার*' এর 'মাবআছুন নবি' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাদ তার *তাবাকাত* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যেখানে বলা হচ্ছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদ ইবনে আদনানের পর আর বংশলতিকা বর্ণনা করতেন না। এতৎসত্ত্বেও বংশবিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আদনানের বংশ পরম্পরা ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং তিনি হলেন নবিজির আদিপিতা।

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.
>
> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের বংশ থেকে কিনানাকে বাছাই করেছেন। কিনানার বংশধর থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশকে। এরপর কুরাইশদের থেকে নির্বাচন করেছেন বনু হাশেমকে। আর বনু হাশেম থেকে চয়ন করেছেন আমাকে।[২১]

আদনান ও ইসমাইলের মধ্যবর্তী প্রজন্মসংখ্যা নিয়ে বংশবিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তথাপি মুসতাদরাকে হাকেম এবং আল্লামা তাবারানির *আল-মুজামুল কাবির* গ্রন্থে বর্ণিত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আদনানের বংশপরম্পরা হলো, আদনান ইবনে উদ্দ ইবনে বাররি ইবনে আরাকুস সারা। সর্বশেষ বর্ণিত এই আরাকুস সারা হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারিতে*

---

[২০] তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ। এখান থেকে কুরাইশ বংশের প্রচলন।—অনুবাদক
[২১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৪৩৪১।

দশের অধিক মত বর্ণনা করার পর বলেন, 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো তাবারানি ও হাকেম যেটা উল্লেখ করেছেন।'[২২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে একজন রাসুল প্রেরণ করার জন্য। কুরআনে তার সেই দুআটি বর্ণিত হয়েছে—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

> হে প্রভু! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৯]

ইসমাইলের মাতা হাজেরা স্বাধীন রমণী ছিলেন নাকি দাসী ছিলেন এ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী হাজেরা দাসী ছিলেন। সারা এর খিদমতের জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হচ্ছে, "আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিসরীয়া দাসী ছিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর; কি জানি, ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব।"[২৩]

তাওরাতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ডেভ শেলুম (D. Shalum) বলেন, 'হাজেরা ছিল ফিরাউন-কন্যা। সারার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে সে নিজ কন্যাকে তার খিদমতে প্রেরণ করে। স্বীয় কন্যা একজন মর্যাদাবান রমণীর সেবা করাটাকে সে পছন্দ করেছিল।'[২৪]

সহিহুল বুখারিতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষে এসেছে, "আর সে হাজেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।" আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আসমানের পানির সন্তানেরা ! হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা।[২৫] এখান থেকে বুঝা যায় সারা এর খেদমতের জন্যই হাজেরাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনামতে হাজেরার পিতা ছিলেন একজন কিবতি সম্রাট। হাফন নামক একটি মিশরীয় গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। একজন ভারতীয়

---

[২২] *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৩৬।
[২৩] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১-২।
[২৪] *তারিখু আরদিল কুরআন,* পৃষ্ঠা : ২৮০।
[২৫] *সহিহুল বুখারি,* কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮৮, হাদিস নং : ৩৩৫৭।

আলেম *আন-নুসুসুল বাহিরাহ ফি হুররিয়াতিল হাজেরা* নামক একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে আসমানেরর পানির সন্তান বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, আরবরা যেসব এলাকায় কিছু বৃষ্টিপাত হয় চতুষ্পদ জন্তু চরানোর সুবিধার্থে সেসব এলাকায় বসবাস করত। আবার অনেকে মনে করেন আসমানি পানি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে জমজম। কেননা আল্লাহ তাআলা হাজেরার জন্য এটি উৎসারিত করেছেন। তার সন্তানও এর ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। সেদিক থেকে তারা এই পানির সন্তানের মতোই। ইবনে হিব্বান বলেন, ইসমাইলের উত্তরসূরিদের আসমানি পানির সন্তান বলা হয়। কেননা ইসমাইল হলেন হাজেরার সন্তান, যাকে হাজেরা জমজমের পানি দিয়ে লালনপালন করেছেন। জমজম হলো আসমানি পানি।[২৬]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের সময় মিশরের অধিবাসী হেক্সোসদের পরিচয়

মিশরীয় রাজবংশের গোড়াপত্তনের পর ত্রয়োদশ প্রজন্ম অতিবাহিত হতে না হতেই মিশরে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসময় মিশরের কর্তৃত্বে আসে আরব সেমেটিকরা। এরাই মূলত হেক্সোস (Hyksos) নামে পরিচিত। আরব ইতিহাসবিদরা অবশ্য এদের নাম দিয়েছিলেন আমালেকা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ঘটনা। এদের আদি নিবাস সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে এরা ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং জাযিরাতুল আরব এর বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আরব গোত্র। দূর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময়ে তারা মিশরে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, একদিক থেকে মিটানি (Mitanni) শাসকদের জুলুম অপরদিকে আরামীয়দের এ অঞ্চলে ব্যাপকহারে হিজরত এই দ্বিমুখী চাপে বাধ্য হয়ে তারা সিরিয়া অঞ্চল থেকে নতুন আবাসস্থলের খোঁজে মিশর এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মান ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড ম্যুরও এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে মিশরে হেক্সোসদের আগমন ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যখন আরামিয়রা তাদের ওপর ঝোঁকে বসছিল তখন থেকেই মূলত বাধ্য হয়ে তারা মিশরে হামলা চালায়।[২৭]

ইহুদি ও খ্রিষ্টান আলেমদের মতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর তার কারাবরণের ঘটনা ঘটে ১৮৯০ খ্রিষ্টপূর্বে। এখান থেকে বুঝা যায় হেক্সোসরা কমপক্ষে খ্রিষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে মিসরে এসেছিল। মিশরে বসবাস শুরু

[২৬] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৪।
[২৭] *মাওয়াকিবুশ শামস*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৮।

করলেও তারা জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মিশরীয়দের সাথে মিশে যায়নি। বরং সর্বক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিল। উভয় জাতির দেবতাদের মধ্যেও ছিল ভিন্নতা। হিজরতের সময় এসব উপাস্যগুলোকে তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল। তাই দেখা যায় পবিৎর কুরআন মিশরীয় শাসকদের ক্ষেত্রে ফিরাউন শব্দটি ব্যবহার করলেও হেক্সোস সম্রাটদের ক্ষেত্রে এ নাম ব্যবহার করেনি। তাদেরকে কুরআন মালিক বা বাদশাহ হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন সুরা ইউসুফে এসেছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى...

বাদশাহ বলল, নিশ্চয় আমি দেখেছি...। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৩]

আরেক আয়াতে এসেছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ...

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো...। [১ সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৫০]

অন্য আয়াতে উল্লেখ হয়েছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي...

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার ঘনিষ্ঠজন বানিয়ে নেব। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৪]

হেক্সোস সম্রাট ও মিশরীয় সম্রাটদের মধ্যে এই পার্থক্যকরণের কারণ হলো, সম্রাটদের ফিরাউন অভিধায় ভূষিত করা মিশরীয়দের একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ। আর যেহেতু উভয় জাতির ধর্ম ভিন্ন তাই হেক্সোস সম্রাটদের ক্ষেত্রে মিশরীয় সম্রাটদের এই ধর্মীয় উপাধিটি ব্যবহার করা হয় হয়নি। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি কথিত তাওরাত সংকলকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাই দেখা যায়, কুরআন উভয় জাতির সম্রাটদের উপাধিতে ভিন্নতা অবলম্বন করলেও তাওরাতে সেটা করা হয়নি। ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাওরাতে হেক্সোস সম্রাটদের জন্য ফিরাউন উপাধিটি ব্যবহার করেছে। শুধু একবারই দেখা গেছে মালিক বা বাদশাহ শব্দটি ব্যবহার বনি ইসরাইলের ঘটনার বর্ণনার শুরুতে।

এখান থেকে কুরআন আল্লাহকর্তৃক অবতীর্ণ ও অলৌকিক হওয়ার দিকটিও চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। কুরআন যদি মানবরচিত হতো তাহলে সেখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থ

বাইবেলের অনুকরণে হেক্সোস সম্রাটদের জন্যও ফিরাউন শব্দটি ব্যবহার করত। কেননা সেই সময় প্রাচীন ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলতেই ছিল এ বাইবেলই।[২৮]

আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, হেক্সোসদের কমপক্ষে তিন শতাব্দী পরে মিশরে ফিরাউনদের রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিরাউনদের যুগেই।

জবিহুল্লাহ হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম

ইহুদিদের কূটচালের আরেক ঘুটি হলো—তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুত্র সন্তানকে জবেহ করার ঘটনাতেও বিকৃতি সাধন করে সেটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্থলে জবিহুল্লাহ হিসেবে ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম প্রচার করে। এখানে আমরা *আদিপুস্তক* থেকে এ ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছি।

এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম; তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। পরে অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া গর্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও আপন পুত্র ইসহাককে সঙ্গে লইলেন, হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিলেন, আর উঠিয়া ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখিলেন। তখন অব্রাহাম আপন দাসদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে গর্দভের সহিত থাক; আমি ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। তখন অব্রাহাম হোমের কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইসহাকের স্কন্ধে দিলেন, এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়গ লইলেন; পরে উভয়ে একত্রে চলিয়া গেলেন। আর ইসহাক আপন পিতা অব্রাহামকে কহিলেন, হে আমার পিতা, তিনি কহিলেন, হে বৎস, দেখ, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, এই দেখুন, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে মেষশাবক কোথায়? অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষশাবক যোগাইবেন। পরে উভয়ে এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইলেন, পরে আপন পুত্র ইসহাককে বাঁধিয়া বেদিতে কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। পরে অব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়গ গ্রহণ করিলেন। এমন

[২৮] *আল-কুরআন ওয়াল ইলমুল আসরি,* (*কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান,* মরিস বুকাইলি) পৃষ্ঠা : ৭৫—নিরীক্ষক।

সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, অব্রাহাম, অব্রাহাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি বলিলেন, যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও। তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ; পরে অব্রাহাম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থে বলিদান করিলেন। আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি রাখিলেন। এই জন্য অদ্যাপি লোকে বলে, সদাপ্রভুর পর্বতে জোগান হইবে। পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলিতেছেন, তুমি এই কার্য করিলে, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে; আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ। পরে অব্রাহাম আপন দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলেন, আর সকলে উঠিয়া একত্রে বের-শেবাতে গেলেন; এবং অব্রাহাম বের-শেবাতে বসতি করিলেন।[২৯]

কথিত তাওরাতে এই হলো ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রিয় পুত্রকে জবেহ করার ঘটনা। এ পর্যায়ে আমরা তাওরাতের এই বর্ণনাটি বিশ্লেষণ করে দেখব প্রকৃত জবিহুল্লাহ্ কে ছিলেন। মোটাদাগে চারটি পয়েন্টে আমরা আলোচনা করব।

এক. আল্লাহ্ তাআলা তাকে একমাত্র পুত্রকে যবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দুই. এই পুত্র তার কাছে অত্যধিক প্রিয় ছিল।

তিন. জবেহ এর ঘটনার পূর্বে এবং পরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বের-শেবাতে বসবাস করতেন।

চার. ইসহাক আ. কে জবেহের স্থানে মোরিয়া এবং বের-শেবা[৩০] এর দূরত্ব কমপক্ষে তিনদিন।

এক. আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে একমাত্র পুত্র যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এ বাক্যটি শুধু ইসমাইল আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা তিনিই ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান। ইসহাক

---

[২৯] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ১-১৯।

[৩০] ফিলিস্তিনের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। জেরুজালেম থেকে পশ্চিমে ৭১ কিলোমিটার দূরত্বে ইসরাইলি সীমানার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক।

আলাইহিস সালামের জন্মের চৌদ্দ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইসহাক আলাইহিস সালাম কখনোই একক সন্তান ছিলেন না। বড় ভাই ইসমাইলের জীবদ্দশায় তাকে 'একমাত্র সন্তান' হিসেবে অভিহিত করা রীতিমত হাস্যকর। *আদিপুস্তকে* বলা হচ্ছে—

> পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল; আর অব্রাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন। অব্রামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।[৩১]

অব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়।[৩২]

সুতরাং এখান থেকে বুঝা যায় জবেহের ঘটনাটি ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। কেননা তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম ও একমাত্র পুত্র ছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

তাওরাতের ভাষ্যমতে প্রথমজাত সন্তান উৎসর্গ করাটাই হলো নিয়ম। চাই সেটা কোনো মানুষ্যসন্তান হোক কিংবা কোনো প্রাণীর শাবক হোক। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত শরিয়তের বিধান হিসেবে এটিই কার্যকর ছিল। *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে, "আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন।"[৩৩]

এটি ছিল আদম আলাইহিস সালামের শরিয়তের বিধান যা মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। প্রথমজাত শাবককে পবিত্রজ্ঞান করে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হতো। *যাত্রাপুস্তকে* (*Book of Exodus*) বলা হয়েছে, "পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, গর্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথমজাত ফল আমার উদ্দেশ্যে পবিত্র করো; তাহা আমারই।"[৩৪]

নিঃসন্দেহে নবি ইসমাইল আলাইহিস সালাম প্রথমজাত সন্তান। আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার এই বিশেষ মর্যাদা তারই প্রাপ্য।

দুই. এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে যাকে তুমি ভালোবাসো।' ইসমাইল আলাইহিস সালামের প্রতি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অধিক ভালোবাসার বিষয়টি একেবারে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এর জন্য কোনো দলিল-প্রমাণ

---

[৩১] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৬।
[৩২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৫।
[৩৩] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ৪।
[৩৪] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৩, অনুচ্ছেদ : ১-২।

খোঁজার প্রয়োজন নেই। ছিয়াশি বছর নিঃসন্তান থাকার পর আল্লাহর কাছে দুআর বরকতে জন্ম নেওয়া সন্তানের প্রতি একজন পিতার কী পরিমাণ আবেগ-ভালোবাসা থাকবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এজন্যই তো তিনি তার নাম রেখেছেন ইসমাইল যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সাড়া দিয়েছেন। খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যখন দ্বিতীয় সন্তান ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখনও তিনি ইসমাইলের জন্য দুআ করেছিলেন। *আদিপুস্তকের* ভাষায়, 'পরে অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক।'[৩৫]

সারা যখন ইসমাইল ও তাঁর মাকে দূরবর্তী স্থানে রেখে আসার আবদার করেছিলেন তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

'আর মিশরীয়া হাগার অব্রাহামের নিমিত্ত যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস করিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি ওই দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; কেননা আমার পুত্র ইসহাকের সহিত ওই দাসীর পুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। এই কথায় অব্রাহাম আপন পুত্রের বিষয়ে অতি অসন্তুষ্ট হইলেন। আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ওই বালকের বিষয়ে ও তোমার ওই দাসীর বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইও না; সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুনো; কেননা ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে। আর ওই দাসীপুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব, কারণ সে তোমার বংশীয়।'[৩৬]

এখান থেকে বুঝা যায় প্রিয় সন্তানের ব্যাপারে সারার আবদারে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পেরেশান ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে তার বংশ থেকেও একটি জাতি তিনি সৃষ্টি করবেন।

তিন. পুত্রকে জবেহ করার নির্দেশ যখন দেওয়া হয় তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বের-শেবাতে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি পুত্রকে নিয়ে মোরিয়া পর্বতে গিয়েছিলেন। আর তাওরাতেই বলা হয়েছে যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাজের ও ইসমাইলকে বের-শেবাতে রেখে গিয়েছিলেন।[৩৭] এবং ইসমাইল মায়ের সাথে ফারাণ প্রান্তরে[৩৮] বসবাস করতেন।[৩৯]

---

[৩৫] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ১৮।

[৩৬] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৯-১৩।

[৩৭] *আদিপুস্তক,* অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ১৪।

[৩৮] ফারাণ প্রান্তর অথবা ফারাণ মরুভূমি। ধারণা করা হয় এ স্থানটি বর্তমান জর্ডানে লুত আলাইহিস সালামের জাতির ধ্বংসাবশেষ ডেড সি অথবা মৃত সাগর থেকে উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত। কারও মতে এটি অবস্থিত সিনাই উপত্যকায়। যা তুর পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান মিশরের ওয়াদি ফিরানকেই এ স্থান বলে ধারণা করা হয়। তবে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের প্রাচীন বইপুস্তকের সূত্রে ধারণা করেন যে, এ স্থানটি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। কেউ বলেছেন, ফারাণ হচ্ছে মক্কার একটি পর্বতের নাম। আল্লামা ইয়াকু হামাভি

তাওরাতের এই ভাষ্য যদি সত্য হয় তাহলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বের-শেবা থেকে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়েই মোরিয়া পর্বতে গিয়েছিলেন। কেননা ইসহাক আলাইহিস সালাম মায়ের সাথে কানানে থাকতেন, বের-শেবাতে নয়। সম্ভবত তাওরাতের লিপিকারকগণ এ বিষয়গুলো খেয়াল না করেই জবেহের ঘটনায় ইসমাইলের জায়গায় ইসহাকের নাম বসিয়ে দিয়েছিলেন।

চার. জবেহের উদ্দেশ্যে মোরিয়া পর্বতে গমন। তাওরাতে উল্লিখিত এই মোরিয়া পর্বতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং শাব্দিক বিশ্লেষণ করলেও বুঝা যায় ঘটনাটি ইসমাইল আলাইহিস সালামের সাথে ঘটেছিল। মোরিয়া শব্দটি মূলত আরবি মারওয়া (مروة) শব্দের অপভ্রংশ। তাওরাতের আরবি কপিতে (بلورة مورة) বা মোরিয়া এলোন বৃক্ষের কথা বলা হলেও ইবরানি কপিতে মোরিয়া প্রান্তরের কথা উল্লেখ হয়েছে।[৪০] এখান থেকে অন্তত এতটুকু প্রমাণিত হয় যে তাওরাতের ভাষ্যকারগণ মূল শব্দটিকে পরিবর্তন করেছে। শব্দের তারতম্য থাকলেও একটি বিষয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলেই একমত যে জবেহের ঘটনা ইবাদতগৃহের কাছেই সংঘটিত হয়েছিল। আর এই ইবাদতগৃহ হলো বাইতুল্লাহ। সুতরাং বলা যায় জবেহের ঘটনাটি বাইতুল্লাহর পার্শ্ববর্তী মারওয়াহ পর্বতে সংঘটিত হয়েছিল।

তাওরাতে বিদ্যমান এই বিরোধের সুন্দর সমাধান দিয়েছে কুরআন। বলা হচ্ছে—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا

লিখেছেন, ফারাণই হচ্ছে মক্কা। ফারাণ পর্বত মদিনার পাশে অবস্থিত বলেও একটি মত পাওয়া যায়। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক।

[৩৯] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ২১।

[৪০] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ৬।

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ.

হে আমার প্রভু! আমাকে এক সৎ পুত্র দান করো। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখো। সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবাই করার জন্য শোয়াল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহিম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই নিষ্ঠাবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম, জবাই করার জন্যে এক মহান জন্তু। আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি। ইবরাহিমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি নিষ্ঠাবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবি। তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের ওপর স্পষ্ট জুলুমকারী। [সুরা সাফফাত, আয়াত: ১০০-১১৩]

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দুবার সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথম সুসংবাদটি ছিল ইসমাইলের জন্মের এবং দ্বিতীয় সুসংবাদটি ইসহাকের জন্মের। আর জবেহের ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সেটা ছিল বাইতুল্লাহর পাশে তরুলতাহীন উপত্যকায়। অপরদিকে এ সংক্রান্ত তাওরাতের বর্ণনাগুলো পরস্পর সাঙ্ঘর্ষিক। সেখানে একদিকে বলা হচ্ছে জবেহের ঘটনা ইসহাকের সাথে ঘটেছিল। আবার এ কথাও বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ইসহাকের জন্মের সুসংবাদের সাথে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, তিনি ইসহাককে বরকতময় করবেন এবং তার বংশধরদের থেকে এক বিশাল জাতি সৃষ্টি করবেন। যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে—

'তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক রাখিবে। আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে।'[৪১]

---

[৪১] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ১৯।

এটা কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা যে ইসহাকের জন্মের পূর্বে প্রদত্ত বিশাল বংশধর সৃষ্টির ওয়াদা পূর্ণ করবেন বলেছেন আবার সেই ইসহাককেই শৈশবে জবেহ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন! আর এটা কীভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য পরীক্ষা হতে পারে! তিনি তো জানেনই তার পুত্র ইসহাক একটি বিশাল বংশের পিতা হবে। সুতরাং তাওরাতের এই ভাষ্য সুস্পষ্ট স্ববিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

উল্লেখ্য, ইসমাইল আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও একটি বিশাল বংশের পিতা হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা ইসমাইলের জন্মের পূর্বে দেওয়া হয়নি। বরং তাওরাতেরই ভাষ্যমতে ইসহাকের জন্মের প্রাক্কালে সেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ জবেহের ঘটনার পরে।

কেউ কেউ এভাবেও ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবদ্দশাতেই ইসমাইলের মৃত্যু হয়। ফলে ইসমাইলের মৃত্যুর পর ইসহাককে একমাত্র সন্তান বলাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ধোপে টিকবে না। কেননা তাওরাতেই বলা হয়েছে, উভয় সন্তানের জীবদ্দশায় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। দুই ভাই পিতার দাফনকার্যে অংশ নেন।

"অব্রাহামের জীবনকাল একশত পঁচাত্তর বৎসর; তিনি এত বৎসর জীবিত ছিলেন। পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ূ হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন। আর তাঁহার পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মকপেলা গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন।"[৪২]

জবিহুল্লাহর বিষয়টি বোঝার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না।[৪৩]

ইবরানি কারা?

ড. আহমদ সওসাহ বলেন, "অধিকাংশ আরব ও ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ ইবারি বা ইবরানি (Hebrews) শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ এবং তারও আগে শব্দটি উত্তর আরব এবং শামের মরুঅঞ্চলের কতগুলো গোত্রকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতো এবং ইবারিয়্যাহ (Hebrew) বলতে বোঝানো হতো এদের ভাষাকে। এটি ফিলিস্তিনের প্রাচীনতম অধিবাসী কানানিদের ভাষা। এ ছাড়াও সিনাই উপত্যকায় বসবাসকারী

[৪২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ৭-৯।
[৪৩] ভারতীয় আলেম হামিদুদ্দিন ফারাহি রহ. এর এ বিষয়ে একটি চমৎকার পুস্তিকা রয়েছে।

গোত্রসমূহ এবং উত্তর জর্ডানের আমালেকা, মাদায়েনি প্রভৃতি আরবগোত্রের ভাষাও ছিল এটি।

প্রথমদিকে কিছু যাযাবর গোত্রকে ইবরানি বলা হলেও পরবর্তী সময় মরুঅঞ্চলের অধিবাসীকেই সাধারণভাবে ইবরানি হিসেবে অভিহিত করার প্রচলন পড়ে যায়। প্রাচীন আসমানি গ্রন্থসমূহ এবং ফিরাউনদের বিভিন্ন লিপিতে এ শব্দটির বিভিন্ন ব্যাবহারিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যে সময়টাতে এই শব্দটি জাতি কিংবা ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দাবিদার ইহুদিরাও বলে থাকে যে এই ইবরানি হলো কানানিদের ভাষা। পাশাপাশি ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে প্রভাব বিস্তারকারী আরামীয়রাও এই ভাষাভাষি ছিল। সে সময়ে ইবরানি শব্দটি আরামীয়দের সমস্ত শাখাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। আর এরা সবাই ছিল খাঁটি আরব। জাযিরাতুল আরব থেকে এসে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। আর তখন পর্যন্ত ইহুদিদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[৪৪]

ইহুদিদের কথিত তাওরাতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য ইবারি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৫] তাদের দাবি হলো, ইবরানিরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধারা থেকে এসেছে। কিন্তু তাদের এই দাবি স্বেচ্ছাচারিতা বৈ কিছুই নয়। তাওরাতের বিরোধপূর্ণ বর্ণনা থেকেই তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়। সেখানে কখনো ইসরাইলিদেরকে ইবরানি নামে সম্বোধন করা হয়েছে আবার কখনো এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তাদের সাথে ইবরানিদের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। যেমন যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে—

"তুমি ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্ব করিবে, পরে সপ্তম বৎসরে বিনামূল্যে মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে।" [৪৬]

তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাতের তথ্যমতে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দাসেরা ইসরাইলি বংশধারার নয়। বরং ভিন্ন বংশধারা থেকেই তাদের উদ্ভব।[৪৭] মরু অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে মিশরীয় ও ফিলিস্তিনিরা রূপক অর্থে ইসরাইলিদেরকে ইবারি হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রাচীন ইবারি বা ইবরানি তারা নয়, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সংগত কারণে দেখা যায়—বনি ইসরাইল যখন কেনানে বসতি

---

[৪৪] জেমস উইলফেনসন কর্তৃক রচিত *তারিখুল ইয়াহুদ ফিল আরব* এবং আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ এর *ইবরাহিম আবুল আম্বিয়া* এর সূত্রে *আর-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ২৪৩

[৪৫] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ২৪; অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ১৪; অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ১৩।

[৪৬] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ২।

[৪৭] *লেবীয় পুস্তক*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ৪২।

স্থাপন করল এবং মরু অঞ্চলের যাযাবর জীবন ছেড়ে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হতে লাগল সে সময় তাদের জন্য ইবারি শব্দ ব্যবহার করাটাকে তারা অপছন্দ করত।[৪৮]

ইবারি শব্দের উৎসমূল বিষয়ে ভাষাবিদগণ সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। অনেকে মনে করেন, শব্দটি আরবি (عربي) শব্দের বিকৃত রূপ। আরবি শব্দের 'রা' এবং 'বা' বর্ণের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমেই শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকেই এর উল্টো মত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ ইবারি (عبري) শব্দ থেকে বর্ণদ্বয়ের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে আরবি (عربي) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ, কেননা ব্যাবহারিক দিক থেকে ইবারি শব্দটি আরবির চেয়ে অনেক প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য ইবারি শব্দের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়।[৪৯] পক্ষান্তরে আরবি শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ করা যায় খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে অ্যাসেরিয়ান লিপিতে। অ্যাসেরিয়ান সম্রাট তৃতীয় শ্যালমেনসার (৮৫৯-৮২৪ খ্রিষ্টপূর্ব) এর নকশাতে প্রথম এর ব্যবহার দেখা যায়। তিনি ৮৫৪ খ্রিষ্টপূর্বে দামেস্কের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। আরব অঞ্চলের রাজন্যবর্গকে তিনি আরব রাজা শব্দে অভিহিত করেছেন এবং আরামীয় ও আরুমীয়দের অভিহিত করেছেন মুরাইবি (Al-Muraybi) নামে। এখান থেকে বুঝা যায়, অ্যাসেরিয়ানরা আরামীয় ও আরুমীয়দেরকে আরব হিসেবে গণ্য করত।[৫০]

কুরআন এ অঞ্চলকে বুঝানোর জন্য (واد غير ذي زرع) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছে যার অর্থ হলো তরুলতাহীন উপত্যকা। এটি আরব শব্দের সমার্থক। ওই সময় এই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। তাই পরিচয় দিতে গিয়ে স্থানের প্রকৃতি বিবেচনায় উক্ত শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। কথিত তাওরাতেও এ ধরনের শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন সেখানে বলা হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্রকে ফারাণ উপত্যকায় রেখে গিয়েছেন। আর ফারাণ উপত্যকা মানেই তরুলতাহীন উপত্যকা।

[৪৮] *তারিখুল লুগাতিস সামিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৮।

[৪৯] উইলফেনসন তার *তারিখুল লুগাতিস সামিয়্যাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মিসরের Tell amarna-তে কিছু ঐতিহাসিক চিঠি হস্তগত হয়েছে। এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে বাদশাহ আমুনহোতেফ এর সময়কার। সে সময় বনি ইসরাইল মিশরের অধীন ছিল। ফিলিস্তিনের কানানি আমিরদের পক্ষ থেকে মিশর সম্রাট বরাবর লিখিত এসব চিঠিতে উল্লেখ হয়েছে যে, ইবারি গোত্রগুলো ফিলিস্তিনে আক্রমণ করছে। আর তারা মিশরের অধীনস্ত মরু অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করছে।

[৫০] *তারিখুল আরব ওয়াল বিলাদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, ইবারি এবং আরবি শব্দদ্বয় একই ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন। প্রায়োগিক দিক থেকে এটি প্রথম খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তাও পৃথিবীতে জাতি হিসেবে ইসরাইলিদের আবির্ভাবের পূর্বে। এজন্যই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদি হওয়ার যে দাবি তারা করে থাকে কুরআন তা নাকচ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানিফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৭]

অর্থাৎ তিনি ইহুদিদের ঈশ্বর যেহোভা (Jehova) এর অনুসারী ছিলেন না। এখন প্রশ্ন হলো, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কে ইবারি নামকরণের কারণ কী? এর জবাবে গবেষকগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

১. এটি আরবি 'আবারা (عبر)' শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ পাড়ি দেওয়া। যেহেতু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফুরাত ও জর্ডান নদী পাড়ি দিয়েছেন, তাই তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২. অনেকের মতে আবির (عابر) বা ইবার (عبر) নামে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন। তার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৫১]

কিন্তু উইলফেনসন এই দুটি মতের একটিও মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করেন, ইবারি শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং বনি ইসরাইলের মূল নিবাসের দিকে সম্বন্ধ করেই এই নামকরণ করা হয়। কেননা, বনি ইসরাইল প্রকৃতপক্ষে মরুবাসী ছিল। নির্দিষ্ট কোনো স্থানে তারা থিতু হতো না। পানি ও চারণভূমির সন্ধানে তারা নিজেদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো নিয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বিচরণ করে বেড়াত। তিনি বলেন, ইবারি শব্দটি মূলত আরবি 'আবারা (عبر)' ফেয়েল তথা ক্রিয়াবাচক শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, রাস্তা, উপত্যকা কিংবা নদী প্রভৃতি পাড়ি দেওয়া। আরবি এবং ইবরানি উভয় ভাষায় শব্দটি এই অর্থ ধারণ করে।

[৫১] *তানকিহুল আবহাছ লিল মিলালিস সালাস*, পৃষ্ঠা : ২২।

মরুবাসী যাযাবরদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরতে থাকা। পাড়ি দেওয়ার অর্থটি এই শব্দের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং ইবারি শব্দের অর্থ হচ্ছে মরুবাসী।[৫২]

উইলফেনসনের এই অভিমত ব্যক্ত করার কারণ হলো, তিনি শুধুমাত্র বনি ইসরাইলকে ইবরানি মনে করেন। নতুবা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শুধু বনি ইসরাইলকে ইবরানি নামে অভিহিত করা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। কেননা, এ নামটি বনি ইসরাইলের অস্তিত্বের বহু আগেও ছিল। তবে কানানি ও আরামীয়রা অন্য জাতি থেকে পার্থক্য করার জন্য বনি ইসরাইলকে ইবরানি নামে অভিহিত করত।



[৫২] *তারিখুল লুগাতিস সামিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৭৭-৭৮।



ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্বপরিবারে মিশর গমন

মিশরে হেক্সোসদের শাসনামলে ভূমধ্যসাগরের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার পরিবারের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সবাইকে নিয়ে মিশর গমন করেন। মূলত পূর্ব থেকে মিশরে অবস্থান করা তার পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের আহ্বানেই তিনি সেখানে পাড়ি জমান। ইউসুফ আলাইহিস সালামের আহ্বানের বিষয়টি কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে—

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ .

> আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৩]

ইতিপূর্বে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাকে প্রতিহিংসামূলকভাবে কূপের অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল। সেসময় জর্ডানের জলআদ (ইংরেজি : গিলিয়াড) এলাকার মিশরগামী একটি গোত্র ইউসুফকে কূপ থেকে তুলে নেয়। পরে তারা তাকে মিশরের হেক্সোস শাসকদের নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করে দেয়। ইউসুফ আলাইহিস

সালামের ঘটনা কুরআন, হাদিস এবং ইহুদিদের গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা।[৫৩]

সেসময় মেমফিস (Memphis) ছিল মিশরের রাজধানী। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরে পৌঁছান তখন তার বয়স ছিল আঠারো বছর। দুই বছর তিনি মিশরীয় শাসকের প্রাসাদে অবস্থান করেন। এরপর মিথ্যা অপবাদে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। সাত বছর কারাভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে তিনি ছাড়া পান। ত্রিশ বছর বয়সে মিশর সম্রাট আবু ফিস তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মন্ত্রিত্ব দান করেন।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বপরিবারে মিশর পৌঁছালে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেন। সম্রাটকে বলে তাদের জন্য রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে উর্বর ভূমিও বরাদ্দ দেন। কুরআন এই ঘটনার বর্ণনা এভাবেই দিয়েছে যে—

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ .

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছাল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ চাহেন তো শান্তচিত্তে মিশরে প্রবেশ করুন। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯৯]

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মিশরে সতেরো বছর বসবাস করেন। অতঃপর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাথে যারা হিজরত করে মিশর এসেছিল তাদের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো। এই তালিকা দ্বারা কথিত তাওরাতের কিছু ভুলভ্রান্তির অবসান হবে।

ক্র.	নাম	পুত্র	কন্যা	পৌত্র	প্রপৌত্র	মোট
১	রুবেন (Ruben),	১	-	-	-	১
	হনোক (Hanok), পললু (Pallu), হিষ্রোণ (Hezton), করমি (Karmi)	-	-	৪	-	৪

[৫৩] কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে হেক্সোস সম্রাট আবু ফিস (Abu Fies) এর যুগে ইউসুফ আ. মিশরে পৌঁছেন।

ক্র.	নাম	পুত্র	কন্যা	পৌত্র	প্রপৌত্র	মোট
২	শিমিয়ন (Simeon),	১	-	-	-	১
	যিমুয়েল (Jemuel), যামিন (Jamin), উহাদ (Ohad), যাখিন (Jachin), সোহর (Zohar), শৌল (Shaul)	-	-	৬	-	৬
৩	লেবি (Levi),	১	-	-	-	১
	গ্যার্শোন (Gershon), কহাৎ (Kahat), মরারি (Morari)	-	-	৩	-	৩
৪	যুদাহ/যিহুদা (Judah),	১	-	-	-	১
	ইর (Er), ওনান (Onan), শেলাহ (Shelah), পেরেস (Perez), সেরহ (Zareh) (ইর এবং ওনান কানআনে মারা যায়)	-	-	৫	-	৫
৫	ইষাখার (Issachar),	১	-	-	-	১
	তোলয় (Tala), পূয় (Puah), যোব (Jashob), শিম্রোন (Shimran)	-	-	৪	-	৪
৬	সবুলুন (Zabulun),	১	-	-	-	১
	সেরদ (Sered), এলন (Elon), যহলেল (Jahleel),	-	-	৩	-	৩
	ডিনা (Dina)	-	১	-	-	১

এরা সবাই হলো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্ত্রী *লাইয়্যার* গর্ভজাত পুত্র-কন্যা ও তাদের সন্তানাদি। তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী এদের সংখ্যা হচ্ছে তেত্রিশ। কিন্তু সঠিক সংখ্যা হলো চৌত্রিশ। কানআনে মৃত দুজনকে বাদ দিলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ।[৫৪]

[৫৪] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৪৬, অনুচ্ছেদ : ৮-১৫।

ক্র	নাম	পুত্র	কন্যা	পৌত্র	প্রপৌত্র	মোট
৭	গাদ (Gad),	১	-	-	-	১
	সিফিয়ন (Ziphion), হগি (Haggi), শূনি (Shuni), ইষবোন (Ezbon), এরি (Eri), অরোদি (Arodi), অরোলি (Areli)	- -	- -	- ৭	- -	- ৭
৮	আশের (Asher),	১	-	-	-	১
	যিমনা (Jimna), যিশবা (Jishba), যিশবি (Jishbi), বরিয় (Beriah), সারেহ (Sareh)	-	-	৫	-	৫
	বরিয় এর পুত্র হেবল ও মক্কিয়েল	-	-	-	২	২

এরা সবাই লাইয়্যার দাসী যুলফার গর্ভজাত পুত্র ও তাদের সন্তানাদি। এদের সংখ্যা ষোলো।

ক্র	নাম	পুত্র	কন্যা	পৌত্র	প্রপৌত্র	মোট
৯	যোসেফ/ইউসুফ(Joseph)	১	-	-	-	১
	মনঃশি (Manasseh), ইফ্রয়িম (Eprhaim)	-	-	২	-	২
১০	বিনইয়ামিন/বেনজামিন (Benjamin),	১	-	-	-	১

	বেলা (Bela), বেখর (Beker), অসবেল (Ashbel), গেরা (Gera), নামন (Naman), এহি (Ehi), রোশ (Rosh), মুপপীম (Muppim), হুপপীম (Huppim), অর্দ (Ard)	-	-	১০	-	১০

এরা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী *রাহেলের* গর্ভজাত পুত্র ও তাদের সন্তানাদি। এদের সংখ্যা চৌদ্দ।

ক্র	নাম	পুত্র	কন্যা	পৌত্র	প্রপৌত্র	মোট
১১	দান (Dan),	১	-	-	-	১
	হুশিম (Hushim)	-	-	১	-	১
১২	নপ্তালি(Naphtali)	১	-	-	-	১
	যহসিয়েল (Jahziel), গুনি (Guni), যেৎসর (Jezar), শিল্লোম (Shillem)	-	-	৪	-	৪

এরা সবাই রাহেলের দাসী *বিলহার* গর্ভজাত পুত্র ও তাদের সন্তানাদি। এদের সংখ্যা সাত। সর্বমোট সংখ্যা হলো একাৎতর।[৫৫]

এরপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করলেন। কালের আবর্তনে মিশরের শাসনক্ষমতায় ফিরাউনদের আগমন ঘটল। তাদের বিশিষ্ট নেতা আহমস (Ahmose) আরব হেক্সোসদের সরিয়ে প্রথমবারের মতো মিশরে ফিরাউনদের রাজত্ব কায়েম করে। আর তখন থেকেই মূলত মিশরে বনি ইসরাইলের দুর্ভোগ শুরু হয়। তবে আহমস তাদের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তেমন পায়নি। ক্ষমতার ভিত মজবুত করার কাজেই জীবন ও সময় নিঃশেষ হয়েছে।

[৫৫] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৪৬, অনুচ্ছেদ : ১৬-২৫।

তাদের রাজ পরিবারের ঊনবিংশ শাসক দ্বিতীয় র‍্যামেসিস (Second Ramesses) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বনি ইসরাইলের ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। তার সময়ে ইসরাইলিদের পুত্রসন্তানদের হত্যা এবং কন্যাসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হচ্ছে—

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ .

> ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বললেন, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হইচই করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুত আমরা তাদের ওপর প্রবল শক্তিধর। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১২৭]

মিশরীয়রা বনি ইসরাইলকে ভীনদেশির দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। এমনকি এদের দেশপ্রেমের ব্যাপারেও তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, যুদ্ধ বাধলে বনি ইসরাইল মিশরীয়দের বিরুদ্ধে শত্রুদেরকে সহযোগিতা করবে। তাওরাতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> পরে মিশরের ওপরে একজন নূতন রাজা উঠিলেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না। তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল-সন্তানদের জাতি বহুসংখ্যক ও বলবান; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এই দেশ হইতে প্রস্থান করে।[৫৬]

সম্রাট শিপ্রা ও পূয়া নামক দুজন ইবরানি ধাত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছিল জন্মের সময় বনি ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার জন্য।[৫৭]

তাওরাতে বর্ণিত এই তথ্যটিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কেননা মিশরীয় প্রাচীন অধিবাসীদের চেয়েও সংখ্যায় বেড়ে যাওয়া একটি জাতির সমস্ত পুত্রসন্তানকে মাত্র দুজন ধাত্রী হত্যা করবে এটা অকল্পনীয়। বনি ইসরাইলের ওপর এই দুর্যোগ নেমে আসার

---

[৫৬] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৮-১০।

[৫৭] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৫।

কারণ এটাও হতে পারে যে, ফিরাউনরা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নিয়েছিল। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও ছিল তাদের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পদও ছিল তাদের কুক্ষিগত।

মূল ব্যাপারটি যেমনই হোক, বনি ইসরাইলকে নীপিড়ন ও দাসত্বের অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে-পুড়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে বহুদিন।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র লেবির বংশ থেকে মুসা ও হারুন নামে দুজন রাসুল প্রেরণ করলেন। তারা এসে বনি ইসরাইলকে তাওহিদের দাওয়াত দিলেন। মূর্তি, নক্ষত্র, প্রেতাত্মা, রাজা-বাদশা, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতকে আঁকড়ে ধরতে। সর্বোপরি তাদের মনগড়া ইহুদি ধর্ম বাদ দিয়ে আল্লাহপ্রদত্ত আসমানি ধর্মের অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাওরাতের বিবরণ অনুযায়ী মিশর আগমনকারী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানসন্ততির সংখ্যা একাত্তর। কিন্তু এই বিবরণের একটু পরেই তাওরাতে বলা হচ্ছে,"যাকোবের কটি হইতে উৎপন্ন যে প্রাণিগণ তাঁহার সঙ্গে মিশরে উপস্থিত হইল, যাকোবের পুত্রবধূরা ছাড়া তাহারা সর্বসুদ্ধ ছেষট্টি জন। মিশরে যোষেফের যে পুত্রেরা জন্মিয়াছিল, তাহারা দুই জন। যাকোবের পরিজন, যাহারা মিশরে গেল, তাহারা সর্বসুদ্ধ সত্তর জন।"[৫৮]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নতুন নিয়ম (New Testament) এর মাঝেও এ সংক্রান্ত বর্ণনায় বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবারের যারা মিশর এসেছিল তাদের সংখ্যা পঁচাত্তর জন। [৫৯] এদের সাথে যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তার পুত্রদেরকেও যোগ করা হয় তখন এই সংখ্যা দাঁড়ায় আটাত্তর জনে। মিসরে আগমনকারী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবারের সদস্যসংখ্যা নিয়ে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের বিরোধটি এখান থেকেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

মৃত্যুর পূর্বে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুপুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়েমকে নিজের সন্তানদের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে—

> আর মিশরে তোমার কাছে আমার আসিবার পূর্বে তোমার যে দুই পুত্র মিশর দেশে জন্মিয়াছে, তাহারা আমারই; রূবেণ ও শিমিয়োনের ন্যায় ইফ্রয়িম ও মনঃশিও আমারই হইবে। কিন্তু তুমি ইহাদের পরে যাহাদের জন্ম দিয়াছ,

[৫৮] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৪৬, অনুচ্ছেদ : ২৬–২৭।
[৫৯] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১৪।

তোমার সেই সন্তানেরা তোমারই হইবে, এবং এই দুই ভ্রাতার নামে ইহাদেরই অধিকারে আখ্যাত হইবে।[৬০]

কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মিশর আগমনের পর ইউসুফ আলাইহিস সালামের আর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুপুত্রকে নিজের সন্তানদের সাথে জুড়ে নেওয়ায় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানসংখ্যা দাঁড়াল চৌদ্দ জনে। যেহেতু ইউসুফ আলাইহিস সালামের আর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি তাই অবশিষ্ট থাকল তেরো জন। এই তেরো সন্তান থেকে তেরোটি বংশধারা চালু হয়। প্রত্যেকেই তাদের পিতাদের থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করে।

এরপর মুসা আলাইহিস সালাম যখন প্রেরিত হলেন তিনি লেবির উত্তরসূরিদেরকে পৌরহিত্যের কাজে জন্য নিয়োজিত করেন, তখন আর গোত্র অবশিষ্ট থাকে বারোটি। এই বারো গোত্রের দিকেই ইশারা করে কুরআনে বলা হয়েছে—

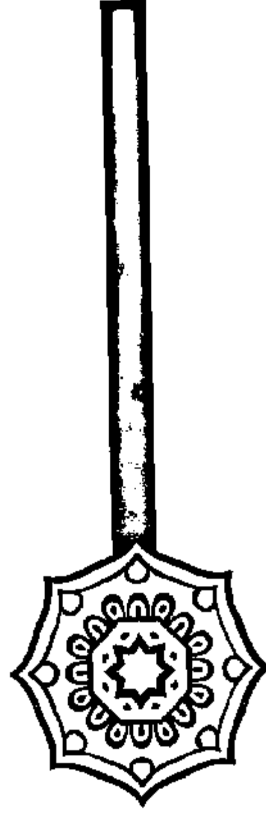
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত করো পাথরের ওপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এলো বারোটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাও, পান করো আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬০]

বারটি প্রস্রবণের এ ঘটনাটি ঘটেছিল সিনাই মরুভূমিতে। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ছিল ইসরাইল। সেদিকে সম্বন্ধ করে তার সন্তানেরা বনি ইসরাইল নামে পরিচিত হয়ে উঠে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বনি ইসরাইল অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে মিশরে বসবাস করেছিল।



[৬০] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৪৮, অনুচ্ছেদ : ৫-৬।



ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বনি ইসরাইলকে চিরমুক্তির লক্ষ্যে মুসা আ.-এর প্রেরণ

মুসা একটি মিশরীয় নাম। এর অর্থ হচ্ছে সন্তান। ইবরানি ভাষায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে শেষ মুহূর্তে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মুসা আলাইহিস সালামের সমগ্র জীবনকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্যায় : মুসা আলাইহিস সালাম ঠিক সে সময়টাতে জন্মগ্রহণ করেন যখন ফিরাউন কর্তৃক ইবরানিদের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যা করা হচ্ছিল। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। বোন মারইয়াম ছিলেন সবার বড়। আর হারুন ছিলেন দ্বিতীয়। জন্মের পর মুসা আলাইহিস সালামের মা ফিরআউনের ভয়ে সন্তানকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে ফিরআউনের স্ত্রী নদীতে গোসল করতে এলে নবজাতকটিকে দেখতে পান। বাচ্চাটিকে দেখে তার মন বিগলিত হয়। তিনি তাকে উঠিয়ে নেন। উল্লেখ্য, ফিরআউনের স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাকে বলা হলো এটা ইবরানি শিশু। ইত্যবসরে সেখানে মুসা আলাইহিস সালামের বোন মারইয়াম উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আমি কি আপনার এই বাচ্চাটিকে দুধ পান করানোর জন্য একজন ইবরানি ধাত্রীকে ডেকে আনব? ফিরআউনের স্ত্রী অনুমতি দিলে সে মুসা আলাইহিস সালামের মাকেই ডেকে

নিয়ে আসে। এরই মাধ্যমে মা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজ পুত্রকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব লাভ করেন।[৬১]

এভাবেই মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউন পরিবারের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছান। এ সময় তিনি নানা জ্ঞান ও কৌশলে পারঙ্গম হয়ে উঠেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি মিশরেই ছিলেন। তার জীবনের এ পর্যায়টি সম্পর্কে এর চেয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পর্যায় : চল্লিশ বছরের পর তিনি একজন ইবরানি ও একজন মিশরি ব্যক্তির গোলযোগকে কেন্দ্র করে অনিচ্ছাকৃত মিশরি ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেন। ভয় পেয়ে তিনি মাদায়েন পালিয়ে যান। এ ঘটনা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ * فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ * فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ * وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ * وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

---

[৬১] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৫-১০। তবে যাত্রাপুস্তকে ফিরআউনের স্ত্রীর স্থলে কন্যার কথা বলা হয়েছে। কুরআনের সুরা কাসাসে এই ঘটনা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

তিনি অধিবাসীদের অজান্তেই শহরে প্রবেশ করলেন। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের আর অন্যজন শত্রুপক্ষের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। মুসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাও। সংস্কারক হতে চাও না। এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে এসে বলল, হে মুসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করো। যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছালেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে ব্যস্ত এবং তাদের পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। [সুরা কাসাস, ১৫-২৩]

*যাত্রাপুস্তকে*ও এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

> তখন মোশি ভীত হইয়া কহিলেন, কথাটা অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পরে ফরৌণ ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি ফরৌণের সমউখ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং মিদিয়ন দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকট বসিলেন। মিদিয়নীয় যাজকের সাতটি কন্যা ছিল; তাহারা সেই স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে জল পান করাইবার জন্য জল তুলিয়া নিপানগুলি পরিপূর্ণ করিল। ...পরে মোশি ঐ ব্যাক্তির সঙ্গে বাস করিতে সম্মত হইলেন, আর তিনি মোশির সাথে আপন কন্যা সিপ্পোরার বিবাহ দিলেন। ...আর ঝোপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর দূত তাকে দর্শন দিলেন; তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখো ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে তথাপি ঝোপ বিনষ্ট হইতেছে না। তাই মোশি কহিলেন, আমি এক পার্শ্বে গিয়া এই মহাশ্চর্য দৃশ্য দেখি, ঝোপ দগ্দ হয় না ইহার কার্রন কি? কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিলেন যে, তিনি দেখিবার জন্য এক পার্শ্বে যাইতেছেন, তখন ঝোপের মধ্য হইতে ইশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, মোশি, মোশি।...অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফরৌণের নিকট প্রেরণ করি, তুমি মিসর হইতে আমার প্রজা ইস্রায়েল সন্তানদিগকে বাহির করিও।[৬২]

তৃতীয় পর্যায় : মাদায়েনের অভিবাস জীবন শেষ করে মুসা আলাইহিস সালাম *জাসান* অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি এবং হারুন আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দিলেন। কুরআনের বর্ণনামতে তিনি মাদায়েনে দশ বছর অবস্থান করেন।

> قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

> তিনি মুসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে

[৬২] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১৪-২১; অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ২-১০। [মূল কিতাবে এখানে রেফারেন্স অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ১৬-১৭ লিখা হয়েছে যা সঠিক নয়।]

চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। [সুরা কাসাস, ২৭]

কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতি কর্মে তেমন একটা সফলতা দেখতে পাননি। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে বলা হচ্ছে—

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.

আর মুসার প্রতি তাঁর জাতির কতিপয় লোক ছাড়া আর কেউই ঈমান আনল না—ফিরাউন ও তার সভাসদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেয়। ফিরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্যতম। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮৩]

তাওরাতের একটি অনুচ্ছেদেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিলেন, দেখো, ইস্রায়েল-সন্তানেরা আমার বাক্যে মনোযোগ করিল না; তবে ফরৌণ কি প্রকারে শুনিবেন? আমি তো বাকপটু নহি।[৬৩]

এরপর আল্লাহ তাআলা মিশরীয়দের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে দশটি আঘাত করলেন। দশম আঘাতের পর মিশরীয়রা মুসা এবং তার দলবলকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফিরআউনের কাছে আবেদন করল।

মিশর থেকে বের হয়ে মুসা-হারুন আ. বনি-ইসরাইলকে নিয়ে সিনাইতে পৌঁছালেন। সেখানে চল্লিশ বছর ইসরাইলিরা উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। একশ বিশ বছর বয়সে মুসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তিনি স্বীয় জাতির সামনে নামুসের বিধানাবলি পুনরাবৃত্তি করেন। মিশর থেকে সিনাই পর্যন্ত তাদের দীর্ঘ সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং সেখানে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আবশ্যকীয় কর্তব্য সম্পর্কেও নসিহত করেন। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

তার নসিহতের অন্যতম অংশ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দশ আজ্ঞা।

১। আমিই আল্লাহ। তোমাদের একক প্রভু।

২। আমার সামনে তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য না থাকুক।

৩। প্রভুর নামে মিথ্যা শপথ করবে না।

---

[৬৩] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ১২।

৪। শনিবারকে স্মরণে রাখবে এবং তার হেফাজত করবে।

৫। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করবে।

৬। নরহত্যা করবে না।

৭। জিনা করবে না।

৮। চুরি করবে না।

৯। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

১০। তোমার ভাইয়ের সম্পদে হিংসা করবে না।

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত ফলকে এই দশটি বাক্য লিপিবদ্ধ ছিল। ফলক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ.

আর আমি তোমাকে ফলকে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৫]

এরপর মুসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। তাকে মোয়াবে[৬৪] দাফন করা হয়। তাওরাত এর ভাষ্য অনুযায়ী তার কবর সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কবর দেখিয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু সম্পর্কে হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

...অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যাতে তাকে পবিত্র ভূমি থেকে পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি সেখানে থাকলে লাল টিলার নিচে রাস্তার পাশে তার কবরটি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।[৬৫]

---

[৬৪] মোয়াব: জর্ডানের কেরাক শহর থেকে উত্তরে সুবাক শহরে যাওয়ার পথে মৃত সাগরের পূর্ব উপকূলজুড়ে বিস্তৃত পর্বতমালার ঐতিহাসিক নাম। উইকিপিডিয়া-নিরীক্ষক।

[৬৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৩৪০৭, *মুসলিম*, হাদিস নং : ২৩৭২।

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসরার রাতে লাল টিলার পাশে মুসার কবরের পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। তখন তিনি নিজ কবরে নামাজ পড়ছিলেন।[৬৬]

আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করানোর জন্য মুসা আলাইহিস সালামের হাতে কিছু মুজেজা প্রকাশ করেছিলেন। তাওরাতে এগুলোকে 'আঘাত' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ফিরাউন ও মিশরীয়দের বিরুদ্ধে এমন আঘাতের সংখ্যা ছিল দশটি। সেগুলো হলো :

১। নীলনদের পানি রক্তে পরিণত হওয়া।

২। ব্যাঙের উৎপাত।

৩। মশার আক্রমণ।

৪। মাছি/দংশকের উৎপাত।

৫। গবাদি পশুতে মহামারি ছড়িয়ে পড়া।

৬। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুতে উঁকুনের আক্রমণ।

৭। ঠান্ডা।

৮। পঙ্গপালের আক্রমণ।

৯। তিমির অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া।

১০। প্রথমজাত সন্তানের মৃত্যু।

এট হলো তাওরাতের বর্ণনা। পক্ষান্তরে কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে নয়টি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছে। বলা হচ্ছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .

> আর আমি মুসাকে সুস্পষ্ট নয়টি নিদর্শন দিয়েছি...। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১০১]

এই আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে সুরা আরাফে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[৬৬] *সহিহ মুসলিম*, ২৩৭৫। কবরের মধ্যে নামাজ পড়ছিলেন বলার দ্বারা বুঝা যায়, এটি মুসা আ. এর কবরের জীবন ছিল। বাস্তব দুনিয়াবি জীবন নয়। কেননা মুসা আ. অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ .

তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মুসা এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখো তাদের অলক্ষণ আল্লাহরই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের ওপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন আমরা কিন্তু তোমার ওপর ঈমান আনছি না। সুতরাং আমি তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা অহংকার করল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। আর তাদের ওপর যখন কোনো আজাব পতিত হয় তখন বলে, হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট সে বিষয়ে দোয়া করো যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে এ আজাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনি-ইসরাইলকে যেতে দেবে। অতঃপর যখন আমি তাদের ওপর থেকে আজাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত-যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩০-১৩৫]

কুরআনে নয়টি নিদর্শন বলতে কোন নয়টিকে বুঝানো হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে তাফসিরকারদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নয়টি নিদর্শন হলো লাঠি, শুভ্র হাত, দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত।

সমুদ্রের মাঝে রাস্তা হওয়া এবং ফিরআউনের স্বদলবলে তাতে ডুবে মরা নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই অধিক যুক্তিসংগত। কেননা এটি মিশরীয়দের ওপর শাস্তির নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পরই সংঘটিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন কাব বলেন, নিদর্শন নয়টি হলো, শুভ্র হাত, লাঠি, সুরা আরাফে বর্ণিত পাঁচটি, সম্পদ বিনষ্টিকরণ ও পাথর।

সম্পদ বিনষ্টের বিষয়টি সুরা ইউনুসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ .

...হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও... [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮৮]

এটি মুসা আলাইহিস সালামের বদদুআ ছিল।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি তাফসির বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ, ইকরিমা, শাবি ও কাতাদা রহিমাহুমুল্লাহও এই ধরনের তাফসির করেছেন। তারা বলেন, 'নিদর্শনগুলো হলো শুভ্র হাত, লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফসলের ঘাটতি, তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত।'

আল্লামা ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ এই তাফসিরটিকে উৎকৃষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এরপর হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ঘাটতিকে একটি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নবম নিদর্শন হিসেবে লাঠি কর্তৃক জাদুকরদের জাদুর সাপ খেয়ে ফেলার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এরপর ইবনে কাসির বলেন, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে এগুলো ছাড়াও প্রচুর নিদর্শন দিয়েছেন। যেমন লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাতের ফলে পানির ঝরনা প্রবাহিত হওয়া, মেঘে ছেয়ে যাওয়া, আকাশ থেকে মান্না-সালওয়া খাদ্য বর্ষণ প্রভৃতি। বনি ইসরাইল মিশর ছেড়ে যাওয়ার পর এগুলো দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আয়াতে বর্ণিত নয়টি নিদর্শনগুলো এমন যে, এগুলো ফিরাউন ও মিশরবাসীও প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এই

নিদর্শনগুলো দেখার পরও অস্বীকার করায় এগুলো তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়।[৬৭]

বনি ইসরাইলকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের মিশর ত্যাগ

ইতিহাসবিদ ড. আহমদ সওসাহ বলেন, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের *যাত্রাপুস্তকে* বিশদভাবে বর্ণিত বনি ইসরাইলকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের মিশর ত্যাগের ঘটনাটি কোনো রূপকথা নয়। এটি বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মিশর ত্যাগের বাস্তবসত্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরপর তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত বর্ণনার সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ যেটা আমাদের সামনে আছে তা হলো তাওরাত। এটি সংকলন করা হয়েছে ঘটনার আটশ বছর পর। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংকলন করার ফলে ঘটনাটি অনেকটা বিকৃত হয়েই সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে। যদ্দরুন অনেকের দৃষ্টিতে এটি ঐতিহাসিক সত্যের বদলে রূপকথায় পরিণত হয়েছে।[৬৮]

ইহুদিদের ঐতিহাসিক বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের কাছে গিয়ে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের অনুমতি চাইতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ফিরাউন দম্ভভরে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা দশম আঘাতটি প্রেরণ করেন। দশম আঘাতটি ছিল প্রথমজাত সন্তান ও শাবকের মৃত্যু। *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে—

পরে মধ্যরাত্রে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিশর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন। তাহাতে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিশরীয় লোক রাত্রিতে উঠিল, এবং মিশরে মহাক্রন্দন হইল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না। তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমরা যাও, তোমরা গিয়া তোমাদের কথানুসারে সদাপ্রভুর সেবা করো।[৬৯]

এখানে *যাত্রাপুস্তকের* রচয়িতা একটি ভুল করে বসলেন। চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুর বিষয়টি পঞ্চম আঘাতে উল্লেখ করার পর এখানে দশম আঘাতে পুনরায় উল্লেখ করলেন। অথচ পঞ্চম আঘাতটি ছিল মহামারির প্রকোপ যেখানে মিশরীয়দের সমস্ত পশু নিঃশেষ হয়ে

---

[৬৭] *ইবনে কাসির,* খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৩।
[৬৮] *আল-আরব ওয়াল-ইয়াহুদ ফিত তারিখ,* পৃষ্ঠা : ২৭৮।
[৬৯] *যাত্রাপুস্তক,* অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ২৯-৩১।

গিয়েছিল। পঞ্চম আঘাতে নিঃশেষ হওয়া জন্তুর দশম আঘাতে আবার প্রথমজাত শাবক মারা যাওয়া নিতান্তই হাস্যকর বিষয়। *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে—

'পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে বলো, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, অথবা এখনও বাধা দেও, তবে দেখো, ক্ষেত্রস্থ তোমার পশুধনের ওপর, অশ্বদের, গর্দভদের, উষ্ট্রদের, গোপালের ও মেষপালের ওপর সদাপ্রভুর হস্ত রহিয়াছে; কঠিন মহামারি হইবে। কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পশুতে ও মিশরের পশুতে প্রভেদ করিবেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের কোন পশু মরিবে না। আর সদাপ্রভু সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন, কল্য সদাপ্রভু দেশে এই কর্ম করিবেন। পরদিন সদাপ্রভু তাহাই করিলেন, তাহাতে মিশরের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটিও মরিল না। তখন ফরৌণ লোক পাঠাইলেন, আর দেখো, ইস্রায়েলের একটি পশুও মরে নাই; তথাপি ফরৌণের হৃদয় ভারী হইল এবং তিনি লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।'[৭০]

সুতরাং চতুষ্পদ জন্তুর দুইবার উল্লেখ করাটা সুস্পষ্ট বিরোধ।

এই ঘটনায় তাওরাতের স্ববিরোধী আরেকটি বক্তব্য হলো—এক জায়গায় বলা হয়েছে ফিরাউন ইসরাইলিদের বাধা দিয়েছে। যেতে দেয়নি। পক্ষান্তরে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে মিশরীয়রা ইসরাইলিদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য তাদের পণ্ডিতগণ উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেছেন, দশম আঘাতের পর ফিরাউন মুসা আলাইহিস সালামকে মিশর ত্যাগের অনুমতি দেয়। কিন্তু পরে তার মতিভ্রম ঘটে। তাই অনুমতি দিয়েও আবার বনি ইসরাইলের পিছু ধাওয়া করে।

অনেকে আবার বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসরাইলিরা তাদের মিশরীয় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে স্বর্ণ-রূপার বিভিন্ন জিনিসপত্র ধার নিয়েছিল। যেমন *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে—

> আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির কথা অনুসারে কার্য করিল; ফলে তাহারা মিশরীয়দের কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল। আর সদাপ্রভু মিশরীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, তাই তাহারা

[৭০] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ১-৭।

যাহা চাহিল, মিশরীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিশরীয়দের ধন হরণ করিল।[৭১]

যাত্রাপুস্তকের উক্ত ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিবেশীরা ইসরাইলিদের শত্রু ছিল না। যাই হোক, ফিরাউন বনি ইসরাইলকে তাড়া করার পেছনে অন্যতম একটি কারণ ছিল এসব মূল্যবান সামগ্রী ফিরিয়ে আনা।

কিন্তু কুরআন ফিরাউন কর্তৃক বনি ইসরাইলের পিছু নেওয়ার কারণ বর্ণনা করেনি। এতটুকু ইঙ্গিত করেছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে গোপনে মিশর থেকে বেরিয়ে যান। এরপর ফিরাউন ও তার বাহিনী পিছু নেয়। কুরআনে বলা হচ্ছে—

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى * فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.

আমি মুসার প্রতি এই মর্মে ওহি পাঠালাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ করো। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। [সুরা ত্বাহা, আয়াত : ৭৭-৭৮]

এর পূর্বেই মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের কাছে বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন।

...فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ...

...অতএব আমাদের সাথে বনি ইসরাইলকে যেতে দাও...[সুরা ত্বাহা, ৪৭]

যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে—

তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা বালক ছাড়া কমবেশ ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ হইতে সুক্কোতে যাত্রা করিল।[৭২]

---

[৭১] *যাত্রাপুস্তক,* অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ৩৫-৩৬।
[৭২] *যাত্রাপুস্তক,* অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ৩৭।

“পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আমার কাছে কেন ক্রন্দন করিতেছ? ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে অগ্রসর হইতে বলো। আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করো, সমুদ্রকে দুই ভাগ করো; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে। আর দেখ, আমিই মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করিব, তাহাতে তাহারা ইহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে এবং আমি ফরৌণের, তাহার সকল সৈন্যের, তাহার রথ সকলের ও তাহার অশ্বারোহীগণের দ্বারা গৌরবান্বিত হইব।”[৭৩]

ফিরাউন ও তার বাহিনী বনি ইসরাইলের পিছু পিছু সমুদ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডুবিয়ে মারলেন।

বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের ঘটনা কুরআনের বহু সুরাতেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন পথে তারা মিশর ত্যাগ করেছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

গবেষকগণ তাওরাতের বর্ণনাকে সামনে রেখে যে পথটিকে অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সেটা হলো সিনাইমুখী প্রাচীন খনিশ্রমিকদের পথটি। বনি ইসরাইল রামেসিস এর জাসান থেকে সুক্কোতে সফর করে। এরপর সুক্কোত থেকে মরুভূমির নিকটবর্তী এথমে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে যাত্রা করে মিগদোল এবং সূফ সাগরের মধ্যবর্তী বালসফোনের সামনে তারা রাত্রি যাপন করে। এখানে অবস্থানকালেই মিশরীয়রা তাদের পিছু ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে বের হয়। এরপর ইসরাইলিরা শুর মরুভূমির দিকে যাত্রা শুরু করে। এ যাত্রায় তারা প্রথমে মারা, মারা থেকে এলিম, এলিম থেকে সিনাই-এর মধ্যবর্তী সিন মরুভূমিতে পৌঁছায়। এরপর তারা দুফকাতে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে উশ এবং উশ থেকে রফিদিম-এ গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এই রফিদিমেই আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে তাদের প্রথম সংঘর্ষ হয়। রফিদিম থেকে ইসরাইলিরা সিনাই উপত্যকায় সিনাই পর্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করে। এই পর্বতটিই পরবর্তীতে মুসার পর্বত এবং তুর পর্বত নামে পরিচিত হয়। এখানেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শরিয়তের বিধিবিধান নাজিল করা হয়। মাদায়েন থেকে মুসা আলাইহিস সালামের স্ত্রী সাপ্পুরা, দুই সন্তান এবং শ্বশুর যিথ্রো এসে এখানেই মিলিত হন।

বনি ইসরাইল সিনাই উপত্যকায় এক বছর অবস্থান করে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে সিনাই থেকে ১৫০ মাইল উত্তরে কাদেশ বরনিয় অভিমুখে রওয়ানা হয়। আকাবা

---

[৭৩] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৭।

উপসাগরের তীরবর্তী হাদারামাউতের পাশ দিয়ে তারা ফারান প্রান্তরে পৌঁছায়। সেখান থেকে অনেকগুলো গ্রাম পেরিয়ে তারা আকাবা উপসাগরের শেষ বিন্দু এজিয়ন হয়ে জিন উপত্যকায় পৌঁছায়। এই জিন উপত্যকাই হলো তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কাদেশ বরনিয়। সেখানে তারা ইদম এর নিকটবর্তী হুর পর্বতে অবস্থান করতে থাকে।[৭৪] আর এখানেই মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়।

ইসরাইলিদের জন্য সরাসরি জাসান থেকে কেনানে চলে আসা সম্ভব ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল ফিরাউন ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করা। তাই মুসা আলাইহিস সালাম সহজ পথটি না ধরে আল্লাহর ইচ্ছায় বাঁকা ও ঘুরপথ নির্বাচন করেন। এ সম্পর্কে তাওরাতে বলা হয়েছে—

> আর ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে, পলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া সোজা পথ থাকিলেও ঈশ্বর সেই পথে তাহাদিগকে চালাইলেন না, কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিশরে ফিরিয়া যায়। অতএব ঈশ্বর লোকদিগকে সূফসাগরের প্রান্তরময় পথ দিয়া গমন করাইলেন।[৭৫]

সিনাই মরুভূমিতে বনি ইসরাইল চল্লিশ বছর উদভ্রান্তের ন্যায় ঘোরাঘুরি করে। এ সময় না তারা মুসার আনুগত্য করেছে, না তারা শরিয়তের পাবন্দ হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালাম তাদেরকে কেনান অভিমুখে রওয়ানা হতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা যুদ্ধের ব্যাপারে শুধু গা-ছাড়া ভাব আর কাপুরুষতাই প্রদর্শন করেছে।

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ .

> তারা বলল : হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ২২]

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

---

[৭৪] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ২৮৬।

[৭৫] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৩, অনুচ্ছেদ : ১৭-১৮।

فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

তারা বলল হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের ওপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। বললেন, এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ২৪-২৬]

তাদের এই কাপুরুষতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাগান্বিত হলেন এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন। তারা দীর্ঘ চল্লিশ বছর উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে।

সিনাই মরুভূমিতে পৌঁছে মুসা আলাইহিস সালাম প্রথম যে কাজটি করেন সেটি ছিল বনি ইসরাইলের আদমশুমারি। এ সম্পর্কে কথিত তাওরাতে বলা হয়েছে—

"মিশর দেশ হইতে লোকদের বাহির হইয়া আসিবার পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরে সমাগম-তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, তোমরা লোকদের গোষ্ঠী অনুসারে, পিতৃকুলানুসারে, নাম-সংখ্যানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ কর। বিংশতি বৎসর ও ততধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য, তাহাদের সৈন্য অনুসারে তুমি ও হারোণ তাহাদিগকে গণনা কর।"[৭৬]

গণনার পর এদের সংখ্যা দাঁড়াল ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ জন। তবে লেবীয়দের এই গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৭৭]

তাওরাতে বর্ণিত এই সংখ্যার সুস্পষ্ট অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়। কেননা *আদিপুস্তকের* ভাষ্য অনুযায়ী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন তার সন্তানদেরকে নিয়ে মিশর পৌঁছান তখন তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর। এদের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালামের দাদা কহাৎ

---

[৭৬] *গণনাপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-৩।

[৭৭] *গণনাপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৪৭।

ইবনে লেবি ইবনে ইয়াকুব এর বয়স ছিল তখন সাত বছর। এরপর মিশর ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বনি ইসরাইলের মাত্র দুটি প্রজন্ম জন্মগ্রহণ করে। কহাৎ এর পুত্র ইমরানের প্রজন্ম এবং ইমরানপুত্র মুসা ও হারুনের প্রজন্ম। সুতরাং মাত্র সত্তরজন নারী-পুরুষ থেকে দুটি প্রজন্মের ব্যবধানে ছয় লক্ষাধিক জনসংখ্যার বিস্তার অসম্ভব। তাও এই সংখ্যাটা বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের বাদ দিয়ে। এজন্যই গবেষকগণ এই বিষয়টি নিয়ে কথিত তাওরাতের ব্যাপক সমালোচনা করে থাকেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকাতেও এই সংখ্যা পনেরো হাজারের বেশি নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮]

কিন্তু কুরআন এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে বলেছে—

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ .

নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল। [সুরা শুআরা, আয়াত : ৫৪]

এর স্বপক্ষে তাওরাতের প্রথম বিবরণীরও সমর্থন পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে—

যখন তোমরা সেখানে কমসংখ্যক এবং অপরিচিত ছিলে।

সংখ্যার এই গরমিল থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে বিদ্যমান তাওরাতের চরম বিকৃত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মিশর ত্যাগের তারিখ

মুসা আলাইহিস সালামের সময়কাল এবং বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিশর ত্যাগের তারিখ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১। মিশরীয় ইতিহাসবিদ ম্যানিথো (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০) এর মতে তার সময়কালের ছয় শতাব্দী পূর্বে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল। ম্যানিথোর এই মতটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকাকারে গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, মিশরীয় হেক্সোস সম্রাট এ শতাব্দীতেই মিশর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই মতের সাথে একমত নয়।

২। দ্বিতীয় মত হলো, মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন বাদশাহ তৃতীয় থোথমোস (১৪৯০-১২৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব) এর সামসময়িক। আর মিশর ত্যাগের ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় আমুন হোতেফ (১৪৩৬-১৪১১ খ্রিষ্টপূর্ব) এর সময়ে।

[৭৮] *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৮৯, ড. ইহসানুল হক রানা রচিত আল-*ইহুদিয়্যাহ* ওয়াল মাসিহিয়্যাহ এর সূত্রে।

৩। তৃতীয় মত হলো, মিসর ত্যাগের ঘটনা দ্বিতীয় র‍্যামেসিস (১২৯০-১২২৩ খ্রিষ্টপূর্ব) এর সময়ে সংঘটিত হয়।

৪। চতুর্থ মত হলো, এটি সংঘটিত হয়েছিল সম্রাট মানেফতাহ (১২২৩-১২১১ খ্রিষ্টপূর্ব) এর শাসনামলে।

মিশরীয় বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ফলকের সুবাদে শেষোক্ত মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। এগুলোর খোদাই করা তথ্যানুসারে সম্রাট মানেফতাহ বনি ইসরাইলকে সমূলে উচ্ছেদ করেছিলেন।[৭৯]

বনি ইসরাইলের মিশরে অবস্থানকাল

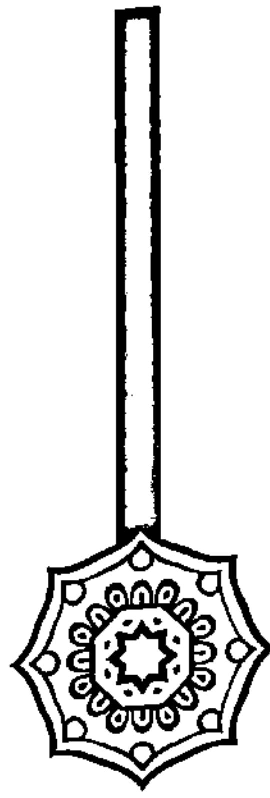
কথিত আছে, বনি ইসরাইল মিশরে চারশ ত্রিশ বছর বসবাস করেছিল। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। হাফেজ ইবনে হাযাম এই সংখ্যাটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "বনি ইসরাইলের মিশরে চারশ ত্রিশ বছর অবস্থানের তথ্যটি যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি চরম ভিত্তিহীন তথ্য। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, কহাৎ ইবনে লেবি স্বীয় দাদা ইয়াকুব ও বাপ-চাচাদের সাথেই মিশরে আগমন করেন। তিনি সর্বমোট বয়স পেয়েছিলেন একশ তেত্রিশ বছর। আর বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হওয়ার সময় মুসা আলাইহিস সালামের বয়স ছিল আশি বছর। এই তথ্যগুলো তাদের কাছে সংরক্ষিত কথিত তাওরাতেই রয়েছে। এখন যদি ধরে নেওয়া হয়, মিশরে প্রবেশের সময় কহাৎ এর বয়স ছিল এক মাস বা তারও কম এবং ইমরানের জন্ম কহাৎ এর মৃত্যুর পরেও হয়। একইভাবে মুসা আলাইহিস সালামের জন্মও ইমরানের মৃত্যুর পর হয় তাহলে সাকুল্যে সময়কাল দাঁড়ায় তিনশ পঞ্চাশ বছর। তাহলে তাদের দাবিকৃত চারশ ত্রিশ বছরের মধ্যে অবশিষ্ট আশি বছর কোথায়? তাদের কারও কারও দাবির প্রেক্ষিতে বাবা ও ভাইদের আগমনের পূর্বে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মিশরে অবস্থানকালও যদি যোগ করা হয় তাও সংখ্যাটি চারশ ত্রিশ হয় না। কেননা ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরে আসেন তখন তার বয়স ছিল সতেরো। আর ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন পরিবার নিয়ে মিশরে আগমন করেন তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের বয়স ছিল উনচল্লিশ। সুতরাং ভাইদের পূর্বে তিনি বাইশ বছর মিশরে ছিলেন। তিনশ পঞ্চাশের সাথে এই বাইশ বছর যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ বাহাত্তর বছর। এরপরও আটান্ন

[৭৯] আহমদ বদরি, *মাওয়াকিবুশ শামস,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১২। ফরাসি বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানে* এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, "দীর্ঘায়ু লাভ করা দ্বিতীয় র‍্যামেসিস এক্সোডাসের ফিরাউন না হওয়াটাই সুনিশ্চিত। তার পরবর্তী মানেফতাহ-ই হলো সেই ফিরাউন যে ইবরানিদের তাড়াতে গিয়ে মারা যায়।"

বছরের ঘাটতি থেকে যায় যা কোনভাবেই মিলানো সম্ভব না।" এরপর তিনি বলেন, "এটি লোকমুখে চর্চিত একটি ভিত্তিহীন আষাঢ়ে গল্প। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কেউই এই সংখ্যাটি বিশ্বাস করবে না।" শেষে তিনি বলেন, "ইসরাইলি গ্রন্থগুলোর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পরিবারসহ মিশরে প্রবেশ থেকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ইসরাইলিদের নিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত সময়কাল হলো সাকুল্যে দুইশ সতেরো বছর।"[৮০]



[৮০] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৯।



ইউশা ইবনে নুন

কুরআন এবং ইসরাইলি প্রাচীন গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় বনি ইসরাইলের সবাই মুসা আলাইহিস সালাম ও তার রিসালাতের ওপর ঈমান আনেনি। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে—

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ.

তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৯৩]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .

তারা বলল : হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, তুমি ও তোমার পালনকর্তাই যাও এবং উভয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকব। মুসা বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের ওপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। তিনি (আল্লাহ) বললেন : এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ২৪-২৬]

আরেক আয়াতে বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ .

আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। এ-বলতে-না বলতেই তোমাদেরকে গ্রাস করে নিলো বজ্র। তখন তোমরা কেবল দেখেই ছিলে, করার কিছুই ছিল না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৫৫]

এই আয়াতগুলোসহ কুরআনের আরও অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, অধিকাংশ বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামকে নবি ও রাসুল হিসেবে মেনে নেয়নি। তারা শুধু ফিরআউনের জুলুম ও দাসত্ব থেকে মুক্তির আশায় একজন নেতা হিসেবে মুসা আলাইহিস সালামের পাশে জড়ো হয়েছিল। এজন্যই দেখা যায় তারা পদে পদে মুসা আলাইহিস সালামের বিরোধীতা করত। আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদাগুলোকে বিশ্বাস করত না। কখনো আবার মুসা আলাইহিস সালামের সাথে মিশর ত্যাগ করার কারণে আফসোসও করত। এমনকি তাকে ভৎর্সনা করতেও দ্বিধা করত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ .

আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় লোক ছাড়া- ফিরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে

দেয়। ফিরাউন তো দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্য থেকে। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮৩]

যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে—

'তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের বিরুদ্ধে প্রান্তরে বচসা করিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা তাঁহাদিগকে কহিল, হায়, হায়, আমরা মিসর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাড়ির কাছে বসিতাম; তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করিতাম, তোমরা ত এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ।'[৮১]

শাস্তির চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনি ইসরাইল আবার নতুন করে ইউশা ইবনে নুনের[৮২] নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়। এসময়ে তাদের কাপুরুষ প্রজন্মটিও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

ইউশা ইবনে নুন দ্রুত জর্ডান নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। পাথেয় প্রস্তুতের জন্য তিনি ইসরাইলিদেরকে তিনদিন সময় দেন।[৮৩] এসময় তিনি যিরিহো (জেরিকো) নগরের অবস্থা ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য দুজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে জর্ডান নদীর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

ইউশা কেনানে প্রবেশ করে যিরিহো (জেরিকো) নগরীর পশ্চিমে গিলগল-এ শিবির স্থাপন করলেন।[৮৪] পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে অভিযান চালিয়ে তিনি গিলগল এর সম্মুখস্থ অয় নগরী দখলে নিলেন। তার নির্দেশে নগরীর বারো হাজার নারী-পুরুষ সকলকে হত্যা করা হয় এবং অয় নগরীটি জ্বালিয়ে চিরস্থায়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়।[৮৫]

---

[৮১] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ২-৩।

[৮২] ইউশা ইবনে নুন হলেন ইউসুফ আ. এর পুত্র ইফ্রয়েম এর বংশধর। তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। মিশর ত্যাগের সময় তার বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। পঁচাশি বছর বয়সে তিনি ইহুদিদের নেতৃত্বে আসেন। মিশর থেকে বের হওয়ার সময় বিশোর্ধ বয়সি তিনি এবং কালিব বিন ইয়াফনা ছাড়া আর কেউই তখন জীবিত ছিল না। তিনি ছিলেন মুসা আ. কর্তৃক ফিলিস্তিনে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য নির্বাচিত বারো জনের একজন। ফিলিস্তিন ঘুরে এসে বারোজনের সবাই স্বীকার করেছিল যে, সেটা অত্যন্ত উর্বর ভূমি। অতঃপর দশজন বলল, সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাদেরকে যুদ্ধ করে বিতাড়িত করা ইহুদিদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইউশা এবং কালেব এই দশজনের সাথে একমত পোষণ করেননি। এ সহসিকতা ও নিষ্ঠার কারণে ইহুদিদের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বটি তার উপর অর্পিত হয়। *তারিখুল আকবাত ওয়াল মাসিহিয়্যাহ*, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৭।

[৮৩] *যিহোশূয়*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১০-১১।

[৮৪] *যিহোশূয়*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১৯; অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১০।

[৮৫] *যিহোশূয়*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ২৮-২৯।

অয় নগরীর সম্রাট সন্ধি ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইউশা ইবনে নুন তাকে হত্যা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখেন। সন্ধ্যা নামার পর মৃত দেহটি নামিয়ে শহরের ফটকে নিক্ষেপ করেন।[৮৬] তার দেহকে পাথরের স্তূপ দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন যে, মুসা আলাইহিস সালাম-ই তাকে এমনটা করতে অসিয়ত করে গেছেন।

গিবিয়ন, কফিরা, বৈরুত, যিয়ারিম প্রভৃতি শহরের বাসিন্দারা নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে ইহুদিদের এই আচরণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা পুরাতন কাপড়, ছেঁড়া জুতো পরে গিলগলে ইউশা ইবনে নুনের সামনে উপস্থিত হয়। আসল পরিচয় গোপন রেখে তারা নিজেদেরকে অনেক দূর অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দেয়। তারা ইসরাইলিদের আনুগত্য প্রকাশ করে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার আবেদন করে। ইউশা ইবনে নুন তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি জানতে পারেন, এরা পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর অধিবাসী। এতে তিনি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। কেননা, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফেরত নেওয়া ছিল অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তাই তিনি তাদেরকে হত্যা থেকে রেহাই দিলেন বটে কিন্তু তাদের দেশ দখলে নিলেন এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করলেন।[৮৭]

ইউশা ইবনে নুনের অভিযানের সংবাদ জেরুজালেমের সম্রাট অদোনিষেদক এর কানে পৌঁছাল। তিনি এও জানতে পারলেন যে, ইউশা যিরিহো (জেরিকো) এবং অয় নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় শহর গিবিয়ন এর অধিবাসীদেরকে দাস বানিয়ে নিয়েছেন। তখন অদোনিষেদক[৮৮] অন্যান্য ইমোরিয় সম্রাটদের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসরাইলিদেরকে প্রতিহত করার প্রস্তাব পাঠালেন। এসব সম্রাটদের মধ্যে ছিলেন হিব্রোনের সম্রাট হোহম, যমুর্ত এর সম্রাট পিরাম, লাখিশ এর সম্রাট যাফিয় ও ইগ্লোনের সম্রাট দাবির। এদিকে গোয়েন্দা মারফত ইউশা ইবনে নুন এদের ব্যাপারে অবহিত হলেন। তিনি দ্রুত গিলগল থেকে অভিযান চালিয়ে এদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্থ করলেন। সম্রাটদের পাঁচজনকেই তিনি পিছু ধাওয়া করে বন্ধি করতে সমর্থ হন। এরপর অন্যান্য সম্রাটদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এদেরকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখেন।

ইউশা ইবনে নুনের অভিযানগুলো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্রাটদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউশাকে পরাজিত করার জন্য মিরোম-এ শিবির স্থাপন করে। কিন্তু তাদের অবস্থাও পূর্ববর্তীদের মতোই হলো। ইসরাইলিদের হাতে এদেরকেও পরাস্ত হতে হলো। এভাবেই ইউশা ইবনে নুন মাত্র সাত বছরে এ অঞ্চলের একত্রিশজন সম্রাটকে

---

[৮৬] *যিহোশূয়,* অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ২৯।
[৮৭] *তারিখুল আকবাত ওয়াল মসিহিয়্যাহ,* খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫২।
[৮৮] বাইবেলের কিছু কিছু বাংলা সংস্করণে অদোনী-বেষকও লেখা হয়েছে।— সম্পাদক

পরাজিত করতে সক্ষম হন। তবে পশ্চিমে গাজা এবং জাফা এর মধ্যবর্তী ফিলিস্তিনিদের উপকূলীয় শহরগুলো ইউশা এবং তার বাহিনীকে রুখে দেয়। এরা সমরাস্ত্রে ইসরাইলিদের চেয়ে বহু বেশি অগ্রসর ছিল। খনিজ লোহা ব্যবহার করে অস্ত্র তৈরিতে তারা ছিল পারঙ্গম। লৌহবর্মসহ নানাবিধ অস্ত্র তারা খুব সহজেই তৈরি করতে পারত। তাই এই শহরগুলো এবং অন্যান্য দুর্গবেষ্টিত শহরগুলো ইউশা যুদ্ধ না করে এড়িয়ে যান। এমন শহরের মধ্যে অন্যতম ছিল জেরুজালেম। এরপর তিনি গিলগলে ফিরে যান এবং অধিকৃত অঞ্চল ইসরাইলি গোত্রগুলোর মাঝে বণ্টন করে দেন।

জীবন সায়াহ্নে ইউশা ইবনে নুন সবাইকে কাছে ডেকে নসিহত করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন, বনি ইসরাইল এক অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল জাতি। তাই নসিহতের শেষে তিনি বললেন—

আমি এবং আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব।[৮৯]

একশত দশ বছর বয়সে ইউশা ইবনে নুন মৃত্যুবরণ করেন। তাকে গাশ পর্বতের উত্তরে পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের তিম্নৎ-সেরহে তার অধিকৃত অঞ্চলে দাফন করা হয়।[৯০]

ইউশা ইবনে নুনের বিজয়াভিযানগুলো নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায়, যেসব ইহুদি চল্লিশ বছর সিনাইতে উদভ্রান্তের মতো বস্তুভিটেহীন অবস্থায় ঘোরাঘুরি করেছিল সুযোগ পেয়ে তারা শত্রুদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। এই স্বভাবটি জাতিগতভাবে ইহুদিদের মাঝে আজও বিদ্যমান।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণও শত্রুদের সাথে ইহুদিদের এই নিষ্ঠুরতার সমালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে উইল ডুরান্ট (Will Durant) এর বক্তব্য আমরা পাঠকদের সমীপে তুলে ধরছি। তিনি বলেন—

ইবরানিগণ কর্তৃক কানানিদের পরাজিত করার দৃষ্টান্ত হলো একদল ক্ষুধার্ত মানুষের আরেকদল নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো। ইবরানিরা কানানিদের যাকেই পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। সমস্ত নারীকে বন্দি করেছে। রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে। তাদের পবিত্র গ্রন্থ অনুসারে এর মাধ্যমে তারা এক গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রভু তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে তারা দাবি করে থাকে।

একটি শহরের ওপর চড়াও হয়ে তারা সেখানকার বারো হাজার বাসিন্দাকে হত্যা করেছিল। শহরের শাসককে শুলিতে চড়িয়েছিল। এমনকি পুরো শহর জ্বালিয়ে

---

[৮৯] *যিহোশূয়,* অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ১৫।

[৯০] *যিহোশূয়,* অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ২৯-৩০; *বিচারকগণ,* অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৮-৯।

দিয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং সেই নির্মমতাকে উপভোগ করার মতো ঘটনা আমাদের জানা নেই। মুসা ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত একজন নেতা। অপরদিকে ইউশা ছিলেন একজন কঠোর প্রকৃতির সৈনিক। মুসা নির্বিবাদে শাসন করেছেন। কোনো রক্তপাত ঘটাননি। অপরদিকে ইউশার শাসনের মূলমন্ত্রই ছিল প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ড যত বেশি হবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। মানবিক আবেগ ও দয়া-মায়াবহির্ভূত এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই ইহুদিরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করে।[৯১]

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ইহুদিরা ইউশা ইবনে নুনের বিজয়াভিযানের বর্ণনায় অতিরঞ্জন করেছে। তারা ইউশাকে কঠোরতা, শত্রুবিনাশী সর্বোপরি শত্রুর সাথে নির্মম আচরণকারী হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। ইউশা ইবনে নুন একজন নবি ছিলেন। এমন মন্দ স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলে আমরা কখনোই মেনে নিতে পারি না।

এ পর্যায়ে এসে ইসরাইলিদের যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাদের স্বতন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সূচনা হয় নতুন যুগের। যে যুগ স্বচ্ছলতা ও সভ্যতার যুগ। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পূর্বেই তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত প্রদান করেছেন। তাওরাতই হলো সেই শরিয়ত। কুরআনের ভাষায় সেই তাওরাতে ছিল তাদের জন্য হেদায়েত এবং নুর। তাওরাত ছিল বনি ইসরাইলের জন্য আকিদা, আহকাম, আখলাক, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির জ্ঞানে সমৃদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا
بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا.

আর আমি তাঁকে ফলকে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও সব বিষয়ের বিশদ বিবরণ। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৫]

এ কথা সুনিশ্চিত যে, বনি ইসরাইল তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে সমস্ত ফিলিস্তিনিকে নিজেদের অধীনস্ত বানাতে পারেনি। বরং ফিলিস্তিনিদের সাথেই তারা বসবাস করত। একই দেশের অধিবাসী ছিল উভয়ে।

[৯১] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৬

ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়[৯২], হিত্তীয়[৯৩], ইমোরীয়[৯৪], পরিষীয়[৯৫], হিব্বীয় ও যিবুষীয়গণের[৯৬] মধ্যে বসতি করিল; আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।[৯৭]

তথাপি ইস্রায়েল-সন্তানগণ গশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়দিগকে (এরা জর্ডানের পূর্বাঞ্চলীয় গোত্র) অধিকারচ্যুত করে নাই; গশূর ও মাখাথ অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করিতেছে।[৯৮]

তাওরাত এ কথাও বলে যে, ইসরাইলিরা জেরুজালেমের মূল বাসিন্দা যিবুষিয়দের বিতাড়িত করতে পারেনি। যেমন বলা হয়েছে—

"পরন্তু বিন্যামীন-সন্তানগণ যিরূশালেম-নিবাসী যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; যিবূষীয়েরা অদ্যাপি যিরূশালেমে বিন্যামীন-সন্তানদের সহিত বাস করিতেছে।[৯৯] যিবুষিয়রা কানআনিদের একটি শাখাগোত্র। আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম যখন হাইকল নির্মাণের ইচ্ছে করলেন তখন এই যিবুষিয়দের থেকেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ক্রয় করেছিলেন।"[১০০]

জেরুজালেমের বাসিন্দারা তাদের শহর ছেড়ে চলে গেছে এমন কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। উল্টো ইতিহাস বলছে, ইসরাইলিরা বিভিন্ন সময়ে এই শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং ইসরাইলিরা এই শহরকে নিজেদের বলে দাবি করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশ। ইনশাআল্লাহ, আজ হোক বা কাল একদিন

---

[৯২] কনানীয়(Canan)=এদের অবস্থান ছিল তাবারিয়া লেক (Lake of Galilee) থেকে নিয়ে পশ্চিমে শ্বেত সাগর (White sea) পর্যন্ত। বনি ইসরাইলের ফিলিস্তিনে প্রবেশের সময় এরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার অধিকারী।

[৯৩] হিত্তিয় (Hattusa)=এরা প্রাচীন ইউরোপিয়ান জাতি। এদের রাজ্যের পরিধি ছিল উত্তরে সিরিয়া থেকে নিয়ে ভূমধ্য সাগর হয়ে লেবানন পর্বতমালা পর্যন্ত।

[৯৪] ইমোরিয় (Amorites)= খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় অঞ্চল থেকে এদের আবির্ভাব। ব্যাবিলনেও তারা কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। এ ছাড়াও ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চলও তারা দখলে নিয়েছিল। বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের পূর্বে এরা দক্ষিণে অরন্ট(Orontes) নদী থেকে নিয়ে উত্তরে গিরমোন পাহাড় পর্যন্ত দখল করে রেখেছিল।

[৯৫] পরিষীয়(Perizzites)= কনানীয়দের একটি শাখা। ইউশা ইবনে নুনের সময়ে এরা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীতে এই এলাকা ইফ্রয়েম ও মনঃশ্বির উত্তরসূরিদের হাতে আসে।

[৯৬] হিব্বীয় ও যিবুষীয়(Hivites,Jebusites)=এরাও কনানীয়দের শাখা। লেবানন পর্বতের পাদদেশে ছিল এদের বসবাস। এদের মধ্যে যিবুষীয়রা বর্তমান জেরুজালেম নগরীর গোড়াপত্তন করে।

[৯৭] *বিচারকগণ*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ৫-৬।

[৯৮] *যিহোশূয়*, অধ্যায় : ১৩, অনুচ্ছেদ : ১৩।

[৯৯] *বিচারকগণ*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২১।

[১০০] *শমূয়েল ২য়*, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ২৪।

তাদেরকে আবারও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই শহর ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয়।

এদের স্বভাবই হলো জমিনে অরাজকতা, অস্থিরতা সৃষ্টি করা। সুযোগ পেলেই এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই বিশৃঙ্খল স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছেন এবং অতীতে দুবার তাদের অরাজকতার কারণে শাস্তির বর্ণনা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

> وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
>
> আমি বনি ইসরাইলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অরাজকতা সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ করো তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এলো, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৪-৭]

পুরাতন নিয়মে তাদের এই অরাজকতা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দাউদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে,

কিন্তু তাহারা জাতিগণের সহিত মিশ্রিত হইল, উহাদের ক্রিয়া শিক্ষা করিল; আর উহাদের প্রতিমা সকলের সেবা করিল, তাহাতে সেই সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল; ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে, আর আপনাদের কন্যাদিগকে ভূতদের উদ্দেশ্যে বলিদান করিল; তাহারা নির্দোষদের রক্তপাত, স্ব স্ব পুত্র-কন্যাদেরই রক্তপাত করিল, কনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলিদান করিল; দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল। এইরূপে তাহারা আপনাদের কার্যে অশুচি, আপনাদের ক্রিয়াতে ব্যভিচারী হইল। তাহাতে আপন প্রজাদের ওপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের বিদ্বেষিগণ তাহাদের ওপরে কর্তৃত্ব করিল। তাহাদের শত্রুগণও তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল এবং তাহারা উহাদের হস্তের বশে নত হইল।"[১০১]

এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন বাস্তবে সংঘটিত হলো তখন তাদের নবি যিশাইয় তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন—

আহা পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ; তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অবজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরাঙ্মুখ হইয়াছে। তোমরা আর কেন প্রহারিত হইবে? হইলে অধিক বিদ্রোহাচরণ করিবে; সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সমুদয় হৃদয় দুর্বল হইয়াছে।[১০২]

যিশাইয়ের পুস্তকের অধিকাংশই হলো নিন্দামূলক বাক্য। বনি ইসরাইল কর্তৃক মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তথা মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং তাদের অন্যান্য বড় বড় পাপাচারের কারণে নবি যিশাইয় তাদের তিরস্কার করে এগুলো বলেছিলেন। কিন্তু বনি ইসরাইল সঠিক পথে ফিরে আসেনি। কুরআনে বর্ণিত তাদের দুবারের অরাজকতার মধ্যে প্রথমটি ব্যাবিলনিয় বন্দিদশা (Babylonian Captivity) নামে পরিচিত। এটি ছিল ব্যাবিলন সম্রাট বুখতে নসর (Nebuchandnezzar) কর্তৃক ধারাবাহিক কতগুলো অভিযানের সমষ্টি। তার প্রথম অভিযানটি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ সালে। এরপর দ্বিতীয় অভিযানটি সে পরিচালনা করে ৫৯৮ খ্রিষ্টপূর্বে। এ অভিযানে যিহুদা রাজা যিহোয়াকিম এবং তাদের নবি দানিয়াল ও তার সহচরবৃন্দ বন্দি হন।[১০৩] তৃতীয় অভিযানটি ছিল ৫৮৮ খ্রিষ্টপূর্বে। এবারের অভিযানে বুখতে নসর ইহুদিদের পুরো রাজত্ব গুঁড়িয়ে দেয় এবং বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। সম্ভবত বুখতে নসরের এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

---

[১০১] *গীত*, অধ্যায় : ১০৬, অনুচ্ছেদ : ৩৫-৪২।
[১০২] *যিশাইয়*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৪-৫।
[১০৩] দানিয়াল, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-7।

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ.

... তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল...। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৫]

বুখতে নসরকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিজ বান্দা বলার অর্থ এই নয় যে সে মুমিন ছিল। বরং উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানব জাতিই আল্লাহর বান্দা। তাদের মধ্যে এই বান্দাকে তিনি পার্থিব ক্ষমতা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। নতুবা ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমানিত যে, বুখতে নসর একজন মুশরিক ছিল।

বনি ইসরাইলের নবি যিরমিয়ও ব্যাবিলন সম্রাট কর্তৃক তাদের ওপর নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

তোমরা আমার বাক্য শুনো নাই, এই জন্য দেখো, আমি আদেশ পাঠাইয়া উত্তরদিকস্থ সমস্ত গোষ্ঠীকে লইয়া আসিব, সদাপ্রভু কহেন, আমি আমার দাস বাবিল-রাজ নবূখদনিৎসরকে আনিব, ও তাহাদিগকে এই দেশের বিরুদ্ধে, এতন্নিবাসীদের বিরুদ্ধে ও চতুর্দিকস্থিত এই সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে আনিব; এবং ইহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিব, এবং বিস্ময়ের ও শিস শব্দের বিষয় ও চিরস্থায়ী উৎসন্ন স্থান করিব। আর ইহাদের মধ্য হইতে আমোদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব, কন্যার রব, যাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো সংহার করিব। তাহাতে এই সমগ্র দেশ উৎসন্ন স্থান ও বিস্ময়ের বিষয় হইবে; এবং এই জাতিগণ সত্তর বৎসর বাবিল-রাজের দাসত্ব করিবে। [১০৪]

এটা ছিল তাদের প্রথমবারের অরাজকতা এবং শাস্তির বিবরণ। ব্যাবিলনে তারা চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় বন্দিদশায় কাটিয়েছিল।

এরপর আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। সেদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

[১০৪] *যিরমিয়*, খণ্ড: ২৫, পৃষ্ঠা: ৯-১১

অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৬]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার পর তাদের মুক্তি দিলেন। ইরান সম্রাট সাইরাস (Cyrus) যুদ্ধে ব্যাবিলনিয়দের পরাজিত করেন। ফলে তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বে পারস্য সম্রাট দারা ব্যাবিলন জয় করেন। তিনি ৫৩০ খ্রিষ্টপূর্বে ইহুদিদেরকে জেরুজালেম গিয়ে নিজেদের রাষ্ট্র পুনর্গঠনের অনুমতি দেন। আল্লাহ তাআলার এই সাহায্যের বিষয়টিও যিরমিয় ও যিশাইয় এর পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বনি ইসরাইল আবার অবাধ্য হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে—

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.

তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ করো তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এলো, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭]

অর্থাৎ, তারা যখন দ্বিতীয়বার অরাজকতা সৃষ্টি করল তখন শত্রুরা এসে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করল। আয়াতে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো বাইতুল মুকাদ্দাস। প্রথম ঘটনার ছয়শ বছর পর ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vespasian) তার পুত্র টাইটাসকে (Titus) সেনাবাহিনী সমেত জেরুজালেম অভিমুখে প্রেরণ করেন। টাইটাস পুরো নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুড়িয়ে দেয়। এমনকি যাওয়ার সময় বিপুলসংখ্যক ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। আর অনেককে হত্যা করে।

এটি ছিল বনি ইসরাইলের অবাধ্যতার শাস্তি। তারা জুলুম আর পাপাচারে পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছে। নবিগণকে হত্যার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন। ইহুদি ঐতিহাসিক ফ্ল্যাভিয়াস জোসেফ এই ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করেছিলেন। ইহুদিদের ইতিহাস সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।[১০৫]

এরই মাধ্যমে ইহুদিদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। জেরুজালেম রোমানদের অধিকারে থেকে যায়। অতঃপর ১৬ হিজরিতে উমর রাদিআল্লাহু আনহু এর যুগে মুসলিমরা সন্ধির মাধ্যমে এই শহর অধিকার করেন।

কুরআনের আয়াতে তাদেরকে সুস্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, তারা যদি উত্তম আচরণ করে তাহলে সেটা তারা নিজেদের স্বার্থেই যেন করল। আর অনিষ্ট করলে তাদেরই অনিষ্ট হবে। আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যতিক্রম কখনো হয়নি এবং হবেও না। যখনই তারা অবাধ্য হয়েছে তার ফল তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। তাদের বর্তমান কর্মের ফলও তারা শীঘ্রই ভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

বিচারকগণের ভূমিকা

হিব্রু ভাষী এ-জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি পুরোটা জয় করতে সক্ষম হয়নি। শুধু অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি অঞ্চলগুলোই তারা দখলে নিয়েছিল। অপরদিকে উপকূলীয় শহরগুলো তাদের বিজয়রথ থামিয়ে দেয়। যার বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

ইতিহাস বলে বনি ইসরাইল অত্যন্ত হঠকারী, অবাধ্য একটি জাতি। শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের মজ্জাগত। যেমন পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে—

ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিশর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুষ্পার্শ্বের লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করিত।[১০৬]

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তৈরি করে দিলেন যারা তাদেরকে শরিয়তের দিকে আহ্বান করবে। এদেরকে বিচারকগণ (Judges) বলা হতো। এ সময়ে বনি ইসরাইলের কোনো বাদশা ছিল না। এসব বিচারকদের মান্য করা তাদের ওপর আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক বিচারক তার গোত্রের দায়িত্বশীল হলেও তারা কার্যত যাযাবর গোত্রপ্রধানের মতো ছিলেন না। তারা বিচারের মজলিস কায়েম

---

[১০৫] তার এই বইটি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুত থেকে ছাপা হয়।

[১০৬] *বিচারকগণ*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১১-১৩।

করতেন। এই বিচারকগণের যুগের সূচনা হয়েছিল ইউশা ইবন্ নুনের পর থেকে। আর সমাপ্তি ঘটে সর্বশেষ বিচারক শমুয়েল এর মাধ্যমে। বিচারকগণ পুস্তকের ভাষায় এই সময়কালের ব্যাপ্তি ছিল চারশ পঞ্চাশ বছর।[১০৭]

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে এই সময়কাল একশ পঞ্চাশ বছরের বেশি হবে না। কেননা, মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়েছিলেন ১২১০ খ্রিষ্টপূর্বে। ইউশা ইবনে নুনের ইন্তেকাল হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১১৩০ সালে। তখন থেকে বিচারকগণের যুগের সূচনা হয়ে ১০২০ খ্রিষ্টপূর্বে শেষ হয়। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে এই সময়কাল কোনোমতেই চারশ পঞ্চাশ বছর নয়।

বিচারকগণ পুস্তকের রচয়িতাদের ভুলের অন্যতম কারণ হলো তারা প্রত্যেক বিচারকের জন্য চল্লিশ বছর করে সময়কাল হিসেব করেছেন যা বাস্তবসম্মত নয়। তা ছাড়া একই সময়ে একাধিক বিচারক বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু লিপিকারগণ প্রত্যেকের সময়কে আলাদা আলাদা হিসেব করেছেন। তাই প্রকৃত সময় থেকে তাদের হিসেবের অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।[১০৮]

বাইবেলে বর্ণিত বিচারকগণ ও তাদের বিচারকাল নিম্নে চার্ট আকারে দেখানো হলো।

বিচারকের নাম	বিচারের সময়কাল	বিচারকের নাম	বিচারের সময়কাল
অৎনিয়েল	৪০বছর	যিপ্তহ	৬ বছর
এহূদ	৮০ বছর	বসন	৭ বছর
শমগর	-	এলোন	১০ বছর
দবোরা বারাক	৪০ বছর	অবদোন	৮ বছর
গিদিয়োন	৪০ বছর	শিমসোন	২০ বছর

[১০৭] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১৩, অনুচ্ছেদ : ১৯-২০।
[১০৮] *ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮-৯।

অবিমেলক	৩ বছর	আলি যাজক	৪০ বছর
তোলয়	২৩ বছর	শমুয়েল	১২ বছর
যায়ির	২২ বছর	-	-

প্রত্যেকের সময়কাল যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ আশি বছর। শমগর এর সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় না। যদি সেটা চল্লিশ বছর হয় তারপরও সংখ্যাটা চারশ পঞ্চাশ হয় না। তা ছাড়া এই বিচারকগণের অনেকে একই সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে ক্ষেত্রে সামষ্টিক সময়কাল আরও কমে যাবে।

এই সময়ে ইহুদি চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাপন এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যাযাবর জাতিটি বিভিন্ন শহর ও গ্রামে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে। শহুরে জীবনধারাতে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে শুরু করে। ছুতার কর্ম, মৃৎশিল্পসহ বিভিন্ন পেশা ও শিল্পে তারা দক্ষ হয়ে উঠে। আর এই সবের পেছনে তাদের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে পূর্ব থেকে এখানে বসবাসরত কানানিরা।

এতৎসত্ত্বেও তাদের অগ্রসরতা ছিল খুবই ধীরগতির। যদ্দরুন বনি ইসরাইলের প্রতাপশালী সম্রাট আল্লাহর নবি সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাহির থেকে নির্মাণকুশলী ও শ্রমিক আনতে বাধ্য হন।[১০৯]

রাজাদের যুগ

তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী ইসরাইলিরা তাদের সর্বশেষ বিচারক শমুয়েল এর কাছে পার্শ্ববর্তী কানানি ও ফিলিস্তিনিদের মতো নিজেদের জন্যও একজন রাজা নির্বাচনের দাবি করেছিল। তাদের সেই দাবির প্রেক্ষিতে শৌলকে রাজা হিসেবে মনোনীত করা হয়।[১১০] শৌলের পর আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম রাজত্ব লাভ করেন। তিনি অধিকাংশ ফিলিস্তিনি শহর পদানত করতে সক্ষম হন। বিশেষত পিতলের খনিসমৃদ্ধ আরামীয়দের সোবা নগরী তার করতলগত হয়। তিনি সেখান থেকে অনেক পিতল আহরণ করে সেগুলো দিয়ে বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করেন।[১১১]

[১০৯] *আল-ইয়াহুদ ফি তারিখিল হাদারাতিল উলা*, পৃষ্ঠা : ১৫।

[১১০] *শমুয়েল ১ম*, অধ্যায় : ১০৫, অনুচ্ছেদ : ১৯-২০।

[১১১] *শমুয়েল ২য়*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ৮।

জেরুসালেম জয়ের পর তিনি সেটাকে নিজের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেন। এরপর যিহোবা প্রভুর জন্য ইবাদতগৃহ নির্মাণকাজ শুরু করেন। দাউদ আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রায় চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়। এরপর তার পুত্র আল্লাহর নবি সুলাইমান আলাইহিস সালাম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার মাধ্যমেই পিতার নির্মিতব্য হাইকলের নির্মাণকাজ শেষ হয়। সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকে ইহুদিদের ইতিহাসে সবচেয়ে বিশাল ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে আমাদের মনে হয় বিশালতার এই বিষয়টি আপেক্ষিক।

এইচ জি ওয়েলস[১১২] বলেন, যেকোনো বিষয়ের যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি আমাদের ভুলে না যাওয়া উচিত। সুলাইমান শুধু একজন ছোটোখাট রাজা ছিলেন। তার রাষ্ট্রটাও ছিল শীর্ণকায় ও ভঙ্গুর। যার কারণে তার মৃত্যুর পর কয়েক বছর যেতে না যেতেই দ্বাবিংশ রাজবংশের প্রথম ফারাও সম্রাট শশাঙ্ক জেরুসালেম দখল করে নেয়। এবং সেখানকার সমস্ত সম্পদও লুটে নেয়। বাইবেলে বর্ণিত শলোমনের রাজত্বের বিশালতার ব্যাপারে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহমিকাবোধই পরবর্তীকালের লেখকগণকে এ ধরনের অতিরঞ্জিত গাল-গল্প জুড়ে দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে।[১১৩]

এইচ জি ওয়েলস তার *মাআলিমু তারিখিল ইনসানিয়্যাহ* (দি আউটলাইন অব হিস্টোরি) গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সুলাইমান ও তার রাজত্ব সম্পর্কে ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থের বর্ণনায় অধিকমাত্রায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি রয়েছে। পরবর্তী কোনো লেখক ধর্মীয় গ্রন্থে এগুলো সংযোজন করেছে। আর এই বর্ণনা খ্রিষ্টান বিশ্ব তো বটেই মুসলিম বিশ্বকেও বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, বিশালতা ও জৌলুসের দিক থেকে সুলাইমান ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট। বাইবেলের রাজাবলি পুস্তকে সুলাইমানের রাজত্বের জাঁকজমক ও বিশালতার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তৃতীয় থোতমোস কিংবা দ্বিতীয় রামসিস অথবা বুখতে নসর কর্তৃক নির্মিত স্থাপনাগুলোর তুলনায় সুলাইমানের স্থাপনাগুলো অতি তুচ্ছ।[১১৪]

আমরা মুসলিমরা তাওরাতের মতো সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের বর্ণনায় অতিরঞ্জন করি না। আবার ওয়েলস এর মতো খাটো করেও দেখি না। কেননা আল্লাহ

---

[১১২] **হারবার্ট জর্জ ওয়েলস** (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬ – ১৩ অগাস্ট, ১৯৪৬) ছিলেন একজন ইংরেজ লেখক। তিনি মূলত তার কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলির জন্য সমধিক পরিচিত। তবে ওয়েলস ছিলেন একজন বহুমুখী লেখক। তিনি সমসাময়িক উপন্যাস, ইতিহাস, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়গুলি নিয়েও বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক।

[১১৩] *মুকারানাতুল আদইয়ান আল- ইয়াহুদিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৯

[১১৪] *মুকারানাতুল আদইয়ান আল-ইয়াহুদিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৮০

তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আমরা সেগুলো বিশ্বাস করি।

এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে কুরআনের ভাষায়—

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ.

কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব। [সুরা সাবা, আয়াত : ১২]

বাতাসকেও তার আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ.

এবং সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ওই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩]

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে—

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

আর আমি সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। [সুরা সাবা, আয়াত : ১২]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.

তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। আর সকল শয়তানকে তার

অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব, এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও-এর কোনো হিসেব দিতে হবে না। নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৩৬-৪০]

এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাকে তুলনাহীন এক রাজত্ব দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেওয়া হয়নি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৩৫]

সহিহুল বুখারি গ্রন্থের একটি হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একটি অবাধ্য জিন রাতে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসে। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা প্রদান করেন। আমি তাকে ধরলাম এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছে করলাম, যাতে তোমরা সবাই স্বচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলাইমানের এ দুআটি আমার মনে পড়ল। "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ যেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা" অতঃপর আমি জিনটিকে ব্যর্থ এবং লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিলাম।'[১১৫]

কুরআনের এসব আয়াত এবং হাদিস থেকে বুঝা যায় সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের আলাদা কিছু বিশেষত্ব ছিল। অন্য কাউকে তার মতো রাজত্ব না দেওয়ার যে দুআ তিনি করেছিলেন সেখান থেকে উদ্দেশ্য হলো মানব, জিন, বাতাস ও অন্যান্য মাখলুকাত তার অধীনস্ত হওয়ার বিষয়টি। রাজত্বের বিশালতা সেখানে উদ্দেশ্য নয়।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর তার পুত্র রহবিয়াম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। এ সময় ইসরাইলিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইতিপূর্বে সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে বিদ্রোহ করে পালিয়ে যাওয়া যারবিয়াম এই সুযোগটিকে কাজে লাগায়।

[১১৫] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৪৬১।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সংবাদ শুনে সে ফিলিস্তিনে ফিরে আসে এবং রহবিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ঘটনাক্রমে সে অধিকাংশ ইসরাইলিদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে বারোটি গোত্রের মধ্যে যিহুদা ও বিনইয়ামিন এর বংশধররা ব্যতীত বাকি দশটি গোত্র যারবিয়ামের সাথে যোগ দেয়। রহবিয়াম জেরুসালেমকে কেন্দ্র করে নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং যিহুদার নামে এই রাজ্যের নামকরণ করে। অপরদিকে যারবিয়াম উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। সে তার রাজ্যের নাম রাখে ইসরাইল এবং শিকমকে (বর্তমান নাবলুস) এ রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করে।

যারবিয়াম ভয় করত যে, তার অধীনস্ত গোত্রগুলো বলিপ্রদান ও তীর্থযাত্রার জন্য জেরুসালেম গমন করতে পারে। এতে করে তার ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে রহবিয়াম শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই সে স্বর্ণ দিয়ে বাছুরাকৃতির দুটি মূর্তি নির্মাণ করে। একটিকে সে রাজ্যের উত্তর প্রান্তের শহর স্থাপন করে। আর অপরটিকে স্থাপন করে দক্ষিণের শহর বেথেলহেমে। এরপর তার নির্দেশে অনুসারীরা এগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করে।

যারবিয়াম আরও অনেক পৌত্তলিক উপাসনাগৃহ নির্মাণ করে। আর এগুলোর পৌরোহিত্যের দায়িত্ব লেবিয়দেরকে বাদ দিয়ে অন্য গোত্রের নির্বাচিত লোকদের অর্পণ করে। আর নিজেকে প্রধান পুরোহিতও ঘোষণা দেয়।

এটাই হলো ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার স্বভাব-চরিত্র। এসব সুস্পষ্ট কুফরি। মুসা আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া ধর্ম কখনোই এগুলো সমর্থন করে না। এর মধ্য দিয়ে তারা মুসা আলাইহিস সালামে শরিয়ত থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

নিজেদের এই বিচ্ছিন্নতা বনি ইসরাইলের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুটো রাজ্যই দীর্ঘমেয়াদি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি কোনো কোনো সময় নিজেদের ভাইদেরকে দমন করার জন্য তারা বহিঃশক্তির সহযোগিতাও নিতে শুরু করে। রহবিয়ামের শাসনের পঞ্চম বছর মিশর সম্রাট প্রথম শশাঙ্ক জেরুসালেম হামলা করে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শশাঙ্ক সেখানকার যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। বাইবেলে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'আর রহবিয়াম রাজার পঞ্চম বৎসরে মিশর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিলেন; তিনি সদাপ্রভুর গৃহের ধন ও রাজবাটীর ধন লইয়া গেলেন; তিনি সমস্তই লইয়া গেলেন, আর শলোমনের নির্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকলও লইয়া গেলেন।'[১১৬]

[১১৬] *রাজাবলি ১ম,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২৫-২৬।

এরপর বনি ইসরাইল তিন শতাব্দী যাবৎ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনিয় সম্রাট বুখতেনসর জেরুসালেমে অভিযান চালিয়ে দশ হাজারেরও অধিক ইহুদিকে ধরে নিয়ে যায়। এসব ইহুদিকে সে নিজের দাস-দাসীতে পরিণত করে। বুখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাসকে বিরান করে দেয় এবং তার সমস্ত চিহ্ন ধুলিসাৎ করে দেয়। তার অভিযানের ব্যাপকতায় ইহুদিদের উভয় রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

বুখতে নসরের অভিযানের আগ পর্যন্ত তিন শতাব্দীব্যাপি বিশজন রাজা বনি ইসরাইলকে শাসন করেন। এরপর আরামীয়রা যিহুদা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে হেবরন থেকে নিয়ে বের-শেবা পর্যন্ত দখলে নিয়ে নেয়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগেও এরা ফিলিস্তিন শাসন করে। এসব আরামীয় শাসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সম্রাট হেরোডাস (Herod)। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪ সাল পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তার পুত্রদের মধ্যে আর্কেলাস (Archelaus), অ্যান্টিপাস (Antipas) ও ফিলিপ (Philip) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট সাইরাস ব্যাবিলন জয় করলে ইসরাইলিরা ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়। ৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বে তারা ফিলিস্তিনে ফিরে আসে। মুক্তির আনন্দে তারা পৌত্তলিক সম্রাট সাইরাসকে অভিনন্দন জানায়।

এরপর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট জেরুসালেম অভিযানে মূলত ইহুদিদের প্রধান রাব্বি বড় একটি দল নিয়ে শহরের বাইরে এসে তাকে সংবর্ধনা দিয়ে শহরে প্রবেশ করায়। পাশাপাশি তাকে এ সংবাদ দেয় যে, নবি দানিয়েল 'আলেকজান্ডার শীঘ্রই পারস্য জয় করবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

এভাবেই ইহুদিরা আলেকজান্ডারকে ধোঁকা দেয়। তিনিও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। সাত বছরের জন্য তাদের ট্যাক্স মওকুফ করে দেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার এক সেনাপতি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে ইহুদিদের একটি অংশকে ৩২০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরে বসতি স্থাপন করে দেয়। ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বে সিরিয়ান সম্রাট সেলুকাস নিকাটোর (Seleucus I Nicator) যিহুদা রাজ্য দখল করেন। এরপর ২০৩ খ্রিষ্টপূর্বে অপর এক সিরিয়ান সম্রাট কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মতো যিহুদা রাজ্য দখল হয়। ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়ায় তারা ইহুদিদের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেন।

১৬৫ খ্রিষ্টপূর্বে যিহুদা মুকাবি জেরুসালেম ফিরে আসতে সক্ষম হন। ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আগমন করেন তখন জেরুসালেম রোমান শাসকের অধীনে ছিল। ইহুদিরাও তাদেরকে মেনে চলত। তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখত। এমনকি একসময় তারা রোমান শাসককে ফুসলিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশও জারি করিয়েছিল।

এরপর রোমানদের সাথে ইহুদিদের সম্পর্কে চিড় ধরে। ইহুদিদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়। ফলে রোমানদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ। ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। তাদের সিনাগগগুলো ধ্বংস করা হয়। তখন থেকে ইহুদিরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাদের অনেকে আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, চীন প্রভৃতি এশীয় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। আবার অনেক পাড়ি জমায় ইউরোপে।

বিশিষ্ট গবেষক ফরিদ ওয়াজদি লিখেন, "মুসলিমরা রোম জয় করার পর ইহুদিদের অবস্থার উন্নতি হয়। বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরে তারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। আরবদের সংশ্রবের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানেও উন্নতি লাভ করতে থাকে। নবম শতাব্দীর শুরুতে কায়রো, পারস্য ও মারাকেশে তাদের নিজস্ব কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ সময়ে ব্যাবিলনে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং ফিলিস্তিনে বাড়তে থাকে। মোঘল মুসলিমদের দরবারেও তারা যথেষ্ট সমাদৃত হয়।"[১১৭]

এই হলো ইহুদিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস প্রমাণ করে ইহুদিরা ফিলিস্তিনের প্রকৃত অধিবাসী নয়। বরং তারা বাইরে থেকে এখানে এসেছে এবং একসময় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

পুরোনো নিয়মে বর্ণিত ঘটনাবলির সময়কাল নির্ধারণ করা নিয়ে গবেষকদের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। আমরা এখানে প্রফেসর বি ইসরাইল ড্যান কর্তৃক রচিত *তারিখু বাইবেল* তথা বাইবেলের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে ঘটনাগুলোর ধারাবাহিক সময়কাল তুলে ধরছি।

১। আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবন -২৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব।

২। নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবন থেকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম - ২৩৪৮-১৯২১ খ্রিষ্টপূর্ব।

৩। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম থেকে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মিশর গমন - ১৯২১-১৭০৬ খ্রিষ্টপূর্ব।

৪। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মিশর গমন থেকে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগ - ১৭০৬-১৪৯১ খ্রিষ্টপূর্ব।

৫। বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগ থেকে সিনাই উপত্যকায় অবস্থান - ১৪৯১-১৪৫১ খ্রিষ্টপূর্ব।

---

[১১৭] *দায়েরাতু মাআরিফিল করনিল ইশরিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮৪-২৮৫

৬। বনি ইসরাইলের কেনানে প্রবেশ থেকে ইউশা ইবনে নুনের ওফাত - ১৪৫১-১৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব।

৭। ইউশা ইবনে নুনের ওফাত থেকে বিচারকগণের যুগ -১৪০০-১০৯৫ খ্রিষ্টপূর্ব।

৮। বনি ইসরাইলের একক রাজত্ব -১০৯৫-৯৭৫ খ্রিষ্টপূর্ব।

৯। রাহবিয়াম এর যুগ থেকে সামেরাহ এর পতন -৯৭৫-৭২২ খ্রিষ্টপূর্ব।

১০। রাহবিয়াম এর যুগ থেকে জেরুজালেমের পতন -৯৭৫-৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্ব।

১১। জেরুজালেমের পতন থেকে বনি ইসরাইলের ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি - ৫৮৬-৫৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব।

১২। বনি ইসরাইলের প্রত্যাবর্তন থেকে পৌত্তলিক পুস্তক রচনা-৫৩৬-৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব।

এতক্ষণ বনি ইসরাইলের যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করেছি সেখান থেকে যা প্রমাণিত হয় তার সারসংক্ষেপ হলো—

১। বনি ইসরাইল ফিলিস্তিনের অধিবাসী নয়। তারা যোদ্ধা হিসেবে দেশ জয়ের লক্ষ্যে এখানে আগমন করেছে।

২। ইতিহাসের কোনও পর্যায়েই তারা সমগ্র ফিলিস্তিনের দখল নিতে পারেনি।

৩। ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা বনি ইসরাইলের শাসন মেনে নেয়নি। উল্টো তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তারা বনি ইসরাইলকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

৪। ইহুদিরা ওয়াদিল কুরা[১১৮]-তে একজন নবির আগমনের প্রত্যাশায় থাকত যিনি ইয়াসরিবে হিজরত করবেন। যিশাইয়ের পুস্তকে এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা এসেছে। তাদের ধারণা ছিল এ নবি ইসহাকের বংশ থেকে জন্ম নেবেন এবং তাদেরকে শত্রু তথা পারসিক, রোমান, অ্যাসেরিয়ান ও ফিলিস্তিনের অধিবাসী ফিনিশীয়দের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। ইহুদিরা শেষ নবির হিজরতস্থলের কাছে অবস্থান করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিল। তাই তারা ইয়াসরিবের আশেপাশে খাইবার ও ফাদাকে বসতি স্থাপন করে। যখন

---

[১১৮] আরব উপদ্বীপে খাইবার এবং তাইমা এর মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক উপত্যকা। বর্তমান সময়ে এর অবস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে অধিকাংশের মত হচ্ছে এ উপত্যকা বর্তমানে ওয়াদি আল-জিজিল নামে পরিচিত।–উইকিপিডিয়া

ইয়াকুত হামাভি লিখেছেন, ওয়াদিল কুরা হচ্ছে মদিনা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী খাইবার ও তাইমা এর মাঝে অবস্থিত উপত্যকা। এখানে অনেক গ্রাম এবং জনপদের বসবাস থাকায় এর নাম ওয়াদিল কুরা অর্থাৎ গ্রামসমূহের উপত্যকা। *মুজামুল বুলদান*, খণ্ড:৫, পৃষ্ঠা: ৩৪৫—নীরিক্ষক।

তারা দেখল যে প্রতিশ্রুত নবি ইসমাইলের বংশে আগমন করেছেন তখন আর মেনে নিতে পারল না। অস্বীকার করে বসল।

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৬]

৫। মুসা আলাইহিস সালামের ওপর তাদের জন্য যে শরিয়ত নাজিল করা হয়েছিল তারা তা কখনোই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শত্রুদের দ্বারা অপদস্থ করেছেন। চাপিয়ে দিয়েছেন লাঞ্ছনা ও যাযাবর জীবন। কুরআনে বলা হচ্ছে,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

তাদের ওপর লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গজব। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, তারা নাফরমানি করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬১]

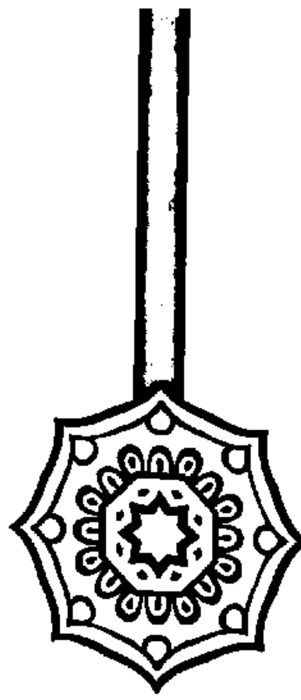
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ .

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গজব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানি করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১২]

খ্রিষ্টপূর্ব ৭০ সালে টাইটাসের আক্রমণের পর থেকে অদ্যাবধি তাদের ওপর এই লাঞ্ছনা ও যাযাবর জীবন ঝেঁকে বসে আছে। সে সময়ে টাইটাস জেরুজালেমসহ তাদের নগরগুলো পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছিল। তাদের অধিকাংশকে হত্যা করেছে। অন্যদেরকে দাস বানিয়ে নিয়েছে। তখন থেকেই মূলত ফিলিস্তিনের সাথে ইসরাইলিদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর ষড়যন্ত্রে কোনো ধরনের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।





কুরআনের দর্পণে ইহুদি জাতি

কুরআন ইহুদি জাতির চরিত্রকে অত্যন্ত সূচারুরূপে চিত্রায়িত করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১। আল্লাহ এবং আখিরাতকে অস্বীকার

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
>
> তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ওই লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা, আয়াত : ২৯]

ইহুদিরা আল্লাহর উপর ঈমান আনত ঠিকই কিন্তু তার সত্তা ও গুণাবলির মধ্যে শিরক করত। তাদের যাজকগণকে তারা প্রভুর আসনে বসিয়ে দিত। এই যাজকগণ তাদের

মনমতো ধর্মীয় বিধান রচনা করত। এ অর্থেই তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২। তাওরাতকে অস্বীকার

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে—

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ .

তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪৩]

৩। আল্লাহ তাআলাকে উপহাস করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ .

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .

আর ইহুদিরা বলে : আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ৬৪]

৪। প্রতিশ্রুত নবিকে অস্বীকার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ·

> যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে তার সহায়তা নিয়ে বিজয় কামনা করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৯]

ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে প্রতিশ্রুত সেই নবি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহুদিরা এটা ভালো করেই জানত। কিন্তু ইয়াসরিবের অধিবাসীরা তাদের আগেই মুসলিম হয়ে যাওয়ায় তার প্রতিহিংসাবশত বিরোধিতা শুরু করে। উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই এর ঘটনা এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

৫। সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ও সত্যকে গোপন করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

> আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিয়ো না এবং আমার (আজাব) থেকে বাঁচো। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিয়ো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৪১-৪২]

৬। কপটতা

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে—

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

যখন তারা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা মুসলিম হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করো না? [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

আর আহলে-কিতাবগণের একদল বলল, মুসলিমগণের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার করো, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭২]

অন্য আয়াতে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ক্রটি করে না-তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও বহুগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখো! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস করো। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি।

পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর ক্রোধবশত, আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আর আল্লাহ্ মনের কথা ভালোই জানেন। তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনো ক্ষতিই হবে না। নিশ্চয় তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১৮-১২০]

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

হে রাসুল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে, আমরা মুসলিম, অথচ তাদের অন্তর মুসলিম নয় এবং যারা ইহুদি; মিথ্যাবলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে

নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪১]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন—

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ .

তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৮]

৭। অসৎকাজে নিষেধ ছেড়ে দেওয়া

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৯]

৮। কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আজাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৮০-৮১]

৯। আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

হে মুসলিমগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৫]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন—

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

কোনো কোনো ইহুদি তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। [সুরা নিসা, আয়াত : ৪৬]

আরেক আয়াতে বলা হচ্ছে—

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا .

তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেন, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ৪১]

অন্যত্র তিনি বলেন—

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

يَكْسِبُونَ .

অতএব, তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৯]

১০। চুক্তি ভঙ্গ করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

কি আশ্চর্য, যখন তারা কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১০০][১১৯]

[১১৯] ইতিহাসের পাতায় তাদের চুক্তিভঙ্গের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন আবু সুফিয়ান মক্কার কাফের-মুশরিকদের নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করেন তখনো ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সহযোগিতা করে। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে কুরআনে বলা হয়েছে—

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا .

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছু নয়। যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সুরা আহযাব, আয়াত : ১০-১৫]

১১। নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান দাবি করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১৮]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন—

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোজখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতেগোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৪]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন—

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে-অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৯৪]

১২। অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে—

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আজাব। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৬১]

আরেক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪২]

১৩। যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ * ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনো-ই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করো, তাহলে তারা পশ্চাৎপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা

উপার্জন করেছে আল্লাহর গজব। ওদের ওপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানি করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১১-১১২]

১৪। দুনিয়াপ্রীতি—

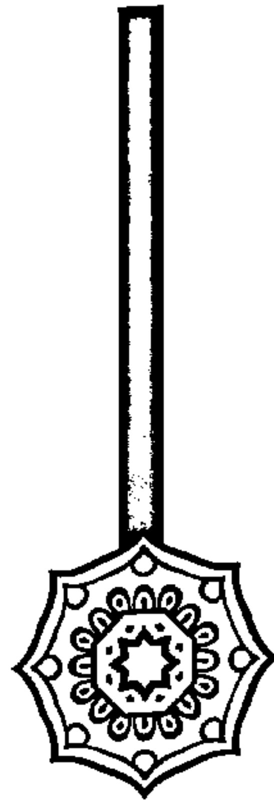
আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .

আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভি দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৯৬]

কুরআন অবতরণকালে এটাই ছিল ইহুদিদের অবস্থা। বর্তমান ইহুদিরা এর চেয়েও নিকৃষ্ট।





ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ

পুরাতন নিয়ম

ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. তাওরাত (Law)

দুই. নবিয়েম / নবিগণের পুস্তক (Prophets)

তিন. কেতুবেম / পবিত্র সহিফাসমূহ (Hagiographa)

এই তিন প্রকার গ্রন্থের সমষ্টিকে তারা সংক্ষেপে তানাখ (TANAKH) বলে থাকে।

মূলত গ্রন্থটির তিনটি অংশের অদ্যাক্ষরের সমন্বয়ে তানাখ শব্দটি গঠিত। খ্রিষ্টানরা অবশ্য এই সমষ্টির নাম দিয়েছে পুরাতন নিয়ম (Old testament)। মূলত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে তারা দুপর্বে ভাগ করে থাকে, যার প্রথম অংশ হচ্ছে এই পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট। আর দ্বিতীয় অংশ হলো নতুন নিয়ম (New Testament)। এখানে নিয়ম বা বিধি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেসব প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের ওপর ধার্য করেছেন। সুতরাং পুরাতন নিয়ম বলতে উদ্দেশ্য হলো প্রাচীন প্রতিশ্রুতি। আর নতুন নিয়ম থেকে উদ্দেশ্য হলো, যে প্রতিশ্রুতি ঈসা- আলাইহিস সালাম- থেকে নেওয়া হয়েছিল। পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মকে সম্মিলিতভাবে বাইবেল বলা হয়।

এটি মূলত ইউনানী শব্দ বিবিলিয়া (Bibilia) থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, এক ধরনের মিশরীয় চামড়া যা প্রাচীনকালে লেখালিখির কাজে ব্যবহৃত হতো। খ্রিষ্টানরা বাইবেল শব্দের সাথে পরে Saera তথা 'পবিত্র' শব্দটি জুড়ে দেয়। ফলে এর নাম দাঁড়ায় পবিত্র বাইবেল। ইহুদি পল করিন্থিয়ানস[১২০] বাসীদের কাছে লিখিত তার দ্বিতীয় পত্রে প্রথম পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট শব্দটি ব্যবহার করে।

উল্লেখ্য, পল ইহুদি হলেও ঈসা আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বগমনের পর সে নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবি করে। আর নতুন নিয়ম তথা নিউ টেস্টামেন্ট শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন মথি।[১২১] অবশ্য তাদের ধারণা মথি এটা ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে শুনেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ পুস্তক ইবরানি বা হিব্রু ভাষায় রচিত। হিব্রু হলো একটি সেমিটিক ভাষা। বিভিন্ন দিক থেকে এটি আরবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরামীয় ভাষাতেও পুরাতন নিয়মের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পাওয়া যায়। এটিও হিব্রুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ভাষা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মূল ভাষায় রচিত পুরাতন নিয়মের কোনো কপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনুবাদ।[১২২]

বর্তমান হিব্রু পুরাতন নিয়মের যে মূল পাঠটি আমাদের সামনে রয়েছে তা মূলত মাসুরি লিপি (Massoretic Text) থেকে কপিকৃত। ইহুদি পণ্ডিতগণ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রাচীন শহর তাইবেরিয়াসে এটি সংকলন করেন। ছাপার অক্ষরে হিব্রু ভাষায় পুরাতন নিয়ম প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো এটি ছাপানো হয়। এখান থেকেই পুরাতন নিয়ম জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বর্তমানে এটিই বহুল প্রচারিত পুরাতন নিয়ম।

এখান থেকে বোঝা যায়, পুরাতন নিয়ম দীর্ঘ ছয় শতাব্দী যাবৎ সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে এটি কখনো কখনো লিখিত আকারে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছেছে। আবার কখনো শুধু মৌখিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লিখিত কোনো কপি ছিল না।

ফরাসি গবেষক মরিস বুকাইলি বলেন, এই পুস্তিকাগুলি দীর্ঘ নয় শতাব্দীব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে শুধু জনশ্রুতি ও লোককথার ওপর ভিত্তি

---

[১২০] *করিন্থিয়* ২য়, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১৪। করিন্থিয়ানস হলো গ্রিসের একটি নগরী। ৫৩ খ্রিস্টাব্দে পোল খ্রিস্টবাদের দাওয়াত নিয়ে সেখানে সফর করেছিল।

[১২১] *মথি,* অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ১৮।

[১২২] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস,* পৃষ্ঠা : ৭৬৩

করে এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনকি নিত্যনতুন ঘটনা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে এগুলোকে সংশোধন ও সংস্কার করা হয়।"[১২৩]

এসময় ইহুদি পণ্ডিতগণ এই পুস্তকগুলিকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে যুগোপযোগী করে তোলারও চেষ্টা করেন।

থমাস বলেন, "ইহুদি আলেমরা ১৮টি স্থানে তাওরাতের মূল টেক্সট পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যা বর্তমানে 'পণ্ডিতদের সংস্করণ' নামে পরিচিত।"[১২৪]

এই ১৮ স্থানকে তারা সরাসরি পরিবর্তিত বলে স্বীকার করেন। এর বাইরে হাজারেরও অধিক স্থান এমন আছে যেগুলোর ব্যাপারে তাদের পণ্ডিতদের বক্তব্য হলো, এগুলো উৎকৃষ্ট নয়, এসব এভাবে না হয়ে ওভাবে হওয়া উচিত ছিল।

কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস প্রণেতা বলেন,"মাসুরিগণ বিভিন্ন অধ্যায়ে সংশয়পূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো টীকাতে লিপিবদ্ধ করেছে এবং এগুলো গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয় হওয়ার বিষয়টি ইহুদি পণ্ডিতগণের গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।" [১২৫]

পুরাতন নিয়মের পুস্তক-সংখ্যা নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন উপদলের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্টদের মতে এর সংখ্যা ৩৯টি। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা এগুলো নিয়েই পর্যালোচনা করব। অপরদিকে ক্যাথলিকদের মতে এই সংখ্যা ৪৬। তারা নহমিয়ের পুস্তকের পর যিহুদা ও তোবিয়াস নামক দুটি পুস্তিকা বৃদ্ধি করে। একইভাবে পরমগীত এর পর যিশুইয় ইবনে সিরাখ ও প্রজ্ঞা নামক দুটি পুস্তক, যিরমিয় এর গীত এর পর বারুখ এবং মালাখি এর পর ম্যাকাবি ১ম ও ২য় পুস্তকগুলি সংযোজন করে। আবার এদিকে অর্থোডক্স এবং ইঞ্জিলিয়গণ মনে করেন, ৫৩টি পুস্তক মিলেই পুরাতন নিয়ম সমৃদ্ধ। এগুলো ছাড়াও পুরাতন নিয়মের পুস্তকসংখ্যা নিয়ে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে।

পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তক নিম্নরূপ :

১। আদিপুস্তক
২। যাত্রাপুস্তক
৩। লেবীয় পুস্তক
৪। গণনাপুস্তক
৫। দ্বিতীয় বিবরণ
৬। যিহোশুয়
৭। বিচারকগণের পুস্তক
৮। রুতের বিবরণ
৯। শমুয়েল ১ম
১০। শমুয়েল ২য়

---

[১২৩] *দিরাসাত ফিল কুতুবিল মুকাদ্দাসাহ,* পৃষ্ঠা : ২৩
[১২৪] *হিস্ট্রি অফ দা ইংলিশ বাইবেল,* পৃষ্ঠা : ১৪
[১২৫] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস,* পৃষ্ঠা : ৭৬৩

১১। রাজাবলি ১ম

১২। রাজাবলি ২য়

১৩। বংশাবলি ১ম

১৪। বংশাবলি ২য়

১৫। ইস্রা

১৬। নহমিয়

১৭। ইস্টের

১৮। ইয়োব

১৯। গীত

২০। হিতোপদেশ

২১। উপদেশক

২২। পরমগীত

২৩। যিশাইয়

২৪। যিরমিয়

২৫। বিলাপ

২৬। যিহিস্কেল

২৭। দানিয়াল

২৮। হোশেয়

২৯। যোয়ে

৩০। আমোষ

৩১। ওবদিয়

৩২। যোনা

৩৩। মীখা

৩৪। নহম

৩৫। হবক

৩৬। সফনিয়

৩৭। হগয়

৩৮। সখরিয়

৩৯। মালাখি

ইহুদিরা এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে।

এক. নামুস। অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালামের পাঁচ পুস্তক।

দুই. নবিগণের পুস্তক।

তিন. পবিত্র সহিফাসমূহ।

প্রথম. নামুস তথা মুসা আলাইহিস সালামের পাঁচ পুস্তক। এগুলোকে সেমিটিক ভাষায় তাওরাহ বলা হয় যার অর্থ হচ্ছে শরিয়ত বা বিধিবিধান। নামুস শব্দের অর্থও বিধিবিধান। এটি মূলত গ্রিক শব্দ। সুতরাং নামুস থেকে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রীতিনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক বিধিবিধানসম্বলিত শরিয়ত যা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে প্রণয়ন করেছেন। এদিকে ইঙ্গিত করে ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

> মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা (নামুস) কিংবা নবিগণকে লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।[১২৬]

---

[১২৬] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৭।

মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কিসাসের বিধান অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা। যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে—

> যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন।[১২৭]

এরকম আরেকটি বিধান হলো ব্যভিচারিণীকে পুড়িয়ে হত্যা করা যেমন *আদিপুস্তকেই* বলা হচ্ছে—

> প্রায় তিন মাস পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, আরও দেখো, ব্যভিচারহেতু তাহার গর্ভ হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া দেও।[১২৮]

ব্যবস্থাবেত্তাগণ অর্থাৎ যারা এই শরিয়তের ব্যাখ্যা করত, তারা ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের সবচেয়ে বড় শত্রু। কেননা, তারা ইহুদিদের মাঝে এই শরিয়তের ব্যাখ্যার দায়িত্বকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছিল। মসিহ আলাইহিস সালামের আত্মপ্রকাশকে তারা নিজেদের পেশার জন্য হুমকি মনে করতে শুরু করে। একারণে মসিহ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের নিন্দা করেন। যেমন লুকের সুসমাচারে বলা হয়েছে—

তখন ব্যবস্থাবেত্তাদের একজন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরু, এই কথা বলিয়া আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন। তিনি কহিলেন, হ্যাঁ ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক তোমাদিগকেও, কেননা তোমরা মনুষ্যদের উপরে দুর্বহ বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাকো, কিন্তু আপনার একটি অঙ্গুলি দিয়া সেই সকল বোঝা স্পর্শ করো না।[১২৯]

এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

> مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

[১২৭] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ৬।
[১২৮] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৩৮, অনুচ্ছেদ : ২৪।
[১২৯] *লুক*, অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ৪৫-৪৬।

যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো, যে কেবল পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট! আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা জুমুআ, আয়াত : ৫]

ইহুদি এবং খ্রিষ্টান উভয়ে বিশ্বাস করে এই নামুস তথা শরিয়ত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। মুসা আলাইহিস সালাম একজন রাসুল এবং এই শরিয়তের বাহক মাত্র। পরবর্তীতে অবশ্য তাদের এ ধারণায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। বলা হয়ে থাকে— সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে ইহুদিদের কানানে প্রবেশসংক্রান্ত আলোচনা স্থান পাওয়া পুস্তকগুলি মুসা আলাইহিস সালাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তাওরাতের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—

'পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে শুনাইয়া দেও; কেননা আমি আকাশের নিচে হইতে অমালেকের নাম নিঃশেষে লোপ করিব।'[১৩০]

এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমালেকাদের পরাজয়।

অন্যস্থানে বলা হয়েছে—

মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞায় তাহাদের যাত্রা অনুসারে সেই উত্তরণ-স্থানগুলির বিবরণ লিখিলেন। তাহাদের যাত্রা অনুসারে উত্তরণ-স্থান সকলের বিবরণ এই।[১৩১]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে—

পরে মোশি এই ব্যবস্থা (তাওরাত) লিখিলেন, এবং লেবি-বংশজাত যাজকগণ, যাহারা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিত, তাহাদিগকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে সমর্পণ করিলেন।[১৩২]

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের বাইরে আধুনিক বায়োলজিক্যাল গবেষণা বলছে, এই পুস্তকগুলি এক্সোডাস তথা মিসর ত্যাগের সূচনা থেকে নিয়ে কানানে প্রবেশ পর্যন্ত প্রায়

---

[১৩০] *যাত্রাপুস্তক,* অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ১৪।
[১৩১] *গণনা পুস্তক,* অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ২।
[১৩২] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ৩১, অনুচ্ছেদ : ৯।

তিন শতাব্দী যাবৎ লেখা হয়েছে। আর মুসা আলাইহিস সালাম কানানে প্রবেশ এর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন যেমনটি তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে।

তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না।[১৩৩]

মৃত্যুকালে মুসা আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল একশ বিশ বছর। এ বয়সেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল সতেজ ও তীক্ষ্ম। মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুতে বনি ইসরাইল মোয়াবে ত্রিশ দিন শোক প্রকাশ করে ক্রন্দন করে। [১৩৪]

এই ঘটনা পর্যালোচনা করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাযম লিখেছেন—

তাদের তাওরাতের সর্বশেষ অধ্যায় হচ্ছে এটি। এই অধ্যায়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তাদের কাছে রক্ষিত এই তাওরাত আসল তাওরাত নয়। এটি একটি বিকৃত ও বিচ্যুত তাওরাত। এটি সংকলিত ইতিহাস, যা সংকলন করেছেন কোনো গণ্ডমূর্খ ব্যক্তি মনগড়া চিন্তা থেকে। এটি কখনোই আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত তাওরাত হতে পারে না। কেননা এটি মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত তাওরাত যদি হতো তাহলে সেখানে মুসা আলাইহিস সালাম মৃত্যু ও দাফনের আলোচনা স্থান পেতো না। তিনি আরও বলেন, এখানে যে বলা হলো 'অদ্যপি তার কবর কেউ চিনে না' এ বাক্যটিও আমার পূর্বকথাকে সমর্থন করে এবং বোঝা যায়, এটি মুসা আলাইহিস সালামের ওফাতের দীর্ঘকাল পরে রচিত হয়েছে।[১৩৫]

এ ছাড়াও এর বিভিন্ন অংশের শরিয়তের অংশ হওয়া নিয়ে ইহুদিদের মতানৈক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, এগুলো মুসা আলাইহিস সালামের লেখা নয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহিও নয়।

---

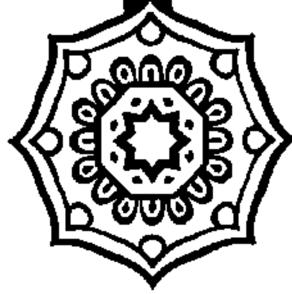
[১৩৩] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ৩৪, অনুচ্ছেদ : ৫-৬। "অদ্যাপি কেউ জানে না" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত সংকলন যখন হচ্ছিল তখন পর্যন্ত কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করেছেন তিনি মুসা আলাইহিস সালামকে নিজ কবরে নামাজরত অবস্থায় পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে এটি ছিল মুসা আলাইহিস সালামের কবরের জীবন বাস্তব দুনিয়াবি জীবন নয়। কেননা তিনি অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

[১৩৪] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৬

[১৩৫] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৬

গবেষকগণ মনে করেন, পুরাতন নিয়মে প্রথম অংশ তাওরাত লিপিবদ্ধ হয় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বে। দ্বিতীয় অংশ নবিগণের পুস্তক লিপিবদ্ধ হয় ২০০ খ্রিষ্টপূর্বে এবং তৃতীয় অংশ পবিত্র সহিফাগুলো লিপিবদ্ধ হয় ৯০ খ্রিষ্টাব্দে। যদি এর পুরোটা মুসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে হতো কিংবা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হতো তাহলে তাদের আলিমগণ এটির শরিয়ত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করতেন না।





১ম অংশ : তাওরাত তথা মুসা আ.-এর পুস্তকসমূহ

১ম পুস্তক : *আদিপুস্তক*

বিষয় বিবেচনায় এই পুস্তকটিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. সৃষ্টির সূচনা ও তার পর্যায়সমূহ।

দুই. পৃথিবীতে মানব জাতির পদার্পণ, আদম-হাওয়া, নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবন, প্লাবন পরবর্তী নতুন পৃথিবীর বিকাশ।

তিন. ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম, তার অবস্থা, সফর, দাওয়াত, সন্তানসন্ততি, বনি ইসরাইলের মিশর গমন, ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনা, সর্বশেষ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালামের মৃত্যু।

আদিপুস্তক এর প্রথম অংশে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব, বিশ্বজগতের সৃষ্টির আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে যথেষ্ট বৈপরীত্যপূর্ণ বক্তব্য স্থান পেয়েছে। এ ছাড়াও কতগুলো বক্তব্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সুস্পষ্ট ভুল হিসেবে প্রমাণিত।

যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে,

পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।[১৩৬]

এটি ছিল সৃষ্টির প্রথম দিনের ঘটনা। এর একটু পরেই চতুর্থ দিনের বিবরণিতে বলা হয়েছে—

পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে ভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সেই সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক; এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া তাহা আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।[১৩৭]

এখান থেকে বোঝা যায়, নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোকে প্রথম দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করা হয়েছে চতুর্থ দিন। মাধ্যমের আগে ফলাফল বা গাছের আগে ফলের আত্মপ্রকাশের মতো একটি অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা এখান থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। আল্লাহপ্রদত্ত ওহিতে এমন অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা অকল্পনীয়।

একই পুস্তকের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে—

পরে ঈশ্বর সপ্তম দিবসে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিবসে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।[১৩৮]

এখানে আল্লাহ তাআলা বিশ্রাম নিয়েছেন বলা হচ্ছে। তার মানে জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে তার পরিশ্রম হয়েছে। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অতঃপর বিশ্রাম নিয়েছেন। এমন চিন্তা-বিশ্বাস আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকারান্তরে তার সত্তার ত্রুটির পরিচায়ক। অথচ তিনি সমস্ত ত্রুটির ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া যেখানে সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তার বাণী *কুন* (হও) বললেই হয়ে যায়, সেখানে পরিশ্রান্ত হওয়া অতঃপর বিশ্রাম নেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আর যদি বিশ্রাম থেকে উদ্দেশ্য হয় সপ্তম দিনে তিনি কর্মহীন থেকেছেন তাহলে সেটা তার চিরঞ্জীবিতা ও স্থায়িত্বকে বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তাআলার সত্তায় কর্মহীন শব্দটি প্রয়োগ করা যায় না। এ

[১৩৬] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৩-৪।
[১৩৭] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৪-১৫।
[১৩৮] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২।

বিষয়ে পবিত্র কুরআনুল কারিমই একমাত্র ন্যায়সংগত বক্তব্য দিয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনোরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। [সূরা ক্বাফ, আয়াত : ৩৮]

তাওরাতের এই বিষয়টি নিয়ে আপত্তি আসার পর তাদের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদে বিশ্রামের অর্থকে বিরত থাকা অর্থে পাল্টে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে আসমান জমিন সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে কাজ থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন ইংরেজি অনুবাদে বলা হয়েছে, And also the whole universe was completed by the seventh day God finished what He had been doing and stopped working.

উর্দু হিন্দিসহ আরও বিভিন্ন ভাষার অনুবাদেও তারা এমন পরিবর্তন করেছে।

আদিপুস্তক এর চতুর্থ, পঞ্চম, একাদশ, একবিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আদি পুরুষগণের আয়ুষ্কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালামকে সূচনা ধরে প্রত্যেকের জন্ম ও মৃত্যু সাল উল্লেখ করা হয়েছে। ফরাসি বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি এ সংক্রান্ত একটি চার্ট তৈরি করেছেন চার্টটি তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কিতাবুল মুকাদ্দাস অধ্যয়ন'* এ উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে চার্টটি হুবহু তুলে ধরছি।

ক্র	নাম	জন্মসন (আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি সূচনা ধরে)	বয়স	মৃত্যুসন (আদম আ.-এর সৃষ্টিকে সূচনা ধরে)
১	আদম	...	৯৩০	৯৩০
২	শেথ (শীষ)	১৩০	৯১২	১০৪২
৩	ইনোশ	২৩৫	৯০৫	১০৪২

৪	কৈনন	৩২৫	৯১০	১১৪০
৫	মহললেল	৩৯৫	৮৯৫	১৩৯০
৬	যেরদ	৪৬০	৯৬২	১৪২২
৭	হনোক	৬২২	৩৬৫	৯৮৭
৮	মথুশেলহ	৬৮৭	৯৬৯	১৬৫৬
৯	লেমক	৮৭৪	৭৭৭	১৬৫১
১০	নুহ	১০৫৬	৯৫০	২০০৬
১১	শেম	১৫৫৬	৬০০	২১৫৬
১২	অর্ফকশদ	১৬৫৮	৪৩৮	২০৯৬
১৩	শেলহ	১৬৯৩	৪৩৩	২১২২
১৪	এবর	১৭২৩	৪৬৪	২১৮৭
১৫	পেলগ	১৭৫৭	২৩৯	১৯৯৬
১৬	রিয়ু	১৭৮৭	২৩৯	২০২৬
১৭	সরুগ	১৮১৯	২৩০	২০৪৯
১৮	নাহোর	১৮৪৯	১৪৮	১৯৯৭
১৯	তেরহ	১৮৭৮	২০৫	২০৮৩
২০	ইবরাহিম	১৯৪৮	১৭৫	২১২৩

এই চার্টটির দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, নুহ আলাইহিস সালামের জীবদ্দশাতেই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। অথচ প্রাচীন ইতিহাসে তারা সমকালীন হওয়া কিংবা তাদের পরস্পরের সাক্ষাতের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চার্ট থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়— নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবন এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মাঝে সর্বোচ্চ ব্যবধান হলো ৮৯২ বছর। তাও যদি আমরা মনে করি যে নুহ আলাইহিস সালামের জন্মের পর পরই প্লাবন হয়েছিল। অথচ এটা অসম্ভব। প্লাবনের সম্ভাব্য সময় ছিল আদম আলাইহিস সালামের আগমনের ১৫৩১ বছর পর এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্মের ৪১৭ বছর পূর্বে। খ্রিষ্টপূর্ব হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন সর্বোচ্চ ১৮ শতকের মানুষ। সে হিসেবে সর্বগ্রাসী সেই প্লাবনটি সংঘটিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাবিংশ শতাব্দীতে। অবশ্য মরিস বুকাইলি যাজকদের বর্ণনার ভিত্তিতে প্লাবনের সময় নুহ আলাইহিস সালামের বয়স ৬০০ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এটি কুরআনের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, কুরআনে বলা হচ্ছে—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

> আমি নুহ আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল জালিম। [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪]

এই খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাবিংশ শতাব্দী এবং তারও পূর্বে পৃথিবীর বুকে অনেক প্রাচীন সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মিশরের কথাই ধরা যাক। দ্বাবিংশ শতাব্দী ছিল মিশরীয় সভ্যতার মধ্যকাল। এ সময়ে মিশরে একাদশ রাজবংশ এবং ব্যাবিলনে প্রথম কিংবা তৃতীয় রাজবংশ শাসন করছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, মিশরীয় সভ্যতার শুরুটা হয়েছিল আরও শত শত বছর পূর্বে আর এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর কোনোকালেই পরিপূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং প্লাবনের সময় সমগ্র মানবজাতি বিলীন হওয়ার যে দাবি তাওরাতে করা হয়েছে সেরকম কোনো ঘটনাও ঘটেনি। উপরন্তু এ দাবিও অবান্তর যে, তাওরাতের তিন পুস্তকের বর্ণনাগুলো মানবজাতির ব্যাপারে যে সকল তথ্য দিয়েছে সেগুলো বাস্তবতার সাথে সাযুজ্য রাখে।[১৩৯]

এখানে আরেকটি বিষয় এই যে, তাওরাতের এই বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল আনুমানিক সপ্তত্রিংশ শতাব্দীতে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান

---

[১৩৯] *দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসাহ আলা দওইল মাআরিফিল হাদিসাহ,* পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪।

বলছে, লক্ষ্য বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। খ্রিষ্টানদেরই লিখিত একটি বিশ্বকোষের তথ্য মতে, ফিলিস্তিনে দুই লক্ষ বছর পূর্বের মানবজাতির বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।[১৪০]

বিশিষ্ট খ্রিষ্টান নৃবিজ্ঞানী ডোনাল্ড জনসন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ঘোষণা করেন যে, চার মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। তার এই গবেষণা ডারউইনের বিবর্তনবাদের থিওরিকেও ভুল প্রমাণিত করে।[১৪১]

দ্বিতীয় পুস্তক : যাত্রাপুস্তক

বনি ইসরাইলের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা আলোচিত হয়েছে এ পুস্তকে। দীর্ঘদিন ফেরাউনের নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর বনি ইসরাইল মুসা আ. এর সাথে মিশর ত্যাগ করে সিনাই মরুতে পৌঁছায় এবং সেখানে চল্লিশ বছর উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে। উক্ত ঘটনাই সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে এ পুস্তকে। পাশাপাশি ইবাদত, লেনদেন এবং শাস্তি সম্পর্কিত কিছু বিধিবিধানও এ পুস্তকে স্থান পেয়েছে। পুস্তকটিকে আমরা মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি।

এক. মিশরে অবস্থানকালীন সময়ের আলোচনা। এই অংশে পুস্তকটি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সপরিবারে মিশরে আগমন সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেছে। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওফাতের পর বনি ইসরাইলের ওপর নেমে আসা দুর্যোগ, মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম, তার প্রাথমিক জীবন, দাওয়াতের পদ্ধতি, ফেরাউনের সাথে বিরোধ, অতঃপর ফিরাউন ও মিশরীয়দের ওপর দশটি আঘাতের বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই. মিশর থেকে সিনাই—। এই অংশে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগ, অতঃপর সমুদ্রে রাস্তা হয়ে যাওয়া এবং মরুভূমিতে তাদের জন্য আসমানি খাবার মান্না-সালওয়ার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তিন. সিনাইতে বনি ইসরাইলের জীবনযাপন। এ অংশে সিনাইতে বনি ইসরাইলের জীবনযাপন, মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক আনীত শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ, গোবৎস উপাসনা, মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক বনি ইসরাইলের নিন্দা, মুসা আলাইহিস সালামের তুর পর্বতে গমন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

[১৪০] *ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া*, পৃষ্ঠা : ১৫
[১৪১] *আল-ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৪

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

> আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির ... [সুরা বাকারা, আয়াত : ৫১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

> আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪২]

এই অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দশ আদেশ। এ পর্যায়ে আমরা এই দশ আদেশ নিয়ে আলোচনা করব।

দশ আদেশ বা আজ্ঞা

মুসা আলাইহিস সালাম কীভাবে দশ আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন এ নিয়ে তাওরাতের আলোচনা বিরোধপূর্ণ। তাওরাত কখনো বলছে, আল্লাহ তাআলা নিজেই এই কালিমাগুলো বলেছেন।[১৪২] আর মুসা আলাইহিস সালাম স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার অন্য সময় বলছে, এই দশটি আদেশ আল্লাহর আঙুল দ্বারা পাথরে লিখিত আকারে মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে।[১৪৩]

মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন পর পাহাড় থেকে নেমে এসে দেখলেন বনি ইসরাইল বাছুর পুজায় লিপ্ত হয়েছে। তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। এমনকি রাগের মাথায় দুটি ফলক ভেঙে ফেললেন। এরপর অবাধ্য জাতিকে পবিত্র করার পর পুনরায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে পাহাড়ে গেলেন। এবারে তিনি নতুন দুটি ফলক নিয়ে এলেন। এগুলোতে প্রভুর আদেশ লিপিবদ্ধ ছিল।[১৪৪] তবে এ দুটি ফলক মুসা আলাইহিস সালামের নিজ হাতে খোদাই-করা ছিল।[১৪৫] বর্ণনার এই বিরোধ কথিত তাওরাতের ওপর স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি করে।

---

[১৪২] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১। [মূল কিতাবে এ স্থানে রেফারেন্স নম্বর দেয়া আছে অধ্যায় ২০ যা সঠিক নয়।]

[১৪৩] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৩১, অনুচ্ছেদ : ১৮; অধ্যায় : ৩২, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৬।

[১৪৪] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ৯-১০

[১৪৫] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ১-৪।

দশটি আদেশের মধ্যে প্রথম তিনটি হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য তথা হক্কুল্লাহ সম্পর্কে। এই তিনটি আদেশ প্রথম ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। আর বাকি সাতটি আদেশ হলো মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব তথা হক্কুল ইবাদ সম্পর্কে। এগুলো দ্বিতীয় ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এই বিভাজনটি অগাস্টিন কর্তৃক বর্ণিত। রোমান ক্যাথলিকগণ এটিকে গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মত হলো, প্রথম ফলকে চারটি আদেশ এবং দ্বিতীয় ফলকে ছয়টি আদেশ লিপিবদ্ধ ছিল। তাওরাতে বর্ণিত সেই দশটি আদেশ আমরা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করলাম।

প্রথম আদেশ: আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

দ্বিতীয় আদেশ: "তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নিচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোনো মূর্তি নির্মাণ করিও না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের ওপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়া করি। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না।"

তৃতীয় আদেশ: তুমি বিশ্রামদিন (শনিবার) স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন। সেই দিন তুমি, কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোনো কার্য করিও না। কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন।

চতুর্থ আদেশ: তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।

পঞ্চম আদেশ : নরহত্যা করিও না।

ষষ্ঠ আদেশ : ব্যভিচার করিও না।

সপ্তম আদেশ : চুরি করিও না।

অষ্টম আদেশ : তোমরা প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।

নবম আদেশ : তোমরা লোভ করিও না প্রতিবাসীর স্ত্রীতে।

দশম আদেশ: কিংবা প্রতিবাসীর গৃহে বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোনো বস্তুতেই লোভ করিও না।[১৪৬]

দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মিশর ত্যাগ করা বনি ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফেরাউনের নির্যাতন ও মিশরীয়দের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কুরআন তাদেরকে বারংবার এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যাতে তারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরে আসে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়তের অনুগামী হয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সুপথে ফিরে আসার বদলে তারা তাদের মুক্তির দিনটিকে উৎসব হিসেবে গ্রহণ করে। এই দিনটিকে তারা ঈদুল ফেসাখ বা পাসওভার (Passover) উৎসব নাম দিয়ে আড়ম্বরতার সাথে পালন করে থাকে। এই উৎসবের আরেক নাম ঈদুল ফিতর। বনি ইসরাইলকে খুব দ্রুত মিশর থেকে বের হতে বলা হয়েছিল। ফলে তারা রুটির খামিরকে ভালোভাবে গাজাতে পারেনি। সেদিকে লক্ষ্য করেই এই নামকরণ করা হয়েছে।

যাত্রাপুস্তক এর দ্বাদশ অধ্যায়ে এই উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এপ্রিলের ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় শুরু হয়ে ২১ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত এই উৎসব পালিত হয়। এরপর তারা ভেড়া জবাই করে। প্রবাহিত রক্ত তাদের প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক বহন করে। আর মিশরের বন্দিদশার কথা স্মরণ করে এই দিনগুলোতে তেতো লতা-পাতা খাওয়া হয়। পরিবারের প্রধান কিংবা উপস্থিতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এসময় তাদেরকে মিশর ত্যাগের কাহিনি পড়ে শোনান। ইহুদি ধর্মমতে কেউ যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে তাহলে সে ইসরাইলি দলভুক্ত থাকে না।

ইহুদিদের অন্যান্য উৎসব

- ঈদুল আসাবি (Shavuot) : ঈদুল ফেসাখ তথা পাসওভারের সাত সপ্তাহ পর জুনের ছয় তারিখে এই উৎসব পালন করা হয়। কথিত আছে, এই দিনে আল্লাহ তাআলা তুর পর্বতে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আলাপ করেছিলেন।
- রোশ হাশানা (Rosh Hashana) : তাদের ধারণা এই দিনে ইসহাক আলাইহিস সালামকে জবাই থেকে মুক্তি দিয়ে তদস্থলে দুম্বা জবাই দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে

---

[১৪৬] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৬-২১।—নিরীক্ষক

তিনি ইসহাক ছিলেন না। ছিলেন ইসমাইল। ইতিপূর্বে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করে এসেছি।

❖ ঈদুল সোমারিয়া : অর্থ্যাৎ বড় উপবাস। এই দিনে ইহুদিরা রোজা রাখে। তারা বিশ্বাস করে এটি মুসা আলাহিস সালাম কর্তৃক উপবাস যাপনের তৃতীয় চল্লিশ দিনের শেষ দিন এটি।

❖ ঈদুস মিজাল্লা : তারা সাত দিন কুঁড়েঘরে বসবাস করে।[১৪৭] হাইকল যখন আবাদ ছিল তখন তাদের উপর বছরে তিনবার তীর্থ যাত্রা করা আবশ্যক ছিল।[১৪৮]

তৃতীয় পুস্তক : লেবীয় পুস্তক

মুসা আলাইহিস সালামের দাদা লেবি বিন ইয়াকুবের দিকে সম্বন্ধ করে এই পুস্তকটিকে লেবীয় পুস্তক বলা হয়। লেবির বংশধর ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য পালনকারী তথা যাজক শ্রেণি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমাগম তাঁবু বহন ও স্থাপনের দায়িত্ব তাদের হাতেই অর্পিত ছিল। এই পুস্তকে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই পুস্তকটি এই নামে নামকরণ করা হয়। পাশাপাশি এই পুস্তকে আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তক এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ।

এক. যাজক ও পূজারি কর্তৃক নৈবেদ্য ও বলিদানের নিয়মাবলি।

দুই. হারুন ও তার পুত্রদের যাজকীয় পদে অভিষেক।

তিন. পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কিত বর্ণনা।

চার. মানত ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির বিধান।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে এই পুস্তকটি মুসা আলাইহিস সালাম লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু গবেষকগণ বলছেন এটি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা হয়েছে। এই পুস্তকের সূচিপত্র থেকে সেটাই পরিস্ফুট হয়।

চতুর্থ পুস্তক : গণনা পুস্তক

এটি পূর্ববর্তী তিনটি পুস্তকের পরিশিষ্ট এর মতো। এখানে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সময় থেকে নিয়ে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের ঘটনা, অতঃপর সিনাই মরুভূমিতে

---

[১৪৭] সিনাইতে তাদের চল্লিশ বছরের যাযাবর জীবনের স্মৃতিরোমন্থনস্বরূপ তারা এটি করে থাকে। -অনুবাদক

[১৪৮] বিস্তারিত : *তারিখুল ইয়াহুদ*, মাকরিজি, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪১

তাদের জীবনযাপনের ঘটনা এবং সর্বশেষে মোয়াব অঞ্চলে পৌঁছার কাহিনি বিবৃত হয়েছে।

বনি ইসরাইলের বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যসংখ্যা, সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তুর গণনা স্থান পেয়েছে বিধায় এটিকে গণনা পুস্তক বলা হয়। সিনাই পৌঁছে মুসা আলাইহিস সালাম প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা ছিল লেবির বংশধর ব্যতীত অন্যদের আদমশুমারি করা এবং প্রত্যেক গোত্রের অবস্থান নির্ধারণ করা। এরপর লেবীয়দেরকে গণনা করে তাদের অবস্থানস্থল নির্ধারণ করা এবং তাদের পৌরোহিত্যকার্য সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া। ইসরাইলিদের সিনাইতে দুবার আদমশুমারি হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমবার হয়েছিল মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে। লেবীয়দেরকে বাদ দিয়ে অস্ত্র বহন করতে পারে এমন বিশোর্ধ বয়সী পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ জনে।[১৪৯] প্রত্যেক গোত্রের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ।

ক্র.	বংশের নাম	সংখ্যা
১	রুবেন এর বংশ	৪৬৫০০
২	শিমিয়ন এর বংশ	৫৯৩০০
৩	গাদ এর বংশ	৪৫৬৫০
৪	যিহুদা এর বংশ	৭৪৬০০
৫	ইষাখার এর বংশ	৫৪৪০০
৬	ইফ্রয়িম এর বংশ	৪০৫০০
৭	যবুলুন এর বংশ	৫৭৪০০
৮	মনঃশি এর বংশ	৩২২০০
৯	বিন্যামিন এর বংশ	৩৫৪০০
১০	দান এর বংশ	৬২৭০০
১১	আশের এর বংশ	৪১৫০০
১২	নফতালি এর বংশ	৫৩৪০০
	মোট	৬০৩৫৫০

[১৪৯] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৪৫-৪৬।

এই গণনায় লেবীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে তাদের এক মাস বা তদূর্ধ্ব বয়সী পুরুষের সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার।[১৫০] বনি ইসরাইলের এই সংখ্যাতে নিশ্চিত অতিরঞ্জন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাথে যারা কানান থেকে এসেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর। এরপর মিশরে মাত্র দুটি প্রজন্ম জন্মগ্রহণ করে। মুসা আলাইহিস সালামের পিতা ইমরানের প্রজন্ম এবং মুসা আলাইহিস সালামের প্রজন্ম। সত্তরজনের একটি গোষ্ঠীমাত্র দুই প্রজন্মের ব্যবধানে ছয় লক্ষে পৌঁছে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। তাও এই ছয় লক্ষ সংখ্যাটি বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদেরকে বাদ দিয়ে। এদিকে লেবীয়দের সংখ্যাটা আরও বেশি আশ্চর্যজনক। লেবি হলেন ইমরানের দাদা। তার তিন পুত্র। গোর্শন, কহাৎ ও মরারি। এদের মধ্যে কহাত হলেন মুসা আলাইহিস সালামের দাদা। সংগত কারণে লেবির এই তিন পুত্র থেকে এত অল্প সময়ে বংশবিস্তার হয়ে বাইশ হাজারে পৌঁছা একেবারেই অসম্ভব।

বনি ইসরাইলের দ্বিতীয় আদমশুমারি হয়েছিল প্রথম শুমারির আটত্রিশ বছর পর তাদের কানানে প্রবেশের পূর্বে।[১৫১] এই শুমারিতে লেবীয়দের সংখ্যা ছিল তেইশ হাজার আর অন্যদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এক হাজার সাতশ ত্রিশ।[১৫২] নিরপেক্ষ খ্রিষ্টানদের অনেকেই স্বীকার করেন যে, এ সংখ্যাতত্ত্বে অতিরঞ্জন রয়েছে।[১৫৩]

পঞ্চম পুস্তক : দ্বিতীয় বিবরণ

মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলেই পুস্তকটির এ নামকরণ করা হয়েছে। এ পুস্তকে মূলত বনি-ইসরাইলের জন্য শরিযয়তের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ইহুদিদের দাবি হলো, ইউশা ইবনে নুন নেতৃত্বে আসার পূর্বে মুসা আলাইহিস সালাম এই পুস্তকটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে গবেষকদের মত হলো এটি সম্রাট যিহুদা (৬৯৩-৬৩৯খ্রিষ্টপূর্ব) এর সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যিশাইয় (৬৩৮-৬০৮ খ্রিষ্টপূর্ব) এর সময়ে এটি প্রকাশিত হয়।[১৫৪] কেননা এই পুস্তকে মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী উপর্যুক্ত সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

---

[১৫০] *গণনা পুস্তক,* অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ৩৯।

[১৫১] *গণনা পুস্তক,* অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ৫১।

[১৫২] *গণনা পুস্তক,* অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ৫১।

[১৫৩] *মনিনি,* উর্দু সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২০৫

[১৫৪] *মনিনি,* উর্দু সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২০৮

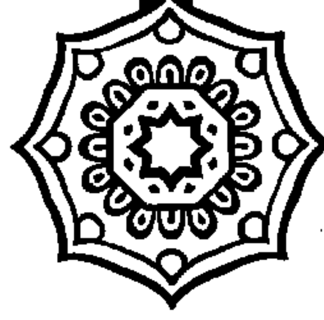
এই পুস্তকে রাজনীতি, যুদ্ধ, অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি ও লেনদেনসম্পর্কিত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও মুসা আলাইহিস সালামের তিনটি ঐতিহাসিক খুতবা এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। যেগুলো তিনি মোয়াবে মিশর থেকে বের হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্তিতে বনি ইসরাইলের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। খুতবাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ।

প্রথম খুতবা : আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

দ্বিতীয় খুতবা : দশ আদেশের পুনরাবৃত্তি, শরিয়ত পালনের বরকত এবং শরিয়ত না মানার পরিণতি।

তৃতীয় খুতবা : বনি-ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে মুসা আলাইহিস সালামের বিদায়-সম্ভাষণ।





দ্বিতীয় অংশ

ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ

বনি ইসরাইল কানান তথা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি দখল করে সেখানে থিতু হওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলি এই পুস্তকগুলিতে বিবৃত হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিচারক ও রাজাগণের সংখ্যা, তাদের সময়কাল এবং প্রতিশ্রুত ভূমিতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা এ পুস্তকগুলিতে স্থান পেয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে এই পুস্তকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এক. যিহোশুয় এর পুস্তক

মুসা আলাইহিস সালামের পরবর্তী নবি এবং বনি ইসরাইলের নেতা যিহোশুয় (ইউশা ইবনে নুন) এর দিকে সম্বন্ধ করে এর নামকরণ করা হয়। তার প্রকৃত নাম ছিল হোশেয়। মুসা আলাইহিস সালাম সেটা পরিবর্তন করে রাখেন যিহোশুয়।[১৫৫] ইনি ছিলেন ইফ্রয়িম এর বংশধর। মিশরেই তার জন্ম। প্রথমে তিনি মুসা আলাইহিস সালামের খাদেম ছিলেন।[১৫৬] মুসা আলাইহিস সালাম তার মাঝে নিখুঁত নিষ্ঠা ও অসাধারণ

[১৫৫] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ১৩, অনুচ্ছেদ : ১৬।
[১৫৬] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ১৩।

যোগ্যতা দেখতে পান। ফলে কানানে সফল গুপ্তচরবৃত্তির পর তিনি তাকে নিজের খলিফা মনোনীত করেন এবং তাকে সেই দেশ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মুসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালে পর তিনি স্বাভাবিকভাবেই বনি ইসরাইলের নেতৃত্বে চলে আসেন। এরপর সবাইকে তিনদিনের প্রস্তুতির সময় দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত জর্ডান নদী পাড়ি দেন।[১৫৭] এই পুস্তকে যিহোশুয় এর নেতৃত্বে পবিত্র ভূমিতে ইসরাইল জাতির অধিকার স্থাপনের কাহিনি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ সময় তাঁর হাতে বেশ কিছু মুজেযা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সূর্য স্থির হয়ে যাওয়া।[১৫৮]

---

[১৫৭] *যিহোশূয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১০-১১।
[১৫৮] *যিহোশূয়*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৪।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাল্লাহু তার নিজস্ব সনদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘শুধু ইউশা ইবনে নুন এর জন্য সূর্যের গতি স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে সফর করছিলেন।’

এই হাদিসের সনদ সহিহ। আল্লামা সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি শুধু জামেউস-সগির গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন। তাই ব্যাখ্যাকার ইমাম মুনাবি হাদিসটির সমালোচনা করেছেন। তিনি ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ-এর বরাত দিয়ে বলেন এই হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হিশাম ইবনে সিরিনের সনদে উল্লেখ করেছেন।[১৫৮]

মূল হাদিসটি বুখারি-মুসলিমেও স্থান পেয়েছে। ইমাম বুখারি *কিতাবু ফরদিল খুমুস* এবং ইমাম মুসলিম *কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ারে* এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। উভয়ে হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনুল আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনুল আলা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক থেকে, তিনি মা'মার থেকে, তিনি হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ থেকে এবং তিনি আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

“একজন নবি যুদ্ধে বের হলেন....অতঃপর তিনি সূর্যকে লক্ষ করে বললেন, তুমিও নির্দেশিত আমিও নির্দেশিত। হে আল্লাহ! আপনি কিছু সময়ের জন্য এই সূর্যের গতি স্থির রাখুন। অতঃপর সূর্যকে স্থির করে দেওয়া হলো। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করলেন।”

এই বর্ণনায় নবির নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং গ্রামের নামও উল্লেখ করা হয়নি।

মুস্তাদরাক হাকেম এর রেওয়ায়েতে অবশ্য তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসটি বর্ণনা করার পর কাব আহবার বলেন—

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম তাওরাতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। হে আবু হুরাইরা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে সেই নবির নাম বলেছেন? আবু হুরাইরা বললেন, না, বলেননি। তখন কাব বললেন,তিনি ছিলেন ইউশা ইবনে নুন। আচ্ছা নবিজি কি আপনাকে সেই গ্রামের নাম বলেছেন? আবু হুরাইরা বললেন, না, বলেননি। তখন কাব বললেন,সেটি ছিল যিরিহো (জেরিকো) নগরী।
হাকিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি সহিহ ও গরিব হাদিস। ইমাম যাহাবিও একই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হলো, হাদিসের সনদের রাবি মোবারক ইবনে ফাদালা একজন মুদাল্লিস[১৫৮]। তবে হাফেজ ইবনে কাসির *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, বিষয়টি অমীমাংসিত। এই ঘটনাটি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের সময়কার ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা, সেটি ছিল মূলত উদ্দিষ্ট। যিরিহো (জেরিকো) বিজয় ছিল একটি মাধ্যমমাত্র।

রাজ্য জয়ের পর যিহোশুয় তথা ইউশা ইবনে নুন ইসরাইল জাতিকে সুবিন্যস্ত করেন এবং গোত্রগুলোর মাঝে ভূমি বণ্টন সম্পন্ন করেন। এরপর তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং ইফ্রয়িম পর্বতে তাকে দাফন করা হয়।

আধুনিক ইহুদি-খ্রিষ্টান গবেষকগণ এখন পর্যন্ত এই পুস্তকটির রচয়িতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তবে প্রাচীন ইহুদি-খ্রিষ্টানগণ মনে করতেন, শেষ পাঁচটি অনুচ্ছেদসহ আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ ব্যতীত এই পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ যিহোশুয় নিজেই রচনা করেছেন শেষ পাঁচটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

এই সকল ঘটনার পরে নুনের পুত্র, সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় একশত দশ বৎসর বয়সে মরিলেন। পরে লোকেরা গাশ পর্বতের উত্তরে পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ তিম্নৎ-সেরহে তাঁহার অধিকারের অঞ্চলে তাঁহার কবর দিলো। যিহোশুয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে প্রাচীনবর্গ যিহোশুয়ের মরণের পরে জীবিত ছিলেন, ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত কার্য জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল সদাপ্রভুর সেবা করিল।

আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যোষেফের অস্থি, যাহা মিশর হইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে সেই ভূমিখণ্ডে কবরস্থ করিল, যাহা যাকোব একশ রৌপ্য-মুদ্রায় শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন; আর তাহা যোষেফ-সন্তানগণের অধিকার হইল। পরে হারোণের পুত্র ইলিয়াসা মরিলেন; আর লোকেরা তাঁহাকে তাঁহার পুত্র পীনহসের পাহাড়ে কবর দিলো, পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের সেই পাহাড় তাঁহাকে দত্ত হইয়াছিল।'[১৫৯]

এই অনুচ্ছেদগুলোতে যিহোশূয় এর মৃত্যু, দাফন এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এজন্যই খ্রিষ্টানদের অনেকেই মনে করেন এই পুস্তকটি হারুন আলাইহিস সালামের পুত্র ইলিয়াসার লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এমতটিও শুদ্ধ নয় কেননা এ পুস্তকের শেষ অনুচ্ছেদে ইলিয়াসার এর মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ হয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো এই পুস্তকের প্রকৃত রচয়িতা অদ্যাবধি অজ্ঞাত।

দুই. বিচারকগণের পুস্তক

যিহোশুয় থেকে নিয়ে শমুয়েল পর্যন্ত বনি ইসরাইলের নেতাগণকে বিচারক হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই পুস্তকে বনি-ইসরাইলের বিচারকগণ, তাদের সময়কাল এবং বিচারকার্যে তাদের ঘুষের লেনদেনের আলোচনা বিবৃত হয়েছে। এদের পরেই মূলত বনি

[১৫৯] *যিহশুয়,* অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ২৯-৩৩।

ইসরাইলের বাদশা হিসেবে মনোনীত করা হয় আইনে তালুতকে। তালুত ছিলেন তাদের প্রথম রাজা।

তাওরাত সংকলকগণ বিচারকদের সময়কাল নিয়ে একমত হতে পারেননি। এই পুস্তকে বলা হয়েছে, তাদের সময়কাল ছিল চারশ পঞ্চাশ বছর। আবার অপর দিকে বলা হচ্ছে এদের সময়কাল শুরু হয়েছিল ১১৩০ খ্রিষ্টপূর্বে আর শেষ হয়েছিল ১০২০ খ্রিষ্টপূর্বে।

একইভাবে এই পুস্তকের রচয়িতা ব্যাপারেও ইহুদি পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। তাদের অনেকেই বলছেন এটি শেষ বিচারক শমুয়েল রচনা করেছেন। এ মতটি মেনে নিলে বলতে হয়, পুস্তকটি বিচারকগণের যুগ শেষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারমানে এই দাঁড়াল যে, দীর্ঘ শতাব্দীকালব্যাপী এই পুস্তকটি কোনো ধরনের সূত্র ছাড়া শুধু শ্রুতিকথার ওপর নির্ভর করে চলে এসেছে। এতে করে এই পুস্তকের ওপর আস্থাটা রাখা সম্ভব নয়। এই পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পুস্তকটি অনেক বিলম্বে রচিত হয়েছে।

ওই সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না, যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভালো বোধ হইত, সে তাহাই করিত।[১৬০]

এখান থেকে বোঝা যায়, পুস্তকটি রাজাদের যুগে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এর রচয়িতা অত্যন্ত দুঃখভরে ইহুদিদের জুলুম, অবাধ্যতা এবং তাদের পরিচালনার জন্য কোনো রাজা না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয়

এই পুস্তকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো বনি-ইসরাইলের ধর্মবিমুখতা। কমপক্ষে সাত বারের বেশি এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। বনি ইসরাইল যখন দ্বীন থেকে দূরে সরে যেত তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিতেন। এরপর তারা কান্নাকাটি করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা এই বিচারকগণের হাতে তাদেরকে নিস্তার দিতেন। এটাই হলো এই পুস্তকের মৌলিক শিক্ষা। বলা হচ্ছে—

ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিশর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী

[১৬০] *বিচারকর্তৃগণ*, অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ৬।

হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল।[১৬১]

তিন. রুতের বিবরণ

রুত মোয়াবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে সুন্দরী রমণী। মূলত রুত ছিলেন একজন মোয়াবি রমণী যিনি নিজ পিতা, পরিবার এবং জাতিকে ছেড়ে বনি ইসরাইলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। যিহুদার বংশের জনৈক পুরুষের সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাদের বংশধারা থেকেই দাউদ আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। কথিত আছে, রুত হলেন দাউদ আলাইহিস সালামের দাদি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইহুদিরা পিতামাতা উভয়ে ইহুদি না হলে তাকে নিজেদের জাতির অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্তু রুতের ক্ষেত্রে তাদের আচরণটা ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন।

এই পুস্তকটি মূলত রাজাগণের আলোচনায় প্রবেশ এর ভূমিকাস্বরূপ। তথাপি ইহুদি জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে একজন মোয়াবিয় নারীর ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতি সম্মান জানিয়ে পুস্তকটির এই নামকরণ করা হয়। *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস* থেকে সংক্ষিপ্তাকারে রুতের ঘটনাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইবরানিদের মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইলিমেলক নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে মোয়াবে চলে যায় এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। কিছুদিন পর সে নিজের স্ত্রী নয়মি এবং দুই ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করে। ছেলে দুটি দুজন মোয়াবীয় রমণীকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর ছেলে দুটিও মারা যায়। ইত্যবসরে নয়মি জানতে পারেন যে, তাদের দেশে দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তখন সে নিজ দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করে। পুত্রবধূদ্বয়কে ডেকে নিজ নিজ পিতৃগৃহে চলে যেতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তার পীড়াপীড়িতে একজন আরফা নামক পুত্রবধূ যেতে রাজি হয় এবং পিতৃগৃহে চলে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্রবধূ রুত, সে কোনোমতেই শাশুড়িকে ছেড়ে পিতৃগৃহে চলে যেতে সম্মত হয় না। তার পক্ষ থেকে শাশুড়ির প্রতি পরম আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।[১৬২]

এরপর রুত নয়মির সাথে বেথেলহেমে প্রবেশ করেন। পুস্তকে রুতের ঘটনাবলি অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তির সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে রুতের সাথে যিহুদা গোত্রীয় বোয়স এর বিবাহ হয়। তাদের ঘরে ওবেদ নামক একটি পুত্র সন্তানের জন্ম নেয়। রুতের বিবরণের ভাষ্য অনুযায়ী এই ওবেদ হলেন দাউদ আলাইহিস সালামের দাদা। পুস্তকটি কবে রচিত হয়েছে তা নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন এটি শমুয়েল

[১৬১] *বিচারকর্তৃগণ*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১১; অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১২; অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১; অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ১; অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৬।

[১৬২] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, ৩৯১,। পাঠক চাইলে রুতের বিবরণের সাথে ঘটনাটি মিলিয়ে নিতে পারেন।

রচনা করেছেন। অনেকের মতে এটি যিহিস্কেল এর রচনা। আবার কারও কারও মতে এটি ইয্রা রচনা করেছেন।

চার, পাঁচ, ছয় ও সাত. শমুয়েল ও রাজাবলি

সমুয়েল ইবরানি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম। বলা হয়ে থাকে, মুসা আলাইহিস সালামের পর তিনিই ইবরানিদের প্রথম নবি এবং সর্বশেষ বিচারক। ইহুদিদের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কেননা, তিনি ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইহুদি জাতিকে রক্ষা করেছিলেন এবং লুণ্ঠিত হওয়া পবিত্র তাবুত (Ark of covenant) ফিরিয়ে এনেছিলেন।

দীর্ঘকাল বিচারকার্য পরিচালনা করে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। এরপর তিনি নিজের দুই ছেলেকে বিচারকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু পুত্রদ্বয় নিজেদের কাজে ইনসাফের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা ঘুষের লেনদেনেও জড়িয়ে পড়ে।[১৬৩] এরপর বনি-ইসরাইলের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ শমুয়েল এর কাছে আসেন। তারা তাকে জানান, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠায় তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তারা শমুয়েলের কাছে আবেদন জানান যাতে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য একজন বাদশা নিযুক্ত করা হয়। তাদের সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা একজন বাদশা নিযুক্ত করলেন কুরআনের ভাষায় যার নাম হচ্ছে তালুত। কুরআনে বলা হয়েছে—

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا.

> আর তাদের নবি তাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশা হিসেবে প্রেরণ করলেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪৭]

শমুয়েল এর পুস্তকে তার নাম বিবৃত হয়েছে সৌল।[১৬৪]

তালুত সৈন্যসমাবেশ ঘটালেন। তার প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল ফিলিস্তিনিরা, যাদের নেতৃত্বে ছিল জালুত নামক এক বীর। ইবরানিদের ভাষায় তার নাম হচ্ছে গিলিয়াড। তালুতের বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন যিশয় পুত্র দাউদ আলাইহিস সালাম। যুদ্ধে তিনি জালুতকে পরাজিত করেন। ফিলিস্তিনিরাও পরাজিত হয়। দাউদের বীরত্বে সৌল খুশি হন এবং নিজ কন্যা মিখলকে তার সাথে বিবাহ দেন। এরই মাধ্যমে দাউদ ও সৌল এর মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সম্পর্ক পরবর্তীতে তাদের জন্য কাল হয়ে

[১৬৩] *সমুয়েল প্রথম,* অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ১; অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ৪।

[১৬৪] সমুয়েলের ৮,৯,১০,১১তম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত ঘটনা বিবরণ রয়েছে।—নিরীক্ষক

দাঁড়ায়। কারণ, সৌল দাউদের রাজত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। পরিণতিতে তাকে এবং তার সন্তানদেরকে জীবন দিতে হয়। এরপর ইসরাইলিদের রাজত্ব দাউদ আলাইহিস সালামের হাতে অর্পিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ.

আর আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যা ইচ্ছা হয় তা শিক্ষা দিলেন। [সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫১]

এরপর দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালাম পিতার রাজত্বের উত্তরাধিকারী হন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর ইসরাইলিরা দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মিশরে ফিরাউনদের দাত্রিংশ রাজ পরিবারের সম্রাট প্রথম শশাঙ্ক জেরুজালেমের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয় এবং শহরের অধিকাংশ মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।

এ চারটি পুস্তকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনকালের চিত্রায়ন অতিরঞ্জন করা হয়েছে। তার প্রজ্ঞা, রাজ্য পরিচালনার বর্ণনা এখানে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল স্থাপত্যকীর্তি, বিভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ, জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ প্রভৃতির বর্ণনাও পুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রজ্ঞা ও তার সুনিপুণ হাতে রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে আমরা একমত। তিনি বনি ইসরাইলের জন্য আল্লাহর মনোনীত একজন নবি ছিলেন। কিন্তু ইহুদি গ্রন্থগুলো তার এই স্থাপত্যকীর্তি ও নির্মাণযজ্ঞ নিয়ে যে অতিরঞ্জিত বক্তব্য দিয়েছে তার সাথে আমরা একমত নই। বিশেষ করে ফারাও ও ফিনিশীয়দের স্থাপত্য কীর্তির তুলনায় তার নির্মাণযজ্ঞ খুব বেশি আহামরি কিছু নয়। পশ্চিমা গবেষকগণ ইহুদি গ্রন্থগুলোর এমন অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে এগুলো এতই অতিরঞ্জিত যার কোনো সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। গুস্তাভ লি বোন তার *আল-ইয়াহুদ ফিল হাদারাতিল উলা* গ্রন্থে এবং এইচ জি ওয়েলস তার *মাআলিমু তারিখিল ইনসানিয়্যাহ* (এ আউটলাইন অব হিস্ট্রি) গ্রন্থে এসব বর্ণনার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

এই চারটি পুস্তকে ঘুরেফিরে এগুলোই আলোচিত হয়েছে। শমুয়েল এর পুস্তকদ্বয় প্রকৃতপক্ষে একটি পুস্তক ছিল। হিব্রু বাইবেলেও এভাবেই রয়েছে ১৫১৬-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভেনিস সংস্করণে এটিকে দুটি পুস্তকে ভাগ করা হয়। আর রাজাবলি প্রথম থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজা সৌল এবং রাজাবলি দ্বিতীয় থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজা দাউদ আলাইহিস সালাম।

আট ও নয়, বংশাবলি ১ম ও ২য়

অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কারণে বোঝা যায় দুটি পুস্তক প্রকৃতপক্ষে একটি পুস্তকই ছিল। গ্রিক বাইবেলের অনুবাদকগণ এটিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। পরবর্তীতে এই বিভাজনটি সর্বজন সমাদৃত হয়। পুস্তক দুটিকে শমুয়েল এর পুস্তকদ্বয় এর সম্পূরক বলা চলে। এর আলোচ্য বিষয়কে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. আদম ও তার বংশধর।

দুই. সৌলের মৃত্যু এবং দাউদ এর রাজত্ব।

তিন. সুলাইমান এর শাসনকাল।

চার.সুলেইমানের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের ভাঙন।

সম্ভাব্য খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই পুস্তক রচনা করা হয়। এটি রচনা করতে গিয়ে *আদিপুস্তক* থেকে নিয়ে রাজাবলি পর্যন্ত পুস্তকগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। আমি জানি না কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। কেননা, ইহুদিদের ইতিহাসের নতুন কোনো আলোচনাই এতে স্থান পায়নি। আমার এও বুঝে আসে না যে, কীসের ভিত্তিতে এটিকে তারা পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে? এ পুস্তককে সর্বোচ্চ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

দশ ও এগারো, ইয্রা ও নহমিয়

ইয্রা ইবরানি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে সাহায্য। ইয্রা ছিলেন পারস্য সম্রাটের প্রধান পুরোহিত। ব্যাবিলনীয় বন্দিদশার সময়ে তিনি ইহুদিদের ব্যাপারে সম্রাটের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ইহুদিদের বিষয়ে তিনি সম্রাটকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন। সম্রাট তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং জেরুজালেমে ফিরে যাওয়া এবং ফিলিস্তিনে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেন। এটি ছিল ৪৫৮-৩৯৮ খ্রিষ্টপূর্ব সময় কালের ঘটনা। জেরুজালেম পৌঁছে ইয্রা বুখতে নসর কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যাওয়া হাইকল পুনর্নির্মাণ-কাজে হাত দেন। পাশাপাশি লেবীয়দের সহযোগিতায় মুসা আলাইহিস সালাম পাঁচ পুস্তক নতুনভাবে রচনা এবং লোকজনকে এগুলো শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করেন। ইহুদিরা তার সমস্ত সংস্কার কার্যক্রম এবং তার সংকলিত তাওরাত সাদরে গ্রহণ করে। কেননা ইয্রা ছিলেন ইহুদিদের কল্যাণকামী ও একনিষ্ঠ ব্যক্তি। এর ফলে তিনি যা ইচ্ছা তাই বলে মুসা আলাইহিস সালামের দিকে সম্বন্ধ করতেন। কারণ, তার এই নিষ্ঠা ও কল্যাণকামিতার দ্বারা তিনি ইহুদিদের মাঝে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হন। ইহুদিরাও তার কথা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়। এমনকি

অনেকে তাকে ঈশ্বর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ.

আর ইহুদিরা বলে, উজায়ের আল্লাহর পুত্র। [সুরা তওবা, আয়াত: ৩০]

নহমিয় হলেন গরবুক এর পুত্র। তিনি ব্যাবিলন থেকে ইহুদিদের সাথে আগমন করেন। ইয্রার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তার মহান কর্মযজ্ঞের দিকে তাকিয়ে পুস্তকটি এই নামে নামকরণ করা হয়। মূলত ইয্রা ও নহমিয় পুস্তকদ্বয় বংশাবলি পুস্তকদ্বয়ের অংশবিশেষ ছিল। পরবর্তী সময় এটিকে স্বতন্ত্র পুস্তক হিসেবে রূপদান করা হয়। হিব্রু বাইবেলে অদ্যাবধি ইয্রা ও নহমিয়কে একটি পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বারো, ইস্টের

ইস্টের একজন ইহুদি রমণীর নাম। তার ঘটনার আলোচনা আছে বলে পুস্তকটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়। পারস্য সম্রাট ইস্টেরকে দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ইস্টের সম্রাট ও তার চাচাতো ভাই মর্দখয় এর মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দিতে সক্ষম হন। ইতিপূর্বে একজন প্রভাবশালী উজির হামানের সাথে মর্দখয় এর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে হামান ইহুদিদেরকে সমূলে বিনাশ করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। এমনকি মার্চের ১৩ তারিখে ইহুদিদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য একটি রাজকীয় ফরমান জারি করতে সক্ষম হয়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ইহুদিদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে ইস্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাচাতো ভাই মর্দখয়কে নিয়ে হামানের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে থাকে। তারা সম্রাটকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, হামান সম্রাটকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করছে। তাদের পরিকল্পনা সফল হয় এবং সম্রাট হামানকে তার অনুসারীবৃন্দসহ হত্যা করার নির্দেশ দেন। কাকতালীয়ভাবে ইহুদিদের হত্যার জন্য নির্ধারিত দিনেই হামান ও তার সহযোগীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত পারসিকদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। এজন্যই মার্চের ১৪ তারিখকে অদ্যাবধি ইহুদিরা উৎসব হিসেবে পালন করে।

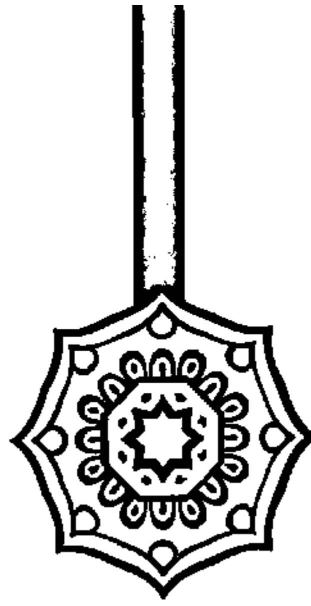
গবেষকগণ মনে করেন, এটি একটি বানোয়াট রূপকথা। এর ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। এই ঘটনা ইহুদি নারীদেরকে অ-ইহুদিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পদ্ধতি বাতলে দেয় এবং একজন ইহুদি নারী সৌন্দর্য দ্বারা নিজ জাতির সেবার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। পুস্তকটিকে আরবিসহ বিভিন্ন অনুবাদে ঐতিহাসিক পুস্তকের সর্বশেষ পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হিব্রু বাইবেলে এটিকে কেতুবেম তথা পবিত্র সহিফাসমূহের

অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা স্বয়ং ইহুদি গবেষকদের মাঝে প্রশ্নবিদ্ধ। মিল্টন সারডিস এবং জর্জির নাজইয়াঞ্জ প্রমুখ এই পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা মেনে নেননি। আবার কেউ কেউ এটিকে অগ্রহণযোগ্য পুস্তকগুলোর একটি মনে করেন।[১৬৫]

পুস্তিকাটি কোন যুগে লেখা হয়েছে তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তুলনামূলক বিশুদ্ধ মত হলো ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বে *আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট* এর বিজয়ের পর গ্রিক শাসন আমলে এটি রচিত হয়েছে। নতুন নিয়মে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না।



[১৬৫] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা: ৬৪।



তৃতীয় অংশ

গীতপুস্তক

কাব্যরূপে ইহুদিদের ধর্মীয় উপদেশাবলি হলো গীতপুস্তক। প্রশংসা, মিনতি, ধ্যান প্রভৃতি এসব কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের এমন পুস্তকের সংখ্যা পাঁচটি। এগুলোর বড় অংশ দাউদ আলাইহিস সালাম লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশিষ্টগুলো রচনা করেছেন লেবীয় এবং অন্যান্য পুরোহিতগণ।

এক. ইয়োব

ইয়োব হলেন কুরআনে বর্ণিত নবিদের একজন। কুরআনে যাকে আইয়ুব নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁকে ধৈর্য, স্থিরতা ও তুষ্টির উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনে তার সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম তা পাওয়া যায় না। পুরাতন নিয়মে ইয়োবকে একজন নেককার মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। যিনি কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো বিদ্রোহী। কখনো আপতিত বিপদকে অম্লান চিত্তে মেনে নিচ্ছেন আবার কখনো বিদ্রোহী হয়ে প্রশ্ন করছেন, আমার সাথেই কেন এমন হলো?

পুরাতন নিয়মে তার সাথে শয়তানের কথোপকথনের একটি ঘটনাও বিবৃত হয়েছে এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান ইয়োবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম

হয়। পশ্চিমা লেখকগণ ইয়োবের পুস্তকটিকে দর্শন ও সাহিত্যের এক অনবদ্য পুস্তক হিসেবে অভিহিত করেছেন। ফরাসি বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি বলেন, প্রকৃত অর্থে এটি সততা ও প্রজ্ঞার পুস্তক।[১৬৬]

কুরআন এবং পুরাতন নিয়মের কোথাও তার সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু তার অবস্থানস্থল সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে যে, তিনি উস নগরীতে বসবাস করতেন।[১৬৭] এটি দামেশক ও ইরম এর মধ্যবর্তী একটি শহর। অনেকের মতে এটি হলো হোরান নগরী। তার সময়কাল সম্পর্কে কুরআনে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে বলা হচ্ছে—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ .

এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহিমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নুহকে পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইসরাইল, ইয়াসা, ইউনুস, লুতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। [সুরা আনআম, আয়াত : ৮৩-৮৬]

আলোচ্য আয়াতে (ذريته) এর সর্বনামটি থেকে যদি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলা যায়, তিনি অর্থাৎ আইয়ুব তাঁর বংশধর। তবে এটি সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে লুত আলাইহিস সালামকেও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র। বংশধর নন। আর যদি সর্বনামটি থেকে নুহ আলাইহিস সালাম

---

[১৬৬] *দিরাসাতুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ৩৬।

[১৬৭] *ইয়্যব*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১।

উদ্দেশ্য হয় তখন বলা যায় তিনি নুহ আলাইহিস সালামের বংশধর। সে ক্ষেত্রে সময়কাল নির্ধারণ করা অনেক কঠিন। সময়কাল যাই হোক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, তিনি একজন নবি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করেছেন। তিনিও আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পুরাতন নিয়মেও তার এই গুণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—

উস দেশে ইয়োব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিলেন।[১৬৮]

একই অধ্যায়ে একটু পর বলা হয়েছে—

তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ইয়োবের ওপরে কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই।[১৬৯]

পুরাতন নিয়মের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সাত পুত্র ও তিন কন্যার পিতা ছিলেন। তার সম্পদের মধ্যে ছিল সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উট, পাঁচশ জোড়া বলদ, পাঁচশ গাধী এবং প্রচুর পরিমাণ দাস-দাসী। পূর্বাঞ্চলের লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে মহান ও বিত্তশালী।[১৭০] এরপর তাঁর সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে তাকে আগের চেয়েও বেশি বিত্তশালী বানিয়ে দেন। এই পুস্তকটিকে আমরা পাঁচটি অংশে ভাগ করতে পারি।

প্রথম: এ অংশে আইয়ুব এর আল্লাহভীতি, সম্পত্তির বিবরণ, আত্মীয়স্বজনের বর্ণনা এবং তার গুণাবলির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় : এ অংশে আইয়ুব ও তার তিন বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন আলোচিত হয়েছে। যন্ত্রণাদগ্ধ আইয়ুব প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তার উপরেই মুসিবত এলো? তার বন্ধুরা ইসরাইলি ধর্মমত অনুযায়ী বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর সব সময় ধার্মিককে পুরস্কৃত করেন আর অধার্মিককে দণ্ড দেন। কাজেই কোনো পাপের ফলস্বরূপ এই নিদারুণ যন্ত্রণা তাকে দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় : আইয়ুবের সর্বকনিষ্ঠ সাথি ইলিহুর প্রজ্ঞাপূর্ণ বচন এ অংশে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ : ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে সৃষ্টিকর্তার আইয়ুবের সাথে কথোপকথন বিবৃত হয়েছে এ অংশে।

---

[১৬৮] *ইয়োব*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১।
[১৬৯] *ইয়োব*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৯।
[১৭০] *ইয়োব*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২-৩।

পঞ্চম : আইয়ুবের বিনয়, সুস্থতা এবং তার ধৈর্যের প্রতিদান সম্পর্কিত আলোচনা এ অংশে স্থান পেয়েছে।

২. দাউদ গীত

এই পুস্তকে মোট গীতের সংখ্যা একশ পঞ্চাশ। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে কতগুলো ধর্মীয় সংগীত/শ্লোক। ইসরাইলিরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে এগুলো আবৃত্তি করে থাকে। একশ পঞ্চাশটি গীতের মধ্যে তিয়াত্তরটি দাউদ আলাইহিস সালামের রচনা বিধায় পুস্তকটিকে তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। বাকি গীতগুলোর রচয়িতা হলেন—

নাম	সংখ্যা	গীত নং
মুসা	১টি	৯০
আসফ	১২টি	৫০,৭৩-৮৩
কোরহ	১১টি	৪২, ৪৪-৪৯, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮
সুলাইমান	২টি	৭২, ১২৭

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু গীত আছে যেগুলোর রচয়িতা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। এ পুস্তকের প্রত্যেকটি গীত অন্যান্য পুস্তকের এক একটি অধ্যায়ের মতো। কুরআনুল কারিমে অবশ্য দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। যেমন বলা হচ্ছে—

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করলাম। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৩]

অন্য আয়াতে এসেছে—

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

আমি নবিদের কতেককে কতেকের ওপর মর্যাদা দিয়েছি আর দাউদকে যাবুর দিয়েছি। [সুরা ইসরা, আয়াত : ৫৫]

কুরআন বর্ণিত যাবুর এবং পুরাতন নিয়মের এই গীত এক নয়। কেননা, এই গীতগুলো দাউদ আলাইহিস সালামের চার শত বছর পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যেখানে বলা হয়েছে—

আঃ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন হইতে উপস্থিত হউক।
সদাপ্রভু যখন আপন প্রজাদের বন্দিত্ব ফিরাইবেন,
তখন যাকোব উল্লসিত হইবে, ইস্রায়েল আনন্দ করিবে।[১৭১]

অন্যস্থানে বলা হয়েছে—

হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে
তাহারা তোমার পবিত্র মন্দির অশুচি করিয়াছে,
যিরূশালেমকে স্তূপের ঢিবী করিয়াছে।
তাহারা তোমার দাসদের শব আকাশের পক্ষিগণকে ভক্ষণার্থে দিয়াছে,
তোমার সাধুদের মাংস পৃথিবীর পশুগণকে দিয়াছে।
তাহারা যিরূশালেমের চারিদিকে জলের ন্যায় উহাদের রক্ত ঢালিয়াছে;
উহাদের কবর দিবার কেহ ছিল না।
আমরা প্রতিবাসিগণের নিকটে তিরস্কারের বিষয় হইয়াছি,
চারিদিকে লোকদের কাছে হাস্য ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি।
হে সদাপ্রভু, আর কতকাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবে?
তোমার অন্তর্জ্বালা কি অগ্নির ন্যায় জ্বলিবে?
ঢালিয়া দেও তোমার কোপ সেই জাতিগণের উপরে, যাহারা তোমাকে জানে না—
সেই রাজ্য সকলের উপরে, যাহারা তোমার নামে ডাকে না।
কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে—
তাহার বাসস্থান শূন্য করিয়াছে।[১৭২]

---

[১৭১] *গীত*, অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ৭।
[১৭২] *গীত*, অধ্যায় : ৭৯, অনুচ্ছেদ : ১-৭।

এই গীতটিকে আসফের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আসফ ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালামের যুগের গায়ক ও বাদক দলের প্রধান যারা বীনা, নেবল ও করতালসহকারে গান করত।[১৭৩] সংগত কারণে বোঝা যাচ্ছে, এই পুস্তকটি বুখতে নসর এর আক্রমণের পর লেখা হয়েছে। কেননা ইসরাইলিরা এসমস্ত গীত পাঠ করে প্রভুর কাছে শত্রুর হাত থেকে নিস্তার কামনা করত। যেমন বলা হয়েছে—

> সদাপ্রভু! আমাদের বন্দিদিগকে ফিরাইয়া আনো, দক্ষিণ দেশের প্রণালির ন্যায় ফিরাইয়া আনো।[১৭৪]

সদাপ্রভু যিরূশালেম গাঁথেন,

তিনি ইস্রায়েলের দূরীকৃতদিগকে সংগ্রহ করেন।

তিনি ভগ্নচিত্তদিগকে সুস্থ করেন,

তাহাদের ক্ষত সকল বাঁধিয়া দেন।[১৭৫]

এই পুস্তক দাউদের গীত এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ দাউদ আলাইহিস সালামের যুগের বহু পরের ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা এবং পরবর্তীতে বনি ইসরাইলের ফিলিস্তিনে ফিরে আসার ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত যাবুর এবং এই গীত এক নয়। এগুলো ঘটনা ও ইসরাইলি উপকথামাত্র, যা দাউদ আলাইহিস সালামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, খ্রিষ্টানদের গির্জাগুলো এসব গীতকে ঐশীবাণী মনে করে, এমনকি এগুলো দিয়ে তাদের ইবাদত পরিচালনা করে।

৩.৪.৫. সুলেমান কাহিনি

এই তিনটি পুস্তকের নাম যথাক্রমে : হিতোপদেশ, উপদেশক ও পরম গীত। এই তিনটি পুস্ককে সুলাইমান আলাইহিস সালামের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কিন্তু গবেষকরা সহজেই ধরতে পারবেন যে, এটি তাঁর রচনা নয়। এ পুস্তকগুলোতে প্রজন্মান্তরে চলে-আসা বিভিন্ন শিষ্টাচারসম্বলিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। নানা সময় নানাভাবে এখানে সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে, হয়েছে বিকৃতিসাধনও। এখানকার কতগুলো শ্লোক ইহুদিরা তাদের পাসওভার উৎসবে আবৃত্তি করে থাকে।

---

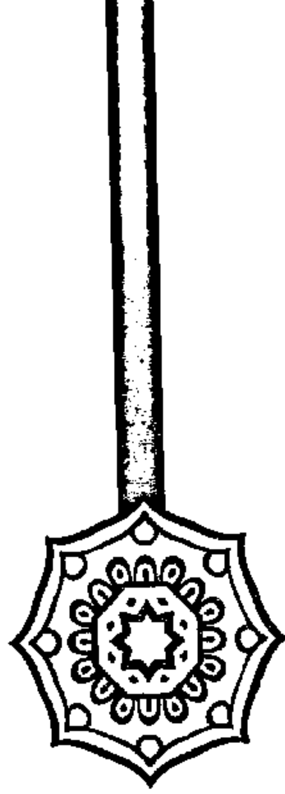
[১৭৩] *বংশাবলি*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ১০।
[১৭৪] *গীত*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১২৬।
[১৭৫] *গীত*, অধ্যায় : ১৪৭, অনুচ্ছেদ : ২-৩।

উপদেশক : (الجامعة।) উপদেশক বনি ইসরাইলের একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নাম। বলা হয়ে থাকে, তিনি দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র। অনেকের মতে তিনি বনি-ইসরাইলের একজন রাজা ছিলেন। যেমন এই পুস্তকের শুরুতে বলা হয়েছে—

আমি উপদেশক, যিরূশালেমে ইস্রায়েলের উপরে রাজা ছিলাম। আর আমি প্রজ্ঞা দ্বারা আকাশের নিচে কৃত সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন ও অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ করিতাম।[১৭৬]



[১৭৬] *উপদেশক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১২-১৩।



নবিগণের পুস্তক

মোট সংখ্যা ১৭ টি

এই পুস্তকগুলি ছোট ছোট নবিদের উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ। এগুলোতে অষ্টম থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীর সময়ে বনি ইসরাইলের ধর্মীয় অধঃপতনের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ পুস্তকগুলি স্বয়ং নবিগণ রচনা করেছেন দাবি করা হলেও ইতিহাসবিদরা এই মতের সাথে একমত নন। এমনকি ধারাবাহিকভাবে এই পুস্তকগুলি নবিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বনি ইসরাইলের আল্লাহর হুকুম থেকে দূরে সরে যাওয়া, ইবাদত-বন্দেগিতে নিষ্ঠার অভাব প্রভৃতি ফুটে উঠেছে এসব পুস্তকে। পুস্তকগুলোতে আরও আছে যে, বনি ইসরাইল যদি নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে, জুলুম অবাধ্যতা ও ঘুষের আদান-প্রদান ত্যাগ না করে তাহলে অচিরেই তারা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে। নিচে পুস্তকগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. যিশাইয়

যিশাইয় শব্দের অর্থ হলো, প্রভু অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিয়েছেন। যিশাইয় ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ মতে তিনি প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এমনকি তারা তাকে পুরাতন নিয়মের মহান নবিদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। পুরাতন নিয়মের এই

পুস্তকটি তার নামে নামকরণ করা হয় এবং তাকেই এর রচয়িতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু গবেষকগণ বলছেন এটি তার রচনা নয়। কেননা এর সূচি ও আলোচ্য বিষয় দেখলেই বোঝা যায় এখানে অন্য কারও হাতের ছাপ রয়েছে।

২. যিরমিয়

ইনি হিল্কিয়ের পুত্র বিন্যামিন প্রদেশের অনাথোৎ নিবাসী পুরোহিতদের একজন। তার নামের অর্থ হচ্ছে প্রভু গোড়াপত্তন করেছেন বা প্রভু স্থির রাখবেন। প্রচলিত তাওরাতের ভাষ্যমতে তিনি বনি-ইসরাইলের বড় নবিদের মধ্যে একজন। তিনি শাসক, যাজক ও স্বীয় জাতির পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখোমুখি হন। তথাপি শেষ পর্যন্ত তিনিই বিজয়ী হন।[১৭৭] তার নবুওয়তের সময়কালের ব্যাপ্তি ছিল আঠারো বছর। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর ভাগে রাজত্বকারী সম্রাট যিশোয় এর সময়ে তিনি তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। *যিরমিয়* এর পুস্তক অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় বনি ইসরাইল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এরপরও তারা কামনা করত, তারা প্রভুর ঘরের উত্তরাধিকারী হবে। যেমন বলা হয়েছে,

হে বিন্যামীন-সন্তানগণ, তোমরা যিরূশালেমের মধ্য হইতে পলায়ন করো, তকোয় নগরে তূরী বাজাও, বৈৎ-হক্কেরমে ধ্বজা তুল, কেননা উত্তরদিক হইতে অমঙ্গল ও মহাধ্বংস উকি মারিতেছে। সুন্দরী সুখভোগিনী সিয়োন-কন্যাকে আমি সংহার করিব। মেষপালকগণ আপন আপন পাল সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে আসিবে; তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চারিদিকে আপন আপন তাম্বু স্থাপন করিবে, প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে পাল চরাইবে। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কর; উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে যাত্রা করি। ধিক্ আমাদিগকে! কেননা দিবাবসান হইতেছে, সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘ হইতেছে। উঠ, আমরা রাত্রিযোগে যাত্রা করি, তাহার অট্টালিকা সকল নষ্ট করি। বস্তুত বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন, তোমরা বৃক্ষ কাটিয়া যিরূশালেমের বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধ; সেই নগর প্রতিফল পাইবে; তাহার ভিতরে সকলই উপদ্রব। যেমন উনুই আপন জল নির্গত করে, তেমনি সে আপন দুষ্টতা নির্গত করে; তাহার মধ্যে দৌরাত্ম্য ও লুটের শব্দ শুনা যায়; পীড়া ও আঘাত নিয়ত আমার দৃষ্টিগোচর রহিয়াছে।[১৭৮]

৩. *যিরমিয়* এর বিলাপ

জেরুজালেম ধ্বংস এবং অবরোধকালীন সময়ে যোদ্ধাদের ক্ষুৎপিপাসায় কাতরতার বর্ণনা নিয়ে এই পুস্তক রচিত হয়। এই বিলাপ গাঁথায় যিরমিয় ঘোষণা করেন যে, ইহুদি

[১৭৭] *যিরমিয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২-১০।
[১৭৮] *যিরমিয়,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১-৭।

জাতির ভুলের কারণে এই দুর্যোগ আপতিত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের উদ্ধত্য, অনুগত করতে অস্বীকৃতি প্রভৃতি কারণে এ বিপদ তাদের উপর চেপে বসেছে। গ্রিক বাইবেলে এই পুস্তকের সূচনাতে বলা হয়েছে, বনি ইসরাইলের বন্দিদশা এবং জেরুজালেম এর ধ্বংস হওয়ার পর যিরমিয় বসে বসে কাঁদতে লাগলেন এবং জেরুজালেমের জন্য এই শোক গাঁথা গাইতে লাগলেন।

জেরুজালেম ধ্বংসের পর ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বে এই পুস্তকটি রচনা করা হয় বলে ধারণা করা হয়। হিব্রু বাইবেলে এটিকে পুরাতন নিয়মের তৃতীয় অংশ তথা কেতুবেম এ উপদেশক এর পুস্তক এরপর ইস্টের আগে এটিকে স্থান দেওয়া হয়েছ।

যিরমিয় বলেন—

ইহার কারণ তাহার ভাববাদিগণের পাপ ও তাহার যাজকগণের অপরাধ;

কেননা তাহারা তাহার মধ্যে ধার্মিকগণের রক্তপাত করিত।

তাহারা অন্ধগণের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,

রক্তে কলুষিত হইয়াছে

লোকেরা তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না।[১৭৯]

তিনি আরও বলেন,

আমার নগরীর সমস্ত কন্যার নিমিত্ত আমার চক্ষু আমার প্রাণকে আর্দ্র করে।[১৮০]

৪. যিহিস্কেল

যিহিস্কেল ইবরানি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে প্রভু শক্তিশালী করবেন। তিনি বুষির পুত্র। তার জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং পরিণত বয়সে পৌঁছা সবই ফিলিস্তিনে। এরপর তিনি সম্রাট যিহিওয়াকিন এর সঙ্গে বন্দি হয়ে ব্যাবিলনে পৌঁছেন। সেখানে খাবুর নদীর তীরে তিনি বসবাস করেন এবং সেখানেই নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। নবুওয়াতলাভের পর তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় বন্দি ইহুদিদেরকে গিয়ে এ কথা বলার জন্য যে, তাদের এই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর গৃহহীনতার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে এই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। সুতরাং তাদের উচিত পাপাচার থেকে ফিরে আসা।

যেমন এই পুস্তকটিতে বলা হয়েছে—

---

[১৭৯] *বিলাপ*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৪।
[১৮০] *বিলাপ*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ৫১।

হে আদম সন্তান আমি তোমাকে বনি ইসরাইলের কাছে পাঠালাম। তারা অবাধ্য জাতি। তারা এবং তাদের বাপ দাদারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

তাই তুমি ইসরাইল সন্তানদিগকে বলো, সদাপ্রভু এমনটাই বলেছেন। তোমরা তওবা করে ফিরে এসো। ফিরে এসো মূর্তিপূজা ও পাপাচার থেকে।

যিহিস্কেল বন্দি ইহুদিদেরকে এভাবেই সতর্ক করতেন। প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষে ইহুদিদের হাতেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

৫. দানিয়াল

দানিয়াল বনি ইসরাইলের একজন নবি। বুখতে নসর রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত যুবকদের সাথে তাকেও বন্দি করে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদে নিজের সেবা যত্নের জন্য। এসব যুবক খুবই অল্প সময়ে অ্যাসেরিয়ান ভাষা এবং ব্যাবিলনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে দানিয়াল ছিলেন সবচেয়ে বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী।

প্রথমবারের মতো তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে সুসানা নামক এক সুন্দরী নারীকেন্দ্রিক একটি ঘটনায়। সুসানা ছিল ব্যাবিলনে অবস্থানরত এক ইহুদির স্ত্রী। দুজন প্রবীন ইহুদি তাকে কুপ্রস্তাব দেয় এবং উত্যক্ত করতে থাকে। তখন সুসানা লোকজনের সাহায্য চায়। ইত্যবসরে প্রবীন ইহুদিদ্বয় পুরো দোষ সুসানার উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের দাবি—সুসানাকে অন্য এক যুবকের সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেছে। বিচারের মজলিসে প্রবীন লোক দুটির সামাজিক মর্যাদার দিকে তাকিয়ে বিচারকমণ্ডলী সুসানার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তারা যখন সুসানাকে নিয়ে যেতে থাকে তখন দানিয়াল তাদেরকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বিচারের রায়কে পুনর্বিবেচনা করার আবেদন করেন।

এরপর অভিযোগকারীদের একজনকে দূরে সরিয়ে অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেন, সে সুসানাকে কোন স্থানে অন্য যুবকের সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেছে? তখন লোকটি একটি স্থানের নাম বলে। এরপর তাকে দূরে সরিয়ে অপরজনকে একই প্রশ্ন করা হয়। এই ব্যক্তি অন্য স্থানের নাম বলে। এতে করে উভয়ের মিথ্যার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে বিচারকগণ সুসানাকে মুক্তি দেন এবং প্রবীণ ইহুদিদ্বয়ের মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করেন।[১৮১] এভাবেই চারিদিকে দানিয়ালের বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

---

[১৮১] *তারিখুল আকবাত*, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯

এমনিভাবে দানিয়াল ব্যাবিলন সম্রাটের স্বপ্নবেত্তার কাজ করতেন। সম্রাট তাকে রাজ্যের প্রধান গণক এবং ব্যাবিলন নগরীর ওয়ালির দায়িত্ব প্রদান করেন। বুখতে নসরের মৃত্যুর পর তার পুত্র বেল্টশৎসর এর সময়ে তিনি উজির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পারসিক সম্রাট আসেন এবং অ্যাসেরিয়ানদের পরাজিত করেন।

এ যুগেও দানিয়াল নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। সম্রাট সাইরাসের যুগে তিনি ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

দানিয়ালের পুস্তকে বিভিন্ন স্বপ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। এই স্বপ্নগুলোর কতেক ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুওয়তের পূর্বাভাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আবুল আলিয়ার বরাতে বর্ণনা করেন, আমি ওই পুস্তকটি পড়েছি সেখানে তোমাদের বর্ণনা, ঘটনা এমনকি তোমাদের ভাষা সম্পর্কেও আলোচনা স্থান পেয়েছে। সাশ (Shush)[১৮২]এর বাসিন্দারা দুর্ভিক্ষের সময় দানিয়ালের কবরটি খুলে দিত। আবু মুসা রাদিআল্লাহু আনহু বিষয়টি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দেন, যাতে দিনের বেলা তেরোটি কবর খনন করা হয় এবং রাতের বেলা কোনো একটিতে তাঁকে দাফন করা হয়। এতে করে মানুষ ফেতনা থেকে বাঁচবে।[১৮৩]

৬. হোশেয়

এর অর্থ হলো পরিত্রাণ। তিনি বেরির পুত্র। হোশেয় বনি ইসরাইলের একজন ছোট নবি। ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বে সামেরার[১৮৪] পতনকালীন সময় তিনি নবি ছিলেন। নবি যিশাইয় এবং তিনি সামসময়িক ছিলেন।

৭. যোয়েল

যোয়েল অর্থ যিহোভাই প্রভু। তিনি পথুয়েল এর পুত্র এবং যোয়েল পুস্তকের রচয়িতা। কিন্তু কখন এই পুস্তক তিনি রচনা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। যোয়েল তার জাতিকে পাপাচারের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আহ্বান করেছেন তাওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন—

---

[১৮২] ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে খুজেস্তান প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক

[১৮৩] *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মসিহ,* খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫

[১৮৪] সামেরা একটি বিলুপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। এটি ছিল বনি ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানে এটি নাবলুস থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সেবাস্তিয়া নামক এলাকায় অবস্থিত। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক

কিন্তু, সদাপ্রভু বলেন, এখনও তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এবং উপবাস, রোদন ও বিলাপসহকারে আমার কাছে ফিরিয়া আইস।[১৮৫]

৮. আমোষ

আমোষ অর্থ হলো সমৃদ্ধি। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মানুষ। ইহুদিদেরকে তিনি তাওবার দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে অবক্ষয় এবং তাদের পৌত্তলিক চিন্তা-চেতনার তিনি সমালোচনা করেছেন। ইসরায়েলিদের শেষ পরিণতি নিয়ে তিনি ছিলেন অসম্ভব শঙ্কিত।

৯. ওবদিয়

ওবদিয় অর্থ হলো যিহোবার দাস। ইনি দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধর। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জেরুজালেমের ধ্বংসের পূর্বে অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যাবিলন থেকে বন্দি ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়কালে তিনি দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত তেমন পাওয়া যায় না।

১০. যোনা

যোনা শব্দের অর্থ হলো কবুতর। যোনা হলেন অমিত্তয়ের সন্তান এবং যবলুন এর বংশধর। কথিত তাওরাতের ভাষ্যমতে প্রভু তাকে নিনবি[১৮৬] শহরে গিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে তারশিশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জাফাতে পৌঁছেন। সেখানে তিনি তারশিশে যাওয়ার জন্য একটি জাহাজও পেয়ে যান।[১৮৭] তিনি ভাড়া পরিশোধ করে জাহাজে চেপে বসেন। তখন প্রভু প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলেন। এতে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। এমনকি জাহাজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। মাঝি-মাল্লারা ভয় পেয়ে নিজেদের দেবতাদের ডাকতে শুরু করল। আসবাবপত্র সব নদীতে ফেলে দিলো। এদিকে যোনা নিচে জাহাজের পাটাতনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় প্রধান মাঝি এসে তাকে ডেকে বললেন, এমন পরিস্থিতিতে তুমি ঘুমাচ্ছ! উঠে এসো তোমার প্রভুকে ডাকো। হয়তো তিনি আমাদের

---

[১৮৫] যোয়েল, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১২।

[১৮৬] নিনবি হলো দজলা ও যাব নদীর মোহনা থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে দজলার পূর্ব তীরে অ্যাসেরিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইবনে কাসিরের মত হলো এটি মসুল নগরীর একটি গ্রাম।

[১৮৭] ঘটনা থেকে বুঝা যায় যোনা জাফা থেকে সমুদ্রপথে তারশিশে রওনা হয়েছিলেন। গবেষকরা মনে করেন সমুদ্রটি ছিল ভূমধ্যসাগর। তারশিশ নগরীটি স্পেনের দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালির নিকটে অবস্থিত তারতিসুস (Tartessus) নগরী। অনেকে মনে করেন এটি আফ্রিকার উত্তরে বর্তমান কার্টেজীনা নগরী।

দিকে মুখ তুলবেন আর আমরা ধ্বংস থেকে বেঁচে যাব। এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এসো আমরা লটারি দিই—কার কারণে এই বিপদ লটারির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হোক। কথামত লটারি দেওয়া হলো এবং যোনার নাম উঠে এলো। তারা বলতে লাগল, বলো দেখি, আমাদের উপর এই বিপদ কেন? তোমার কাজ কি? কোত্থেকে এসেছ? কোথায় তোমার নিবাস? কোন জাতির তুমি?" তখন যোনা বললেন, আমি ইবরানি। আমি ভয় করি আসমানের প্রভুকে, যিনি জল-স্থল সৃষ্টি করেছেন।" লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং বলল, তুমি এটা কী করলে? লোকেরা জানত, তিনি প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। ইতিপূর্বে তিনিই তাদেরকে সেটা বলেছিলেন। লোকেরা আবার বলল, সমুদ্র শান্ত হওয়ার জন্য এখন আমরা কি করতে পারি? সমুদ্র তো ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। তিনি বললেন, আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও। সমুদ্র ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমি জানি, আমার কারণেই এই ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়েছে।

লোকেরা জাহাজকে তীরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দাঁড় টানতে লাগল। কিন্তু তারা পারল না। সমুদ্র ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল। তখন তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, হে প্রভু, এই লোকের প্রাণের নিমিত্তে আমাদের বিনাশ করবেন না। আমাদের ওপর নির্দোষের রক্তও অর্পণ করবেন না। আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন। এরপর তারা যোনাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিলো। সমুদ্র ঠান্ডা হয়ে গেল। লোকেরা প্রভুকে ভীষণ ভয় করল। তারা বলিদান করল এবং নানা ধরনের মানত করল। আর প্রভু যোনাকে গ্রাস করার জন্য একটি বিরাট মাছ প্রস্তুত করে দিলেন। সেই মাছের পেটে তিনি তিনদিন তিন রাত ছিলেন।

যোনা মাছের পেটে আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং স্বীয় অপরাধের দরুন তওবা করতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিনবি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিনবিতে গিয়ে সেখানকার লোকদেরকে বললেন, ৪০ দিনের মধ্যে এই গ্রাম উল্টে যাবে। তখন শহরের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে।[১৮৮] যোনার ঘটনা কুরআনে বর্ণিত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কুরআনে সরাসরি চারবার তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [সুরা নিসা ১৬৩, সুরা আনআম ৮৬, সুরা ইউনুস ৯৮, সুরা সাফফাত ১৩৯] আর সুরা আম্বিয়াতে গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন বলা হচ্ছে—

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

[১৮৮] যোনা এর পুস্তকের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়। *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*: ১১২৬।

এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন—তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭]

একইভাবে সুরা কলমে বলা হয়েছে—

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ.

আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালার মতো হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। [সুরা কালাম ৬৮:৪৮]

সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসিনে কেরাম একমত যে, এখানে মাছওয়ালা বলতে ইউনুস ইবনে মাত্তাই উদ্দেশ্য।

তার ঘটনা কুরআনে বিবৃত হয়েছে—

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ○ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ○ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ○ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ○ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। অতঃপর লটারি (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। যদি তিনি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো। অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর ওপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম এবং তাঁকে লক্ষ বা ততধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। তারা বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। [সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৮]

আধুনিক গবেষকদের মতে পুরাতন নিয়মের যোনার পুস্তকটি রচিত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে।

১১. মিখা

মিখা শব্দের অর্থ হলো যিহোবার মতো কে আছে? ইনি যিশাইয় এর সামসময়িক। তিনি সামেরা এবং জেরুজালেমের ধ্বংস ও বনি ইসরাইলের বন্দি হবার ব্যাপারে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পুস্তকের ভাষ্যমতে তার নাম হলো মোরেষ্টিও।

১২. নহম

নহম শব্দের অর্থ হলো সম্মানিত। ব্যাবিলনীয় বন্দিদের মধ্যে তিনিও একজন। প্রভু তাকে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং প্রতিশোধপরায়ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশুদ্ধ মত হলো এই পুস্তকটি ৬৬৩ খ্রিষ্টপূর্বে লেখা হয়েছে।

১৩. হবককুম

এর অর্থ হচ্ছে কোলাকুলি করল। ইনি ছিলেন হাইকলের একজন গীতিকার। তিনি লেবীর বংশধর। এই পুস্তকে হবককুম প্রভুর কাছে বিভিন্ন অভিযোগের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

হে সদাপ্রভু, কত কাল আমি আর্তনাদ করিব, আর তুমি শুনিবে না? আমি দৌরাত্মের বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদিতেছি, আর তুমি নিস্তার করিতেছ না।[১৮৯]

১৪. সফনিয়

সফনিয় অর্থ হলো যিহোবা গোপন রাখবেন। সফনিয় কুশির পুত্র। কুশি গদলিয়ের পুত্র। গদলিয় আমরিয়ের পুত্র। আমরিয় যিহিস্কেলের পুত্র। তিনি সম্রাট যিশয়ের সমকালীন ছিলেন। জেরুজালেমে তিনি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। এই পুস্তক এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো শেষ বিচার এবং সেদিনের মুক্তির পথ তাওবা। এটা সুস্পষ্ট যে, পুস্তকটি ক্যালেডিয়ান যুগে রচিত হয়েছে। কেননা হাইকল তখনও বিদ্যমান ছিল। এজন্যই গীতমূলক পঙক্তিগুলো সেখানে চর্চা হতো।

---

[১৮৯] *হবককুম,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২।

১৫. হগয়

এর অর্থ হচ্ছে ঈদের দিন জন্মগ্রহণকারী। ব্যাবিলনের বন্দিদের মুক্তির পরবর্তীকালে তিনি তার দাওয়াতি কাজ করেন। ইহুদিদেরকে তিনি পনেরো বছর যাবৎ অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকা হাইকলের নির্মাণ সমাপ্ত করতে উৎসাহিত করেন। এই পুস্তকটিতে সম্রাট দারিয়াস (৫২০ খ্রিষ্টপূর্ব) এর ইতিহাস মাস, বছরসহ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

১৬. সখরিয়

ইনি বেরিখিয়ের পুত্র। বেরিখিয় ইদ্দোর পুত্র। এরা লেবির বংশধর। তার দায়িত্ব ছিল পৌরোহিত্যকর্ম। তিনি হগয়ের সামসময়িক ছিলেন। কানানিদের মাঝে তিনি দাওয়াতি কাজ করেন। দুর্বল জাতিকে তিনি প্রত্যয়ী করে তোলেন। তিনি নিজ শহরে বসবাস করছিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেন। মৃত্যুর পর তিনি বন্ধু হগয় এর পাশে সমাহিত হন। এই পুস্তকটি কখন রচিত হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সম্ভাব্য ৫২০ খ্রিষ্টপূর্বে সম্রাট প্রথম দারিয়াসের সময় এটি রচিত হয়।

১৭. মালাখি

এর অর্থ হলো আমার রাসুল। পুস্তকে বর্ণিত তথ্য ছাড়া তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এই পুস্তকটি রচনার সময় বনি ইসরাইলের কোনো বাদশা ছিল না। পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত একজন প্রশাসক বা ওয়ালি তাদের বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। কথিত আছে, তিনি নহমিয়ের (৪২৩ খ্রিষ্টপূর্ব) এর সামসময়িক। এটি পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ পুস্তক।

ইহুদিদের বিশ্বাস হলো এরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে বনি ইসরাইলের মাঝে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছেন। যখনই তারা দ্বীন থেকে দূরে সরে যেত তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শুধরাবার জন্য নবিদেরকে প্রেরণ করতেন। এদের প্রচেষ্টাতেই বনি ইসরাইল নিজেদের জাতীয়তাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং তাদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে সমর্থ হয়।

কিন্তু আমরা মুসলিমরা এদের প্রত্যেকের নবি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কেননা, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পুরাতন নিয়মের ভাষ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে প্রচুর ভণ্ড নবির আবির্ভাব হয়েছে। কেননা নবুয়তের মহিমান্বিত বিষয়টি ইহুদিদের কাছে পেশায় পরিণত হয়েছিল। নবুওয়তের দাবি করলেই মিলত বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদ। সম্রাট ও প্রশাসকের নৈকট্য লাভ করা যেত।

পুরাতন নিয়মের এসব পুস্তক ছাড়াও ইহুদিদের আরও কিছু প্রাচীন পুস্তক রয়েছে যেগুলোকে তারা পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেনি। তারা এগুলোকে সন্দেহজনক পুস্তক বা (Apocrypha) বলে থাকে।

ইয্রার পুস্তক অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনি ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসেন। এরপরই তিনি তাওরাত সংকলন শুরু করেন। সংকলন করতে গিয়ে তিনি কতগুলো পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন আর কতগুলো পুস্তক ইহুদি জনসাধারণ থেকে লুকিয়ে রাখেন। এগুলোর নাম দেওয়া হয় সফরেম গেনুশেম। তখন থেকেই ইহুদি পণ্ডিতগণ কর্তৃক ধর্মগ্রন্থ নিয়ে লুকোছাপা শুরু হয়। তারা বলতে থাকে এটা সাধারণ জনগণের যারা উচিত নয়, ওটা পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবত এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا.

যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। [সুরা আনআম, আয়াত: ৯১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসুল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ১৫]

বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইহুদিদের নিজেদের প্রস্তুতকৃত গ্রিক সংস্করণে এই সন্দেহজনক পুস্তকগুলোর অনেকগুলোই স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

১। ইয্রা ১ম

২। ইয্রা ২য়

৩। যুডিথ

৪। তোবিয়াস

৫। ইস্টেরের পরিশিষ্ট

৬। জ্ঞানপুস্তক

৭। যিহুশুয় ইবনে সিরাখ

৮। নবি বারুখ

৯। যিরমিয়ের চিঠি

১০। তিন যুবকের গীত

১১। সুসানার গল্প

১২। (বালতীনের ঘটনা)

১৩। মনঃষির ইবাদাত

১৪। ম্যাকাবিজ ১ম

১৫। ম্যাকাবিজ ২য়[১৯০]

চার্লস তার কিতাব অ্যাপোক্রিপাস এর ভূমিকাতে লিখেন, এ ধরনের পুস্তিকার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ।[১৯১]

একজন খ্রিষ্টান লেখক হাবিব সায়ীদ বলেন, খ্রিষ্টীয় গির্জা এই পুস্তকগুলো শুধুমাত্র কল্যাণ ও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য পাঠ করে থাকে।[১৯২]

অনেক গবেষক স্বীকার করেছেন যে, এই পুস্তকগুলো জরাথ্রুষ্টের দ্বিত্ববাদ এবং পারস্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত।

এমন কিছু পুস্তকের নামও পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়, যেগুলোকে ইহুদিরা শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন :

১। নিয়ম পুস্তক, যাত্রাপুস্তক, ২৪/৭

২। যুদ্ধপুস্তক, গণনাপুস্তক, ২১/১৪

৩। যাশের, যিহোশুয় ১০/১৩ এবং সমুয়েল ২য় ১/১৮

৪। হনানি এর পুত্র যিহো এর সমাচার, বংশাবলি ২য় ২১/৩৪

---

[১৯০] *আদইয়ানুল আলম*, পৃষ্ঠা: ২০২
[১৯১] *অ্যাপোক্রিপস, অক্সফোর্ড এডিশন*, ১৯১৩
[১৯২] *আদইয়ানুল আলম*, পৃষ্ঠা: ২০২

৫। নাথন ভাববাদীর পুস্তক, বংশাবলি ২য়, ৯/২৯ এবং এবং বংশাবলি ১ম ২৯/২৯

৬। শিলনিয় ওহিয়ের বাণী, বংশাবলি ২য়, ৯/২৯

৭। ইদ্দো দর্শকের বাণী, বংশাবলি ২য়, ৯/২৯

৮। শলোমনের বৃত্তান্ত, রাজাবলি ১ম, ১১/৪১

৯। আমোসপুত্র যিশাইয়র পুস্তক, বংশাবলি ২য়, ২৬/২২

১০। গাদ দর্শকের পুস্তক, বংশাবলি ১ম, ২৯/২৯

১১। শলোমনের প্রবাদবাক্য, রাজাবলি ১ম, ৪/৩২

(মোট প্রবাদসংখ্যা তিন হাজার পুরাতন নিয়মের প্রবাদ ব্যতীত)

১২। যোশিয়ের জন্য যিরমিয়ের বিলাপগীত, বংশাবলি ২য়, ৩৫/২৫

(এটি পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত যিরমিয়ের গীত ভিন্ন আরেকটি পুস্তক।)

পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত পুস্তকগুলোর নাম উল্লেখ থাকলেও এগুলো বর্তমানে বিলুপ্ত। এ ছাড়াও আরও অনেক পুস্তক বিলুপ্ত হয়েছে বলে খ্রিষ্টান লেখকগণ স্বীকার করেছেন।

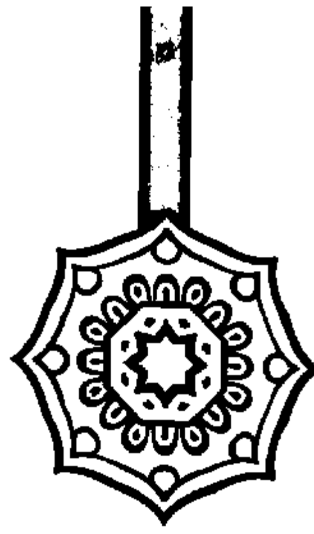
খ্রিষ্টান লেখক আমফার্ড তার প্রশ্নোত্তর পর্বের[১৯৩] দ্বিতীয় প্রশ্নে বলেন, 'যে সকল পুস্তকে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর নাম ছিল নাসিরিয় পুস্তক। ইহুদিরা সেগুলোকে বিনষ্ট করে ফেলেছে।'

পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন, ইহুদিরা নবিগণের পুস্তককে নষ্ট করেছে, পুড়িয়েছে কিংবা ফেলে দিয়েছে। কেননা, এগুলোতে কঠোর বিধিবিধান ছিল। আবার কতগুলোতে ভবিষ্যতে আসমানি শরিয়ত নিয়ে একজন নবির আগমনের কথাও উল্লেখ ছিল। ব্যাখ্যাকার ডেলি এ ব্যাপারে ইস্রাকে দোষারোপ করেছেন। তার মতে এই পুস্তকগুলো হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইস্রাই দায়ী। কেননা, তিনি শলোমনের মাত্র তিনটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ মানুষের উপকারার্থে রচনা করা শলোমনের পুস্তকের সংখ্যা অনেক।[১৯৪]



[১৯৩] ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত।

[১৯৪] ...খণ্ড : ২, পৃ : ১৩৯, প্রকাশকাল : ১৮৫৬



পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

এ পর্যন্ত আলোচিত পুস্তকগুলো প্রাচীন ইহুদি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে বিবেচিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক আরও কিছু পুস্তকের কথা বললেও ইহুদিরা সেগুলো স্বীকার করে না। অপরদিকে ইহুদিদের সামেরা উপদলটি শুধু সাতটি পুস্তককে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে সেগুলো হলো মুসার ৫ পুস্তক, যিহোশুয় ও বিচারকগণের পুস্তক।

ভাষা

গবেষকরা মনে করেন, ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাথমিকভাবে তিনটি ভাষায় সম্পাদিত হয়। ভাষাগুলো হলো ইবরানি বা হিব্রু (Hebrew) আরামি (Aramaie) ও ইউনানী (Greek)।

১। ইবরানি বা হিব্রু ভাষা

ইবরানিদের একটি অংশ তথা বনি-ইসরাইলের ভাষাকে হিব্রু ভাষা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ইবরানিরা বহু জাতিসত্তার সমষ্টি। যেমন আরামীয়, মোয়্যূবীয়, আমোরীয় প্রভৃতি। তবে ইবরানি বা হিব্রু ভাষা নামটি কেবল বনি ইসরাইলের ভাষার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

ভাষাটি খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ সময়ের মধ্যে লিখিত ইহুদি পুস্তকগুলো এ ভাষায়ই লেখা হয়।

২। আরামীয় ভাষা

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যাসিরিয়ান ও ব্যাবিলিয়নরা ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাজ্য এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো দখল করে নেয়। তখন আরামীয় ভাষাটি ছিল ইরাক অঞ্চলের ব্যাবিলিয়নদের একাডেমিক ভাষা। তাদের হাত ধরে বিজিত অঞ্চলগুলোতে এ ভাষা চালু হয়। এ সময় রচিত পুস্তকসমূহে এই ভাষাটি ব্যবহৃত হয়। এমন পুস্তকের মধ্যে রয়েছে ইয়্রার পুস্তকের কয়েকটি অধ্যায়, দানিয়ালের পুস্তক ও যিরমিয়ের পুস্তক। একইভাবে এ সময় ইহুদিদের মিশনা পুস্তকটিকেও আরামীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় গিমারা। মিশনা এবং গিমারার পর আরেকটি পুস্তকের প্রকাশ ঘটে যার নাম তালমুদ। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই তালমুদকে। অচিরেই আমরা পৃথক একটি অধ্যায়ে এটি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৩। ইউনানি বা গ্রিক ভাষা

এটি ইউনানি শহরগুলোর লেখ্য ও কথ্য ভাষা। পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার ইউনানি উপনিবেশগুলোতে ও এই ভাষার প্রচলন ছিল। অন্য দুটি ভাষার তুলনায় এটিকে বেশ নতুনই বলা চলে। ২৮৪-২৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষা থেকে এ ভাষায় অনূদিত হয়। ইহুদি রাব্বি ইলিয়াসরের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার ৭২ জন ইহুদি পাদরি ৭২ দিনে এই কর্মযজ্ঞটি সম্পাদন করেন। টলেমি দ্বিতীয় ফিলাডেলফাস (Ptolemy 2nd Philadelphus) এর নির্দেশে তারা এই অনুবাদ কর্মটি করেছিলেন। পুরাতন নিয়মের এই অনুবাদকে সেপ্টুয়েজিন্ট (Septuagint) বলা হয়। সেপ্টুয়েজিন্ট শব্দটি ল্যাটিন। এর অর্থ হলো ৭০ জনের অনুবাদ। মূলত অনুবাদকের সংখ্যার দিকে লক্ষ রেখে এই নামকরণ করা হয়। এই গ্রিক অনুবাদ থেকেই মূলত পুরাতন নিয়ম ল্যাটিন ভাষাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়। এ অনুবাদটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা সামনে আসবে।

এই নুসখাগুলোর কোনটিকে গ্রহণ করা হবে এ নিয়ে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইহুদিরা হিব্রু বাইবেলকে প্রাধান্য দিলেও খ্রিষ্টানরা গ্রিক বাইবেলকে সামনে রাখে এবং গুরুত্ব দেয় বেশি।[১৯৫]

---

[১৯৫] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা: ৭৬৮

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্ তাআলা যে তাওরাতের কথা বলেছেন ইহুদিরা মরুভূমিতে জীবনযাপন কালীন সময়ে সেটিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। সম্ভবত মুসা আলাইহিস সালাম ওহির মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, তার জাতি সত্যের পথে অটল থাকবে না। আল্লাহর কিতাবকেও তারা হেফাজত করবে না। তাই তাওরাতের গূঢ় রহস্য এবং ফলকগুলো তিনি স্বীয় প্রতিনিধি ও খাদেম ইউশা ইবনে নুনকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এগুলো হারুন আলাইহিস সালামের সন্তানদের কাছে পৌঁছানোর। কারণ, হারুন আলাইহিস সালাম রিসালাতের দায়িত্বে মুসা আলাইহিস সালামের অংশীদার ছিলেন। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম জীবদ্দশায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই মুসা আলাইহিস সালাম ইউশাকে দায়িত্ব দেন স্বীয় আমানত হারুন আলাইহিস সালামের দুই পুত্র শিবর ও শিব্বিরকে পৌঁছানোর জন্য।[১৯৬]

এরপর ইউশা ইবনে নুন যতটুকু পৌঁছাতে পেরেছিলেন তাওরাতের ঠিক ততটুকুই অবশিষ্ট ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল আখলাক ও দণ্ডবিধি প্রভৃতি। এ ছাড়াও ইহুদিদের মধ্যে যিহোশুয়ের দশ বিধান অদ্যাবধি পরিচিত।

ইহুদিদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত নিঃসন্দেহে তাদের রচিত গ্রন্থ। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর নাজিলকৃত তাওরাত নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.

অতএব, তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [সুরা বাকারা: ৭৯]

[১৯৬] ইসলামি গ্রন্থ মতে হারুন আলাইহিস সালামের তিন পুত্র। শিবর, শিব্বির ও মুবাশশির। পক্ষান্তরে ইহুদিদের মতে তার চার পুত্র। ইথামার, ইলিয়াশার, নাদার ও অবিহো।—অনুবাদক

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তাওরাত এর একটি পৃষ্ঠা দেখেছিলেন। তিনি এটা ফেলে দিতে নির্দেশ দেন এবং এ ধরনের মিথ্যা ও বিকৃত জিনিসের পেছনে সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেন।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা উমর আহলে কিতাবদের নিকট পাওয়া একটি কিতাব নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং নবিজির সামনেই সেটি পড়লেন। এতে নবিজি সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। অতঃপর বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তুমি কি সন্দিহান? সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ যদি মুসা আলাইহিস সালাম বেঁচে থাকতেন তাকেও আমার অনুসরণ করতে হতো।[১৯৭]

এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কুরআন নাজিল হয়েছে তা তাওরাতে বর্ণিত আকিদা, শরিয়ত, নবিদের ঘটনা সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কুরআন তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং বনি ইসরাইলকর্তৃক তাওহিদ ও নবি-রাসুলদের জীবনীতে যে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে সেগুলোকে সংশোধন করে। যদি মুসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন তাহলে এই তাওরাতকে কখনো স্বীকৃতি দিতেন না, বরং কুরআনের অনুসরণ করতেন।

তাওরাত লিপিবদ্ধকরণের পর্যায়সমূহ

পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রথম অংশ তথা তাওরাতের পুস্তকগুলো। ইহুদিরা বিশ্বাস করে এগুলো আল্লাহর ওহি যা মুসা আলাইহিস সালামের উপর নাজিল হয়েছিল। তারা এও বিশ্বাস করে যে মুসা নিজেই এই পুস্তকগুলো একত্রিত করেছেন, যা পরবর্তীতে তাওরাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই গ্রন্থ গুলো একক কোনো ব্যক্তির রচনা নয়। এমনকি এগুলো মুসা আলাইহিস সালামের যুগেও রচিত হয়নি। বরং মুসা আলাইহিস সালামের ওফাতের দীর্ঘকাল পর এগুলো লিখা হয়েছে।

এগুলো অধ্যয়ন করলে যে কেউই দেখতে পাবে যে, মুসা আলাইহিস সালাম পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা এগুলোতে স্থান পেয়েছে। যেমন *আদিপুস্তকে* এসেছে, অতঃপর ইসরাইল সফর করিল এবং মিগদল ইদরের পেছনে তাঁবু স্থাপন করল।[১৯৮]

---

[১৯৭] *মুসনাদে আহমদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮৭, *শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকি, দারেমি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৫।
[১৯৮] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ২২।

আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে মিগদল ইদর (Tower of Edar) বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি টাওয়ার। এটি মুসা আলাইহিস সালামের সাতশ বছর পর সুলাইমান আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছিলেন।

একই পুস্তকে আরও বলা হয়েছে, ইস্রায়েল-সন্তানদের ওপরে কোনো রাজা রাজত্ব করিবার পূর্বে ইঁহারা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন।[১৯৯]

এখান থেকে বোঝা যায়, বনি ইসরাইলের বেশকিছু রাজা অতিবাহিত হওয়ার পর *আদিপুস্তক* রচিত হয়েছে।

যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে, বনি ইসরাইল কানান দেশে পৌঁছে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মান্না ভক্ষণ করিয়াছিল। তারা মোশির যুগে কানানে পৌঁছতে পারেনি।

এর অর্থ দাঁড়ায়—এই পুস্তক বনি ইসরাইল কানানে পৌঁছার পর লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর মুসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তারা কানানে পৌঁছতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিবরণে মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা পূর্বেই মনোজ্ঞ আলোচনা করেছি।

পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই অনুচ্ছেদগুলো মুসার পরে তাওরাতে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা, মুসা আলাইহিস সালাম নিজেই নিজের মৃত্যু বিবরণী লিখে যাবেন, এটা হাস্যকর অসম্ভব।

এখানে আরও বহু ঘটনা বিবৃত হয়েছে যেগুলো মুসা আলাইহিস সালামের পরে সংঘটিত হয়েছে। তাওরাতে এগুলো লিপিবদ্ধ ছিল।[২০০]

ইহুদি পণ্ডিতগণ এবং খ্রিষ্টান আলেমগণ যখন কথিত তাওরাতে এই বৈপরীত্যগুলো দেখতে পেলেন তখন তারা স্বেচ্ছায় তাওরাত বিকৃতিতে লেগে গেলেন। এই বিকৃতিকে তারা 'পাদরিদের সংস্করণ' নামে নামকরণ করেন।

টমাস বলেন, *আদিপুস্তকে* এ কথা ছিল যে, যিহোবা প্রভু আব্রাহামের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই বাক্যটিকে পরিবর্তন করে তারা লিখে দিলো, অব্রাহাম আ. তখনও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিলেন।[২০১]

প্রথম বাক্যটিতে যখন তারা প্রভুর শানে বেয়াদবি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা বাক্যটিকে ঘুরিয়ে দিলো।

---

[১৯৯] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ৩৬, অনুচ্ছেদ : ৩১।

[২০০] উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ১৪; দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ১; *বিচারকগণের পুস্তক*, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ২৯; *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ১৪।

[২০১] *History of the English Bible*

বিচারকগণের পুস্তকে বলা হয়েছিল, জোনাথন মুসার নাতি। কিন্তু পরে তারা তাকে ভুলে মনঃষির নাতি বানিয়ে দেয়।[২০২]

তাদের এই সংস্কারের পরও এখনও কথিত তাওরাতে প্রচুর সাংঘর্ষিক ও জগাখিচুড়িমার্কা বক্তব্য অবশিষ্ট আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো।

১। *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে, তখন মোশি ও হারোণ, নাদব ও অবীহূ এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জন উঠিয়া গেলেন; আর তাঁহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন।[২০৩]

একই পুস্তকে আবার বলা হয়েছে, আরও কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না।[২০৪]

২। *যাত্রাপুস্তকে* আরও বলা হয়েছে, আমার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী চিহ্ন; কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।[২০৫]

অথচ যিশাইয় এর পুস্তকে বলা হয়েছে, তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুনো নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।[২০৬]

৩। *শমূয়েলের* ২য় পুস্তকে বলা হয়েছে, আর সৌলের কন্যা মীখলের মরণকাল পর্যন্ত সন্তান হইল না।[২০৭]

একই পুস্তকে বলা হয়েছে, কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের জন্য অর্মোণি ও মফীবোশৎ নামে যে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল এবং মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের জন্য শৌলের কন্যা মীখল যে পাঁচটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া রাজা গিবিয়োনীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।[২০৮]

---

[২০২] *বিচারকগণ*, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ৩০।
[২০৩] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ৯-১০।
[২০৪] *যাত্রাপুস্তক* , অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ২০।
[২০৫] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৩১, অনুচ্ছেদ : ১৭।
[২০৬] *যিশাইয়*, অধ্যায় : ৪০, অনুচ্ছেদ : ২৮।
[২০৭] *শমুয়েল ২য়*, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ২৩।
[২০৮] *শমুয়েল ২য়*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৮।

৪। *রাজাবলি ২য়* পুস্তকে বলা হয়েছে, অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী।[২০৯]

অপরদিকে *বংশাবলি* ২য় পুস্তকে বলা হয়েছে, অহসিয় বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, ইনি অম্রির পৌত্রী।[২১০]

৫। *আদিপুস্তকে* এসেছে, যে স্থানে আব্রাহামকর্তৃক পুত্রকে জবাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল আব্রাহাম সে স্থানের নাম রেখেছিলেন যিহোবা যিরি। আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি[২১১] রাখিলেন। এই জন্য অদ্যাপি লোকে বলে, সদাপ্রভুর পর্বতে যোগান হইবে।[২১২]

ইহুদিদের নিকট যিহোবা আল্লাহ তাআলার একটি নাম। এর অর্থ হচ্ছে সেই সত্তা যিনি অস্তিত্বশীল। যিহোবা শব্দের ব্যবহার শুরু হয় মুসা আলাইহিস সালামের যুগে। এর আগে শব্দটি পরিচিত ছিল না। যেমন *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা[২১৩]; আমি অব্রাহামকে, ইসহাককে ও যাকোবকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা[২১৪] নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।'[২১৫]

৬। দ্বিতীয় বিবরণে দশ আজ্ঞার বর্ণনায় বলা হয়েছে, সদাপ্রভু পর্বতে অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন।[২১৬]

এখানে বর্ণিত দশ আজ্ঞা এ সপ্তম দিনে আল্লাহ তাআলার বিশ্রামের কথা উল্লেখ হয়নি শনিবারের ব্যাপারে শুধু বলা হয়েছে, যাতে তোমার গোলাম তোমার দাসীও তোমার মতো বিশ্রাম নেয়।[২১৭]

---

[২০৯] *রাজাবলি ২য়*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ২৬।
[২১০] *বংশাবলি ২য়*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ২।
[২১১] অর্থ্যাৎ সদাপ্রভু যোগাইবেন।
[২১২] *আদিপুস্তক*, খণ্ড:২২, পৃষ্ঠা: ১৪
[২১৩] *সদাপ্রভু*
]২১৪] *সদাপ্রভু*
[২১৫] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ২-৩।
[২১৬] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২২।
[২১৭] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৪।

একই পুস্তকে দশ আজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে, তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর গৃহে কি ক্ষেত্রে, কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোনো বস্তুতেই লোভ করিও না।[২১৮]

এই দশটি আজ্ঞা *যাত্রাপুস্তকেও* উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণীর দশ আজ্ঞার সাথে *যাত্রাপুস্তকের* দশ আজ্ঞার বেশ কিছু অমিল রয়েছে। যেমন *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে, কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন।[২১৯]

একইভাবে এই পুস্তকে প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করা হয়নি যার বর্ণনা দ্বিতীয় বিবরণীতে ছিল।[২২০]

তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী এই দশটি আজ্ঞা প্রভু নিজেই লিখে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো প্রভুর লিখিত বাণীতে কি এমন বৈপরীত্ব থাকতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় হলো দ্বিতীয় বিবরণে এই দশটি অজ্ঞার আলোচনার পর জোর দিয়ে বলা হয়েছে প্রভু এরচেয়ে কিছুই বাড়িয়ে বলেননি। অথচ *যাত্রাপুস্তকে* এসেছে, পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা নিজেরাই দেখিলে, আমি আকাশ হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিলাম। তোমরা আমার প্রতিযোগী কিছু নির্মাণ করিও না; আপনাদের নিমিত্তে রৌপ্যময় দেবতা কি স্বর্ণময় দেবতা নির্মাণ করিও না।[২২১]

৭। *আদিপুস্তকে* বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ষষ্ঠ দিনে মানুষ এবং চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করলেন। সেখানে বলা হয়েছে, পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।[২২২]

---

[২১৮] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২১।
[২১৯] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১১।
[২২০] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১৭।
[২২১] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২২-২৩।
[২২২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২৪-২৬।

এটি ঘটেছিল জমিনের বুকে গাছগাছালি ফলমূল ও আসমানের পাখি সৃষ্টির পর। অথচ একই পুস্তকে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা প্রাণিজগতের পূর্বে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন। তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল।[২২৩]

এর আগে একই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।"[২২৪] আর এগুলো প্রাণীজগৎ সৃষ্টির পূর্বে।

৮। ইহুদিদের শরিয়ত অনুযায়ী ফুফুকে বিবাহ করা হারাম। যেমন লেবির পুস্তকে বলা হয়েছে, 'আর তুমি আপন মাসীর কিংবা পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; তাহা করিলে তোমার নিকটবর্তী কুটুম্বের আবরণীয় অনাবৃত করা হয়, তাহারা উভয়েই আপন আপন অপরাধ বহন করিবে।'[২২৫]

অথচ মুসা আলাইহিস সালামের পিতা নাকি তার ফুফুকে বিবাহ করেছিলেন। যেমন যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে, 'অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন। অম্রমের বয়স একশত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।'[২২৬]

একইভাবে *গণনাপুস্তকে* বলা হয়েছে, অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবদ, তিনি লেবির কন্যা, মিশরে লেবির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অম্রামের জন্য হারোণ, মোশি ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিয়াছিলেন।"[২২৭]

কহাৎ হলেন লেবির পুত্র ও ইমরানের পিতা। সুতরাং তাওরাতের এই বক্তব্য যদি শুদ্ধ হয় তাহলে বলতে হয় মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম ইহুদি শরিয়ত অনুযায়ী শুদ্ধ নয়।

এই হলো তাওরাতের বৈপরীত্যের কিছু নমুনা। বস্তুত তাওরাতের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে তারিখ, বংশপরিচয়, আহকাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর বিরোধ বিদ্যমান।

---

[২২৩] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১৯।

[২২৪] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৭।

[২২৫] *লেবীয় পুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১৯।

[২২৬] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ২০।

[২২৭] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ৫৯।

খ্রিষ্টানগণ পুরাতন নিয়মের কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সামনে এলেই তাকে মনসুখ তথা রহিত বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। প্রশ্ন হলো সন, তারিখ, বংশপরিচয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা কি বলবে? অপরিবর্তনীয় বিষয় কি রহিত হতে পারে?

এগুলো ভুল-সমুদ্রের কয়েকটি বিন্দুমাত্র। নতুবা তাওরাতের সুরিয়ানি বর্ণনার সাথে ইবরানি বর্ণনার রয়েছে বিস্তর ব্যবধান আর সংঘর্ষ। দুটি বর্ণনার ১৩১৪ টি স্থানে বিরোধপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

এই কিতাবটিকে ইহুদিরা আল্লাহ তাআলা ওহি হিসেবে দাবি করে। অথচ অদ্যাবধি কিতাবটির নতুন নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। কিতাবটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৪৮৮খ্রিষ্টাব্দে। এরপর ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ান্ডার হোপ এর তত্ত্বাবধানে এটির পুনঃসংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রথম সংস্করণ এর মাঝে বার হাজারেরও বেশি অমিল রয়েছে।

বিগত দুই শতাব্দীতে কিছু খ্রিষ্টান স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই তাওরাত মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক রচিত নয়। যেমন ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাইবেলের ক্যাথলিক সংস্করণে বলা হয়েছে, এ যুগে কোন ক্যাথলিক আলেম একথা বিশ্বাস করে না যে, এই কিতাব পুরোটা মুসা নিজেই লিখেছেন অথবা নিজ তত্ত্বাবধানে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। বরং এ কথা বলতে বাধ্য হয় যে, পরবর্তী যুগে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন উপলক্ষে এতে অনেক সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে।

তাওরাত সংকলনের বিভিন্ন স্তর

ইহুদি ও খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, প্রাথমিকভাবে তাওরাত পুরোটা একখণ্ড ছিল। অতঃপর ২৮৪ খ্রিষ্টপূর্বে ইহুদিরা যখন এটাকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করে তখন তারা এটিকে পাঁচ খণ্ডে ভাগ করে নেয়। ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে কার্ডিনাল এতে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ যুক্ত করেন। পণ্ডিতগণ এতে নুকতা, হরকত প্রভৃতি জুড়ে দেন। কেননা, হিব্রু, বাইবেলে নুকতা-হরকত ছিল না। এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তাহকিকের পরও তাওরাত শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে তালগোল পাকানোই রয়ে গেছে।

প্রথম তাওরাতের বিনাশ ঘটে ৯৪৫ খ্রিষ্টপূর্বে রহবিয়াম বিন সুলাইমান এর রাজত্বকালে, যখন মিশর সম্রাট শশাঙ্ক আক্রমণ করেছিলেন।[২২৮]

---

[২২৮] রহবিয়াম বিন সুলাইমান যখন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন তার বয়স ছিল ষোলো বছর। নবি সুলাইমান আলাইহিস সালামের ওফাতের পর সে সতেরো বছর রাজত্ব করেছিল। পুরো রাজত্বকালে সে শুধু কুফরি করে গিয়েছে। এমনকি তার অনুসারীসহ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছে। অধীনদের মধ্যে বিরোধিতা করার মতো কেউ ছিল না। রহবিয়াম কুফরির ওপরেই মৃত্যুবরণ করে। তারপর রহবিয়ামের পুত্র অবিয়াম শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সেও পিতার মতোই পৌত্তলিক ছিল। এরপর তার পুত্র আসা ক্ষমতায় আরোহণ করে। তবে সে ঈমানদার ছিল। =

রাজাবলি ১ম পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, আর রহবিয়াম রাজার পঞ্চম বৎসরে মিসর-রাজ শীশক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিলেন; তিনি সদাপ্রভুর গৃহের ধন ও রাজবাটীর ধন লইয়া গেলেন; তিনি সমস্তই লইয়া গেলেন, আর শলোমনের নির্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকলও লইয়া গেলেন।[২২৯]

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তাওরাত গায়েব ছিল। এরপর যাজক হিল্কিয় ঘোষণা দিলেন যে তিনি হাইকলের ভেতর শরিয়তসম্বলিত একটি পুস্তক পেয়েছেন। রাজাবলি দ্বিতীয় পুস্তকে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন হিল্কিয় মহাযাজক শাফন লেখককে কহিলেন, আমি সদাপ্রভুর গৃহে ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইয়াছি। পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই পুস্তক দিলে তিনি তাহা পাঠ করিলেন। আর শাফন লেখক রাজার নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই সমাচার দিলেন, আপনার দাসগণ সেই গৃহে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্যকারীদের হস্তে দিয়াছে। পরে শাফন লেখক রাজাকে কহিলেন, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখানি পুস্তক দিয়াছেন। আর শাফন রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য সকল শুনিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িলেন।[২৩০]

৬২৩ খ্রিষ্টপূর্বে যিহুদা রাজ্যে ঘটনাটি ঘটেছিল। এখান থেকে বোঝা যায়, সে সময়টাতে তাওরাতের কপি খুব বেশি ছিল না। শুধু একটি কপি পাওয়া গিয়েছিল হাইকলের ভিতর। প্রায় তিনশ বছর গায়েব থাকার পর হিল্কিও একমাত্র কপিটি খুঁজে পান। প্রশ্ন আসে, এটাই যে মুসা আলাইহিস সালামের তাওরাত তার প্রমাণ কি? প্রকৃত তাওরাতের সাথে মিলিয়ে দেখার কি কোনো সুযোগ ছিল? এত বছর পরে তো এমন কেউই বেঁচে ছিলেন না যিনি সরাসরি মুসা আলাইহিস সালাম কিংবা তার সন্তানদের কাছ থেকে তাওরাত শুনেছেন। খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ লক্ষ লক্ষ ঘণ্টা গবেষণা করেও এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলন সম্রাট বুখতে নসর জেরুজালেমে হামলা চালান এবং বায়তুল মুকাদ্দাস গুঁড়িয়ে দেন (৫৯৭ খ্রিষ্টপূর্ব)। সেখানকার সমস্ত আলামত তিনি মুছে দেন এবং চল্লিশ হাজারেরও বেশি ইহুদিদেরকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। প্রায় চল্লিশ মতান্তরে সত্তর বছর এরা ব্যাবিলনে দাসবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। একপর্যায়ে তারা নিজেদের জাতিগত ভাষা হিব্রু ভাষাও ভুলে যায়।

=এরপর বনি ইসরাইলের যত রাজা আসে তাদের অধিকাংশই প্রকাশ্যে কুফরি করত। মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের প্রতিপালন তারা করত না। ধর্মীয় কিতাবগুলোকেও তারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতো না।

[২২৯] *রাজাবলি ১ম,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২৫-২৬।

[২৩০] *রাজাবলি ২য়,* অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ৮-১১।

বংশাবলি দ্বিতীয় পুস্তকের ছত্রিশতম অধ্যায়ে বুখতে নসর এর জেরুজালেম অভিযানের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আর তাঁহার লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ পোড়াইয়া দিল, যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন করিল, এবং তথাকার সকল অট্টালিকা অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিল, তথাকার সমস্ত মনোরম পাত্র বিনষ্ট করিল। আর তিনি খড়্গ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত অবশিষ্ট লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেলেন; তাহাতে পারস্য-রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের দাস থাকিল।[২৩১]

ইহুদিরা পারস্য সম্রাটের সহযোগিতায় ব্যাবিলন শাসকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজেদের দেশে ফিরে আসে। এরপর তাদের পণ্ডিতগণ নতুনভাবে তাওরাত সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে যাজক ইয্রার যথেষ্ট অবদান ছিল। ইয্রার পুস্তকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, তিনি ইহুদি ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। একইভাবে হারিয়ে যাওয়া তাওরাতকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন। এ ছাড়াও তিনি তাওরাতে অ্যাসিরিয়ান শব্দ প্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কিন্তু ইয্রা কীভাবে নতুনভাবে তাওরাত সংকলন করেছিলেন এ ব্যাপারে খ্রিষ্টান আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন, তিনি ইতিপূর্বে এগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন। পরে নবি নহমিয় এর সহযোগিতায় তিনি এটিকে সংকলন করেন। উল্লেখ্য, নহমিয় হাইকল নির্মাণেও ইয্রার সহযোগী ছিলেন। খ্রিষ্টান লেখক কিটোসহ অনেকেরই মত হলো, ইজরা পুরো তাওরাত মুখস্থ জানতেন। নিজ স্মৃতিশক্তি থেকেই তিনি এটাকে পুনর্বার সংকলন করেন।

তৃতীয় মত হলো, ইয্রা একশ বিশ জন পণ্ডিতকে নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করে দিয়েছিলেন। এটাই পরবর্তীতে মহান গির্জা (The great church) নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের সবার দায়িত্ব ছিল তাওরাত সংকলন করা, কপি করা, পড়া এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এখানে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাওরাত সংকলনের ভিত্তিটাই নড়বড়ে। এর সংকলন পদ্ধতি নিয়ে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

হাফেজ ইবনে হাজম বলেন, ইয্রা কর্তৃক তাওরাত লিপিবদ্ধ করার ঘটনাটি বায়তুল মুকাদ্দাস বিরান হওয়ার সত্তর বছরেরও অধিক পরে সংগঠিত হয়েছিল। তাদের কিতাবগুলো সাক্ষ্য দেয় যে বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার প্রায় চল্লিশ বছর পর ইয্রা এটি লিখেন। এ সময় তাদের মধ্যে কোনো নবি ছিল না। ছিল না কোনো কুব্বা কিংবা

[২৩১] *বংশাবলি ২য়,* অধ্যায় : ৩৬, অনুচ্ছেদ : ১৯-২০।

তাবুত।... তখন থেকেই মূলত তাওরাতের প্রচার প্রসার ঘটতে থাকে। তবে এই প্রচার-প্রসার ছিল খুবই দুর্বল পন্থায়।[২৩২]

এ কথা স্পষ্ট যে ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিলিস্তিনে ফিরে এসে তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পুনরায় ইহুদি জাতিসত্তার সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে। ভিন্ন জাতি কর্তৃক জুলুম-অত্যাচারের অভিজ্ঞতা তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য তারা কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করে। তাওরাত থেকে এই মূলনীতিগুলো সহজেই অনুমান করা যায়।

মূলনীতিগুলো হলো—

১। আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তার কোনো শরিক নেই। তারা তার নাম রাখে যিহোবা। এবং ইনি হলেন বনি ইসরাইলের প্রভু। তার দায়িত্ব হচ্ছে বনি ইসরাইলকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করা।

২। মুসা আলাইহিস সালামের আনীত শরিয়ত বনি ইসরাইলের জন্য খাস।

৩। মুসা আলাইহিস সালাম একজন নবির সুসংবাদ দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুত নবি বনি ইসরাইলের ত্রাণকর্তা হবেন এবং তিনি হবেন ইসহাক এর বংশধর।

৪। অন্যান্য জাতিগুলো বনি ইসরাইলের সেবক।

৫। ইসরাইলিরা অন্য জাতির সাথে মিশে যাওয়া কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য জাতি থেকে নিজেদের বংশকে পবিত্র রাখা প্রত্যেক ইসরাইলির কর্তব্য।

এইসব বিচ্ছিন্নতাকামি ও সাম্প্রদায়িক মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন তাওরাত লিপিবদ্ধ হয়। এরপর তাদের প্রবীণদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। কেননা এভাবেই ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হবে।

এরপর ১৭০ খ্রিষ্টপূর্বে তৃতীয়বারের মতো তাওরাত হারিয়ে যায়। মেসিডোনিয়া সম্রাট এন্টিওকাস এপিফানেস এসময় জেরুজালেমে অভিযান চালায়। হাইকলকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানে রক্ষিত সমস্ত পুস্তক ও চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে পূজার জন্য মূর্তি নির্মাণ করে। এমনকি সেখানকার জবেহের স্থানে শূকর বলি দেয়। এরপর ঘোষণা করে যে, কারও কাছে তাওরাতের কপি পাওয়া গেলে তাকে তাৎক্ষণিক হত্যা করা হবে।

অতঃপর সৈনিকরা ইহুদিদের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়। কারও ঘরে তাওরাতের কপি পাওয়া গেলে তারা ঘরের মালিককে হত্যা করত এবং তাওরাতের কপিটিও পুড়িয়ে ফেলত। এভাবে তারা সমস্ত কপিগুলো ধ্বংস করে দেয়। পাঁচ বছর পর ইহুদিরা যখন

---

[২৩২] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৭

আবার বায়তুল মুকাদ্দাস ফেরত পায় তখন তারা হাইকলের পুনর্নির্মাণ শুরু করে এবং দাবি করে যে তাদের কাছে তাওরাত বিদ্যমান আছে। তাদের রীতি অনুযায়ী হাইকলের ভেতরে এর একটি কপিও তারা সংরক্ষণ করে। কিন্তু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাখা এই তাওরাতের কপিটি কোত্থেকে এলো তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

এরপর সত্তর খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাসের জেরুজালেম অভিযানে চতুর্থবারের মতো তাওরাত বিলুপ্ত হয়। এই অভিযানে দশ লক্ষেরও বেশি ইহুদিকে হত্যা করা হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং জীবিতদেরকে বন্দি করে দাস বানিয়ে ফেলা হয়।

বাইবেলের একজন ব্যাখ্যাকার বলেন, অভিযানের প্রাক্কালে টাইটাসের ইচ্ছে ছিল না জেরুজালেমকে ধ্বংস করা। তাঁর অভিপ্রায় ছিল ইহুদিরা স্বেচ্ছায় শহরকে তার হাতে অর্পণ করবে। এ উদ্দেশ্যেই টাইটাস ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাইনকে ইহুদি নেতৃবৃন্দের কাছে সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহুদিরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং টাইটাস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আর তারা ময়দানে অটল থাকতে পারেনি। এরপর রোমানরা প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে ওঠে। যুদ্ধে অবতীর্ণ একজন ইহুদিকেও তারা ছাড়েনি। প্রত্যেককে হত্যা করে। অবশিষ্টরা বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে। কিন্তু একজন রোমান সৈনিক সেখানে আগুনের তির নিক্ষেপ করে। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসে আগুন ধরে যায়। টাইটাস বাইতুল মুকাদ্দাস পোড়াতে চায়নি।

তিনি লোকদেরকে আগুন নেভাতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে রক্ষিত তরবারি, স্বর্ণালঙ্কার ও যাবতীয় পুস্তকসহ পুড়ে যায়।[২৩৩]

টাইটাসের অভিযানের পর অবশিষ্ট ইহুদিরা একত্রিত হয়। সত্তর খ্রিষ্টাব্দে তারা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে তাদেরকে পরাস্ত হতে হয়। এতে করে রোমান হুকুমত প্রচণ্ড রেগে যায় এবং জেরুজালেমের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে। এই বাহিনীটি ইহুদিদের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেয়। বাইতুল মুকাদ্দাস এর স্থানে তাদের দেবতার নামে মন্দির নির্মাণ করে। এমনকি জেরুজালেমের নাম পর্যন্ত পাল্টে দেয়। নতুন নাম রাখে ইলিয়া। বলা হয়ে থাকে এ যুদ্ধে পাঁচ লাখেরও বেশি ইহুদি নিহত হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রোমান সম্রাট হ্যাডরিয়ানের শাসনামলে।

---

[২৩৩] *দিরাসাতুন মুকারিনাতুন লি আদইয়ানিল আলম*, পৃষ্ঠা: ৩৭৬

৪০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের উত্তর দিক থেকে পৌত্তলিকদের আগমন ঘটে। তারা রোমানদের সমস্ত উপনিবেশগুলোতে হামলা চালায়। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সমস্ত নিদর্শন তারা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বিশেষ করে পুস্তক, শিক্ষাকেন্দ্র ও লাইব্রেরি।

৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইরান-শাহ্ পারভেজ জেরুজালেম আক্রমণ করেন। নব্বই হাজারেরও বেশি ইহুদিকে তিনি হত্যা করেন। পবিত্র স্থানগুলোকে গুঁড়িয়ে দেন এবং ধর্মীয় পুস্তকগুলো পুড়িয়ে ফেলেন।

এই হলো ইহুদিদের তাওরাতের গল্প। দখলদারদের কাছে এটি ছিল খেলনা বস্তু যখন তখন ছুড়ে ফেলা যায়। আর ইহুদিদের কাছে ছিল হাতের পুতুল, যা ইচ্ছে মতো তৈরি করে নেওয়া যায়। এভাবে ইহুদি খ্রিষ্টানদের কাছে রক্ষিত তাওরাত তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে।

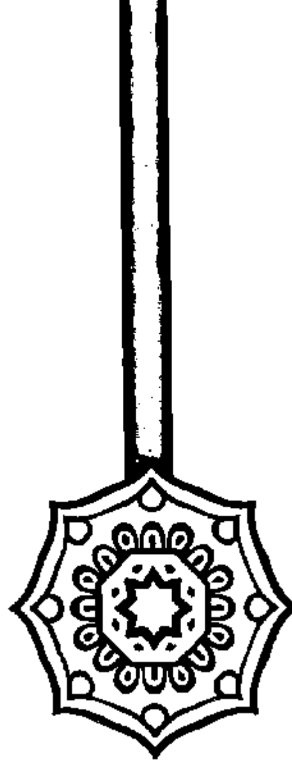
এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তাওরাতের বক্তব্যগুলোর পারস্পরিক তুলনার মধ্য দিয়ে কিতাবটির হাকিকত স্পষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র একরোখা জেদী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই এটাকে বিশুদ্ধ বলতে পারে না।

ইতিহাসবিদগণ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যখন ইহুদিরা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয় তখন মুসলিমরাই তাদের সাথে সদাচারের পরিচয় দেয় এদেরকে সাবাতিয়ান ইহুদি বা দোনমেহ (Donmeh) বলা হয়।[২৩৪]

এদের অনেকেই জেরুজালেমে আগমন করে। সুলতান সুলাইমান কানুনি তাদেরকে মসজিদে আকসার বাতি জ্বালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাদীক্ষা সর্বক্ষেত্রে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে থাকে।



[২৩৪] দোনমেহ একটি তুর্কি শব্দ। এর অর্থ হলো ফিরে যাওয়া। ইতিহাস বলছে ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কে সাবাত জেফি নামক এক ইহুদি জন্মগ্রহণ করে। তার পরিবারের মূল নিবাস ছিল স্পেন। এই ব্যক্তি এবং তার কিছু অনুসারী প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়। কিন্তু তারা আন্তরিকভাবে ইসলামের অনুসারী ছিল না। এ ধরনের কপট আচরণের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। ইতিহাসে এরা দোনমেহ এবং সাবাতিয়ান ইহুদি নামে পরিচিত।



পুরাতন নিয়মের অনুলিপি

১। হিব্রু

পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হলো হিব্রু ভাষার। এটি মৃত সাগর (Dead Sea) এর কাছে কমরান (Qumran) উপত্যকায় পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো তারিখ খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর।

তামরের অধিবাসী একজন আরব রাখাল যিরিহো থেকে বারো কিলোমিটার দূরে মৃত সাগরের উত্তর পশ্চিম তীরে উপত্যকার মুখে একটি গুহাতে পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পান। পুরানো লিলেন কাপড়ে মোড়ানো কিতাবটি একটি মাটির পাত্রের ভেতরে রাখা ছিল। কিতাবটিতে পুরাতন নিয়মের কিছু পুস্তক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবি যিশাইয়ের পুস্তক।

একইভাবে এই অঞ্চলের অন্যান্য গুহা থেকে কিতাবটির অন্যান্য অংশ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ছিল লেবীয় পুস্তক, গীত পুস্তক এবং ইয়োবের পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদ।[২৩৫]

---

[২৩৫] J.A. Sanders, *The dead sea psalus scrall, Oxford University*-১৯৬৭, *মাখতুতাতুল বাহরিল মাইয়িত*, ৫৪, *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, ১৬১

কিন্তু আমাদের সামনে হিব্রু যে কপিটি রয়েছে তা ম্যাসোরেটিক লিপি থেকে উৎকলিত। ষষ্ঠ থেকে দ্বাবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদি আলেমগণ এটি প্রস্তুত করেন। হিব্রু ভাষায় প্রথম পুরাতন নিয়ম ছাপা হয় ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ডাচি অব মিলান[২৩৬] সাম্রাজ্যের সোন্সিউমানে (ধারণা অনুযায়ী বর্তমান সুইজারল্যান্ড)।

এরপর দ্বিতীয়বার ছাপা হয় ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির ব্রেসসিয়াতে।

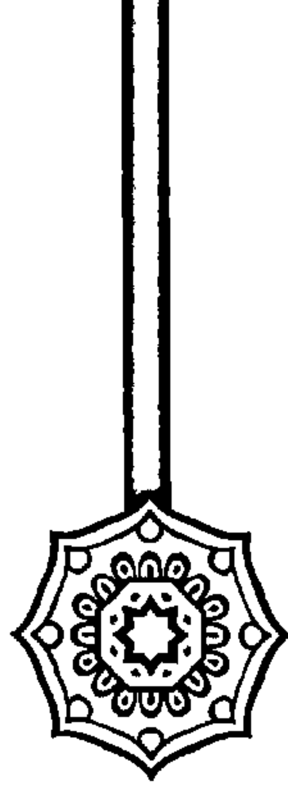
২। সামেরিয়া (Samaritan)

এই পাণ্ডুলিপিতে শুধু মুসার পাঁচ কিতাব সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষকরা মনে করেন এটি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখা হয়েছে। এটি কোনো অনুবাদগ্রন্থ নয়। বরং এটি সামেরিয় হরফে লিখিত মূল হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন এটি পুরাতন হিব্রু হরফে লিখিত হয়েছে। এই সামেরিয়াহ তাওরাতের হস্তলিখিত একটি পাণ্ডুলিপি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নাবলুস শহরে পাওয়া গিয়েছে। সামেরি যাজক আবুল হাসান ইসহাক আস-সুরি হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে এটিকে আরবিতে রূপান্তর করেন। ড. আহমদ হিজাযী এটি প্রকাশ করেন এবং শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দেন। সামেরিয় তাওরাত ও হিব্রু তাওরাতের মাঝে ছয় হাজারেরও বেশি বৈপরীত্য বিদ্যমান। যেমন জেরুজালেমের চেয়ে গেরিজিম পর্বতকে (Gerizim) অধিক সম্মান করা।

এই কপিটির দিকে ইঙ্গিত করে ইবনে হাযম বলেন, তাওরাতের এই নুসখাটি প্রথম ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে ছাপানো হয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার ছাপানো হয় ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে।



[২৩৬] ডাচি অব মিলান ছিল ১৩৯৫ থেকে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় একটি সাম্রাজ্য। এটি ছিল হলি রোমান এম্পায়ারের একটি অংশ। উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক



পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সন্দেহ নেই যে, ইসলাম তাওরাতকে স্বীকৃতি দেয়। মুসলিমদেরকেও এর ওপর ঈমান আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারিমও তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে সত্যায়ন করে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলোকে কুরআন স্বীকৃতি দেয় না। কারণ, এগুলো নিছক বনি ইসরাইলের ইতিহাস এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবি রাসুলদের স্মৃতিচারণ ব্যতীত আর কিছুই না। তাই কুরআন এগুলো সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেনি। সযত্নে এড়িয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হলো এগুলোতে নবি-রাসুলদের ব্যাপারে এমন কতগুলো বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা তাদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমরা পুনরায় বলছি, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা যে তাওরাতের কথা বলেছেন সেটি মুসা আলাইহিস সালাম নিজ হাতে লিখেছেন এবং দুটি ফলকের সাথে সেই তাওরাত তিনি তাবুত তথা নিয়ম সিন্দুকে সংরক্ষণ করেছেন।

আর আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবে।[২৩৭]

---

[২৩৭] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ২৬।

তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিবে।[২৩৮]

আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পর্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানে থাক, তাহাতে আমি দুইখানা প্রস্তরফলক এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব, যেন তুমি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পার।[২৩৯]

বনি ইসরাইল এই তাঁবুতটি[২৪০] নিয়ে কানানে প্রবেশ করেছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাস এর সবচেয়ে পবিত্র স্থানে সেটাকে স্থাপন করেছিল। আল্লাহর নবি সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময়ে তারা এটি খুলে দেখে। খোলার পর ভেতরে পাথরের ফলক ব্যতীত আর কিছুই এখানে ছিল না। যেমন বাইবেলে বলা হচ্ছে—

> সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানি প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন; সেই সময়ে, মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন।[২৪১]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দুর্ঘটনা ঘটে। সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাস লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। ইতিপূর্বে আমরা সে ইতিহাস আলোচনা করেছি।

সে সময়টাতে মুসা আলাইহিস সালামের অবশিষ্ট শিক্ষাগুলো হারিয়ে যায়। তবে দণ্ডবিধি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু বিধিবিধান অবশিষ্ট থেকে যায়। বিভিন্ন সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ধারার কিছু নালিশ ও বিচার আসত।

ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিবাহিত ব্যভিচারিণীকে রজম করার ব্যাপারে কিংবা ইবনে সালাম কর্তৃক ইবনে সুরিয়ার হাতে আঘাত করার ঘটনায় তাওরাত দ্বারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি প্রমাণিত। তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং তাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে আল্লাহ তাআলা এগুলো অবশিষ্ট রেখে দিয়েছেন। নবিজির রিসালাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তাওরাত দিয়ে দলিল দেওয়া হয়েছিল একান্ত অপারগতাবশত, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং সামনেও কিছু আলোচনা আসবে। এরপর তাদের বিকৃত কিতাবেও যে আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু

---

[২৩৮] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ২১।

[২৩৯] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ২১।

[২৪০] আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এটিকে মুসা আলাইহিস সালাম সমাধিস্থল থেকে বের করেছিলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পূর্বে এটিকে তাঁর পূর্বপুরুষগণের সাথে কানানে সমাধিস্থ করার অসিয়ত করেছিলেন।

[২৪১] *রাজাবলি ১ম*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ৯।

আলিইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা রেখে দিয়েছেন তা আলোচনা করব। তবে এই উল্লেখ করাটা হলো তাদের জন্য অপমানস্বরূপ। নতুবা তাদের কিতাবের কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত হাতে নিয়ে আমি তোমার ওপর ঈমান আনলাম—বলেছেন মর্মে যে হাদিসটি বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বানোয়াট। এ ধরনের কোনো হাদিসই বর্ণিত হয়নি। সুতরাং একটি বানোয়াট ও বিকৃতিকে বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তাআলার বানী—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

বলে দিন : হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না করো। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৬৮]

হ্যাঁ, কথা সত্য। সন্দেহ নেই আমরাও এমনটাই বলে থাকি যে তাওরাত ও ইনজিলকে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু যে কিতাবকে তারা বিকৃত করে ফেলেছে, যে কিতাবের অনেক বক্তব্যকে তারা ছাঁটাই করে দিয়েছে কিভাবে তারা সেগুলোকে বাস্তবায়ন করবে? তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বাস্তবায়নের পথ একটাই। আর তা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা। এতে করে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বাস্তবায়ন করতে পারবে। চাই সেগুলোর অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক। পাশাপাশি এই কিতাবগুলোতে তারা মনগড়া যা প্রবেশ করিয়েছে সেগুলোকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। এটাই হবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বাস্তবায়ন। সুতরাং বুঝা গেল আমাদের বক্তব্য কুরআনের আয়াতের সাথে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলহামদুলিল্লাহ।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

হে নবি! আপনি বলে দিন, তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদি হয়ে থাকো। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৩]

এই আয়াতটিতে তাদের মিথ্যায় ভরা তাওরাতকেই নিয়ে আসতে বলা হয়েছে, যে মিথ্যা তাদের পূর্বপুরুষরা সংযোজন করেছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলছেন যে, তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাতই নিয়ে আসুক। কিন্তু তারা আনবে না। কেননা আনলে তাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়বে। মুসলিম আলেমদের সাথে বিতর্কে এসে তাদের এমন লেজে গোবরে অবস্থা বহুবারই হয়েছে। এরা এমন এক জাতি যাদের মিথ্যা বলতে বাধে না। এখনো পর্যন্ত তারা আলোচনা ও বিতর্কের মজলিস থেকে গা বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত হীন চরিত্র। কোনো পরিশুদ্ধ মানুষ এমন চরিত্রকে মেনে নিতে পারে না। এমন চরিত্র থেকে আমরা আল্লাহর পানাহ চাই।

আল্লাহ তাআলার বাণী—

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ .

আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ি গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। [সুরা মায়েদা, ৪৪]

এখানে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা স্বস্থানে ঠিকই আছে। কেননা আমরা বলি আল্লাহ তাআলা তাওরাত নাজিল করেছেন। এই তাওরাতের বিধান অনুযায়ী নবিগণ বিচার করেছেন। এ সমস্ত নবিদের মধ্যে রয়েছেন মুসা আলাইহিস সালাম, হারুন আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রমুখ। এরপর তাদের যাজক, পুরোহিতগণও এই তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। এদের অনেকে ছিলেন নবিদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত। আবার অনেকে ছিলেন সাধারণ যাজক। তাওরাত বিকৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা এর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা

করেছেন। এটাই আমাদের বক্তব্য। উক্ত আয়াতের কোথাও বলা হয়নি যে তাদের তাওরাত বিকৃত হয়নি। কোনোমতেই এমন দাবি আয়াত থেকে বোঝা যায় না।

অনেক মুসলিম মনে করে থাকে, এই আয়াত নাজিল হয়েছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দুজন বিবাহিত ইহুদিকে জেনার অপরাধে রজমের শাস্তি দেয়ার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা এবং অপব্যাখ্যা। এমনকি এই ব্যাখ্যা কুরআনের অন্য আয়াতের সাথেও সাংঘর্ষিক। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে—

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً.

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪৮]

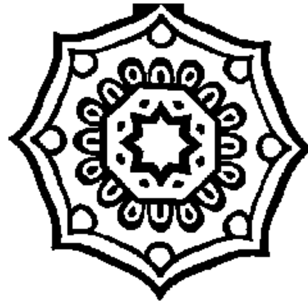
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ .

তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪৯][২৪২]



[২৪২] *আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২১২-২১৪।



পুরাতন নিয়মের প্রাচীন অনুবাদ

১। গ্রিক অনুবাদ

গ্রিক সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ড এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলোতে পরিচিত একটি ভাষা হলো গ্রিক বা ইউনানী ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮২ সাল। সম্রাট ক্লডিয়াস টলেমির (Claudias Ptolemy) নির্দেশে মিশরে বাহাত্তর জন ইহুদি পণ্ডিত সমবেত হন। এই পণ্ডিতগণ পুরোনো নিয়মকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেন। এটাকেই গ্রিক অনুবাদ বলা হয়। এর অপর নাম সেপটুয়েজিন্ট। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় (Septuagent)। আর ফরাসি ভাষায় এর নাম Version Be Septant। রোমান সংখ্যায় এটাকে LXX দ্বারা নির্দেশ করা হয়।[২৪৩]

অনুবাদকগণ সামেরিয়ান পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে এটি অনুবাদ করেন। যদ্দরুণ সামেরিয়ান কপি এবং সেপ্টুয়াজিন্টের মাঝে এক হাজার নয়শটি অনুচ্ছেদের মিল পাওয়া যায়। অপরদিকে হিব্রু তাওরাত ও সামেরিয়ান তাওরাতের অমিলের সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি।

---

[২৪৩] *তারিখুস সুহুফিস সামাওয়িয়্যাহ*

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের মাঝে এই অনুবাদের বিন্যাসের ব্যাপারে যেমন মতদ্বৈততা রয়েছে, একইভাবে মতানৈক্য রয়েছে সংযোজন ও বিয়োজন নিয়েও। পাশাপাশি এই অনুবাদে এমন কিছু পুস্তক রয়েছে যা হিব্রু তাওরাতে নেই।

হিব্রু তাওরাত ও এই অনুবাদের বেশকিছু বাক্যেও অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। যেমন :

১। হিব্রু তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী আদম আলাইহিস সালাম এবং নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের মধ্যবর্তী সময়কাল হলো ১৬৫৬ বছর। অথচ এই অনুবাদে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে ২২৬২ বছর।

২। সন্দেহপূর্ণ ও রহস্যাবৃত পুস্তক অ্যাপোক্রিফা থেকে এই অনুবাদে স্থান দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি।

৩। হিব্রু তাওরাতের যবুর পুস্তকটি গ্রিক অনুবাদে পাওয়া যায় না।

৪। অনুবাদকগণ আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামগুলোকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এগুলো মানুষের গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাদের ধারণা ছিল এভাবে না বললে যিহোবার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা হয় না।

এসব স্পষ্ট বৈপরীত্য সত্ত্বেও গ্রিক বাইবেলটি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয়ের মাঝে সমাদৃত ছিল। এরপর তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট কনস্টানটিন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর খ্রিষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। এরপর তিনি (সম্রাট কনস্টানটিন) পোপ জেরোমিকে ৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পুরোনো নিয়ম ও নতুন নিয়মে রোমান ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন জেরোমি শামে (বৃহত্তর সিরিয়া) চলে যান এবং বেথেলহেমে চৌদ্দ বছর অবস্থান করেন। এসময় তিনি তার পাশে হিব্রু ভাষার নুসখাগুলো (সংস্করণগুলো) জড়ো করেন। অবশেষে ইহুদি পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি ৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সরাসরি হিব্রু থেকে রোমান ভাষায় রূপান্তরে সক্ষম হন। শুরুতে গির্জাগুলো এই অনুবাদটি গ্রহণ না করলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত গির্জায় এটি সমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে টমাস মন্তব্য করেন, কয়েকবারই জেরোমির এই অনুবাদটি সংশোধন করা হয়েছিল। তারপরও এটি বিভিন্ন দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে জেরোমি প্রাচীন পুস্তকগুলি সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৪৪]

যাই হোক, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সিনাগগ এবং গির্জা এটিকে মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করেছিল। উভয়ে এটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন খ্রিষ্টানরা এর বিভিন্ন পঙক্তি দিয়ে ইহুদিদের প্রচলিত আচার ও শিক্ষার সমালোচনা

---

[২৪৪] *তারিখুস সুহুফিস সামাওয়িয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৩

করতে শুরু করে তখন ইহুদিরা হিব্রু তাওরাতে ফিরে যায় যা তাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত ছিল। বহুল প্রচলিত এই অনুবাদকে তারা অপাঙক্তেয় ঘোষণা করে। কেননা এটি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছিল।[২৪৫]

২। ক্যালডিয়ান অনুবাদ

ব্যাবিলনের দীর্ঘদিন দাসত্বের জীবনযাপনের কারণে ইহুদিদের ভাষা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখের ভাষা ছিল তখন আরামীয় ভাষা। এটিকে রূপকার্থে ক্যালডিয়ান ভাষাও বলা হয়ে থাকে। ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের হিব্রু ভাষার সাথে এই ভাষার বিস্তর ফারাক রয়েছে। ভাষাগত এই জটিলতার কারণে তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলোকে আরামীয় ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই অনুবাদকেই তারা নাম দিয়েছিল 'তরজুমাত'। নহমিয়ের পুস্তকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

> এইরূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক সেই পুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা পাঠ করিল, এবং তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিলো। আর শাসনকর্তা নহিমিয়, অধ্যাপক ইস্রা যাজক ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সমস্ত লোককে কহিলেন, অদ্যকার দিন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা শোক করিও না, রোদন করিও না। কেননা ব্যবস্থা-পুস্তকের বাক্য শ্রবণে সমস্ত লোক রোদন করিতেছিল।[২৪৬]

অর্থাৎ তারা পুস্তকগুলোকে ক্যালডিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছিল যে ভাষায় ইহুদিরা তখন কথা বলত।

৩। ল্যাটিন অনুবাদ

ঈসা আলাইহিস সালাম পরবর্তী যুগে প্রথম শতাব্দীতেই গ্রিক অনুবাদ থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়। কেননা ল্যাটিন ভাষা সেসময় উত্তর আফ্রিকার বহুল প্রচলিত ভাষা ছিল। এখানকার ইহুদি-খ্রিষ্টান অধিবাসীরা এই অনুবাদ দিয়ে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করত।

৪। ইথিওপিয়ান অনুবাদ

৩২০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিক অনুবাদ থেকে পুরাতন নিয়মকে ইথিউপিয়ান (হাবশি) ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বলা হয়ে থাকে সম্রাট কনস্টানাটিন (৩২৪-৩৩৭ খ্রি.) এর সময়ে যখন হাবশায় খ্রিষ্টধর্ম প্রবেশ করে তখন এই অনুবাদের কাজ শুরু হয়। এরপর চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হয়।

---

[২৪৫] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস,* পৃষ্ঠা : ৭৬৮

[২৪৬] *নহমিয়,* অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ৮-৯।

৫। গোথিক (Gothic) অনুবাদ

বিশপ ভিলাস ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে পুরোনো ও নতুন নিয়মকে গোথিক ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু তিনি সামুয়েলের পুস্তকদ্বয় এবং রাজাবলি পুস্তকদ্বয় অনুবাদ করেননি। তার বক্তব্য ছিল এই পুস্তকগুলি গোথিক জাতির জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কেননা এগুলোতে নৈরাজ্যবাদী চেতনা বিদ্যমান রয়েছে।[২৪৭]

৬। আরমেনিয় অনুবাদ

প্রধান বিশপ আইজ্যাক (৩৯০-৪২৮খ্রি.) প্রথমে আরমেনিয় ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেন।

৭। আরবি অনুবাদ

ইতিহাসের সর্বপ্রথম আরবি অনুবাদটি সম্পাদিত হয় ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে। সেভিলের বিশপ জন এ দায়িত্ব পালন করেন।

ইবনে নাদিম মনে করেন, প্রথমে তাওরাতকে হিব্রু থেকে আরবিতে রূপান্তর করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম।[২৪৮]

ইতিহাসবিদ মাসউদি অবশ্য তিনটি মত উল্লেখ করেছেন।

এক. হানিন ইবনে ইসহাক আন-নিসতুরি (মৃ. ২৬০ হিজরি মোতাবেক ৮৭৩-৮৭৪ খ্রি.)। তিনি গ্রিক বাইবেল থেকে এটি অনুবাদ করেন।

দুই. আবু কাসির (মৃ. ৩২০ হিজরি মোতাবেক ৯৩৪ খ্রি.)।

তিন. সাদ বিন ইউসুফ আল-ফাইয়ুমি (মৃ. ৩৩১ হিজরি মোতাবেক ৯৪৩ খ্রি.)।

শেষোক্ত দুজন হলেন ইহুদি পণ্ডিত। এরপর হিবা ইবনুল আসসাল ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে কিবতি ভাষা থেকে আরবিতে রূপান্তর করেন।

এখান থেকে বুঝা যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইসরাইলি পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ কোনো আরবি কপি ছিল না।[২৪৯]

---

[২৪৭] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ৭৭১

[২৪৮] *আল ফিহরিসত*, পৃষ্ঠা : ৩৩

[২৪৯] এজন্যই যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের ভাষা শিখতে বলেছিলেন, হে যায়েদ, তুমি ইহুদিদের ভাষা শিখে নাও। কেননা, তাদের ওপর আমি ভরসা করতে পারি না। এরপর যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে তা শিখে নিলেন। তিনি ইহুদিদের চিঠিপত্র নবিজিকে পড়ে শোনাতেন এবং লিখতেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটি তালিক হিসেবে এনেছেন, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৬১। তবে তিনি তার *তারিখুল কাবির* গ্রন্থে হাদিসটি মুত্তাসিল সনদে এনেছেন ৩/৩৮০-৩৮১।

বর্তমানে বাইবেলের উভয় নিয়মের দুটি পূর্ণাঙ্গ আরবি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়।

এক. আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট অনুবাদ। দুজন আমেরিকান ও তিনজন লেবানিজ পণ্ডিত এই অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। তন্মধ্যে উনচল্লিশ পুস্তক বিশিষ্ট পুরাতন নিয়ম ছাপা হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে।

দুই. ক্যাথলিক অনুবাদ। যিশু সোসাইটির ফাদারগণ ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই অনুবাদটি সম্পন্ন করেন। এটি বৈরুত থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়। এরপর আবার নতুনভাবে ক্যাথলিক অনুবাদ ছাপা হয় ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে। উনচল্লিশ পুস্তকের এই পুরাতন নিয়মটি বৈরুতের 'দারুল কিতাবিল মুকাদ্দাস ফিল আলামিল আরাবি' থেকে ছাপানো হয়।



সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৬৪৫, *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২৭১৬, হাকেম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৫।



আলোচনার সারনির্যাস

তাওরাত সম্পর্কে এই আলোচনার পর আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হতে পারি।

১। তাওরাত এর প্রথম সংকলন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তথ্য জানা যায় না।

২। প্রতিবার ধ্বংস ও হারিয়ে যাওয়ার পর তাওরাতকে নতুনভাবে সংকলন করা হয়। কিন্তু এই সংকলনকর্ম সাধন করতে গিয়ে সংকলকদের সামনে কোনো সুনির্ধারিত নীতিমালা ছিল না।

৩। প্রথমদিকে তাওরাতের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলেও কাল পরিক্রমায় বারবার এটি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

৪। ইহুদিদের প্রত্যেকটি গ্রুপ তাওরাতের মধ্যে নিজেদের মত ও চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫। তাওরাত প্রথমে হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। এরপর এটিকে আরামীয় ও গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং এই অনুবাদগুলোতে যথেষ্ট বিকৃতি সাধন করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরামীয় অনুবাদকে সামনে রেখেই অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়।

৬। বনি ইসরাইল ইসমাইলের বংশধরদের হিংসার চোখে দেখত। তাই তারা তাওরাতে ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরদের ব্যাপারে অযাচিত মন্তব্য জুড়ে দিয়েছে।

তারা এদের সম্পর্কে 'গাবিম' (الغويم) শব্দ ব্যবহার করে। হিব্রু ভাষার এই শব্দটি থেকে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। তাদের দৃষ্টিতে ইহুদি ছাড়া পৃথিবীর আর সব জাতি হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।

তাওরাত সম্পর্কিত আলোচনা আমরা সুহাইল মিখাইল ডেভ এর বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেন, 'তাওরাতের লেখকগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদেরকে ভয়ংকর সব শিক্ষাদীক্ষার অনুগামী করা। পাশাপাশি ইহুদিজাতিকে সামরিক ধাঁচে গড়ে তোলা যাতে করে তারা শত্রুদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। একইভাবে তাওরাত তার অনুসারীদের অন্তরে শত্রুদের প্রতি চিরস্থায়ীভাবে হিংসা জাগিয়ে তোলার কাজ করে। কেননা, এই শত্রুদের কারণেই তারা জুলুমের শিকার হয়েছে, গৃহহীন হয়েছে এমনকি পবিত্র ভূমিতেও তারা স্থায়ী হতে পারেনি। তাদের প্রধান শত্রু হলো ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে বসবাস করা কানানি, ফিনিশীয়, ইদোমি প্রভৃতি অ-ইহুদি জাতিসত্তাগুলো।'

দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে—

> আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কবলিত করিবে; তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক, এবং তুমি তাহাদের দেবগণের সেবা করিও না, কেননা, তাহা তোমার ফাঁদস্বরূপ।[২৫০]

একই পুস্তকে বলা হয়েছে—

> তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে লইয়া যাইবেন ও তোমার সম্মুখ হইতে অনেক জাতিকে, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান এই সাত জাতিকে দূর করিবেন।[২৫১]

আরও বলা হয়েছে—

> কেননা, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূতলে যত জাতি আছে, সেই সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।[২৫২]

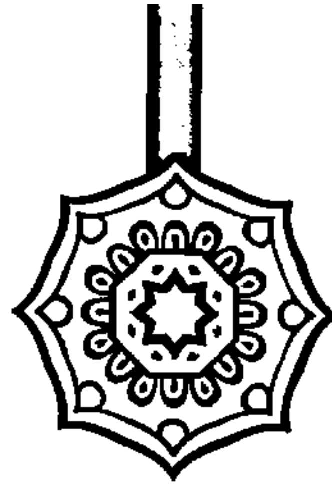
---

[২৫০] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১৬।
[২৫১] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১।
[২৫২] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৬।

এই হলো তাওরাতের কিছু অনুচ্ছেদ যেগুলো মানবজাতিকে সমষ্টিগতভাবে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং পুনঃপুন পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের কর্তৃত্ব স্থাপনের আদেশ প্রদান করতে থাকে। ইহুদিদের সিনাগগগুলোতে এই নির্দেশনাবলি প্রতিদিন পাঠ করা হয়।

এই সমস্ত শিক্ষাগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে তাদের কাছে বিদ্যমান এই তাওরাত মুসা আলাইহিস সালামের তাওরাত নয়। এখানে তারা তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। নতুবা কীভাবে সম্ভব তাওরাতে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে! অথচ দশ আজ্ঞার সারমর্ম এই হত্যা আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।





ইহুদিদের দল-উপদল

খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৮ সালে মেসিডোনিয়দের (Macedonia) হাতে ফিলিস্তিনের পতন ঘটে। এরপর গ্রিকরা ইহুদিদের ওপর জুলুম অত্যাচার শুরু করে। নিজেদের ধর্মের অনুগামী করার জন্য তারা ইহুদিদের ওপর নানাভাবে চাপ দিতে থাকে। তাদেরকে বাধ্য করে জিউস, ডায়োনিসাস প্রভৃতি গ্রিক দেবতার পূজা করতে। ইহুদিদের অনেকেই গ্রিকদের ডাকে সাড়া দিয়ে পৌত্তলিক কার্যকলাপ শুরু করে দেয়। আবার কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষার ওপর স্থির থাকে। ফলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হয়। আদর্শিক এই বিভক্তির পাশাপাশি তাদের মাঝে রাজনৈতিক ও গোত্রীয় বিভক্তিও প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

তাদের এই বিভক্তির সূচনা হয় মূলত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর রাজ্য বিভাজনের মাধ্যমে। ইহুদিরা তখন পরস্পর বিবাদমান দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করেছি। তখন থেকে নিয়ে আর তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হয়নি। গ্রিকদের আগমনের পর এই অনৈক্য আরও বাড়তে থাকে। এখানে তাদের প্রসিদ্ধ উপদল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। চ্যাশিদিম (Chasidim)

এর শাব্দিক অর্থ হলো আনুগত্য। এরা ইহুদি জীবনাদর্শকে কঠোরভাবে মেনে চলে। নির্যাতনের সময়ও তাদের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তারা নামুস তথা মুসা আলাইহিস সালামের পুস্তকগুলিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। এদের মধ্য থেকেই ফরিশি (Pharisee) নামক আরেকটি দলের উদ্ভব ঘটে। ফরিশি আরামীয় ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো বিচ্ছিন্ন। এ উপদলটি নামুস এর বিধিবিধান অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলে।

ইহুদিদের এই দলটির সাথে অন্যান্য দলের চরম বিরোধ বিদ্যমান। বিশেষ করে সাদ্দুকিদের (Sadducees) সাথে। এরা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় মানুষকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য। যেমনটা মথির সুসমাচারে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। খ্রিষ্টান লেখকগণ এদেরকে মুসলিমদের বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মুতাজিলাদের সাথে তুলনা করে থাকেন।[২৫৩] এদেরকে কে, কখন, কেন এই উপাধি দিয়েছিল তা জানা যায় না।

কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের লেখক মনে করেন এরা সম্রাট হিরকানাস (Hyrcanus) (১৩৫-১০৫ খ্রিষ্টপূর্ব) এর যুগ থেকে ফরিশি নামে পরিচিত হয়। হিরকানাস প্রথমদিকে এদের অনুসারী হলেও পরবর্তী সময়ে সাদ্দুকিদের সাথে যোগ দেন।

সম্রাট হিরকানাসের পর তার ছেলে আলেকজান্ডার জান্নাইস (Alexander Jannaes) এদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। তার মৃত্যুর পর ৭৮ খ্রিষ্টপূর্বে তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা সালোম (Alexandra Salome) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ফরিশিদের পৃষ্ঠপোষকরূপে আবির্ভূত হন। ফলে ইহুদিদের ধর্মীয় জীবনে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এমনকি ধর্মীয় বিষয়ে তারা ইহুদিজাতির নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।[২৫৪]

ফরিশিরা নিজেদের সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে ভাই, বন্ধু প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করে থাকে। এ ছাড়াও তারা যাজকবর্গ কর্তৃক রচিত তালমুদের অনুসারী হওয়ায় নিজেদেরকে যাজক উপাধিতে পরিচয় দিয়ে থাকে।

এই ফরিশিগণ ৭৮ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত নিপীড়নের শিকার হয়। এরপর আলেকজান্ডার জান্নাইস এর স্ত্রী আলেকজান্দ্রা সালোম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তারা ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্বের আসনে চলে আসে। এই উপদলটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

[২৫৩] *আদইয়ানুল আলম*, পৃষ্ঠা : ২০৫।
[২৫৪] *আল-কামুস*, পৃষ্ঠা : ৬৭৪

এই সম্প্রদায়টি বিশ্বাস করে তাওরাত তার পঞ্চপুস্তকসহ অনাদী থেকে মাখলুক। এটি পবিত্র ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ওহির মাধ্যমে এটি মুসা আলাইহিস সালামকে প্রদান করা হয়। সুতরাং পরবর্তীকালে এটিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, নতুন করে কিছু সৃষ্টি করা হয়নি।

এরা মুখে মুখে প্রচলিত তাওরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নীতিসূত্র ও বিভিন্ন উপদেশ বাণীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের রাব্বিগণ মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে এটি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তারা মনে করে এই অলিখিত বাণীগুলো লিখিত শরিয়তের সমমর্যাদা সম্পন্ন। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অলিখিত শরিয়তই অধিক গুরুত্ব বহন করে। পূর্বপুরুষের অতিরঞ্জিত অন্ধ অনুসরণ এবং ঘৃণার কারণে এদের সম্পর্কে মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে—

> তখন জেরুসালেম হইতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, আপনার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীনদের পরমপরাগত বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা, আহার করিবার সময়ে তাহারা হাত ধোয় না। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও তোমাদের পরমপরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর কেন? কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর করিও;' আর 'যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।' কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে ব্যক্তি পিতাকে কি মাতাকে বলে, 'আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা ঈশ্বরকে দত্তক দেওয়া হইয়াছে,' সে আপন পিতাকে বা আপন মাতাকে আর সমাদর করিবে না; এইরূপে তোমরা আপনাদের পরমপরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করিয়াছ।[২৫৫]

এই পরম্পরাগত অলিখিত বক্তব্যগুলো পরবর্তীতে তালমুদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে ইহুদিদের এই দলটি মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে থাকে। তারা পরম্পরাগত বিধান মেনে চলে এবং তাদের যাজকগণের কাছ থেকে কিতাবুল মুকাদ্দাসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকে।

[২৫৫] *মথি*, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ১-৬।

দুই. মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস

১। এই সম্প্রদায়টি আখেরাত, ফেরেশতা, পুনরুত্থান প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে। এদের অধিকাংশই অনাড়ম্বর ও সন্ন্যাস জীবনযাপন করে। বিয়ে করে না। তবে তাদের অস্তিত্ব ও বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য পালক পুত্র গ্রহণ করে থাকে।

২। এরা আত্মার চিরন্তন হওয়ায় বিশ্বাসী।

৩। এরা রাব্বিগণকে নিষ্পাপ মনে করে। তাদেরকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। রাব্বিদের কথাকে ঐশীবাণী বিবেচনা করে। এমনকি তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার ন্যায় ভয় করে। এ প্রসঙ্গে তালমুদে বলা হয়েছে—

'বিশ্বাসীদের কর্তব্য হলো রাব্বিদের কথাকে শরিয়তের সমান বিবেচনা করা। কেননা, তাদের বক্তব্য হলো আল্লাহ তাআলার জীবন্ত বাণী। যদি কোনো রাব্বি তার ডান হাতকে বাম হাত বলে কিংবা বাম হাতকে ডান হাত বলে তাহলে সেটাই বিশ্বাস করবে। তার সাথে তর্ক করবে না।'

এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনে বলা হয়েছে—

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

> তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। [সুরা তাওবাহ, আয়াত : ৩১]

এজন্যই তারা ইজতিহাদের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। কেননা, প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব নিষ্পাপ ও পবিত্র রাব্বিদের কাছেই রয়েছে।

এই দলটি মাসিহ আলাইহিস সালামের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল। তার দণ্ডাদেশের ব্যাপারে রাজকীয় ফরমান জারি করার জন্য এরাই চেষ্টা চালিয়েছিল। তাকে হত্যার জন্য হীন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল এরাই। এমনকি গুপ্তহত্যার চেষ্টাও তারা বাকি রাখেনি। এজন্যই মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে—

> পরে ফরীশীরা বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারে।[২৫৬]

---

[২৫৬] *মার্ক*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ৬।

তাদের এই শত্রুতার মূল কারণ হলো, ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের কপটতা, কুফরি, তাওরাত বিকৃতিকরণ এবং বিদাতি কর্মকাণ্ডের গুমর ফাঁস করে দিয়েছিলেন। মথির সুসমাচারের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'কিন্তু, হায় অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটগোষ্ঠী ! ধিক্ তোমাদিগকে! তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাক; আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আসে, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দাও না। হায়, অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, ভণ্ড-দুরাচারমহল, ধিক্ তোমাদিগকে! একজনকে যিহূদী-ধর্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া থাক; আর যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকীয় করিয়া তুল। হা, অন্ধ পথ-দর্শকেরা, ধিক্ তোমাদিগকে! তোমরা বলিয়া থাক, কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল। মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটি শ্রেষ্ঠ ? স্বর্ণ না সেই মন্দির, যাহা স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে? আরও বলিয়া থাক, কেহ যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ তাহার উপরিস্থ উপহারের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল। হায় অন্ধরা, বলো দেখি, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? উপহার, না সেই যজ্ঞবেদি, যাহা উপহারকে পবিত্র করে?'[২৫৭]

এরপর মসিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'হা জেরুসালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক !'[২৫৮]

জন দ্য ব্যাপটিস্ট এই দলটিকে 'সাপের বাচ্চা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

মথির সুসমাচারের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'তখন ফরীশীরা গিয়া মন্ত্রণা করিল, কিরূপে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ফেলিতে পারে। আর তাহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যগণকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন, কেননা, আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। ভালো, আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কী? কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না? কিন্তু যীশু তাহাদের দুষ্টামি বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটি দিনার আনিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই মূর্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের।

---

[২৫৭] *মথি*, অধ্যায় : ২৩, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৯।

[২৫৮] *মথি*, অধ্যায় : ২৩, অনুচ্ছেদ : ৩৭।

তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও।'[২৫৯]

এভাবেই ফরিশিরা মসিহ আলাইহিস সালামকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত। যাতে করে তিনি কায়সারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন এবং সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কায়সার তাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করেন।

এই দলটির গোড়াপত্তন কখন হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মতটি ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাইন (মৃ. ৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এ সম্প্রদায়টি জোনাথন এর যুগে সংগঠিত হয়। জোনাথন ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালামের অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

২। সাদ্দুকি (Sadducees)

ইমাম ইবনে হাযম মনে করেন, এই উপদলটি সাদ্দুক নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধিত। তিনি সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে প্রধান যাজক ছিলেন। কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস এর লেখক এর সাথে আরও যুক্ত করে বলেন, ম্যাকাবিদের যুগে পৌরহিত্যের নেতৃত্ব তার পরিবারের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।[২৬০] অতঃপর তার সহযোগী ও অনুচরদের সাদ্দুকি নামে অভিহিত করা হয়। এ উপদলটি তুলনামূলক ছোট হলেও এদের অধিকাংশই ছিল ধনী এবং শিক্ষিত শ্রেণি। ইউরোপিয়ান কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন এরা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর অন্য এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধিত যার নাম সাদেক (صادق) শব্দমূল থেকে নির্গত।

এ সম্প্রদায়ের আকিদাগত বৈশিষ্ট্য

১। এ সম্প্রদায়টি পুনরুত্থান, আখেরাত, হিসাব, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসী নয়। তারা মনে করে দেহের সাথে সাথে আত্মারও মরণ ঘটে। সম্ভবত এমন লোকদের দিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

---

[২৫৯] *মথি*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ১৫-২১।

[২৬০] ম্যাকাবিরা মূলত হাশমোনিয়ান রাজবংশ হিসেবে পরিচিত। এরা হাশমন আবু মজদ ম্যাকাবির দিকে সম্বন্ধিত। হাশমোনিয়ান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন জোনাথন অ্যারিস্টোবুলাস (৪০-৩৭ খ্রিষ্টপূর্ব)। এরপর সাম্রাজ্য হেরোড দ্য গ্রেট এর হাতে হস্তান্তরিত হয়।

এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা দণ্ডিতও হব না। [সুরা সাফফাত, আয়াত : ৫৮-৫৯]

২। ফেরেশতা, রুহ, শয়তান, আখেরাতের অস্তিত্বকে এরা অস্বীকার করে।

৩। এরা তাকদিরকে অস্বীকার করে এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে কর্ম মানুষের নিজের সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টি নয়। কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের লেখক বলেন, 'তারা ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলে। তারা বলে আমরা আমাদের কর্মের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। আমরা নিজেদের কল্যাণ এর কারণ এবং বোকামির দণ্ড বহনকারী।'

৪। তারা মসিহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকে অস্বীকার করে এবং তার আবির্ভাব এর অপেক্ষায়ও থাকে না।

ধর্মীয় উৎসগত বৈশিষ্ট্য

১। এরা পুরাতন নিয়মে বিশ্বাসী। তবে তাওরাতের সর্বজনীন পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না। কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের লেখক বলেন, 'সাদ্দুকিগণ তাদের শিক্ষাকে কিতাবের বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তারা বলে শুধুমাত্র নামুসের লিখিত হরফই আবশ্যককারী।'

২। মুসা আলাইহিস সালামের দিকে সম্পর্কিত মৌখিক বাণীগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করে।

৩। এরা তালমুদ এবং তালমুদের শিক্ষায় বিশ্বাসী নয়। কেননা, এদের উদ্ভবের অনেক পরে ফরিশিগণ এটি লিপিবদ্ধ করে।

৪। এরা বলে থাকে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজেকে নিজেই পরিচালনার জন্য। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছার দিকে তাকিয়ে থাকা অহেতুক একটি কাজ। মানুষের উচিত সমস্যার সমাধান নিজেই করে নেওয়া।

মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে সাদ্দুকিদের সম্পর্ক

এই সম্প্রদায়ের সাথে প্রথম দিকে মসিহ আলাইহিস সালামের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কেননা, তিনি ফরিশিদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু পুনরুত্থান ও আখেরাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণে পরবর্তীকালে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা চেষ্টা করেছিল তাদের আকিদা এবং ফরিশিদের বিরোধীদের ক্ষেত্রে মসিহ আলাইহিস সালাম কে তাদের দলভুক্ত করতে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা, মসিহ আলাইহিস সালাম তাদের আকিদাগত বিভ্রান্তির বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

মথি লিখিত সুসমাচারের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

সেই দিন সাদ্দুকিদের- যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই- তাঁহার কাছে আসিল; এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরু, মোশি বলিয়াছেন, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে। ভাল, আমাদের মধ্যে সাতটি ভাই ছিল; আর জ্যেষ্ঠ বিবাহের পর মরিয়া গেল, এবং সন্তান না হওয়াতে আপন ভ্রাতার জন্য নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সপ্তম জন পর্যন্ত সেইরূপ করিল। সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মরিয়া গেল। অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে? সকলেই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। কেননা, পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে। কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর' ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের। এই কথা শুনিয়া লোকসমূহ তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকার জ্ঞান করিল।[২৬১] [২৬২]

এখান থেকেই মসিহ আলাইহিস সালাম এবং সাদ্দুকিদের মাঝে বিরোধ শুরু হয়। যুগে যুগে খ্রিষ্টানদের বিরোধিতায় এরা ফরিশিদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। জন দ্য ব্যাপটিস্ট ফরিশিদের মত এদেরকেও সাপের বাচ্চা বলে সম্বোধন করেছেন। খ্রিষ্টানদের সাথে এই চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়টি অন্যান্য জাতির সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করত। অপরদিকে ফরিশিরা অ-ইসরাইলিদেরকে শত্রুতা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত। সম্ভবত এই সম্প্রদায়টি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

কোনো কোনো আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধনসম্পদ আমানত রাখো, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৫]

আর ফরিশিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

---

[২৬১] *মথি*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ২৩-৩৩।

[২৬২] এখানে আরবি বাইবেল এবং বাংলা বাইবেলের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষণীয়। আরবিতে যে বাক্য আছে তার অর্থ হলো তারা মসিহ-এর বক্তব্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু বাংলাতে অনুবাদ করা হয়েছে তারা চমৎকার জ্ঞান করিল।-অনুবাদক

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দিনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না-যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, (উম্মিদের অধিকার বিনষ্ট করাতে) আমাদের কোনো পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৫]

ইহুদি সম্প্রদায়ের পরিভাষা অনুযায়ী অ-ইহুদিদেরকে উম্মি বলা হয়।

সাদ্দুকিরা কখনো বিপ্লব, সংঘাত ও বিপৎসংকুল কোনো কাজে অংশ নিতে আগ্রহী হয় না। তারা সর্বাবস্থায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে। শুধু যেকোনো উপায়ে তাদের ইহুদি ধর্মের সম্মান রক্ষা হলেই হলো। তাদের বিশেষত্ব এবং জিহ্বার স্বীকৃতি পেলে তারা শাসকগোষ্ঠীর ওপর সন্তুষ্ট থাকে। পরিস্থিতি মেনে নেওয়াকে তারা হিকমাহ্ তথা প্রজ্ঞার পরিচয় বলে মনে করে। এদের সংখ্যা অনেক কম যেমনটা ড. আহমদ শালবি তার *মুকারানাতুল আদইয়ান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩। ইনানিয়্যাহ/ কুররাইয়্যাহ সম্প্রদায়

ইনানিয়্যাহ সম্প্রদায় ইহুদিদের প্রধান উপদলগুলোর একটি। পূর্বোল্লিখিত উপদলগুলোর অনেক পরে এদের উদ্ভব। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে ইনান ইবনে দাউদ নামক এক ব্যক্তির হাতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। তখন মুসলিমবিশ্বের খলিফা ছিলেন আবু জাফর আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)। তার অর্থ হলো মুসা আলাইহিস সালামের তিরোধানের প্রায় বিশ শতাব্দী পর এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব। প্রতিষ্ঠাতা ইনান ইবনে দাউদ এর নামানুসারে এদেরকে ইনানিয়্যাহ বলা হয়। এদের আরেক নাম কুররাইয়্যাহ (قرائية) এটি (قراءة) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে যা পঠিত হয় অর্থাৎ কিতাব বা পুস্তক। ইহুদিদের কাছে এই শব্দটি পুরাতন নিয়মের পুস্তক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কুররাইন শব্দের অর্থ হলো যারা শুধু কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বর্তমানেও এই সম্প্রদায়ের প্রচুর অনুসারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

ইহুদি

এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১। পুরাতন নিয়মের বিধিবিধানকে আঁকড়ে ধরা।

২। তালমুদের শিক্ষাকে স্বীকৃতি না দেওয়া।

৩। রাব্বিদের ক্ষমতার স্বীকৃতি না দেওয়া।

৪। রাব্বিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সকল বিধিবিধান প্রত্যাখ্যান করা।

ইতিপূর্বে অনেক ইহুদি নেতা ইনান ইবনে দাউদের জন্য পথ সুগম করে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিরিয়ান ইহুদি নেতা সারডিউস। তিনি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। তার স্লোগান ছিল, 'তালমুদকে ত্যাগ করো'। অনেকেই তার অনুসরণ করেছিল। একসময় সে নিজেকে প্রতিশ্রুতি মসিহ দাবি করতে শুরু করে। তার এই কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ইহুদি-খ্রিষ্টান এবং মুসলিমবিশ্বেও ফিতনা দেখা দেয়। এরপর তাকে বন্দী করে উমাইয়া খলিফা ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক এর সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি দেখলেন ফিতনা দমনের জন্য এই ইহুদিকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করাই শ্রেয়। এভাবেই তার আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর ইসফাহানে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি নেতা উয়াইদিয়ান বিন ঈসার উত্থান ঘটে। তিনি নতুনভাবে সারডিউস এর তালমুদ ত্যাগের দাওয়াত শুরু করেন। ইহুদিদের বিভিন্ন বিধিবিধানও তিনি সংস্কার করেন।

'শাহরাস্তানি' এদের নেতা আবু ঈসা আল-ইসফাহানির দিকে সম্বন্ধ করে এদেরকে ঈসাবিয়্যাহ নামে উল্লেখ করেছেন।[২৬৩]

উয়াইদিয়ান ও তার অনুসারীরা ইহুদিদের ওপর নিজেদের মত চাপিয়ে দেয়ার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। তার অবস্থাও সারডিউস এর মতোই হয়েছিল।

এদের পরেই ইনান বিন দাউদের প্রকাশ ঘটে। সে এসে তার মতাদর্শ প্রচারের সুগম পথ পেয়ে যায় এবং সফলতা লাভ করে। সে এসে ইহুদিদের মধ্যে ইজতেহাদ তথা নিজে নিজে শরিয়ত নিয়ে গবেষণা করার পথ খুলে দেয়। এমনকি প্রত্যেক মুজতাহিদকে তার পৃথক পৃথক মতাদর্শ প্রচারের সুযোগ করে দেয়।

---

[২৬৩] বিস্তারিত জানতে *আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল*, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৫ এর টীকা দ্রষ্টব্য।

এরপর এই দলটি আরও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে দুটি উপদল ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। একটি হলো বিনইয়ামিন। অপরটি হলো আকবরিয়া।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় ইহুদিদের উপদল এবং তাদের আকিদা বিশ্বাসের মূল বিতর্ক হলো তালমুদ কেন্দ্রিক। রব্বানিরা তালমুদে বিশ্বাসী। অপরদিকে কুররাইনরা তালমুদে বিশ্বাসী নয়।

এখন পর্যন্ত ইহুদিদের এদুটি গ্রুপ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে কাফির আখ্যায়িত করে এবং প্রতিপক্ষকে নিজেদের ইবাদতগৃহ ব্যবহার করা তো দূরের কথা প্রবেশ করতেও দেয় না। ইতিহাসের পাতায় এদের বহু সহিংস সংঘর্ষের বিবরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মিশরের ফাতেমীয় সম্রাট আয-যাহের ইবনুল হাকিম বি-আমরিল্লাহ এর সময়কালের ঘটনার কথাই উল্লেখ করা যাক। তিনি ৪২১-৪২৭ হিজরি মোতাবেক ১০২০-১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের সহিংস কর্মকাণ্ডের ফলে বাধ্য হয়ে খলিফা রাজকীয় ফরমান জারি করলেন যে, একদল অন্য দলের পেছনে পড়তে পারবে না এবং একে অপরের ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপও করতে পারবে না। এই ফরমানের খেলাফ কেউ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

৪। সামেরাহ

এরা বনি ইসরাইল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি ইহুদি উপদল। এদের নিজস্ব ইবাদত গৃহ রয়েছে।

জোসেফাস বলেন, 'প্রধান যাজক ইয়াদু এর ভাই মনঃশি এক ভিনদেশি রমণীকে বিয়ে করে। তখন জেরুযালেমের প্রবীণ শায়খগণ তাকে দুটো সুযোগ দেন। হয়তো স্ত্রীকে তালাক দেবে নতুবা সে বলিদান এর জন্য নির্ধারিত পবিত্র স্থানে আসতে পারবে না। তখন মনঃশি অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থ করে। এ সময় তার শ্বশুর এগিয়ে আসেন। তিনি মনঃশিকে প্রস্তাব দেন যাতে স্ত্রীকে তালাক না দেয়। তিনি জেরুজালেমের বিপরীতে আরেকটি ইবাদতগৃহ নির্মাণ করে দেবেন। মনঃশি রাজি হয়ে যায়। অতঃপর তার জন্য গেরিজিম পর্বতে একটি হাইকল নির্মাণ করা হয়। এই হলো সামেরাহ সম্প্রদায়ের আলাদা ইবাদতগৃহের রহস্য।[২৬৪]

এভাবেই ইহুদিদের এই সম্প্রদায়টি জেরুজালেম থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। এরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে গেরিজিম পর্বতে হাইকল (সৌধ) নির্মাণের কাহিনি সংযুক্ত করে। অথচ অন্যাদের কপিতে এই আলোচনা স্থান পায়নি।

---

[২৬৪] *কামুসুল কিতাবুল মুকাদ্দাস,* পৃষ্ঠা : ২৫৮, এই হাইকলটি নির্মিত হয়েছিল ৪৩২ খ্রিষ্টপূর্বে ফিলিসতিনে।

তারা বলে থাকে, আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে নাবলুস পর্বতে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটা ছিল মূলত তুর পর্বত যেখানে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু দাউদ সেটাকে পরিবর্তন করে ইলিয়াতে নির্মাণ করেন। এতে করে তিনি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন।[২৬৫]

এরা আরও বলে থাকে, তাওরাতে শুধু একজন নবির আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যিনি মুসা আলাইহিস সালামের পরে আগমন করবেন। তাওরাতকে সত্যায়ন করবেন। তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন।

সামেরাহতে উলফান নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। সে নবুয়াত দাবি করে বসে। তার দাবি ছিল সে-ই হলো মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রতিশ্রুত নবি এবং সে-ই হলো ওই নক্ষত্র যার ব্যাপারে তাওরাতে বলা হয়েছে যে, তিনি চাঁদের মতো আলোকিত করবেন। ঈসা আলাইহিস সালামের প্রায় একশ বছর আগে তার আবির্ভাব ঘটে। এরপর সামেরাহ সম্প্রদায় দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো দোস্তানিয়া অপরটি হলো কোস্তানিয়া। দোস্তানিয়া শব্দের অর্থ হলো বিচ্ছিন্ন মিথ্যুকদের দল। আর কোস্তানিয়া শব্দের অর্থ হলো সত্যবাদীদের দল।

এরা আখিরাত প্রতিদান, সওয়াব ও শাস্তিকে বিশ্বাস করে। তবে দোস্তানিয়ারা মনে করে প্রতিদান ও শাস্তি শুধু এই দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ।

সামেরাহ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কাঠামোটি সম্পূর্ণ আলাদা। ইহুদিরা তাদেরকে ধর্মের গণ্ডি থেকেই বের করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। ফলে এই প্রচেষ্টা তাদের মাঝে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান শত্রুতার রূপ ধারণ করে।

আল-বেরুনি (মৃ. ৪৪০ হিজরি মেতাবেক ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) মনে করেন, এই সামেরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরাই বুখতেনসরকে ইহুদিদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করেছিল। যার ফলে বুখতেনসর তাদেরকে সহজেই হত্যা ও বন্দী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে সামেরাহ সম্প্রদায়ের কাউকে স্পর্শও করেনি।[২৬৬]

ইহুদিদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।[২৬৭]

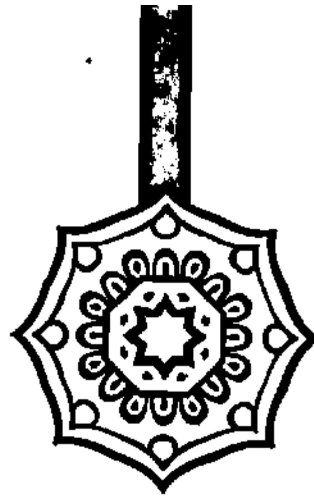


---

[২৬৫] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা : ৫৮

[২৬৬] *আল-আছারুল বাকিয়াহ ফিল কুরুনিল খালিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২১।

[২৬৭] বিস্তারিত দেখুন : *তারিখুল ইয়াহুদ, মাকরিজি (৭৬৬-৮৪৫ হিজরি)।*



তালমুদ (TALMUD)

তালমুদ শব্দটি হিব্রু LAMAD থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো তালিম বা শিক্ষা। পরিভাষায় তালমুদ বলা হয়, 'তাওরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে ইহুদি পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রজন্মান্তরে চলে আসা ইতিহাস, বিধিবিধান, আকিদা প্রভৃতি বিষয়ের মৌখিক বর্ণনার সমষ্টি।'

ইহুদিদের দৃষ্টিতে ওহি দুপ্রকার। যথা :

এক. লিখিত।

দুই. অলিখিত বা মৌখিক।

লিখিত ওহি

লিখিত ওহির মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক দুটি ফলক যেগুলো মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লিখিত অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছেন।

অলিখিত বা মৌখিক ওহি

তাওরাতের বাণীর পাশাপাশি ইহুদিদের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন রীতি নীতির সমষ্টিই হলো মৌখিক বা অলিখিত ওহি। ইহুদিরা মনে করে এসব প্রথা ও শিক্ষা মুসা আলাইহিস সালাম পর্বতের ওপর থেকে তার জাতির জন্য প্রদান করেছিলেন। এরপর পালাক্রমে

হারুন, ইলিয়াসার, যিহোশুয় এগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন এবং পরবর্তী নবিদের কাছে অর্পণ করেন।[২৬৮] এরপর এই বর্ণনাগুলো পুরোহিত ইযরার কাছে পৌঁছায়। তিনি ১২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যদের এগুলো শিক্ষা দেন। এরপর ওহির এই অংশটি ২৫০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত এই সদস্যদের পুত্র এবং পৌত্রদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। এদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন শিমসন (৩০০ খ্রিষ্টপূর্ব)। এরপর এই ওহি লেখকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। তাদের কাছ থেকে উলামাদের কাছে। উলামাদের থেকে যাজক ও রাব্বিগণের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলে ৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

ইহুদিদের এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে এই বর্ণনাগুলো মধ্য দিয়ে অনেক মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পকথা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে প্রবেশ করে। যে কেউ ইচ্ছে মতো কিছু একটা লিখত আর বলত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ .

অতএব, তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৯]

লোকমুখে প্রসিদ্ধ এই বর্ণনাগুলো দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের রাব্বি যিহুদা সংকলন করেন এবং এর নাম দেন মিশনা। মিশনা শব্দের অর্থ হলো পুনরাবৃত্তি। এটাকে তিনি তাওরাতের তাফসির হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরপর আলেমগণ এর ব্যাখ্যা লিখেন যার নাম দেওয়া হয় গিমারা। এই মিশনা ও গিমারা এর সমষ্টিকে বলা হয় তালমুদ। জোসেফ বলেন, 'পুরাতন নিয়মে মুসা আলাইহিস সালামের সমস্ত ওসিয়ত সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি যে লিখিত শরিয়তে কোনও ধরনের সংযোজন বিয়োজন এর ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।[২৬৯] কিন্তু যখন হিব্রু ভাষায় বাইবেলকে

[২৬৮] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ২২২।

[২৬৯] দ্বিতীয় বিবরণের চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করিবে।'

সংকলন করা হচ্ছিল এবং এর অপূর্ণাঙ্গতাকে পূর্ণতা দিয়ে সুসংহত করা হচ্ছিল ততদিনে ইহুদিদের জীবনাচারে বড় ধরনের পরিবর্তন এসে যায়। তাই শরিয়তের অনেকগুলো বাক্যের মৌখিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরে এই মৌখিক ব্যাখ্যার পঠন-পাঠন ব্যাপক আকার লাভ করে। অনেক শিক্ষকগণ প্রাচীন শরিয়তের ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিধান এর প্রচার প্রসার করতে থাকেন।... কয়েক শতাব্দীব্যাপী চলমান এই বিকাশ তেষট্টি অধ্যায় সম্বলিত ছয় খণ্ডের একটি সংকলনের রূপ ধারণ করে। যার নামকরণ করা হয় মিশনা। কিন্তু যে সময়টাতে মিশনার এই সংকলন তৈরি হয় তখন মাঝেমধ্যেই উলামায়ে কেরাম এই রচনাগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন।

কারণ, তাওরাত এবং মিশনা উভয়টি হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছিল। সেসময় ইহুদিদের ভাষা ছিল হিব্রু। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়।[২৭০] তারা আরামীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তাদের অধ্যায়নের ভাষাও হয়ে যায় আরামীয়। পরবর্তী সময়ে তাদের সেই ব্যাখ্যাগুলো আরামীয় ভাষায় সংকলিত হয়। যার নাম রাখা হয় গিমারা। এরপর মিশনা ও গিমারার বর্ণনাগুলো চল্লিশ খণ্ডের একটি কিতাবে সংকলিত হয় যা তালমুদ নামে পরিচিতি লাভ করে।[২৭১]

ফরাসি অধ্যাপক ড. রোলিং তার গ্রন্থ *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*[২৭২] এ বলেন, 'মসিহ এর একশ পঞ্চাশ বছর পর রাব্বি জুডাস এর ভয় হলো যে এসব মৌখিক শিক্ষাগুলো এবং পরম্পরাগত বর্ণনাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হতে পারে। তাই তিনি এগুলোকে একটি গ্রন্থে একত্র করে এর নাম দেন মিশনা (Michna)। মিশনা শব্দের অর্থ হলো পুনরুক্ত বিধান। তাওরাতের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় এই নামকরণ করা হয়।'

পরবর্তী বছরগুলোতে ফিলিস্তিন ও ব্যাবিলনের রাব্বিগণ জুডাস এর সংকলনের ওপর অনেক নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেন। ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে রাব্বি যিহুদা এসব সংযুক্তি ও মৌখিক বর্ণনাগুলোকে পুনরায় সংকলন করেন। ফলে মিশনা জুডাস এবং যিহুদা উভয়ের যৌথ সংকলনে পরিণত হয়।

---

[২৭০] ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ব্যাবিলনে দীর্ঘকাল ইহুদিরা দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করে। তখন তাদের মাতৃভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্থানীয় আরামিয় ভাষা হয়ে যায় তাদের নতুন ভাষা। একটি জাতির ভাষাগত বিবর্তনের এটি একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। -অনুবাদক

[২৭১] *হিকমাতুল আদইয়ানিল হাইয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৫৪-১৫৫।

[২৭২] পৃ. ৪১, মূল বইয়ের আরবি অনুবাদ করেন মিশরের একজন খ্রিষ্টান আলিম ড. ইউসুফ নাসরুল্লাহ।

ইহুদিদের জন্য মিশনা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে তাদের ফকিহ্ ও আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী যুগগুলোতে এই ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাদের এই ব্যাখ্যাই গিমারা (Gimara) নামে পরিচিত হয়। গিমারা শব্দের অর্থ হলো শিক্ষার পূর্ণতা। মূল মিশনা ও তার ব্যাখ্যা গিমারা এর সমষ্টি পরবর্তীতে তালমুদ নামে পরিচিত হয়।[২৭৩]

অধিকাংশ ইহুদি তালমুদকে আসমানি গ্রন্থ মনে করে এবং এটিকে তাওরাতের সমকক্ষ বিবেচনা করে। তারা মনে করে আল্লাহ তাআলা তুর পর্বতে মুসা আলাইহিস সালামকে লিখিত আকারে তাওরাত দান করেছেন এবং তালমুদ প্রেরণ করেছেন মৌখিকভাবে। অনেক ইহুদি শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা এই মৌখিক বর্ণনাগুলোকে তাওরাত এর চেয়েও উঁচু মর্যাদায় স্থান দিয়েছে। কেননা, তাদের কাছে তালমুদের কথা মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের চেয়েও উত্তম। এর উদাহরণ রুটি আর তরকারির মতো। তরকারি ছাড়া যেমন শুধু রুটি খাওয়া যায় না তদ্রূপ তালমুদ ছাড়া তাওরাতও কল্পনা করা যায় না। তারা সুস্পষ্টভাবে বলে থাকে যে, ওই ব্যক্তির কোনো প্রভু নেই যে মিশনা ও গিমারা ছাড়া তাওরাত অধ্যয়ন করে।

ইহুদিদের অনেকে তো আরও এককাঠি সরেস। তারা মনে করে তাদের রাব্বিগণের কথা হলো প্রভুর জীবন্তবাণী। যখনই কোনও জটিল সমস্যা সামনে আসে, এমনকি আসমানে তার সমাধান সম্ভব হয় না তখন আল্লাহ তাআলা তাদের রাব্বিগণের সাথে পরামর্শ করেন।[২৭৪]

তালমুদের প্রকার

ইহুদিদের মধ্যে দুই ধরনের তালমুদ বিদ্যমান :

এক. জেরুজালেমের তালমুদ। এটি সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত। খ্রিষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে এর সংকলন সমাপ্ত হয়। এতে মিশনা এবং ইহুদি রাব্বি ও আলেমগণের সংযোজন ও ব্যাখ্যাগুলো সংযোজিত হয়েছে। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাবারিয়া এর রাব্বিগণ।

দুই. ব্যাবিলনের তালমুদ। এটি প্রথমোক্ত তালমুদ এর চেয়ে তিনগুণ বড়। জেরুজালেমের তালমুদ এর সহায়তা নিয়ে এটি রচনা করা হয়। ধারাবাহিকভাবে চলমান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংযোজনের পর এটি খ্রিষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের রাব্বিগণ

---

[২৭৩] *মুকারানাতুল আদইয়ান, আল-ইয়াহুদিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২৬৯।
[২৭৪] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৬।

কর্তৃক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এই দ্বিতীয় তালমুদই বর্তমান বিশ্বে ইহুদিদের কাছে প্রচলিত। সাধারণভাবে তালমুদ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়।

তালমুদ পরবর্তী ইহুদি আলেমগণ কর্তৃক সঙ্কলিত মাসআলাগুলোকে টোসেফটা (Tosefta) এবং মিদরাশ (Midrash) বলা হয়। তবে পরবর্তী এই সংকলনগুলো ইহুদি উলামা ও রাব্বিদের কাছে তালমুদ এর মতো সমাদৃত হয়নি।

তালমুদে ইহুদিজাতির শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, ইহুদিরা আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত জাতি। আর পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের গোলাম। তালমুদে ইহুদিজাতিকে অন্যান্য মানব সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জাতি হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একচ্ছত্র হকদার তারাই। অন্য কোনো মানুষের তাতে অধিকার থাকতে পারে না। তালমুদ এর এমন একপেশে বর্ণনার কারণে ইহুদিরা সবসময় কামনা করে, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে এর আলোচনা সম্পর্কে অনবগত থাকে।

তালমুদের গোপনীয়তা

ইহুদিরা তালমুদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। এই গোপনীয়তার কারণ হলো এতে বিদ্যমান এমন কিছু আলোচনা যা মানবতার জন্য অমর্যাদাকর। পাশাপাশি এটি ইহুদিজাতিকে সমগ্র বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে প্ররোচিত করে। এজন্য ইহুদি রাব্বিগণ সাধারণ ইহুদিদের থেকেও তালমুদকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন যাতে করে এর গোপনীয়তা লঙ্ঘন না হয়। গোপনীয়তার বিষয়ে তাদের কঠোর অবস্থানের কারণেই লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে চৌদ্দশ বছর রাব্বিগণ এটি লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি প্রশাসন প্রকাশ্যে এটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় এর পেছনে একটি চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে।

ঘটনাটি হলো, নিকোলাস ডনিন (Nicholas Donin) নামক এক ইহুদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সে পোপ নবম গ্রেগরির কাছে তালমুদ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসে এবং বলে যে, এই তালমুদে মসিহ এবং কুমারী মাতা মরিয়ম সম্পর্কে লাঞ্ছনাকর অশালীন মন্তব্য রয়েছে। সে আরও অভিযোগ করে, তালমুদ ইহুদিদেরকে উৎসাহ দেয় খ্রিষ্টানদের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক আচরণ করতে। অতঃপর পোপ লোকদেরকে নির্দেশ দেন যে, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেনে তালমুদের যত

কপি পাওয়া যাবে সব যাতে ডোমিনিকান[২৭৫] ও ফরাসি পাদরিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পোপ এসব পাদরিদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যাতে তালমুদ এর কপি গুলো ভালো ভাবে ঘেঁটে দেখে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে।

পোপের এই নির্দেশের পর কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে কোনো লিখিত তথ্য আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এই তথ্য আমাদের কাছে আছে যে, সম্রাট নবম লুইস তালমুদের কপিগুলো তার কাছে সমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলেও ফরমান জারি করেন। এরপর তিনি চারজন ইহুদি পণ্ডিতকে প্যারিসে ডেকে পাঠান সম্রাট ও সাম্রাজ্যের সামনে তাদের পুস্তক সম্পর্কে সাফাই গাওয়ার জন্য। তিনদিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা পর সম্রাট তালমুদ এর সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এটি ছিল ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।

এরপর ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দে তালমুদের কপিগুলো একত্র করা হয়। ২৪টি ওয়াগন বোঝাই করে এগুলোকে প্যারিসে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের ত্রিসীমানায় তালমুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পোপের পক্ষ থেকে ফরমান জারি করা হয়।[২৭৬]

মিশনার সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ইতালির পারমা (Parma) নগরীতে। এটি খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। ব্যাখ্যাসহ মিশনার প্রথম ছাপানো কপি প্রকাশিত হয় ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে।[২৭৭] এরপর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়। কিন্তু অনুবাদে টীকা-টিপ্পনী এবং যে অংশগুলো রাব্বিগণ ব্যতীত অন্যদের অবগত হওয়া নিষেধ সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়।

ব্যাবিলনীয় মিশনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি অনুবাদের কাজটি করেন ক্যানন ড্যানি (Canon Dany) ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার পূর্বে আরবি ভাষাতে তালমুদ রূপান্তর হয়। ১১৩৯-১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইহুদি দার্শনিক মুসা বিন মাইমুন আল-আন্দালুসি আস সিরাজ নামে আরবি ভাষায় মিশনার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

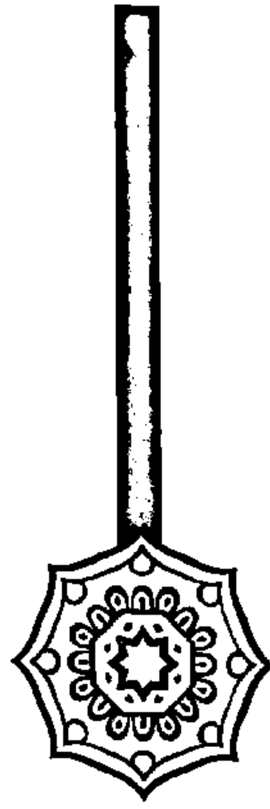
---

[২৭৫] ১২১২ মতান্তরে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট ডমিনিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাদরিগণ।-অনুবাদক
[২৭৬] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০৬-১০৭।
[২৭৭] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

ব্যাবিলনীয় তালমুদের মূল আরবি নুসখাটি ইসরাইল থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গের মাঝে নামমাত্র মূল্য দশ ডলারে বণ্টন করা হয়। এই কপিটি সাধারণ ইহুদিদের কাছেও পৌঁছতে দেওয়া হয়নি। অথচ তারা প্রতি বছর কিতাবুল মুকাদ্দাস তথা বাইবেলের লক্ষ লক্ষ কপি ছাপায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্রি বিতরণ করে।

বলা হয়ে থাকে মূল তালমুদ ১৫২০-১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইতালির ভেনিস থেকে ছাপা হয়। পৃথিবীজুড়ে তার মাত্র তিনটি কপি বিদ্যমান।





তালমুদের কয়েকটি বাণী

প্রভুর মর্যাদা প্রসঙ্গে

তালমুদে বলা হয়েছে, দিন হচ্ছে বারো ঘণ্টার সমষ্টি। তন্মধ্যে প্রথম তিন ঘণ্টা আল্লাহ তাআলা বসে বসে শরিয়তের বিধিবিধান অধ্যয়ন করেন। এরপরের তিন ঘণ্টা তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন। অতঃপর তিন ঘণ্টা বিশ্বজগতের আহারের ব্যবস্থা করেন। শেষ তিন ঘণ্টায় তিনি মাছের রাজা তিমির সাথে খেলাধুলা করেন।[২৭৮]

ইহুদিদের দুঃখ-দুর্দশায় ফেলে রাখায় আল্লাহ তাআলা লজ্জিত হন। এমনকি প্রতিদিন তিনি লজ্জায় বুক চাপড়ে কান্না করেন। তখন তার চোখ থেকে সমুদ্রে দুফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। এর আওয়াজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। সমুদ্রের পানি উত্তাল হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময় পৃথিবীও কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।[২৭৯]

তালমুদ এর ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা অস্থিরতা থেকে মুক্ত নন। রাগান্বিত অবস্থায় তার মধ্যে অস্থিরতা চেপে বসে। এমনকি অনেকসময় ভুল সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন। বনি ইসরাইলের ওপর যেদিন তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন সেদিনও এরকম হয়েছিল। তিনি শপথ করে ফেলেছিলেন যে, তাদেরকে স্থায়ী জীবন থেকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু ক্রোধ

---

[২৭৮] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*, পৃষ্ঠা : ৪৯।

[২৭৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫১।

প্রশমিত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ ধরনের শপথ করাটা ভুল হয়েছে। তাই পরে আর তিনি শপথকে পূরণ করেননি। কেননা, তিনি জানতেন এটি ন্যায় সংগত কর্ম নয়।[২৮০]

ইহুদিদের রুহ সম্পর্কে

আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ছয় লক্ষ রুহ সৃষ্টি করেছেন। তাদের রুহগুলো অন্যান্য রুহ থেকে আলাদা বিশেষত্বের অধিকারী। কেননা, পুত্র যেমন পিতার অংশ তেমনই তাদের রুহগুলো আল্লাহর সত্তার অংশ। এজন্যই অন্যদের রুহের তুলনায় ইহুদিদের রুহগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয়। অন্যদের রুহগুলো চতুষ্পদ জন্তুর রুহের মতো দুরাচারী। তালমুদের ভাষায়, 'অ-ইহুদির বীর্য চতুষ্পদ জন্তুর বীর্যের মতো।'[২৮১]

অ-ইহুদির হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ

তালমুদে বলা হয়েছে,আল্লাহ তাআলা ওই ইহুদিকে ক্ষমা করবেন না যে অ-ইহুদির হারিয়ে যাওয়া বস্তু পেয়ে ফেরত দেয়। কেননা, অ-ইহুদির হারানো বস্তু ফেরত দেওয়া বৈধ নয়।

রাব্বি জেরিকাম বলেন, কোনো ভিনদেশি (অ-ইহুদি) কর্তৃক ইহুদি থেকে প্রাপ্য ঋণের লিখিত প্রমাণপত্র যদি হারিয়ে যায়, এরপর সেটা যদি কোনো ইহুদি খুঁজে পায় তাহলে তা ফেরত দেবে না। কেননা, প্রমাণপত্রটি ইহুদির হস্তগত হওয়ার দ্বারাই ঋণটি মওকুফ হয়ে গিয়েছে।[২৮২]

অ-ইহুদির সাথে প্রতারণা বৈধ

তালমুদ বলছে, অ-ইহুদিকে ধোঁকা দেওয়া ও অতিরিক্ত সুদে তার সম্পদ নিয়ে নেওয়া বৈধ। কিন্তু যখন নিজের ইহুদি ভাইয়ের সাথে বেচাকেনা করবে তখন প্রতারণা করবে না, ধোঁকা দেবে না।

রাব্বি ইসমাইল বলেন, ইহুদির জন্য জরুরি, সে যাতে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে। কেননা, এতে করে অ-ইহুদিদের কাছে তার ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

রাব্বি শমুয়েল বলেন, 'ভিনদেশিদের (অ-ইহুদিদের) সম্পদ চুরি করা বৈধ। তিনি নিজেও এক ভিনদেশি থেকে একটি স্বর্ণের পাত্র ক্রয় করেছিলেন। বিক্রেতা পিতল মনে

---

[২৮০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৫১।
[২৮১] প্রাগুক্ত।
[২৮২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৭।

করে পাত্রটি কম মূল্যে বিক্রয় করে। তিনি তাকে পিতলের মূল্য হিসেবে চার দিরহাম দেন। আবার সুযোগ বুঝে বিক্রেতার একটি দিরহাম চুরিও করেন।'[২৮৩]

অ-ইহুদি সম্পর্কে তালমুদের দৃষ্টিভঙ্গি

তালমুদের দৃষ্টিতে ইহুদিরা হলো আল্লাহর পুত্র। তারা ফিরিশতাদের চেয়ে উত্তম। আর অ-ইহুদিরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। ইহুদিরা আল্লাহর নির্বাচিত জাতি। একমাত্র তাদেরই অধিকার রয়েছে জমিনের বুকে সসম্মানে বসবাস করার।

ইহুদিদের একটি উৎসব তথা ঈদুল ফেসাখে তালমুদের নির্দেশনা হলো অ-ইহুদিদেরকে প্রভুর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া। এরপর তার রক্ত পবিত্র খামিরে মিশ্রিত করা। যেগুলো তারা উৎসবে খেয়ে থাকে। বলির জন্তুর রক্ত ঝরানোর জন্য ইহুদিরা নানারকম বীভৎস পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো সুচ পিপা (The needle barrel)। এটি মূলত একটি পিপা যার ভেতরের দিকে ধারালো ও তীক্ষ্ণ সূচ লাগানো থাকে। এরপর বলির জন্তু বা মানুষকে জীবন্ত এর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে এই সূচ গেঁথে যায় এবং রক্ত ঝরতে থাকে। এভাবে রক্তক্ষরণ এর মাধ্যমে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে প্রাণীটি বা মানুষটি মৃত্যুবরণ করে। এসময় পিপার চতুষ্পার্শ্বে ইহুদিরা বেশ উৎফুল্ল মেজাজে থাকে। এই বিভৎস দৃশ্য তাদের মধ্যে এক ধরনের পৈশাচিক আনন্দ সৃষ্টি করে। রক্ত ঝরে বীপার নিচে জমা হলে পূর্ব থেকে প্রস্তুতকৃত পাত্রে তারা সেগুলো সংগ্রহ করে। কখনো কখনো তারা বলির শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধমনী কেটে দেয় যাতে করে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। আবার কখনো কখনো বলির জন্য প্রস্তুত করা মানুষটাকে পশুর মতো জবেহ করা হয়। রক্ত সংগ্রহ করা হলে তারা সেগুলো রাব্বি বা যাজকের কাছে দেয় পবিত্র খাবার তৈরি করার জন্য।

এই বিকৃত অপরাধ চর্চা ইহুদিদের মাঝে কোনোরুপ ভাবনার উদ্রেক করে না। এমনকি বর্তমানেও তারা সুযোগ পেলেই এর চর্চা করে থাকে। বিশেষ করে অনৈতিক পন্থায় মুসলিমদের ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তারা এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করে যাচ্ছে।

একজন ইউরোপিয়ান লেখক আরনল্ড লিসি (Arnold Leese) ইহুদিদের এ ধরনের অপরাধগুলো প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত ইহুদিদের স্বীকারোক্তিসহ তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। তুকুসুল ইগতিয়ালিল

[২৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৬।

ইহুদিয়্যাহ নামক এই গ্রন্থটি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটিতে ইহুদিদের এমন ভয়ংকর ষাটটি ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস (মৃ. ৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ করেন, তারা শুধু নরবলির রক্তপান এবং খামিরের সাথে মিশিয়ে ক্ষান্ত হতো না। বরং তারা বলি দেওয়া লোকটির শরীর থেকে গোশতও ভক্ষণ করত।

এরপর এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে, গ্রিক সম্রাট চতুর্থ এন্টনিয়াস -যিনি ১৭৪ খ্রিষ্টপূর্বে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং জেরুজালেম জয় করেন জেরুসালেমে প্রবেশের পর হাইকলের এক স্থানে একজন গ্রিককে দেখতে পেলেন যাকে ইহুদিরা বন্দি করে রেখেছিল। ইহুদিরা তাকে ভালো ভালো খাবার দিত। উদ্দেশ্য ছিল খাবার খেয়ে সে মোটাতাজা হবে। এরপর ঈদুল ফিসাখের দিন তাকে বলি দিয়ে তার রক্ত মাংস খাওয়া হবে। লোকটি সম্রাটের কাছে তাকে মুক্ত করার আবেদন করলে তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন।[২৮৪]

তালমুদে আরও বলা হয়েছে, ইহুদির জন্য কোনো অ-ইহুদিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো কিংবা কোনো গর্ত থেকে উদ্ধার করা বৈধ নয়। বরং কোনো অ-ইহুদিকে গর্তে পড়ে থাকতে দেখলে তার ওপর পাথর চাপা দেওয়াটাই কর্তব্য।[২৮৫]

অ-ইহুদিদের প্রতি তাদের এই বিদ্বেষের কারণ হলো, তাদের কল্পিত তাওরাতে সমস্ত কানানিদের হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেসময়ে কিছু কিছু কানানি পালিয়ে গিয়ে অন্যান্য জাতির সাথে মিশে যায়। সুতরাং ইহুদি ছাড়া যে কেউ সেই পালিয়ে যাওয়া কানানি কিংবা তার বংশধর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তাই যেকোনো অ-ইহুদিকে সন্দেহভাজন কানানি হিসেবে হত্যা করা আবশ্যক।

তালমুদ ও মসিহ আলাইহিস সালাম

মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তালমুদের বক্তব্য হলো যিশু জাহান্নামের আগুন বরফের শাস্তি ভোগ করছে। তার মা মরিয়ম তাকে অবৈধভাবে জন্ম দিয়েছেন। খ্রিষ্টান গির্জাগুলো সব আবর্জনার ভাগাড়। সেখানকার উপদেশদাতাগণ ঘেউ ঘেউ করতে থাকা কুকুরের মতো। খ্রিষ্টানকে হত্যা করাই হলো নির্দেশনা। কোনো খ্রিষ্টানের সাথে চুক্তি করলে তা শুদ্ধ হয় না। খ্রিষ্টানকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে ইহুদির জন্য সেটা পূরণ করা জরুরি নয়। ইহুদিদের কর্তব্য হলো খ্রিষ্টান নেতাদের তিনবার অভিশাপ করা।

---

[২৮৪] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ* গ্রন্থের আরবি অনুবাদের ভূমিকা থেকে সংগৃহীত।

[২৮৫] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*।

একইভাবে যারা বনি ইসরাইলের সাথে শত্রুতা করে থাকে তাদেরকেও তিনবার অভিশাপ করা।[২৮৬]

শপথ সম্পর্কে

ইহুদিরা অন্য জাতির সাথে শপথ করলে সেটা শপথ হিসেবে বিবেচিত হয় না। এটা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে শপথ করার মতো। চতুষ্পদ জন্তুর সাথে শপথ করলে সেটা শপথ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কেননা, শপথ করা হয় মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য। মানুষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন নেই। ইহুদি যদি কোনো খ্রিষ্টান এর সাথে শপথ করতে বাধ্য হয় তাহলে সেটাকে শপথ বিবেচনা করার দরকার নেই। ইহুদির কর্তব্য প্রয়োজনে বিশবার মিথ্যা শপথ করা। এ ক্ষেত্রে ইহুদি কোনো ভাইয়ের জন্য তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।[২৮৭]

অ-ইহুদি নারী সম্পর্কে

তালমুদ অ-ইহুদি নারীর সাথে অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা দেয়। অ-ইহুদির স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ। কেননা, অ-ইহুদিদের বিবাহগুলো তালমুদের বিধান অনুযায়ী বাতিল ও অবৈধ। অ-ইহুদি নারী চতুষ্পদ জন্তুর মতো। চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে বিবাহ হয় না। তাই ইহুদি কর্তৃক কোনো খ্রিষ্টান নারীর সাথে সহবাস করা হারাম নয়। বরং অ-ইহুদি নারীকে ধর্ষণ করা ইহুদির অধিকার। রাব্বি টম এর ভাষায়, ইহুদি নারী-পুরুষের সাথে জিনা করলে কোনো শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। কেননা, ইহুদিরা পশুর বংশধর।[২৮৮]

এ পর্যায়ে পাঠকদের সামনে তালমুদ এর কিছু বক্তব্যের অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো। এগুলো ইহুদিধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করা মোহাম্মদ আফিন্দি (মুসা আবুল আফিয়া) এর অনুবাদ।[২৮৯]

---

[২৮৬] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ* এর আরবি অনুবাদকের ভূমিকা থেকে সংগৃহীত। অনুবাদক মনে করেন ফরাসি সম্রাটের দরবারে যেসব ইহুদি রাব্বি তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল তারা মসিহ এবং খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে তাদের এসব বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের এসব অনুচ্ছেদের অনুবাদ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছিল।

[২৮৭] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*, পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪।

[২৮৮] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*, পৃষ্ঠা : ৮৯।

[২৮৯] আবুল আফিয়া ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের যাজক টমাসের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর ইসলামে দীক্ষিত হন। পরবর্তীসময়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি গোপনে তালমুদের বাক্যগুলোর অনুবাদ শুরু করেন এবং সেগুলো ফরাসি কনস্যুলেট এর উপদেষ্টা ও গভর্নর শরিফ পাশাকে হস্তান্তর করেন। শরিফ পাশা এই মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ইহুদিরা তাকে অর্ধ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ দিয়ে তালমুদের ব্যাপারে তদন্ত থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। পাশাপাশি আবুল আফিয়াহ কর্তৃক কৃত অনুবাদকে নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তাব দেয়।

১। পৌত্তলিক কেউ যদি কোনো ইসরাইলিকে কষ্ট দেয় তাহলে সেই পৌত্তলিককে হত্যা করা হবে। কেননা, সে প্রভুর কুদরতকে কষ্ট দিয়েছে। এজন্যই মুসা একজন মিশরিকে হত্যা করেছিল। কেননা, সে একজন ইহুদিকে কষ্ট দিয়েছিল।
রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই অনুবাদ সত্যায়ন করেছেন।

২। কোনো অ-ইহুদি যদি সপ্তাহের কোনোদিন বিশ্রাম নেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তারা দিনেও বিশ্রাম নেবে না, রাতেও বিশ্রাম নেবে না। একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে যদি সে শনিবার ব্যতীত অন্য দিন বিশ্রাম নেয়। যে পৌত্তলিক তাওরাত পড়বে সে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হবে। কেননা, তাওরাত ইহুদিদের জন্য খাস। যে এটাকে গোপনে গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হবে।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই অনুবাদকে সত্যায়ন করেছেন।

৩। 'নুহ আলাইহিস সালামের কোনো বংশধর যদি আল্লাহর নাম নিয়ে তিরস্কার করে এরপর যদি সে ইহুদিধর্মে প্রবেশ করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হবে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অন্য কাউকে হত্যা করবে কিংবা স্বীয় গোত্রের কোনো নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো ইহুদিকে হত্যা করবে কিংবা কোনো ইহুদি নারীর সাথে জিনা করবে সে কোনো ধরনের অনুগ্রহ ছাড়াই মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হবে।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

৪। 'আল্লাহ তাআলা অন্যান্য জাতির সম্পদকে বনি ইসরাইলের জন্য হালাল করেছেন। যেহেতু তারা দশ আজ্ঞার সাতটি তথা মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, নরহত্যা, চুরি, জবেহবিহীন জন্তু ভক্ষণ করা, মানুষকে নপুংসক বানানো এবং প্রাণীতে শংকর জাত সৃষ্টি করা প্রভৃতির বিরোধিতা করে থাকে।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করেছেন।

৫। 'ইহুদিদের কর্তব্য হলো অন্যান্য জাতিকে ফসলি জমি ব্যবহারে বাধা দেওয়া। তাদের প্রশংসা না করা। তাদের কোনো ভালো গুণ বর্ণনা না করা এবং দাম না দিয়ে তাদেরকে কিছু উপহার না দেওয়া।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করেছেন :

৬। 'ইসরাইলিদের কোনো পশু অ-ইহুদির ঘরে রাখা বৈধ নয়। অ-ইহুদি এই পশুর সাথে কুকর্ম করার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, অন্যান্য জাতিগুলো হলো দুরাচারী। এরা নারীদের চেয়ে পশুর সাথে কুকর্ম করতে বেশি আগ্রহী হয়। এরা ঘাতক। ইবলিস যখন সাপের আকৃতিতে হাওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছে তখন থেকেই এদের স্বভাব

নিম্নমানের। এরা খিয়ানতকারী।... বনি ইসরাইলও এমন ছিল। কিন্তু ধারাবাহিক পূণ্যকর্মের কারণে তারা পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের এধরনের পুণ্যকর্মের মধ্যে রয়েছে সিনাই পর্বতে অবস্থান। তাই ইহুদি নারী-পুরুষের জন্য অ-ইহুদি নারী পুরুষের সাথে বসা নিষিদ্ধ। কেননা, এতে করে ইহুদি হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে পারে।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই বক্তব্যকে সত্যায়ন করেছেন।

৭। 'ইহুদি পুরুষের জন্য অ-ইহুদি নারীকে বিবাহ করা হারাম। কেননা, এসব নারীগণ শৈশব থেকেই অপবিত্র। সর্বাবস্থায় এরা ঋতুমতি হিসেবে বিবেচিত। তাওরাত ইসরাইলিদের জন্য তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে বসবাসকারী সাতটি জাতির নারীদেরকে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে।'

তালমুদে বলা হয়েছে, 'তাওরাতের এই নিষিদ্ধতা প্রকৃত রজঃস্রাবের কারণে নয়। কেননা, এই নারীগণ মানুষের মধ্যে পরিগণিত নয়। এরা চতুষ্পদ জন্তু। আর চতুষ্পদ জন্তুর হায়েজ হয় না। হাকিমগণ ইহুদিদের শারীরিক চাহিদা দমনের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। কারণ, তারা এখান থেকে বুঝে নিতে পারবে, অ-ইহুদি নারী নাপাক না হলে এ অবস্থায় ইহুদি নারীও নাপাক হবে না। তখন তারা উভয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না। কে মানুষ হিসেবে বিবেচিত আর কে পশু? তাই তারা এখান থেকে বুঝে নিবে ইহুদি ব্যতীত অন্যরা হলো পশু।

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এটাকে সত্যায়ন করেছেন।

৮। 'তাওরাতের বিধান অনুযায়ী কোনো ইহুদি কবর স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যায়। তবে এই বিধান শুধু ইহুদিদের কবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য জাতির কবর অপবিত্র নয়। কেননা, তারা তো চতুষ্পদ জন্তু। আদম সন্তান নয়। সুতরাং তাদের কবর কবরই নয়।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এটাকে সত্যায়ন করেছেন।

৯। 'দান-সদকা, পুণ্যকাজ ইসরাইলিদের মর্যাদা সমুন্নত করে। তাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। অন্যান্য জাতির দান-সদকা হলো পাপ। কেননা, তারা অহংকারবশত সেটা করে থাকে। ইহুদি যদি সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য অথবা জান্নাত লাভের আশায় সদকা করে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। কিন্তু অ-ইহুদির এমন কোনো আমল কবুল করা হয় না।'

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এটাকে সত্যায়ন করে বলেন, 'এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন অহংকার ও প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে সদকাহ দেওয়া হবে।'

১০। মুহাম্মদ আফেন্দি বলেন, 'তাওরাতে ভীনদেশি, পৌত্তলিকদের জন্য নির্দিষ্ট করে যা বলা হয়েছে সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল অ-ইহুদি। এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।'

তালমুদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে। ইহুদির কর্তব্য হলো অ-ইহুদির হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফেরত না দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃত মালিক জানা থাকলেও। অ-ইহুদি যদি কোনো ইহুদির কাছে কিছু জমা রাখে তখন ইহুদি সেটা ফেরত না দিয়ে নিজে ভোগ করাও বৈধ।

মোটকথা, শাসক ব্যতীত অন্যদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া ইহুদিদের জন্য বৈধ।

রাব্বি ইয়াকুব আল-ইনতাবি এই ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করেছেন।[২৯০]

ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাব বিশেষ করে বুখতেনসর কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর রচিত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, সেসময় তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায়। এমনকি পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। তখন ইহুদি নেতাগণ তাদের অন্তর থেকে ব্যাবিলনের দুঃসময় ও বন্দি জীবনের স্মৃতি কাটিয়ে হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাদের আলেম ও পণ্ডিতগণ মিলে 'শরিয়ত ও প্রতিশ্রুতি' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তাদেরকে অন্যদের সাথে মেশার অনুপযুক্ত ঘোষণা করেন। এ ক্ষেত্রে ফরিশিগণ ছিল শীর্ষে।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব জুডাহ্ বলছে, 'তখন থেকে ইহুদিদের জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অসহায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পরিস্থিতিও পাল্টে যায়। পূর্ববর্তী শরিয়ত নতুন ধাঁচে পরিচালিত হয়। প্রাচীন রীতিনীতিতে নতুন ধারাবাহিকতা আসে। হিংস্রতা ইহুদিদের স্বভাব কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিল। একইভাবে তাদের জীবন, চিন্তা-ধারা সর্বোপরি তাদের ভবিষ্যৎকে পাল্টে দিয়েছিল।'

এখান থেকে ইহুদি ও অ-ইহুদির মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞার সূচনা হয়। শুরু হয় অন্যদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অ-ইহুদিদের সাথে অনাদর ও নির্দয় আচরণের। ব্যাবিলনীয় লেখকগণ ইহুদি জাতির ওপর ভয়ংকর কিছু শিক্ষাদীক্ষা চাপিয়ে দিয়েছিল। ইহুদিদের এগুলো আবশ্যিকভাবে পালন করতে হতো। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে কার্যত সামরিককভাবে একতাবদ্ধ করা। যাতে করে শত্রুদের প্রতি নির্দয় হয়ে বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে।

---

[২৯০] টমাস ও তার সহচর এর হত্যাকাণ্ডের পর লিখিত চার্লস লরেন্টেরর পুস্তক থেকে সংগৃহীত। পৃ. ১৫০-১৫৬। পুস্তকটি *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ* এর সাথে সংযুক্ত।

এজন্যই আমরা দেখি তাদের দাবিকৃত তাওরাত অ-ইহুদিদেরকে সমূলে হত্যার নির্দেশ দেয়। তাওরাতের এই বাণীসমূহ তাদের সিনাগগগুলোতে প্রকাশ্যে পঠিত হয়।

ইহুদিরা যুদ্ধের জন্য এক কাল্পনিক প্রভু আবিষ্কার করেছিল। তারা সেই প্রভুর নাম দিয়েছে যিহোবা। ইনি ইহুদিদের গোত্রীয় প্রভু। তার দায়িত্ব হচ্ছে ইহুদিদের শত্রু বিনাশ করা।

কথিত তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে ইহুদিদেরকে সমস্ত জীব এমনকি প্রাণীকুলকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে অ-ইহুদিদের মূলোৎপাটন করা।

'আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে ওই জাতিগণকে অল্প অল্প করিয়া দূর করিবেন; তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারিবে না, পাছে তোমার প্রতিকূলে বন্যপশুগণ বর্ধিত হয়। কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন; এবং যে পর্যন্ত তাহারা বিনষ্ট না হয়, তাবৎ মহাব্যাকুলতায় তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবেন।'[২৯১]

গণনাপুস্তকে বলা হয়েছে—

'কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত না করো, তবে যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবে তাহারা তোমাদের চক্ষে কণ্টক ও তোমাদের কক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দেবে।'[২৯২]

যুদ্ধের এই নতুন সেনাপতি ইহুদিদেরকে শত্রু বিনাশের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাদেরকে এই বলে ভয় দেখিয়েছে যে, তারা যদি শত্রু হত্যা না করে তাহলে যিহোবা তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবেন। গণনা পুস্তক বলা হয়েছে—

'আর আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।'[২৯৩]

দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে—

'তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ফরমানে কর্ণপাত না করিলে, তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে জাতিগণকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদেরই ন্যায় তোমরা বিনষ্ট হইবে।'[২৯৪]

[২৯১] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ২২-২৩।
[২৯২] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ৫৫।
[২৯৩] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ৫৬।
[২৯৪] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ২০।

একই পুস্তকে আরও বলা হয়েছে—

'আর যদি তুমি কোনো প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাও, অন্য দেবগণের পশ্চাদগামী হও, তাহাদের সেবা করো, ও তাহাদের নিকটে প্রণিপাত করো, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে।'[২৯৫]

তাদের পবিত্র গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এই প্রভুর মধ্যে শুধু শয়তানি গুণাবলি বিদ্যমান। তিনি অত্যন্ত হিংস্র, দুষ্ট প্রকৃতির, ধ্বংস ও রক্তপাতে আসক্ত। অ-ইহুদির জন্য তার মাঝে দয়ার ছিটেফোঁটাও নেই। অ-ইহুদি তার শত্রু।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কীভাবে এই পুরাতন নিয়মকে গ্রহণ করে যেখানে যিহোবার মতো একজন প্রভুর উল্লেখ আছে। যে পুস্তক অ-ইহুদিদেরকে সমূলে হত্যা করতে নির্দেশ দেয় কীভাবে তারা সে পুস্তকের ওপর ঈমান রাখে। খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন উপদল সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তাদের অনেকেই পুরাতন নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটাকে তারা শরিয়তসিদ্ধ মানতে নারাজ। এমন একটি উপদল হলো ম্যানুবি সম্প্রদায়। তাদের নেতা ম্যানির দিকে সম্বন্ধ করে এই নামকরণ করা হয়। খ্রিষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে পারস্যে এদের উদ্ভব হয়।

তালমুদের ভাষা

মিশনা লেখা হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। তেষট্টিটি পুস্তকের সমষ্টি ইহুদিদের এই ধর্মগ্রন্থটি রচিত হয় খিষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে।

মিশনার ব্যাখ্যা লেখা হয় আরামিয় ভাষায়। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য পরবর্তীতে দুটি ধারা প্রচলিত হয়। প্রথমটি হলো ফিলিস্তিনি ধারা। এরা ফিলিস্তিনের আধুনিক আরবি ভাষা ব্যবহার করত। খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এদের এই ব্যাখ্যার কাজ চলমান থাকে। এই তালমুদ বাইতুল মুকাদ্দাসের তালমুদ বা জেরুজালেমের তালমুদ নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় ধারাটি ব্যাবিলনকেন্দ্রিক। এরা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আরামীয় ভাষা ব্যবহার করত। এদের কাজ শেষ হয় খ্রিষ্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই তালমুদটি ব্যাবিলনীয় তালমুদ নামে পরিচিত। এটি জেরুসালেমের তালমুদ এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়। রাব্বিদের মাঝে এই তালমুদ অধিক পরিচিত। সাধারণভাবে তালমুদ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়।

পরবর্তী যুগের সংকলিত মাসআলাগুলোকে টোসেপ্টা ও মিদরাশ বলা হয়। তবে এই পুস্তকগুলো তালমুদের মতো প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

---

[২৯৫] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ১৯।

ইহুদিরা এই ভয়ংকর শিক্ষা নিয়েই চলেছে। সময়ে সময়ে তারা ফিতনা ও বিভিন্ন সমস্যা উসকে দিয়েছে। তারা অনেক গোপন সংগঠন তৈরি করেছে যাদের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে গোলযোগ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সব জায়গায় তাদের প্ররোচনায় বহু বিধ্বংসী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তাদের প্ররোচনায় পুঁজিবাদীরা সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে, সাম্যবাদীরা পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নেমেছে। মানবতার বিরুদ্ধে এমন শত্রুভাবাপন্ন চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা গোপন ও ভয়ঙ্কর কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলো পরবর্তীকালে প্রটোকল নামে পরিচিতি লাভ করে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এসব প্রটোকল এর বিষয়বস্তু এবং এগুলোর প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব।

জায়নবাদী[২৯৬] প্রটোকল

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলস শহরে পঞ্চাশটির বেশি ইহুদি সংস্থার তিন শতাধিক নেতা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে তারা তালমুদের শিক্ষাকে সামনে রেখে অনেকগুলো গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওই সমস্ত জাতি গোষ্ঠী থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যারা কোনো না কোনোভাবে ইহুদিদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় অংশ নিয়েছে। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে তারা যে জুলুম অবিচারের শিকার হয়েছে তার প্রতিশোধ নেওয়া। তাই তারা পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা সম্বলিত এই গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জায়নবাদী নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্তগুলো ধীর-স্থির, গোছালো ও সুনিপুণভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে তারা সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে। এমনকি সকল নেতৃবৃন্দের কাছে এগুলো লিখিত আকারেও তারা দেয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। তিনি চাইলেন এই সিদ্ধান্তগুলো বিশ্বজগতের সামনে উন্মোচিত হোক এবং মানবতাবিরোধী তাদের এই ষড়যন্ত্রগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ুক।

একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসি নারী ফ্রিম্যাসনারিদের একটি ঘাঁটিতে তাদের এক নেতার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। ঘটনাক্রমে সিদ্ধান্তগুলোর কিছু অংশ তার নজরে পড়ে। এরপর তিনি সেখান থেকে কিছু অংশ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসেন। ঘটনাটি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের। এরপরে সিদ্ধান্তগুলো তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে রুশ সাম্রাজ্যের

[২৯৬] ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে জায়নবাদ (Zionism) নামে অভিহিত করা হয়। হিব্রু Zion শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। জায়ন হচ্ছে জেরুজালেমের একটি পাহাড়ের নাম এবং শব্দটির অর্থ হচ্ছে দাগ কাটার মতো ঘটনা বা স্মৃতি উৎসব। এটি একটি বহুমাত্রিক আন্দোলন।

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অ্যালেক্স নিডবলস্কি এর কাছে পৌঁছান। অ্যালেক্স সমগ্র পৃথিবীর জন্য এই চুক্তিনামার ভয়াবহতা তিনি আঁচ করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে তার মাতৃভূমি রাশিয়ার জন্য এটি ছিল বিপজ্জনক। তিনি তার রাশিয়ান বন্ধু সারগেই নেইলসকে এটি অধ্যয়ন এবং সামসময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য অর্পণ করেন। এরপর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পরবর্তী বছর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে এটি রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন।

অন্য আরেকটি বর্ণনা বলছে, রুশ প্রশাসন জায়নবাদী চলাফেরার ওপর নজর রাখছিল। বাসেলের সম্মেলনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা প্রেরণ করা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পুলিশ গোপনে হানা দেয় এবং প্রটোকলগুলো সেখান থেকে উদ্ধার হয়।[২৯৭]

এভাবেই তাদের এই প্রটোকলগুলো বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঘটনা প্রকাশের পর রাশিয়ায় ইহুদিদের ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। দশ হাজারেরও অধিক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। বেঁচে থাকা ইহুদিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সব জায়গা থেকে ইহুদিরা এই চুক্তিগুলোর সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করতে থাকে। কিন্তু তাদের এই ঘোষণার কোনো মূল্য তখন আর বাকি ছিল না। কেননা, প্রটোকলের বক্তব্যের সাথে তৎকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি খাপে খাপে মিলে যাচ্ছিল।

প্রটোকলগুলোর আরবি অনুবাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খলিফা বলেন, 'এরপর সারগেই নেইলস ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজে একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্ট যুক্ত করে এটি প্রকাশ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গোপনে এর সবকটি কপি ফুরিয়ে যায়। কারণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে ইহুদিরা বাজার থেকে এর সমস্ত কপি উঠিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এরপর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। কিন্তু এবারও সমস্ত কপি গায়েব হয়ে যায়। অতঃপর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি আবারও প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে বছর বলশেভিক পার্টি জারদেরকে হটিয়ে রাশিয়ার ক্ষমতায় আরোহণ করে। তারা পুস্তকটিকে বাজেয়াপ্ত করে। মূলত বলশেভিক পার্টির অধিকাংশ সদস্যই ছিল প্রকাশ্য ইহুদি বা ইহুদিদের দোসর। এরপর রাশিয়া থেকে এই প্রটোকলগুলো গায়েব হয়ে যায়।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণ এর একটি কপি লন্ডনের জাদুঘরে এসে পৌঁছায়। এটিকে সিলগালা করে রাখা হয় এবং ওপরে গ্রহণের তারিখ লেখা হয় ১০ আগস্ট ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। দীর্ঘদিন এই কপিটি অপাংক্তেয় অবস্থায় পড়েছিল। এরপর ১৯১৭ খ্রিষ্টাবে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে সে সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা মর্নিং

---

[২৯৭] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ৩৫২।

পোস্ট (The Morning Post) সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভিক্টর মার্সডেনকে রাশিয়ায় প্রেরণ করে। ইতিপূর্বে ভিক্টর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বেশ কিছু রাশিয়ান পুস্তক সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে প্রটোকল পুস্তকটিও ছিল। তিনি কপিটি পড়েন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ১৯১৭ সালে পুস্তকটি অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে ১২ বছর পূর্বে প্রকাশিত এই পুস্তকে প্রকাশক আজকের এই অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ভিক্টর মিউজিয়ামে বসে বসে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তার অনুবাদের কয়েকটি সংস্করণ ছাপা হয়। তন্মধ্যে সর্বশেষ সংস্করণ ছাপা হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। ডগলাস এর ভাষ্য অনুযায়ী, এরপর ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান কোনো প্রকাশকই এটি ছাপাতে সাহস করেনি।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর পরপরই পুস্তকটির অধিকাংশ কপি উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর প্রকাশনা স্থগিত হয়ে যায়।

এই হলো পুস্তকটির ঘটনা। এদিকে প্রকাশক সার্গেই নেইলস এর ভাগ্যে জুটেছিল বন্দিজীবন। তাকে ভ্লাদিমির-এ নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই তিনি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাসিত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ভয়ংকর পুস্তক প্রকাশ করে পৃথিবীকে তিনি চিরঋণী করে গেছেন।

এই প্রটোকলগুলোর সংখ্যা হলো চল্লিশটি। সেখান থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

প্রটোকল এক

‘এ কথা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি যে, সচ্চরিত্রের মানুষের চেয়ে দুশ্চরিত্রের মানুষের সংখ্যা বেশি। একাডেমিক আলোচনার চেয়ে জোরপূর্বক সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত শাসন অধিক ফলদায়ক।’

‘চারিত্রিক সৌকর্য আর রাজনীতি সমানতালে চলতে পারে না। চরিত্রবান শাসকের জন্য দক্ষ রাজনীতিবিদ হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বেশিদিন সিংহাসনে টিকে থাকতে পারবেন না’

‘ক্ষমতা পেতে চাইলে ধোঁকা এবং লৌকিকতার আশ্রয় নিতেই হবে। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মতো মহৎ গুণাবলি রাজনীতির ময়দানে পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।’

‘উদ্দেশ্যের দ্বারা মাধ্যম সমর্থিত হয়। পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে কোনটা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক এবং জরুরি তা-ই বিবেচনা করা উচিত।’

'আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত সহিংসতা আর ধোঁকা।'

'অনিশ্চয়তাই কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ অর্জনের একমাত্র পথ। যদি ঘুষ, ধোঁকা ও খেয়ানত আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মুহূর্তকালের জন্য দ্বিধান্বিত না হওয়া উচিত।'

'ধোঁকা ও সহিংসতাকে শুধু স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হিসেবেই নয় এগুলোকে বিজয়ের জন্য আবশ্যকীয় কর্ম হিসেবে গ্রহণ করা কর্তব্য।'

প্রটোকল দুই

'সাধারণ জনগণ থেকে যাদের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব বিদ্যমান তাদেরকে আমরা প্রশাসনিক নেতৃত্বের জন্য বেছে নেব। এরা শাসনকার্য অভিজ্ঞ হতে পারবে না।'

'আমাদের এই বিবৃতিগুলোকে ফাঁকা বুলি মনে করবেন না। মনে রাখবেন ইতিপূর্বে ডারউইন, কার্ল মার্কস ও নিটসের সফলতার ছক আমরাই সাজিয়েছিলাম।'

'প্রশাসনের আয়ত্তাধীন মিডিয়াগুলো সবচেয়ে বড় শক্তি। এদের মাধ্যমে আমরা মানুষের গতিপথ ঠিক করে দিতে পারব। মিডিয়া জৈবিক প্রয়োজন ও মানুষের অভিযোগ তুলে ধরবে। এতে করে কখনো কখনো হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যে মিডিয়াতে বাক স্বাধীনতার বিষয়টি জাগ্রত হয়েছে। তবে প্রশাসন এই শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে না। ফলে এটা এখন আমাদের হাতে। মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রভাব মজবুত করেছি। কিন্তু নিজেরা পর্দার আড়ালে থেকেছি। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা স্বর্ণকে পবিত্র করেছি। যদিও এতে আমাদেরকে রক্তের নদী উৎসর্গ করতে হয়েছে। স্বজাতির চড়া মূল্য দিতে হলেও আমরা মনে করি আমাদের একটি কুরবানি আল্লাহর কাছে অ-ইহুদিদের হাজার হাজার কুরবানির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

প্রটোকল তিন

'জাতীয় অধিকার গরিবের জন্য উপহাস মাত্র।'

'হিংসা-বিদ্বেষ এর মতো অনুভূতিগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে শাসন করব। এগুলো সংকীর্ণতা ও দরিদ্রতা সৃষ্টি করে। এই অনুভূতিগুলোই দূর থেকে আমাদের পথ পরিষ্কার করার মাধ্যম।'

'আমরা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করব। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্ত মাধ্যমকে আমরা কাজে লাগাব। আমাদের কব্জায় থাকা স্বর্ণও এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার কাজ করবে।'

প্রটোকল চার

'বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত খনিজ সম্পদ অ-ইহুদিদের কাছে থাকতে পারবে না। অংশীদারি চুক্তির মাধ্যমে এগুলো আমাদের ভান্ডারে জমা হতে থাকবে।'

প্রটোকল পাঁচ

'বিগত বিশ বছর যাবৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে অ-ইহুদিদের প্রত্যেকের মাঝে আমরা মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের বীজ পুঁতে দিয়েছি।'

'ব্যবসা ও শিল্পখাতে সিন্ডিকেট তৈরি করতে হবে যাতে মূলধনের জন্য একটি স্বাধীন ক্ষেত্র তৈরি হয়। এজন্য গোটা বিশ্বব্যাপী গোপনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।'

'আমাদের সফল হুকুমতের জন্য জরুরি হলো, দেশে দেশে সামাজিক রীতিনীতি, আবেগ, অভ্যাসগত বিষয় ও ভুলভ্রান্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। এতে করে মানুষ তার উপর চেপে বসা অন্ধকার নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত পাবে না। তখন মানুষের পরস্পর বোঝাপড়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'এই রাজনীতি আমাদেরকে বিভিন্ন সংস্থার মাঝে মতবিরোধ এর বীজ বপন করতে এবং বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করতে সহায়তা করবে।'

প্রটোকল সাত

'এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে আলোচনা-সমঝোতা প্রভৃতির মাধ্যমে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু অফিশিয়াল ভাষায় আমরা এর বিপরীত প্রকাশ করব। যাতে নিজেদেরকে আমরা বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল হিসেবে প্রকাশ করতে পারি।'

প্রটোকল এগার

'অ-ইহুদিরা হলো ছাগলের পাল। আর আমরা হলাম বাঘ। আপনারা কি জানেন খামারে বাঘ ঢুকলে ছাগল কী করে? ছাগল সবকিছু থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে। অ-ইহুদিদেরকে আমরা এই অবস্থায় ঠেলে দেবো। তাদেরকে আমরা এমনভাবে প্রস্তুত করব যাতে তারা মনে করে আমরা শত্রুর হাত থেকে তাদের স্বাধীনতা উদ্ধার করে দিচ্ছি।'

'আল্লাহর নির্বাচিত জাতির বিচ্ছিন্নতা তার পক্ষ থেকে রহমত। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বিশ্বের সামনে আমাদেরকে দুর্বল হিসেবে দেখা যায়। অথচ এটাই আমাদের শক্তি। এর মাধ্যমেই আমরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার দুয়ারে পৌঁছতে পেরেছি।'

প্রটোকল চৌদ্দ

'যখন আমরা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব স্থাপন করব আমরাই হব পৃথিবীর নেতা। তখন অন্য কোনও ধর্মকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেবো না।'

'এজন্যই আমাদের কর্তব্য হলো তাদের বিশ্বাসের ভিতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া।'

'আমাদের দার্শনিকগণ অ-ইহুদি ধর্মের দোষগুলো প্রকাশ করবে।'

প্রটোকল সতেরো

'আমাদের হুকুমত হলো ভারতীয় দেবতা বিষ্ণুর মতো। তার শত হস্তের প্রতিটি রাষ্ট্রের এক একটি অংশ ধারণ করে আছে।'

প্রটোকল উনিশ

'বিপ্লব হলো হাতির বিরুদ্ধে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মত।'

প্রটোকল চব্বিশ

'এখন আমরা পদ্ধতি ঠিক করব যাতে করে রাজা দাউদ এর রাজত্বকে আমরা কেয়ামত পর্যন্ত সুসংহত করতে পারি।'

এই হলো গোপনে প্রস্তুত করা প্রটোকলগুলোর কিছু নমুনা। এই পরিকল্পনার পেছনে উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য জাতি (তালমুদের ভাষায় জানোয়ার)কে অবদমন করে বিশ্বব্যাপী কথিত দাউদের সাম্রাজ্যের নামে ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত একক জায়নবাদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তাদের এই ষড়যন্ত্রের প্রথম মুখোশ উন্মোচনকারী সারগেই নেইলস বলেন, 'ইহুদি জাতির সিস্টেমটাই এমন যে সেখানে অন্য কারও প্রবেশের সুযোগ নেই। এজন্যই তাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয় না। তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা অনাদিকালে নিজেই তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একক জায়নিস্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন। তাদেরকে এটাও জানিয়েছেন যে, তারাই একমাত্র জাতি যাদেরকে মানুষ বলা যায়। অন্যান্য জাতিগুলো ইহুদিদের গোলাম কিংবা পশু হিসেবেই বিবেচিত হবে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বকে পদানত করা এবং জায়নবাদী সাম্রাজ্য স্থাপন করা। ইহুদিদেরকে শেখানো হয় যে, তারা মানবজাতির শীর্ষে। এবং তারা যাতে নিজেদেরকে অন্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুরক্ষিত রাখে। এই চিন্তাচেতনা তাদের মধ্যে গোড়া জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র মনে করে।'

এরপর পুস্তকের কিছু বাক্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এগুলো ইহুদিদের জাতিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই লিখিত। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, অ-ইহুদিদের সাথে তাদের আচরণ হচ্ছে পশুর মতো। ইহুদিদের সেবার জন্যই যেন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে সমস্ত মানুষ, তাদের সহায়-সম্পত্তি এমনকি তাদের পৈত্রিক প্রাণটাও ইহুদিদের মালিকানাধীন। যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় জাতির জন্য এমনটাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের প্রয়োজনমাফিক অন্যদেরকে ব্যবহার করবে। ইহুদিদের শরিয়ত তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, বছরের প্রথম দিনে অ-ইহুদিদের সাথে করা তাদের খারাপ আচরণগুলো মার্জনা করা হয়। একই দিনে পরবর্তী এক বছর তারা যে অপরাধ করবে সেগুলোও মার্জনা করা হয়।"[২৯৮]

ইহুদিদের ধর্মীয় পুস্তক পুরাতন নিয়ম ও তালমুদ এর সাথে প্রটোকলগুলো তুলনা করলে দেখা যায় যে এগুলো তালমুদ এর বক্তব্য নতুন ছাঁচে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে কেননা, তালমুদ এর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে, 'প্রভু দণ্ডায়মান হবেন এবং অ-ইহুদিদেরকে ইসরাইলিদের অধীন করে দেবেন এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি ইহুদিদের কাছে অর্পণ করবেন।'

কেননা, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ইহুদিদের মালিকানাধীন। অ-ইহুদিদের দায়িত্ব হচ্ছে গোলামের মতো কাজ করে যাওয়া। গোলামের উৎপাদন মনিব ইচ্ছেমতো গ্রহণ কিংবা ত্যাগ করতে পারে। এজন্যই তালমুদ এই সম্পদ অর্জনের জন্য তাদেরকে ঘুষ ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। রাব্বি রাশি (Rashi) সুস্পষ্টভাবে এটি বলেছেন এবং ইহুদিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যাতে অ-ইহুদিদের সাথে প্রতারণা করে এবং প্রয়োজনে মিথ্যা শপথও করে। একইভাবে তালমুদ অ-ইহুদি থেকে সুদ গ্রহণের বৈধতাও দিয়েছে।[২৯৯]

---

[২৯৮] *আল-খতরুল ইয়াহুদি, ব্রুতুকুলাতু হুকামাই সহইয়ুন*, পৃষ্ঠা : ২৮৮-২৯০।

[২৯৯] *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়াইদিত তালমুদ*, পৃষ্ঠা : ৫৬।

তালমুদে এও বলা হয়েছে যে ইসরাইলিরা আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্য। ইহুদিরা আল্লাহর সত্তার অংশবিশেষ। কোনো অ-ইহুদি কর্তৃক ইহুদিকে আঘাত করা আল্লাহকে আঘাত করার মতো। মানুষ এবং জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততটুকু যতটুকু পার্থক্য রয়েছে ইহুদি এবং অ-ইহুদির মাঝে। উৎসবের দিনে ইহুদিদের জন্য কুকুরকে খাবার দেওয়া বৈধ কিন্তু অ-ইহুদিকে খাবার দেওয়া যাবে না। মনোনীত জাতি শুধু ইহুদিরাই। অন্যান্য জাতিগুলো চতুষ্পদ জন্তু। ইহুদিরা তাদেরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। তালমুদ ইহুদিদেরকে শত্রুর ওপর দয়াদ্র হওয়ার অনুমতি দেয় না।

এজন্যই ইহুদির জন্য ইয়াহুদের সম্পদ চুরি করা বৈধ। একইভাবে অ-ইহুদি নারীর সাথে জিনা করাও বৈধ তাদের একজন বড় রাব্বি মুসা বিন মাইমুন বলেন,"...কেননা, অ-ইহুদি হলো চতুষ্পদ জন্তু।"

পুরাতন নিয়মও মানবতার জন্য তালমুদের চেয়ে কম ভয়ংকর নয়। যেমন সেখানে বলা হয়েছে—

তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করো।
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গীত গাও;
সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা গাও।
ইস্রায়েল আপন নির্মাণকর্তাতে আনন্দ করুক,
সিয়োন-সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লসিত হউক।
তাহারা নৃত্যযোগে তাঁহার নামের প্রশংসা করুক,
তবল ও বীণাযোগে তাঁহার প্রশংসা গান করুক।
কেননা, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রতি প্রীত,
তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণে ভূষিত করিবেন।
সাধুগণ গৌরবে উল্লসিত হউক;
তাহারা আপন আপন শয্যাতে আনন্দগান করুক।
তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা,
তাহাদের হস্তে দ্বিধার খড়্গ থাকুক;
যেন তাহারা জাতিগণকে প্রতিফল দেয়,
লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়;
যেন তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে,
তাহাদের মান্যগণ্য লোকদিগকে লৌহনিগড়ে বদ্ধ করে;

যেন তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত বিচার নিষ্পন্ন করে;
ইহাই তাঁহার সমস্ত সাধুর মর্যাদা।
তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করো।"[৩০০]

এই কিতাব তো মানবজাতিকে সমূলে হত্যার নির্দেশ দেয়। 'আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে কবলিত করিবে; তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক, এবং তুমি তাহাদের দেবগণের সেবা করিও না, কেননা, তাহা তোমার ফাঁদস্বরূপ।[৩০১]

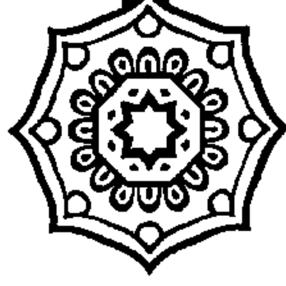
এই হলো তাদের পবিত্র গ্রন্থের আলোকে রচিত প্রটোকলগুলোর বাস্তবতা।



[৩০০] *গীত*, অধ্যায় : ১৪৯।
[৩০১] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস



মসিহ আলাইহিস সালাম

খ্রিষ্টানদের বর্ণনা অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালাম মারইয়ামের গর্ভে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে তিনি যোসেফ নামক এক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন। বিবাহের পূর্ব থেকেই মারইয়ামকে গর্ভবতী দেখতে পেয়ে যোসেফ তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। এমনকি তিনি তাকে ত্যাগ করতেও মনস্থ করলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে বিচ্ছেদ না করার জন্য স্বপ্নে আজ্ঞা দিলেন। একথাও জানিয়ে দিলেন যে মারইয়াম নির্দোষ।

মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে—

"যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মারইয়াম যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা হইতে। আর তাঁহার স্বামী যোসেফ ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখে, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যোসেফ, দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মারইয়ামকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে"[৩০২]

[৩০২] *মথি*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৮-২০।

অতঃপর মারইয়াম গর্ভস্থ সন্তান ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রসব করা পর্যন্ত তারা একসাথেই ছিলেন।

কিন্তু পবিত্র কুরআন ইঙ্গিতে শুধু এতটুকু বলেছে যে, মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার এক অলৌকিক নিদর্শন।

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ، اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قَالَتْ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖۗ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا، قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا، قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا.

এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রুহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বলল, আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তার প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। মারইয়াম বলল, কীরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না। সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৬-২২]

একইভাবে কুরআন তাঁর নাম ঈসা ও মসিহ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর উপনাম হিসেবে বলা হয়েছে 'ইবনে মারইয়াম' অর্থাৎ মারইয়ামের পুত্র। খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের মতো যোসেফের গল্পের অবতারণাও করেনি। এমনিভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের

বংশলতিকা বর্ণনা করেনি। তবে তাঁর বংশপরম্পরা নিয়ে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে অনেক মতপার্থক্য পাওয়া যায়।

মসিহ আলাইহিস সালামের বংশ পরম্পরা

মথি এবং লুক মসিহ আলাইহিস সালামের বংশপরম্পরা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বংশলতিকা পড়ে দেখলে অবাক হতে হয়। কেননা, এগুলো স্ববিরোধী বর্ণনায় ঠাসা। তারা কি এগুলো নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে লিখেছেন? নাকি কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে কপি করেছেন? ইজতিহাদ (কল্পিত গবেষণা) করলে তো মারাত্মক ভুল করেছেন, কারণ, বংশপরম্পরা বর্ণনায় ইজতিহাদ চলে না। আর যদি কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে সেটি কী?

কার্ডিনাল দানিলো বলেন, "মসিহ এর বংশলতিকাটি তার পারিবারিক নথি থেকে নেওয়া হয়েছে।"

ড. মরিস বুকাইলি এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "ব্যাখ্যাকার এ কথা নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি এই কল্পিত নথিপত্র সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ইয়োসিভিয়াস (Eusivius) রচিত *কিতাবু তারিখিল কানিসাহ* থেকে। অথচ ইয়োসিভিয়াস এমন একজন লেখক যার গ্রহণযোগ্যতা চরম প্রশ্নবিদ্ধ। এটি কি দুর্বোধ্য ও হাস্যকর নয় যে—মসিহ আলাইহিস সালামের দু-ধরনের পারিবারিক বংশলতিকা আছে, আবার উভয় বর্ণনায় পূর্বপুরুষের নাম ও সংখ্যায়ও রয়েছে প্রচণ্ড বৈপিরীত্য?"[৩০৩]

এ পর্যায়ে আমরা মথি ও লুক কর্তৃক বর্ণিত বংশতালিকা এখানে উল্লেখ করব। লুক বংশতালিকার বর্ণনা শুরু করেছেন আদম আলাইহিস সালাম থেকে। নিম্নে সেটা দেওয়া হলো।

ক্র.	নাম	ক্র.	নাম	ক্র.	নাম
১	আদম	৮	মথুশেলহ	১৫	এবর/আবের
২	শেথ/শিছ	৯	লেমক	১৬	পেলগ/ফালেহ
৩	ইনোশ	১০	নুহ	১৭	রিয়ু
৪	কৈনন	১১	শেম	১৮	সরুগ
৫	মহললেল	১২	অর্ফকশদ	১৯	নাহোর

[৩০৩] *দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসাহ*, পৃ. ১১৫।

৬	যেরদ	১৩	কৈনন	২০	তেরহ
৭	হনোক	১৪	শেলহ	২১	ইউসুফ/যোসেফ

এরপর ইবরাহিম থেকে যোসেফ পর্যন্ত বংশলতিকা উভয়ে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উভয়ের বর্ণনা চার্ট আকারে পাশাপাশি দেওয়া হলো। একইভাবে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত আংশিক (দাউদ থেকে) বংশলতিকাও উল্লেখ করা হলো। এতে করে পাঠক এই বর্ণনাগুলোর বিরোধ সহজেই মিলিয়ে দেখতে পারবেন।

ক্র.	মথি	ক্র.	লুক	ক্র.	পুরাতন নিয়ম
০১	ইবরাহিম	০১	ইবরাহিম		
০২	ইসহাক	০২	ইসহাক		
০৩	ইয়াকুব/যাকোব	০৩	ইয়াকুব/যাকোব		
০৪	যিহুদা	০৪	যিহুদা		
০৫	পেরস	০৫	পেরস		
০৬	হিষ্রোণ	০৬	হিষ্রোণ		
০৭	অরাম	০৭	অরাম		
০৮	অম্মীনাদব	০৮	অম্মীনাদব		
০৯	নহশোন	০৯	নহশোন		
১০	সলমোন	১০	সলমোন		
১১	বোয়স	১১	বোয়স		
১২	ওবেদ	১২	ওবেদ		
১৩	যিশয়	১৩	যিশয়		
১৪	রাজা দাউদ	১৪	রাজা দাউদ		রাজা দাউদ
১৫	সুলাইমান	১৫	নাথন		সুলাইমান
১৬	রহবিয়াম	১৬	মত্তথ		রহবিয়াম

ক্র.	মথি	ক্র.	লুক	ক্র.	পুরাতন নিয়ম
১৭	অবিয়	১৭	মিন্না		অবিয়
১৮	আসা	১৮	মিলেযা		আসা
১৯	যিহোশাফট	১৯	ইলিয়াকিম		যিহোশাফট
২০	ইলিয়াকিম	২০	যোনাম		যোরাম
২১	উষিয়	২১	ইউসুফ/যোসেফ		অহসিয়
২২	যোথম	২২	যিহুদা		যোয়াশ
২৩	আহস	২৩	শিমিয়ন		অমৎসিয়
২৪	হিস্ক্রিয়	২৪	লেবি		অসরিয়
২৫	মনঃশি	২৫	মত্তথ		যোথম
২৬	আমোন	২৬	যোরিম		আহস
২৭	যোশিয়	২৭	ইলিয়াশর		হিস্ক্রিয়
২৮	যিকনিয়	২৮	যিশয়		মনঃশি
২৯	শল্টিয়েল	২৯	এর/এরব		আমোন
৩০	সরুব্বাবিল	৩০	ইলমাদর		যোশিয়
৩১	অবিহুদ	৩১	কোষম		যিহোয়াকিম
৩২	ইলিয়াকিম	৩২	অদি		যিকনিয়
৩৩ .	আসোব	৩৩	মলকি		শল্টিয়েল ও পদায় (শল্টিয়েল নিঃসন্তান ছিলেন।)
৩৪	সাদোক	৩৪	নেরি		
৩৫	আখিম	৩৫	শল্টিয়েল		সরুব্বাবিল
৩৬	ইলিহুদ	৩৬	সরুব্বাবিল		হনানিয়

ক্র.	মথি	ক্র.	লুক	ক্র.	পুরাতন নিয়ম
৩৭	ইলিয়াসর	৩৭	রিশা		শকনিয়
৩৮	মত্তন	৩৮	যোহন		
৩৯	ইয়াকুব/যাকোব	৩৯	যিহূদা		
৪০	ইউসুফ/যোসেফ	৪০	ইউসুফ/যোসেফ		
৪১	যিশুখ্রিষ্ট	৪১	শিমিয়		
		৪২	মত্তথিয়		
		৪৩	মাট		
		৪৪	নগি		
		৪৫	ইষলি		
		৪৬	নহুম		
		৪৭	আমোষ		
		৪৮	মত্তথিয়		
		৪৯	ইউসুফ/যোসেফ		
		৫০	যান্না		
		৫১	মল্কি		
		৫২	লেবি		
		৫৩	মত্তথ		
		৫৪	এলি		
		৫৫	ইউসুফ/যোসেফ		
		৫৬	যিশুখ্রিষ্ট		

আপত্তি এক

লুকের বর্ণনায় উল্লিখিত ১ম তালিকার ১৩ নম্বর স্থানে অর্ফকশদ এর পর কৈনন এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনা পুরাতন নিয়মের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা সেখানে কৈননকে অর্ফকশদ এর পুত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

আপত্তি দুই

মথির বর্ণনামতে দাউদ থেকে ব্যাবিলনের বন্দিদশা পর্যন্ত চৌদ্দ প্রজন্ম। আর ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে নিয়ে মসিহ্ পর্যন্ত চৌদ্দ প্রজন্ম। সুতরাং দাউদ থেকে মসিহ্ পর্যন্ত মোট আটাশ প্রজন্ম হয়। অপরদিকে লুকের বর্ণনায় দাউদ থেকে মসিহ পর্যন্ত তেতাল্লিশ প্রজন্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

আপত্তি তিন

মথির বর্ণনামতে যোশিয়ের পুত্র যিকনিয় এবং তার ভাইয়ের জন্ম হয়েছিল ব্যাবিলনের বন্দিদশার সময়ে। আর যিকনিয়ের পুত্র শল্টিয়েলের জন্ম হয় বন্দিদশার পরে।[৩০৪] মথির এই বিবরণ পুরাতন নিয়মের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পুরাতন নিয়মের *বংশাবলি ১ম* পুস্তকে বলা হয়েছে, "যোশিয়ের প্রথম পুত্র হলেন যোহানন। দ্বিতীয় পুত্র হলেন যিহোয়াকিম। তৃতীয় পুত্র সদুকিয়। চতুর্থ পুত্র শেলোম। আর যিকনিয় হলেন যিহোয়াকিম এর পুত্র।"[৩০৫] অর্থাৎ যিকনিয় হলেন যোশিয়ের নাতি।

আপত্তি চার

মথির বর্ণনামতে যোশিয় বন্দি অবস্থায় ব্যাবিলনে উপনীত হন। সেখানে তার পুত্র যিকনিয় ও তার ভাইয়েরা জন্মগ্রহণ করেন।

অপরদিকে পুরাতন নিয়মের বর্ণনামতে তিনি আট বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একত্রিশ বছর শাসন করেন। এরপর মিশর সম্রাটের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মিগলো নামক স্থানে তিনি আহত হন। অতঃপর জেরুজালেমে তাকে দাফন করা হয়।[৩০৬]

---

[৩০৪] *মথি*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১১।

[৩০৫] *বংশাবলি ১ম*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১৫।

[৩০৬] *বংশাবলি ২য়*, অধ্যায় : ৩৪, অনুচ্ছেদ : ১-৩৫।

আপত্তি পাঁচ

মথির বক্তব্য অনুযায়ী যিকনিয় হলেন ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বপুরুষ। অথচ পুরাতন নিয়মে দেখা যাচ্ছে, নবি যিরমিয় তার বিরুদ্ধে নিঃসন্তান থাকার জন্য বদদুআ করেছেন যাতে তিনি এবং তার বংশের কেউ দাউদের সিংহাসনে বসতে না পারে।[৩০৭]

আপত্তি ছয়

মথির সুসমাচার অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বপুরুষ সরুব্বাবিল হলেন যিকনিয়ের নাতি। অথচ লুকের সুসমাচারে তাকে নেরির নাতি বলা হয়েছে।

মথির ভাষ্য অনুযায়ী সরুব্বাবিলের পুত্র হলেন অবিহূদ। আর লুকের ভাষ্য অনুযায়ী সরুব্বাবিলের পুত্র হলেন রিশা। এদিকে *বংশাবলি ১ম* গ্রন্থ বলছে, তার পুত্র হলেন হনানিয়।

লুক এবং মথির ভাষ্য অনুযায়ী সরুব্বাবিল শল্টিয়েলের পুত্র। কিন্তু পুরাতন নিয়ম বলছে, শল্টিয়েলের কোনো পুত্রই ছিল না। তিনি শল্টিয়েলের ভাই পদায়ের পুত্র।

আপত্তি সাত

মথির সুসমাচার অনুযায়ী যোসেফ হলেন যাকোবের পুত্র। পক্ষান্তরে লুকের বর্ণনামতে যোসেফ হলেন এলির পুত্র।

আপত্তি আট

মথি মনে করেন, ঈসা আলাইহিস সালাম সুলাইমান বিন দাউদের বংশধর। অপরদিকে লুক মনে করেন, তিনি নাথান বিন দাউদের বংশধর।

আপত্তি নয়

মথি ঈসা আলাইহিস সালামকে দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধর হিসেবে অভিহিত করেছেন। বংশপরম্পরায় যারা সবাই ছিলেন প্রসিদ্ধ সম্রাট। পক্ষান্তরে লুক তাকে সম্রাটদের অধস্তন হিসেবে দেখাননি।

---

[৩০৭] *যিরমিয়*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ৩০।

আপত্তি দশ

পাঠক উপর্যুক্ত চার্টের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, বংশলতিকার বর্ণনায় পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে কী পরিমাণ বিরোধ বিদ্যমান। অথচ পুরাতন নিয়ম হলো নতুন নিয়মের ভিত্তি। এদিকে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস নতুন নিয়ম ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে অহি হিসেবে এসেছে। এই অহি জিবরাইল বহন করে এনেছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, অহিতে কী এমন জঘন্য ভুল থাকতে পারে? পূর্বোক্ত আপত্তিগুলোই তাদের দাবির জবাবে যথেষ্ট।

আপত্তি এগারো

একথা সর্বজনবিদিত যে, বংশলতিকা বর্ণনা করা হয় পিতৃকুলের দিক থেকে। নতুন নিয়মে মসিহ আলাইহিস সালামের বংশলতিকা যোসেফের দিকে সম্বন্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ খ্রিষ্টানরাও বলে থাকে, যোসেফ মসিহ আলাইহিস সালামের পিতা নন। সুতরাং পিতা নন এমন একজন থেকে বংশ বর্ণনা করা আদৌ কোনো যৌক্তিক বক্তব্য পারে না। মসিহ আলাইহিস সালামের বংশলতিকা বর্ণনা করতে হলে মাতা মারইয়ামের দিকে সম্বন্ধ করেই বর্ণনা করা উচিত।

এদিক থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনের বর্ণনাই আপত্তিহীন ও বাস্তবসম্মত। কুরআন তাকে ইবনে মারইয়াম তথা মারইয়াম-তনয় বলে অভিহিত করেছে। পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের দিকটাই উল্লেখ করেছে। পিতৃকুলের বর্ণনা দেওয়ার মতো অযৌক্তিক কোনো বিষয়ের অবতারণা কুরআনে করা হয়নি। অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের কথা বলা হয়েছে সেখানে মসিহ আলাইহিস সালামকে 'মায়ের প্রতি সদাচারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.

> এবং (তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন) জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি অহংকারী ও রূঢ় বানাননি। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩২]

নতুন নিয়মে বর্ণিত মসিহ আলাইহিস সালামের বংশলতিকা পর্যালোচনার পর আমরা আবারও মূল আলোচনা তথা মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনীতে ফিরে যাচ্ছি।

মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনী গবেষণা করতে গেলে খুবই জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সময়ের নির্ভরযোগ্য কোনো ঐতিহাসিক উৎস পাওয়া যায় না। আমাদের সামনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনাসমৃদ্ধ সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থটি বিদ্যমান সেটি হলো *History of the Jewish war* । গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন

কট্টরপন্থী গোঁড়া ইহুদি জোসেফাইন।[৩০৮] তিনি মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই ইহুদি মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তার বইয়ে কোনো কিছুই উল্লেখ করেননি। গোঁড়ামিবশত এমনভাবে এড়িয়ে গেছেন যেন মসিহের ঘটনার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অথচ সে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মসিহকে কেন্দ্র করে। ইউরোপিয়ান পণ্ডিতগণ তার এই গোঁড়ামি ও খিয়ানতের কারণে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ, এটি মসিহ আলাইহিস সালামের ইতিহাসকে ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনীকার ফেরির (Farer) এ কারণে জোসেফাইনের তীব্র সমালোচনা করেছেন।[৩০৯]

মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনী জানার জন্য আমাদের সামনে একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ হলো ইনজিল বা সুসমাচারসমূহ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, এই সুসমাচারগুলোর বর্ণনা পরস্পর সাংঘর্ষিক ও সংঘাতময়। বিশেষ করে মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনায় একটি সুসমাচারের বর্ণনার সাথে অন্য সুসমাচারের বর্ণনার মিল পাওয়া যায় না। এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক সুসমাচার রচনা করে হাওয়ারিদের[৩১০] নামে চালিয়ে দেওয়া। এই হীন কর্মটি পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত চলমান ছিল। এজন্যই গবেষকগণ সুসমাচারে বর্ণিত ইতিহাস ও ঘটনাবলিতে আস্থা রাখতে পারেন না।

উদাহরণস্বরূপ, সুসমাচারগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালাম পিতাবিহীন কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর তাকে শূলিতে চড়ানো হয়েছে। কিছুদিন পর তিনি কবর থেকে উঠে আসেন। এই হলো মূল ঘটনা। কিন্তু সুসমাচারগুলোতে এই ঘটনার বর্ণনা এতটাই সাংঘর্ষিক যে, কোনো মতেই তাতে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। মথি এবং লুক প্রত্যেকে নিজের বর্ণনায় মসিহ আলাইহিস সালামকে পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন বলার পরও তার পিতৃকুলের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন। যিনি পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন তার পিতৃকুলের বর্ণনা দেওয়া নিতান্তই হাস্যকর নয়

---

[৩০৮] তাকে যোসেফ বিন কোরিয়নও বলা হয়। ফরিশি সম্প্রদায়ের অনুসারী এই ব্যক্তিটি ৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বাইতুল মুকাদ্দাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তার গ্রন্থটি *তারিখু জোসেফাইন* নামে বৈরুত থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

[৩০৯] জোসেফাইন থেকে মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে শুধু এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, "সে সময়ে যিশু নামে এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিল। সে অনেক অবাক করা কাজ করত। মানুষকে শিক্ষা দিত। ইহুদি ও গ্রিকদের অনেকেই তার অনুসারী হয়েছিল। ইনিই হলেন মসিহ।"

খ্রিষ্টানগণ এটাকে জোসেফাইনের বক্তব্য মানতে নারাজ। তাদের দাবি হচ্ছে এটি জোসেফাইনের নামে চালিয়ে দেওয়া বক্তব্য। বাস্তবে জোসেফাইন এমনটি কোথাও লিখেননি। উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৫।

[৩১০] ঈসা আলাইহিস সালাম তার শিষ্যদের থেকে বারো জন শিষ্যকে বেছে নেন। বিশিষ্ট এই বারো জন শিষ্যকে হাওয়ারি বলা হয়। কুরআনেও তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কি? এতৎসত্ত্বেও মসিহ আলাইহিস সালামের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে এই সুসমাচারগুলো থেকেই আমাদেরকে উদ্ধৃতি দিতে হয়।

কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, "মসিহ এর জন্ম, তার ব্যাপ্তাইজম[৩১১] ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া সহজ নয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে অনুমাননির্ভর বক্তব্য দিয়ে থাকেন।"

এরপর তিনি বলেন, "মসিহ এর জন্ম ৫ম খ্রিষ্টপূর্বের শেষে কিংবা ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বের শুরুতে হয়েছিল। আর জন্মতারিখ হিসেবে ২৫শে ডিসেম্বর ধারণাটির সূচনা হয় খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীতে। তাই বলা যায়, সম্ভবত তিনি ৫ম খ্রিষ্টপূর্বের ২৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩১২]

মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করলে এই মতটিও ভুল হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মারইয়ামকে তার প্রসবের পর সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

> আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৫]

উক্ত আয়াতে খাওয়ার উপযুক্ত পাকা খেজুরের কথা বলা হয়েছে। গবেষকগণ বলেন, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে খেজুর পাকে। আর ডিসেম্বর আসতে আসতে সেগুলো শুকিয়ে খোরমায় পরিণত হয়। মারইয়ামের পাকা খেজুর খাওয়া থেকে বোঝা যায়, মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম জুলাই-আগস্ট মাসের কোনো একসময় হয়েছিল।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার লেখক লুকের সুসমাচারের একটি অনুচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে ডিসেম্বরে মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম হওয়ার বিষয়ে আপত্তি করেছেন। অনুচ্ছেদটি হলো,

"ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল।"[৩১৩]

---

[৩১১] খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে বিশেষ পদ্ধতিতে গোসল করানোর মাধ্যমে পবিত্র করার প্রক্রিয়াকে ব্যাপ্তাইজম বলা হয়। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মোতাবেক যিশুর আবির্ভাবের পূর্বে যোহন ব্যাপ্তাইজক (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) মানুষকে ব্যাপ্তাইজম করাতেন। জর্ডান নদীতে তিনি যিশুকেও ব্যাপ্তাইজম করিয়েছিলেন।

[৩১২] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ৮৬৩-৮৬৪।

[৩১৩] *লুক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৮।

লেখক বলেন, "এটা ডিসেম্বরে হওয়া অসম্ভব। কেননা, এ সময় ফিলিস্তিনে প্রচুর বৃষ্টি হয়।" খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ হাবিব সাইদ বলেন, "আবহাওয়া বিশারদগণ হিব্রোনের আবহাওয়া নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। ইহুদি বসতির দক্ষিণে অবস্থিত এখানকার আবহাওয়া এবং কাছাকাছি অবস্থিত বেথেলহেমের আবহাওয়া একই রকম থাকে।

তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রতিবছর ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হয়। এমনকি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি থাকে। প্রতি বছর যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবের সময়ে এখানে প্রচুর বরফ জমে। বৃষ্টিও হয়। এ সময়ে ছাগলপাল চারণভূমিতে থাকে না। ইহুদিদের তালমুদ গ্রন্থে এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। ছাগলের পালগুলো মার্চ থেকে নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত প্রায় আট মাস চারণভূমিতে বিচরণ করে। এরপর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো ফিলিস্তিন জুড়েই ছাগল এবং রাখাল খামারেই অবস্থান করে।[৩১৪]

তিনি বলেন, "খ্রিষ্টবিশ্ব প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন পালন করে। অথচ ইতিহাসবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সকলেই একমত যে ১ম খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিষ্টের জন্মের বিষয়টি সঠিক নয়। বছরও সঠিক নয়। দিনও সঠিক নয়। এ বিভ্রান্তির পুরো দায়ভার পাদরি ডায়নোসাস এর ওপর বর্তায়। এ ব্যক্তিটিই হিসেবে তালগোল পাকিয়ে এই বিদঘুটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। রোমে বসবাসকারী এই পাদরিকে ৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে সময়কে পূর্বের সাথে মিলিয়ে যুগনির্ণয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ১ম খ্রিষ্টপূর্ব ও ১ম খ্রিষ্টাব্দ এর মাঝের সফর মাসকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে ফেলেছিলেন। একইভাবে সম্রাট অগাস্টিন এর চার বছরের রাজত্বকালও তিনি হিসেবের মধ্যে আনেননি। এই চার বছর অগাস্টিন তার পূর্বনাম ইকনাফিউস নামে রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন।[৩১৫]

মথির সুসমাচার নিয়ে গবেষণার পর গবেষকগণ মত দিয়েছেন যে, মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল সম্রাট হেরোডের সময়ে। সুতরাং এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম থেকে ৬ষ্ঠ সনের মধ্যেই হওয়াটা যুক্তিযুক্ত। এই মতটি ডায়নোসিস কর্তৃক বর্ণিত ১ম খ্রিষ্টপূর্বে মসিহের জন্মসংক্রান্ত বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। এদিকে লুকের বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিশ বছর বয়সে যিশুর ব্যাপ্টাইজম হয়েছিল। তখন সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসনের পঞ্চবিংশ বছর চলছিল। অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দ হিসেবে তখন ২৮ কিংবা ২৯ সাল চলছিল। এ থেকে বোঝা যায় মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২য় কিংবা ১ম সনে।

---

[৩১৪] *লামহাতুন ফিত তারিখ ফিল ইনজিল*, পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৪।

[৩১৫] *লামহাতুন ফিত তারিখ ফিল ইনজিল*, পৃষ্ঠা : ৩২।

লুক আরও বলেন, "সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়।"[৩১৬] একথা সকলেই অবগত যে কুরিনিয় সিরিয়ার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন ৬-১২ খ্রিষ্টাব্দে।

যোসেফাইন উল্লেখ করেন যে, ইহুদিদের দেশে এই আদমশুমারির কাজ সংঘটিত হয়েছিল ৬-৭ খ্রিষ্টাব্দে। লুক কর্তৃক বর্ণিত আদমশুমারি থেকে যদি এটিই উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলতে হয়, মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম ৬ খ্রিষ্টপূর্ব কিংবা তারও পরে হয়েছিল।[৩১৭]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত জানা ও হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম আলিম এবং মুহাদ্দিসগণ যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন সেটাকে যদি আমরা এখানেও প্রয়োগ করি, তাহলে দেখা যাবে, সুসমাচারে বর্ণিত অনেক বড় বড় ব্যক্তির আলোচনাও গ্রহণযোগ্যতার বাটখারায় টিকছে না। তাদের আলোচনাগুলো বাস্তবতাবিবর্জিত রূপকথা বলেই মনে হবে।

সুস্পষ্ট বিরোধ ও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকা সত্ত্বেও আমরা এই বিকৃত সুসমাচারগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হই। বিশেষ করে মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম, তার প্রাথমিক জীবন এবং পৃথিবীতে তার অবস্থানের শেষ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করতে গেলে এখান থেকেই আমাদের উদ্ধৃতি দিতে হয়।

মারইয়াম নাযারেথ[৩১৮] গ্রামে যোসেফ নামক এক ব্যক্তির সাথে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন এই যোসেফের বাগদত্তা।[৩১৯] এরপর ফিরিশতা এসে তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, অচিরেই তিনি যোসেফের সাথে মিলন ব্যতিরেকেই মসিহকে জন্ম দেবেন। এ কথা শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এবং বললেন, "ইহা কিরুপে হইবে? আমি তো কোনো পুরুষকে জানি না?"[৩২০]

এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে—

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا .

[৩১৬] *লুক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১-২।

[৩১৭] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১২-২১৩।

[৩১৮] ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলে উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত একটি শহর। তাবারিয়া হ্রদ থেকে চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে এবং জেরুজালেম থেকে ৮৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। -মুজামুল বুলদান, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫১।।

[৩১৯] *লুক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২৬-২৭।

[৩২০] *লুক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৩৪।

মারইয়াম বলল, কীরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না ? [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২০]

এরপর লুক বলেন, সেই সময় আগস্ত কৈসরের[৩২১] এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়। সকলে নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্ত আপন আপন নগরে গমন করিল। আর যোসেফও গালীলের[৩২২] নাসরৎ নগর হইতে যিহূদিয়ায় বৈৎলেহম[৩২৩] নামক দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠীজাত ছিলেন; তিনি আপনার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী[৩২৪] মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন; তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল। আর তিনি আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না।[৩২৫]

মসিহের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে মথি বলেন, "হেরোদ[৩২৬] রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হইলে পর, দেখ, পূর্বদেশ হইতে কয়েক জন পণ্ডিত

---

[৩২১] আগস্ত কৈসর/অগাস্টাস কায়সার = এটি একটি ল্যাটিন উপাধি। আর কায়সার হলো রোমান রাজবংশের উপাধি। তিনি ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট (৩১-১৪ খ্রিষ্টপূর্ব)। ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।= =হেরোডাস ছিলেন তার পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে নিযুক্ত গভর্নর। স্থানীয় খাজনা সংগ্রহ করে তিনি রোমে পাঠাতেন। তার রাজত্বের সময়কালেই মসিহ আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।

[৩২২] গালিল = এটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বৃত্ত। ভূমধ্য সাগর ও তাবারিয়া হ্রদের মধ্যবর্তী এলাকায় এই প্রাচীন মহরটি অবস্থিত। এটি দৈর্ঘ্যে উনিশ মাইল আর প্রস্থে পাঁচ মাইল। কানানিদের গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটি পরবর্তীকালে ইহুদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[৩২৩] বেথেলহেম = এটিও হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হলো রুটির ঘর। এটি জেরুজালেম থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানেই আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। মারইয়াম ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধর। এখানে একটি প্রসিদ্ধ গুহা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ঈসা আলাইহিস সালাম এ স্থানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

[৩২৪] কোনো ধরনের রাখ-ঢাক ছাড়াই লুক কীভাবে যোসেফকে মারইয়ামের স্বামী হিসেবে উল্লেখ করলেন! অথচ তখনো তাদের বিয়ে হয়নি। শুধু প্রস্তাবের আদান-প্রদান হয়েছে।

[৩২৫] *লুক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১-৭।

[৩২৬] হেরোদ/হেরোড = ইনি হেরোড দ্য গ্রেট নামে পরিচিত। ৩৯ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে তিনি রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে ইহুদিদের এলাকায় গভর্নরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের পূজার জন্য তিনি জেরুজালেমে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। এমনকি হাইকলে সুলাইমানির ফটকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক ঈগল পাখির একটি বিশাল স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করেন। এতে করে তিনি ইহুদিদের শত্রুতে পরিণত হন। কিন্তু তার শৌর্য-বীর্য ও কঠোরতায় তারা ভীত ছিল। ফলে ব্যর্থ কিছু ষড়যন্ত্র ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। হেরোডের সময়েই মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম হয়।

যিরূশালেমে আসিয়া কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হইলেন, ও তাঁহার সহিত সমুদয় যিরূশালেমও উদ্বিগ্ন হইল। আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকসাধারণের অধ্যাপকগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে, কেননা, ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোনো মতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন।" তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া, ঐ তারা কোন্ সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর; দেখা পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারি। রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, আর দেখ, পূর্বদেশে তাঁহারা যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাহার উপরে আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল। তারাটি দেখিতে পাইয়া তাঁহারা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটিকে তাঁহার মাতা মরিয়মের সহিত দেখিতে পাইলেন, ও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস উপহার দিলেন। পরে তাঁহারা যেন হেরোদের নিকটে ফিরিয়া না যান, স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; আর আমি যত দিন তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা, হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। তখন যোসেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, 'আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম'। পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই পণ্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়াছিলেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক

মৃত্যুর পূর্বে হেরোড জেরুজালেমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে করে পুরো শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে হেরোডের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তার মৃত্যুর পর খুশি হওয়ার মতো কেউ জীবিত না থাকে। *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ১০০৯, *তারিখুল আকবাত ওয়াল মসিহিয়্যাহ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৯১।

বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সেই সকলকে বধ করাইলেন।[৩২৭]

অপরদিকে এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে যোসেফ ও মারইয়াম মসিহ আলাইহিস সালামকে নিয়ে মিশরে চলে গিয়েছিলেন। হেরোডের মৃত্যুর পর তারা আবার স্বদেশে ফিরে আসেন।

মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনায় আমরা আবার লুকের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, "পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের শুচি হইবার কাল সম্পূর্ণ হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেলেন, যেন তাঁহাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লেখা আছে, 'গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে'।"[৩২৮]

আরও বলেন, আর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত কার্য সাধন করিবার পর তাঁহারা গালীলে, তাঁহাদের নিজ নগর নাসরতে, ফিরিয়া গেলেন। পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল। তাঁহার পিতামাতা প্রতিবৎসর নিস্তার-পর্বের সময়ে যিরূশালেমে যাইতেন।[৩২৯]

লুক ও মথির সুসমাচারদ্বয়ের এই দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ বিদ্যমান। পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। তারপরও আমরা কয়েকটি বিরোধ নিম্নে তুরে ধরছি।

এক

লুকের বর্ণনা অনুযায়ী অগাস্টাস এর যুগের আদমশুমারির পর মসিহ আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। অথচ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, এই আদমশুমারি মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মের ষষ্ঠ বছরে হয়েছিল। অপরদিকে মথি বলেছেন, মসিহ আলাইহিস সালাম হেরোডের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ ঐতিহাসিকভাবে এটাও প্রমাণিত যে, মসিহ আলাইহিস সালামের জন্মের চার বছর পূর্বে হেরোড মারা যায়।[৩৩০]

---

[৩২৭] *মথি*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১-১৬।

[৩২৮] *লুক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২২-২৩।

[৩২৯] *লুক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৩৯-৪১।

[৩৩০] ক্রুস, *তুলুউল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৩০।

দুই

মথির দাবি অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালামের পিতা-মাতা তাকে নিয়ে হেরোডের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচতে মিশর চলে গিয়েছিলেন। অপরদিকে লুকের বর্ণনা অনুযায়ী তারা জেরুজালেম গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নাযারেথে উপনীত হয়েছেন। আর এখানেই মসিহ আলাইহিস সালাম বেড়ে ওঠেন।

তিন

মথির সুসমাচারে মসিহ আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের রাজা বলা হয়েছে। অথচ ইতিহাস এ বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। কেননা, মসিহ আলাইহিস সালাম এক দিনের জন্যও ইহুদিদের রাজা ছিলেন না। বরং ইহুদিরাই শাসকগোষ্ঠীর কাছে গিয়ে মসিহ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করায়।

চার

মথির সুসমাচারে মসিহ আলাইহিস সালামকে একজন পরিচালক বলা হয়েছে, যিনি ইহুদি জাতির দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করতেন। অথচ ঐতিহাসিকভাবে এই দাবি ভিত্তিহীন। পরিচালকের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া তো দূরের কথা ইহুদিরা তো তার দাওয়াতে সাড়াই দেয়নি।

পাঁচ

বেথেলহেমকে লক্ষ্য করে মথি বলেন, "তুমি যিহুদার নেতৃবর্গের কাছে ছোট নও।" অপরদিকে পুরাতন নিয়মে ঠিক এর উল্টোটা বলা হয়েছে। *মিখার* পুস্তকে বলা হয়েছে, 'আর তুমি হে বেথেলহেম-ইফরাথা, তুমি যিহুদার সহস্রগণের মাঝে ক্ষুদ্র বলে অগণিতা।'[৩৩১]

আমি জানি না, খ্রিষ্টানরা তাদের সুসমাচারগুলোর স্ববিরোধী বক্তব্যগুলোর সমাধান কীভাবে দেয়? অথচ এই সুসমাচারগুলোই হলো তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি।

একইভাবে হেরোডের কাছে আগমনকারী অগ্নিপূজকদের সম্পর্কেও সঠিক কোনো তথ্য তারা দিতে পারে না। কোত্থেকে এল এরা? আবার কোথায়ই-বা হারিয়ে গেল? এর কোনো সদুত্তর খ্রিষ্টানদের কাছে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সেসময় রোমানদের সাথে অগ্নিপূজকদের সাম্রাজ্য পারস্যের সাথে যুদ্ধ বিরাজমান ছিল। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে এই অগ্নিপূজকরা তাদের ঘোরতর শত্রু রোমান গভর্নর হেরোডের

---

[৩৩১] *মিখা,* অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২।

দরবারে প্রবেশ করতে পারল! বিষয়টির কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে খ্রিষ্টান গবেষকগণ অথই পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

মসিহ আলাইহিস সালামের বারো বছর বয়স থেকে নিয়ে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের বিশদ বিবরণ লুক কিংবা মথি কেউই দেননি। এ সময়কালে মসিহ আলাইহিস সালামের হাইকলে প্রবেশ এবং সেখানকার ঘটনাবলির বিক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়েছেন। অথচ দুজনই মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনী গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করছিলেন। মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনের এ অধ্যায়টি আজও ইতিহাসের অজানা অংশ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।[৩৩২]

এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে হিকমাহ[৩৩৩] ও নবুওয়ত দান করেন। বিভিন্ন মুজিযা ও কারামত দিয়ে শক্তিশালী করেন। সুসমাচারগুলোর লেখকগণ এ বিষয়টির বর্ণনায় অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনের শেষ চল্লিশ দিনের ঘটনাবলি তারা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।

কুরআনুল কারিম মসিহ আলাইহিস সালামের ছয়টি মুজেযার কথা আলোচনা করেছে। সেগুলো হলো—

মুজিযা এক

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ .

আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

মুজিযা দুই

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ

আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

---

[৩৩২] বিষয়টি খ্রিষ্টানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও স্বীকার করে থাকেন। *তুলুউল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২৯।

[৩৩৩] *লুক*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ২৩। শাহরাস্তানি বলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলার প্রত্যাদেশ করেছেন। আর ত্রিশ বছর বয়সে তাবলিগের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সাকুল্যে তিন বছর তিন মাস তিন দিন তার দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২০।

মুজিযা তিন

وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ .

আর আমি জীবিত করে দিই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

মুজিযা চার

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡۚ .

আর আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

মুজিযা পাঁচ

قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ
لَنَا عِيدٗا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٗ مِّنكَۖ .

ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৪]

মুজিযা ছয়

تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗاۖ .

তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১০]

নতুন নিয়মে প্রচুর পরিমাণে মুজিযার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোকে মুজিযার বর্ণনায় ভরপুর পুস্তক বলে অভিহিত করি তাহলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। বর্ণিত এই মুজিযাগুলোর বাস্তবতা ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

এসব অলৌকিক ঘটনা ও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে মসিহ আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনের ইহুদিদের মধ্যে তার দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। গালিলে গিয়ে তিনি সকলের সামনে তাওহিদের ঘোষণা দেন।

"পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন।"[৩৩৪]

এরপর তিনি কফর নহম[৩৩৫]গমন করেন। সেখানে মসিহ আলাইহিস সালাম তার দাওয়াতি কার্যক্রমের কেন্দ্র স্থাপন করেন। দুই বছর যাবৎ তিনি এখান থেকেই দাওয়াতের কাজে বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন এবং কাজ শেষে এখানেই ফিরে আসতেন। তার অনুসারীদের বারো জনকে তিনি বিশেষ শিষ্যরূপে [৩৩৬] গ্রহণ করেন।

"তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্বতে উঠিলেন; আর তিনি বসিলে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।"[৩৩৭]

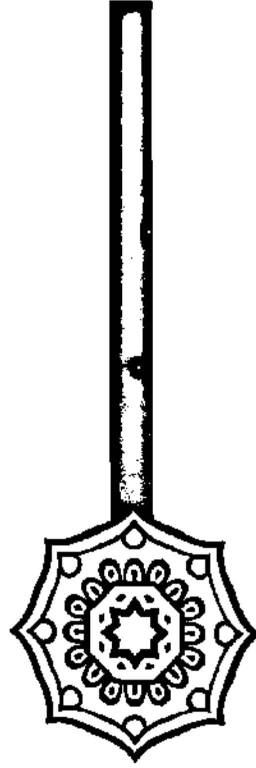


[৩৩৪] *মথি*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ২৩।

[৩৩৫] কফর নহম একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে নহম গ্রাম। তাবারিয়া হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীরে এ গ্রামের অবস্থান।

[৩৩৬] এই শিষ্যগণই পরবর্তীকালে হাওয়ারি নামে পরিচিত হন।-অনুবাদক

[৩৩৭] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১-২।



মসিহ আলাইহিস সালামের
শিষ্যদের তালিকা

সুসমাচারগুলোর বর্ণনাসমূহ এত পরস্পর বিরোধী যে, মসিহ আলাইহিস সালামের বারোজন শিষ্যের তালিকাতেও যথেষ্ট গরমিল ধরা পড়ে। নিম্নে আমরা বিভিন্ন সুসমাচারে বর্ণিত বারোজন শিষ্যের তালিকা চার্ট আকারে তুলে ধরলাম।

ক্র.	মথি – ১০/১-	মার্ক-৩/৩-১৬	লুক-৩/১৪	প্রেরিত	বরনাবা-১৪/১৪
১	শিমোন (পিতর)	শিমোন (পিতর)	শিমোন (পিতর)	পিতর	যিহুদা (যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে)
২	আন্দ্রিয় (পিতরের ভ্রাতা)	যাকোব (সিবদিয়ের পুত্র)	আন্দ্রিয় (পিতরের ভ্রাতা)	যাকোব	আন্দ্রিয়

৩	যাকোব (সিবদিয়ের পুত্র)	যোহন (সিবদিয়ের পুত্র)	যাকোব	যোহন	পিতর
৪	যোহন (সিবদিয়ের পুত্র)	আন্দ্রিয় (পিতরের ভ্রাতা)	যোহন	আন্দ্রিয়	বরনাবা
৫	ফিলিপ	ফিলিপ	ফিলিপ	ফিলিপ	মথি (করগ্রাহী)
৬	বর্থলময়	বর্থলময়	বর্থলময়	থোমা	যোহন (সিবদিয়ের পুত্র)
৭	থোমা	মথি	মথি	বর্থলময়	যাকোব (সিবদিয়ের পুত্র)
৮	মথি (করগ্রাহী)	থোমা	থোমা	মথি	থদ্দেয়
৯	যাকোব (আলফেয়ের পুত্র)	যাকোব (আলফেয়ের পুত্র)	যাকোব (আলফেয়ের পুত্র)	যাকোব (আলফেয়ের পুত্র)	যাকোব
১০	লুইস (থদ্দেয়)	থদ্দেয়	শিমোন	শিমোন	বর্থলময়
১১	শিমোন (কানানি)	শিমোন (কানানি)	যিহুদা (যাকোবের ভ্রাতা)	যিহুদা (যাকোবের ভ্রাতা)	ফিলিপ
১২	যিহুদা (ইস্করিয়োতি)	যিহুদা (ইস্করিয়োতি)	যিহুদা (ইস্করিয়োতি)		

পর্যালোচনা

এক.

লুকের সুসমাচারে লুইস এর স্থলে যাকোবের ভ্রাতা যিহুদার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে যোহন গাদ্দার যিহুদা ব্যতীত অন্য এক যিহুদার নাম উল্লেখ করেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, "ইনি যিহুদা ইস্করিয়োতি নন।"[৩৩৮] এ থেকে বোঝা যায়, ইনি হলেন প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর লেখক লুক কর্তৃক বর্ণিত যাকোবের ভ্রাতা যিহুদা।

দুই.

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে দ্বাদশ শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

তিন.

মথি ও বরনাবা এর বর্ণনা অনুযায়ী করগ্রহীতার নাম ছিল মথি দশম। পক্ষান্তরে মার্কের বর্ণনা অনুযায়ী করগ্রহণের ডেস্কে যিনি বসতেন তার নাম লেবি বিন আলফেয়ের ।[৩৩৯]

চার.

বরনাবার সুসমাচারের বর্ণনামতে বরনাবা ছিলেন বারোজন শিষ্যের একজন। বরনাবা নিজেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "এই সুসমাচারের লেখক যাকে অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ শিষ্যদের তালিকায় স্থান দেননি, প্রকৃতপক্ষে তিনিও একজন শিষ্য ছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[৩৪০]

খ্রিষ্টান গবেষকদের অনেকেই সুসমাচারগুলোর এমন যথেচ্ছচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই লেখকগণ শিষ্যদের নাম বসিয়ে দিয়েছেন বলে তাদের পষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

শিষ্যগণের তালিকা পর্যালোচনার পর আমরা পুনরায় মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্তের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

মসিহ আলাইহিস সালাম বারোজন শিষ্য নির্বাচন করে তাদেরকে ইহুদিদের বিভিন্ন গোত্রে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তাদেরকে তিনি বললেন, "তোমরা পরজাতিগণের

---

[৩৩৮] *যোহন*, অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২২।

[৩৩৯] *মার্ক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১৪।

[৩৪০] প্রমাণস্বরূপ দেখুন : *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ৩৬; অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ২৭; অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ২২-২৫।

পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রাইল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।"[৩৪১]

তিনি তাদেরকে ইনজিলের শিক্ষা[৩৪২] বাস্তবায়ন করতে পরামর্শ দেন। যে ইনজিল তিনি জিবরাইল ফিরিশিতার মাধ্যমে যাইতুন পর্বতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৩৪৩]

ইহুদিরা মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কঠোর বিরোধিতা করে। তাদের খুব অল্পসংখ্যকই তার দাওয়াতে সাড়া দেয়।[৩৪৪] এতে মসিহ আলাইহিস সালাম ক্রোধান্বিত হন এবং কফর নাহম এর বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। "আর তুমি, কফরনাহূম, তুমি নাকি বেহেশত পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? কখনও না, তোমাকে নীচে কবরে ফেলে দেওয়া হবে।"[৩৪৫]

চিন্তার বিষয় হলো, এসব বদদুআ মসিহের মতো একজন কোমলচিত্ত, বিনয়ী ও নম্রভাষী নবির স্বভাবপরিপন্থী। তার তো শ্লোগানই ছিল— প্রেম, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা।

ইহুদিরা মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণ

ইহুদিরা আল্লাহর শরীয়তের অবাধ্য জাতি— এ কথা অকাট্য সত্য। তাদের ধর্মীয় পুস্তক তাওরাতেই তাদের এই অবাধ্যতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এবং বারবার আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মন্দ স্বভাবে কোনো পরিবর্তনই আসেনি। মুসা আলাইহিস সালামের পর থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত হাজার বছর বহু নবি-রাসুল ও সংস্কারগণের আগমন ঘটেছে, কিন্তু তাদের স্বভাব বদলায়নি কিঞ্চিৎও। যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে অবাধ্যতা, কুফরি ও

---

[৩৪১] *মথি*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৫।

[৩৪২] *মার্ক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৫, খ্রিষ্টনগণ অন্যান্য নবির মতো মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে কীভাবে অস্বীকার করে! অথচ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাদের মতের বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

[৩৪৩] বরনাবা, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৩।

[৩৪৪] সুসমাচারগুলোর কোনো কোনো অনুচ্ছেদে এই সংখ্যা একশ বিশজন উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সেই সময়ে এক দিন - যখন অনুমান একশত কুড়ি জন এক স্থানে সমবেত ছিলেন, তখন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন..." করিন্থ নগরীর খ্রিষ্টানদের প্রতি লিখিত পত্রে পোল এই সংখ্যাটি পাঁচশ উল্লেখ করেছেন। করিন্থিয়, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ৬।

[৩৪৫] *মথি*, অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ২৩; *লুক*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ১৫।

পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়েছে। বস্তুবাদের দিকে ধাবিত হয়েছে। পার্থিব স্বার্থে ডুবে গিয়েছে। বস্তুবাদ তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানস ও অনুভূতিকে কাবু করে ফেলেছে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নেককার ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

অপরদিকে তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও জাতিকে পথহারা করার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে, যেখানে ছিল না দ্বীনের মৌলিকত্ব ও মূল লক্ষ্যের ছিটেফোঁটাও। এমন একটি বিশৃঙ্খল সমাজে অরাজক পরিস্থিতিতে যখন একজন নবি এসে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করলেন, বাহ্যিক লৌকিকতা বাদ দিয়ে দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানালেন, তখনই তারা সেই নবিকে কুফরি ও ভ্রষ্টতার অপবাদ দিতে শুরু করল। এমনকি শাসকগোষ্ঠীর সামনে তাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করল। তারা রোমান প্রশাসনকে উস্কে দিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানাও জারি করাতে সক্ষম হলো।

ইহুদি জাতি কর্তৃক মসিহ আলাইহিস সালামের এই কঠোর বিরোধিতার কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

এক.

ইহুদিরা এমন একজন নবির প্রতীক্ষা করত, যিনি তাদের বাদশাহ হবেন। এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু মসিহ আলাইহিস সালামকে তারা এমন একজন নবি হিসেবে আবিষ্কার করল যিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে ধৈর্য, স্থিরতা, চিন্তা-ফিকির ও ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন। ফলে তারা তার সঙ্গ ত্যাগ করল এবং বিভিন্ন গণজমায়েত ও উপাসনাগৃহে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতে শুরু করল। কারণ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৩৪৬]

দুই.

ইহুদিরা সাবাত দিবস তথা শনিবারকে মর্যাদার চোখে দেখতো। কারণ, মুসা আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞায় এ দিবসকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে, “তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন। সেই দিন তুমি, কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার

---

[৩৪৬] *ইয়াসসু মসিহ*, পৃষ্ঠা : ৩৭।

দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোনো কার্য করিও না। কেননা, সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন।[৩৪৭]

এমনকি শনিবারে লাকড়ি সংগ্রহের অপরাধে এক ব্যক্তিকে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার কথাও পুরাতন নিয়মে বিবৃত হয়েছে। যেমন *গণনাপুস্তকে* বলা হয়েছে, "ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন বিশ্রামদিনে একজনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিল। যাহারা তাহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা মোশি, হারোণ ও সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে তাহাকে আনিল। আর তাহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল; কেননা, তাহার প্রতি কি কর্তব্য, তাহা ব্যক্ত হয় নাই। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে মরিয়া গেল।[৩৪৮]

কিন্তু মসিহ আলাইহিস সালাম শনিবারের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করতেন না। এদিনে কাজ করাকেও তিনি নিষিদ্ধ মনে করতেন না। এর বিপরীতে তিনি ও তার অনুসারীরা অষ্টম দিবস তথা রবিবারকে পবিত্রজ্ঞান করতেন। যেমন বরনাবার সুসমাচারে বলা হয়েছে, "আমরা ইহুদিদের বিপরীত অষ্টম দিনকে পবিত্রজ্ঞান করি।" উল্লেখ্য ইহুদিরা শনিবারকে সপ্তম দিবস বলত। সে বিবেচনায় রবিবারকে অষ্টম দিবস বলা হয়েছে।

মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে, আর তিনি বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিলেন; এবং তাঁহার শিষ্যেরা চলিতে চলিতে শীষ ছিঁড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, যাহা বিধেয় নয়, উহারা তাহা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনও পাঠ কর নাই? তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটি যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীগণকেও

[৩৪৭] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ৮-১১।
[৩৪৮] *গণনাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ৩২-৩৬।

দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই; সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।[৩৪৯]

তিন.

মসিহ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের আরেকটি অভিযোগ ছিল তার শিষ্যরা হাত না ধুয়েই আহার গ্রহণ করে। যেমন বর্ণিত হয়েছে, "আর ফরীশীরা ও কয়েকজন অধ্যাপক যিরূশালেম হইতে আসিয়া তাঁহার নিকটে একত্র হইল। তাহারা দেখিল যে, তাঁহার কয়েকজন শিষ্য অশুচি অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতেছে। ফরীশীগণ ও যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের পরমপরাগত বিধি মান্য করায় ভাল করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে না।[৩৫০]

চার.

মসিহ আলাইহিস সালাম জেরুজালেমের ধ্বংস কামনা করে বদদুআ করেছিলেন। যেমন লুকের বর্ণনায় এসেছে, 'আর যখন তোমরা যিরূশালেমকে সেনাসামন্ত দ্বারা বেষ্টিত দেখিবে, তখন জানিবে যে, তাহার ধ্বংস সন্নিকট'।[৩৫১]

মথির বর্ণায় বলা হয়েছে, "হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। কেননা, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্যন্ত না বলিবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন!"[৩৫২]

উপর্যুক্ত কারণগুলোসহ আরও বিভিন্ন কারণে ইহুদিরা মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা রোমান শাসককে তার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। এবং মসিহ দাউদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে অপবাদ আরোপ করে। শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দি ও হত্যার রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়। এরপর রোমান সৈনিকরা মসিহ আলাইহিস সালামকে খুঁজতে খুঁজতে নাগালে পেয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার

---

[৩৪৯] *মার্ক*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২৩-২৮।

[৩৫০] *মার্ক*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১-3।

[৩৫১] *লুক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ২০।

[৩৫২] *মথি*, অধ্যায় : ২৩, অনুচ্ছেদ : ৩৭-39।

আকৃতি যিহুদা ইস্করিয়োতির ওপর ঢেলে দেন। এই যিহুদা ইস্করিয়োতিই হলেন সেই ব্যক্তি, যে মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এ সম্পর্কিত বরনাবার সুসমাচারের বর্ণনা আমরা নিচে তুলে ধরছি।

"যখন সৈনিকগণ যিহুদার সাথে যিশুর অবস্থানস্থলের নিকট পৌঁছল তখন যিশু বহু মানুষের আনাগোনা টের পেলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। এগারো শিষ্য তখন ঘুমোচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার বিপদ দেখে তার দূত জিবরাইল, মিকাইল, রুফাইল, উরাইলকে নির্দেশ দিলেন যিশুকে পৃথিবী থেকে নিয়ে আসার জন্য। অতঃপর পবিত্র ফিরিশতারা এসে তাকে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বের করে নিলেন। তৃতীয় আসমানে সর্বদা তাসবিহ পাঠে রত ফিরিশতাদের সাথে তাকে রাখলেন। যিহুদা জোরপূর্বক কক্ষে প্রবেশ করল যে কক্ষ থেকে যিশুকে তুলে নেওয়া হয়েছে। শিষ্যরা সবাই ছিল ঘুমে আচ্ছন্ন। তখনই ঈশ্বর আশ্চর্য এক ঘটনা সম্পাদন করলেন। যিহুদার চেহারা ও গলার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যিশুর মতো হয়ে গেল। এমনকি আমরা তাকেই যিশু মনে করতে লাগলাম।

কিন্তু সে আমাদেরকে ডেকে তুলে মুআল্লিম (যিশু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমরা অবাক হয়ে তাকে বললাম, আপনিই তো আমাদের মুআল্লিম। আমাদেরকে এখনই ভুলে গেলেন! সে তখন হেসে বলল, তোমরা বোকা নাকি? যিহুদা ইস্করিয়োতিকে চিনতে পারছ না!

এই কথোপকথনের মাঝেই সৈনিকগণ প্রবেশ করল। তারা যিহুদা ইস্করিয়োতিকে পাকড়াও করল। কেননা, সে সবদিক থেকেই যিশুর সদৃশ ছিল।[৩৫৩]

কথিত সুসমাচারগুলোতেও যিশুর আকৃতি ও রূপ অন্য ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৩৫৪] তাদের প্রত্যেকে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, "তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে; কেননা, লেখা আছে, "আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।"[৩৫৫]

[৩৫৩] বরনাবা, অধ্যায় : ২১৫-২১৬।

[৩৫৪] এতদসত্ত্বেও খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস করে মসিহ আলাইহিস সালামকেই শূলে চড়ানো হয়েছে। সমগ্র খ্রিষ্টজগতের পাপ মার্জনার জন্য তিনি আত্মহুতি দিয়েছেন। এই আত্মহুতির স্মৃতি হিসেবে তারা নিজেদের ইবাদাতগৃহে এবং নিজেদের শরীরে ক্রুশ ধারণ করে থাকে।-অনুবাদক

[৩৫৫] *মথি*, অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ৩১; *মার্ক*, অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২৭।

এভাবেই আল্লাহ তাআলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। স্বীয় রাসুলের প্রতি তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাকে নিয়ে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে। আর গাদ্দার যিহুদাকে অর্পণ করলেন সৈনিকদের হাতে। যিহুদা এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করারও সুযোগ পেল না। ব্যাপক চেঁচোমেচি, হট্টগোল ও আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে তারা তাকে মৃত্যুর গর্তে নিপতিত করল। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। আর আল্লাহ তাআলা সুনিপুণভাবে তাদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিলেন। শাসকগোষ্ঠী যিহুদাকে বেত্রাঘাতের পর শূলে চড়াল অথচ তাদের ধারণা ছিল তারা মসিহকে শুলিতে চড়িয়েছে।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত যারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭-১৫৮]

জুরজি যায়দান উপহাসের সুরে বলেন, "তারা বলে মসিহকে বাস্তবে শূলে চড়ানো হয়নি। তার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে চড়ানো হয়েছে।"[৩৫৬]

সুস্থ মস্তিষ্ক খ্রিষ্টানদের এই আকিদাকে খণ্ডন করে। কারণ, যে প্রভু নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না তিনি কীভাবে অন্যকে রক্ষা করবেন? আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ বলেন, "বিষয়টি ওই জাতির কাছে কীভাবে গুরুতর মনে হবে যে জাতি নিজেদের প্রভুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে মেনে নিয়েছে। অতঃপর সেই ক্রুশকেই তারা সম্মানের স্থানে বসিয়েছে। এমনকি পূজাও করতে শুরু করেছে। অথচ তাদের উচিত

[৩৫৬] *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪, দারুল হিলাল।

ছিল, সমস্ত ক্রুশ পুড়িয়ে ফেলা এবং অপদস্থ করা। কেননা, এই ক্রুশেই তাদের প্রভুকে বিদ্ধ করা হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ এই প্রভু সম্পর্কেও তাদের মন্তব্য নানাবিধ। কখনো তারা বলছে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ। আবার কখনো বলছে, আল্লাহর পুত্র। কখনো দাবি করছে, প্রভুর তিন সত্তার এক সত্তা। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার হক নষ্ট করেছে। তার সাথে কুফরি করেছে। সুতরাং তাদের জন্য অসম্ভব নয় সেই প্রভুর বান্দা ও রাসুলকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাকে অস্বীকার করা। এগুলো তাদের কাছে মোটেও জঘন্য কিছু নয়।

বিষয়টি ঐ জাতির কাছে কীভাবে গুরুতর মনে হবে যে জাতি বলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মাখলুকের সাথে কথা বলার জন্য স্বশরীরে মর্তে নেমে এসেছেন। তাদের আপত্তি দূর করতে এবং নিজেকে প্রমাণ করতে তাদের সাথে কথা বলেছেন। আবার তিনি মারইয়ামের পেটে প্রবেশ করেছেন। তার সাথে আড়ালও নিয়েছেন। শারীরিক গঠনে তিনি মাখলুক। সত্তাগতভাবে তিনি খালিক। তিনি নিজেই নিজের আকৃতি তৈরি করেছেন। মা হলেন মানবপ্রকৃতির। সেই মা থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান হলেন ঐশ্বরিক। তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর আবার পরিপূর্ণ মানব। তার অপার অনুগ্রহ এই যে, তিনি পাপমোচনের নিমিত্ত বান্দার পক্ষ থেকে ক্রুশদণ্ডে নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছেন। ফলে তার শত্রু ইহুদিরা শান্ত হয়েছে। আর ইহুদিদের ওপর তার ক্রোধ পরিপূর্ণ হয়েছে। ইহুদিরা তাকে পাকড়াও করেছে। ক্রুশবিদ্ধ করেছে। চপেটাঘাত করেছে। এমনকি তার মুখে থুতুও নিক্ষেপ করেছে। তারা তাকে কাঁটাযুক্ত হেলমেট পরিধান করিয়েছে। তার রক্ত আঙুলে দেবে গেছে। কেননা, তার এক ফোঁটা রক্তও যদি মাটিতে পড়ত তাহলে জমিনের সবকিছুই শুকিয়ে যেত। তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থানে ফুল ফুটেছে।

ইশ্বর তার পাপী বান্দা থেকে প্রতিশোধ নেওয়া প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। যে শিরক করে কিংবা তার অমর্যাদা করে স্বীয় মহত্ত্বের কারণে তিনি তার থেকে প্রতিশোধ নেন না। তাই আল্লাহ তাআলা চাইলেন, এমন একজন মানুষকে দণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, যিনি মানুষ হওয়ার পাশাপাশি তার মতো একজন প্রভুও। তাই আদিপাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করলেন মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করে। কেননা, প্রভুত্বের দিক থেকে মসিহ তার সমকক্ষ। ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো জুমার দিন নয়টায়।

এতক্ষণ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যা বলা হলো সবই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের বিবৃতি। যারা নিজেদের প্রভু সম্পর্কে এমন কথা বলে তাদের জন্য নিজেদের প্রভুর বান্দা ও রাসুলকে জাদুকর বলা বা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কোনো ব্যাপারই নয়।

এজন্যই কোনো এক ভারতীয় রাজা বলেছেন—

"খ্রিষ্টানদের সাথে অন্যান্য জাতি অস্ত্রের মাধ্যমে লড়াই করলেও আমি মনে করি তাদের সাথে লড়াইটা হওয়া উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক। আমরা কাউকে হত্যা করার কথা ভাবি না। কিন্তু এ জাতিটির কথা বিশ্বের সকলের চেয়ে ভিন্ন। এরা বিবেককে কাজে লাগায় না। বুদ্ধির সাথে যেন তাদের চির বৈরিতা। পুরো বিশ্ব একদিকে আর তারা অন্যদিকে। অসম্ভবকে তারা মনে করে সম্ভব। এমন এক শরিয়ত তারা বানিয়ে নিয়েছে যা বিশ্বের কোনো ধরনের কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না। পরন্তু এই শরিয়তের অনুসরণ একজন বিবেকবানকে নির্বোধে পরিণত করে। বুদ্ধিমানকে সাব্যস্ত করে বোকা হিসেবে। আর ভালোকে গণ্য করে মন্দ। কেননা, তাদের আকিদার ভিত্তিই হলো সৃষ্টিকর্তার প্রতি অশীলিত আচরণ। মহোত্তম গুণাবলির পরিবর্তে মর্যাদাহীন বিশেষণে তাকে আখ্যায়িত করা। এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে তাদের অনিষ্ট ও ধ্বংসলীলা ব্যাপকাকার ধারণ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তখন দুর্ভোগ পোহাতে হবে সমগ্র বিশ্বকে। হিংস্র জন্তুকে যেভাবে হত্যা করা হয় এদেরকেও সেভাবে হত্যা করা উচিত।"[৩৫৭]

এদের সম্পর্কে ইহুদি কিমুনি যথার্থ বলেছেন—

"আল্লাহর শানে কিছুতেই শোভা পায় না যে— তিনি রজঃস্রাবের রক্তের মাঝে, গর্ভের সংকীর্ণতা ও অন্ধকারে বসবাস করেছেন। কিংবা চর্মচক্ষু দ্বারা তাকে দর্শন করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রেই তার অক্ষমতা প্রকাশিত হয়। তিনি ভয় পান। মানুষের সম্পদের প্রতি তিনি লোভী। তিনি জেলহাজতে গিয়েছেন। সেখান থেকে পালিয়েছেন। তিনি মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বীয় ক্ষমতার মধ্যেও তিনি অনেক কিছু করতে অক্ষম। যদ্দরুন মানুষকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি মর্তে নেমে এসেছেন। এসেছেন তাদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে। পাপ থেকে পবিত্র করতে। এরপর ইহুদিরা সেই প্রভুর পিছু নিল। তাকে কষ্ট দিলো। অপমান করল। ক্রুশবিদ্ধ করল। এরপর তিনি তিন দিন কবরে থাকলেন।

প্রশ্ন হলো— মসিহের যুগে সংঘটিত এই অপরাধের চেয়ে বড় আর কোনো অপরাধ আছে যা এর পূর্বে কিংবা পরে সংঘটিত হয়েছে? আমরা দেখছি, মসিহের আগমনের পূর্বে শয়তান যেভাবে মানুষকে ধোকা দিত এখনো সেভাবে ধোকা দিচ্ছে। দিগভ্রান্ত করছে। তোমাদের (খ্রিষ্টান) ধর্মে ফাটল ধরিয়েছে। নানা দলে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছে। তোমরা একে অপরকে গোমরাহ বলে অভিহিত করেছ। বিভিন্ন দেশে হাওয়ারিদের ওপর নির্যাতন হয়েছে। তাদেরকে অপদস্থ করা হয়েছে। এমনকি অনেককে

[৩৫৭] *হিদায়াতুল হিয়ারা*, পৃষ্ঠা : ২০-২১।

হত্যা করা হয়েছে। অদ্যাবধি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সহ পুরো বিশ্বে জুলুম, সীমলঙ্ঘন, হত্যা, কুফুরি বিদ্যমান। তাহলে তোমাদের দাবিমতে ঈশ্বরের আগমন ও আত্মহুতির সুফলটা কোথায়?[৩৫৮]

এদিকে বিশ্বাসঘাতক যিহুদা ইস্কারিয়োতির পরিণতির ব্যাপারে সুসমাচারগুলোর বক্তব্য বিরোধপূর্ণ। যেমন প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, "সে অধর্মের বেতন দ্বারা একখানি ক্ষেত্র লাভ করিল; এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়ী ভুঁড়ী সকল বাহির হইয়া পড়িল।"[৩৫৯]

অর্থাৎ, ইহুদিদের থেকে নেওয়া ঘুষের অর্থ দিয়ে সে একটি জমি ক্রয় করে। এরপর সেই জমিতে পড়েই সে মারা যায়।

মথির বক্তব্য হলো সে লজ্জায় স্বীয় শ্বাস রোধ করে আত্মহুতি দেয়।

"তখন যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া দিল, আর কহিল, নির্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি। তাহারা বলিল, আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝিবে। তখন সে ঐ মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, এবং গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল।"[৩৬০]

উভয় বর্ণনার বিরোধ পাঠক নিজ দায়িত্বে বুঝে নেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো ক্রুশবিদ্ধ ও দাফনকৃত ব্যক্তিটি যদি যিহুদা ইস্কারিয়োতি হয়ে থাকে তাহলে কবরে তার দেহের পরিণতি কী হয়েছিল?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

এক. পাহারাদারগণ প্রধান যাজকদিগকে সবকিছু খুলে বলেছিল। এরপর তারা বয়স্ক নেতাদের সাথে মিলিত হয়ে পরামর্শ করে। তারা সৈন্যদেরকে প্রচুর পরিমাণে রুপো উৎকোচ দিয়ে বললো, "তোমরা বলবে মসিহ এর শিষ্যগণ রাতের অন্ধকারে তার দেহ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আমরা সে সময় ঘুমিয়ে ছিলাম।...মথি বলেন, "এ ঘটনাটি ইহুদিদের কাছে আজো প্রসিদ্ধ।" অর্থাৎ, মথি কর্তৃক সুসমাচার লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত

[৩৫৮] *তানকিহুল আবহাস লিল মিলালিস সালাস*, পৃষ্ঠা : ৫৭।

[৩৫৯] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ১৮।

[৩৬০] *মথি*, অধ্যায় : ২৭, অনুচ্ছেদ : ৩-৫।

ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য মথির সুসমাচারটি লিখিত হয়েছে ৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কিংবা তারও পরে।

আমরা মথিকে প্রশ্ন করতে চাই মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের ত্রিশচল্লিশ বছর পর এই প্রচারণার মূল উৎস কী? কীসের ভিত্তিতে এই প্রচারণা চালানো হচ্ছে? মথি নিজে তো এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখার প্রশ্নই আসে না। তাহলে কি সৈনিকদের সাথে মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্যদের কোনো যোগসাজশ ছিল? অথচ একথা প্রসিদ্ধ যে, এই শিষ্যদেরকে অন্যরা ধর্মত্যাগের অপবাদ আরোপের ভয়ে এড়িয়ে চলত। আমরা বলতে পারি, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন কেউ না কেউ লাশটি চুরি করেছে।

দুই, শত্রু কর্তৃক লাশ চুরির বিষয়টি সর্বপ্রথম মারইয়াম মিগদলির মাথায় তখনই আসে যখন তৃতীয় দিনে কবরে লাশ পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি বিষয়টি পিতর এবং আরেকজন শিষ্যকে অবহিত করেন। সংবাদ শুনে তারা উভয়ে কবরের দিকে দৌড়ে যান।

এগুলো তাদেরই ধর্মীয় গ্রন্থের বর্ণনা। সুতরাং বলা যায় ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির দেহ চুরির বিষয়টি নবোদ্ভাবিত কোনো কথা নয়। বরং এটি সে সময়েরই প্রসিদ্ধ ঘটনা যা মথি তার সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন।

মসিহ আলাইহিস সালামের সবচেয়ে কাছের শিষ্য পিতরও মারইয়াম মিগদলির বক্তব্যের ওপর কোনো আপত্তি করেননি। উল্টো ঘটনার সত্যতা জানতে কবর অভিমুখে দৌড় দিয়েছিলেন। এই চিন্তাধারাটি প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্টানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এমনকি এটাও প্রচারিত হয়েছিল যে, মসিহ আলাইহিস সালাম তার কোনো কোনো শিষ্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবরের মধ্যে দেহ না থাকার বিষয়টি প্রমাণের জন্য এটাই যথার্থ দলিল। বাস্তবতা হলো ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ব্যক্তিটির দেহ কবর থেকে চুরি হয়েছিল। হয়তো ফিতনা দমনের জন্য ইহুদিরা চুরি করেছে। অথবা সত্যকে গোপন করার জন্য শিষ্যরাই করেছে। আর মসিহ আলাইহিস সালাম ক্রুশবিদ্ধ হননি। আল্লাহ তাআলা তাকে স্বশরীরে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

যিহুদা ইস্কারিয়োতি নিহত হওয়ার পর শিষ্যগণ দ্বাদশ শিষ্য নির্বাচনের জন্য একত্রিত হন। পদটির জন্য দুই জনের নাম প্রস্তাব করা হয়। তাদের একজন ছিলেন যুস্ট অপরজন ছিলেন মত্তথিয়। শেষে লটারিতে মত্তথিয়ের নাম ওঠে। সেদিন থেকে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের স্থানে আসীন হন।[৩৬১]

---

[৩৬১] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২৩-২৬।

ক্রুশের ঘটনায় মুক্তির পর ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কী ঘটেছিল তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে স্বশরীরে উঠিয়ে নিয়েছেন নাকি শুধু রুহটাকেই নেওয়া হয়েছে?[৩৬২] একদল বলছেন ঈসা আলাইহিস সালাম লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। পরে পৃথিবীর বুকেই তিনি বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। অন্যান্য নবি-রাসুলের মতো তিনিও স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন। তার পবিত্র রুহকে ঊর্ধ্বালোকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবে নবি, সিদ্দিক ও শহিদগণের রুহকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা কুরআনের কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করেন এবং এর বাহ্যিক অর্থকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ

আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের ওপর জয়ী করে রাখব। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৫]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۔

অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৭]

[৩৬২] *ফতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৭। বিশিষ্ট মুফাসসির আবু হাইয়ান তার তাফসির গ্রন্থ *আল-বাহরুল মুহিত-এ ইবনে আতিয়ার* বর্ণনা নকল করে বলেন, "সমস্ত উম্মত এ কথার ওপর একমত যে হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানে জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত। এবং আখেরি জমানায় তিনি অবতরণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। দাজ্জালকে বধ করবেন। আদল-ইনসাফ ছড়িয়ে দেবেন। তার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদি বিজয় লাভ করবে। তিনি হজ করবেন। উমরা করবেন।
মুসলিম শরিফের হাদিসে এসেছে, "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, ইবনে মারইয়াম রাওহা উপত্যকায় হজ অথবা উমরা অথবা দুটোরই ইহরাম বাঁধবেন।" রাওহা উপত্যকাটি মদিনা থেকে বদর যাওয়ার পথে একটি স্থান।

বর্তমান যুগের কাদিয়ানিদের মত হলো, মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরে তাকে জীবিত অবস্থাতেই ক্রুশ থেকে নামানো হয়। জীবিতই দাফন করা হয়। এরপর তৃতীয় দিন তিনি কবর থেকে উঠে হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হন। কাশ্মিরের শ্রীনগরে পৌঁছে সেখানেই থিতু হন। বাকি জীবন এখানে কাটিয়ে ১১০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

কাদিয়ানিদের এই মতকে মুসলিম-খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। গবেষক আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। *আবকারিয়াতুল মসিহ* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কাদিয়ানিরা যেটাকে ঈসা আলাইহিস সালামের কবর বলে দাবি করে থাকে এটা ইয়ুযাসিফ নামক এক ইহুদির কবর।

ক্রুশের ঘটনার পর মসিহ আলাইহিস সালামের পরবর্তী জীবন নিয়ে এই তিনটি মতই প্রসিদ্ধ।[৩৬৩] তন্মধ্যে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। অধিকাংশ মুফাসসির এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, স্বশরীরে ঊর্ধ্বারোহণের মধ্যেই বিশেষত্ব রয়েছে। রুহের ঊর্ধ্বারোহণ কিংবা মর্যাদা উন্নীতকরণ তো অন্য নবিদের বেলায়ও হয়েছে। আয়াতে ঊর্ধ্বারোহণের বিষয়টি ওফাতের প্রসঙ্গ উল্লেখের পর এসেছে। এটি মূলত অলংকার শাস্ত্রের তাকদিম-তাখির (অগ্র-পশ্চাৎ) নীতি[৩৬৪] অনুযায়ী করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, আমি তোমাকে তুলে নেব এবং স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু দেব। কারণ, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ জামানায় দুনিয়াতে আসবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। যেমন বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, অচিরেই তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। যুদ্ধের ইতি টানবেন। সম্পদের প্রাচুর্য বইয়ে দেবেন। তখন সম্পদ গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না।"[৩৬৫]

---

[৩৬৩] মত তিনটি হলো: এক, তাকে স্বশরীরে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। দুই, তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন অতঃপর তার রুহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিন, তিনি হিজরত করে কাশ্মিরের শ্রীনগরে আসেন। এখানেই তার মৃত্যু হয়।-অনুবাদক

[৩৬৪] তাকদিম-তাখির অলংকার শাস্ত্রের একটি নিয়ম। যেখানে নানাবিধ উদ্দেশ্যে পরের বিষয়কে আগে এবং আগের বিষয়কে পরে উল্লেখ করা হয়।-অনুবাদক

[৩৬৫] বুখারি। ক্রুশ ভাঙার দ্বারা বোঝা যায়, তিনি খ্রিষ্টধর্মকে অকার্যকর করবেন এবং খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক ক্রুশকে সম্মানের বিষয়টিও তিনি অপনোদন করবেন। মসিহ আলাইহিস সালামের অবতরণ সম্পর্কিত হাদিস প্রচুর এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এ সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. রচিত ও শায়খ আবু গুদ্দাহ কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষণ কিতাব *আত-তাসরিহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মসিহ* দেখা যেতে পারে।

এদিকে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। পরে কবরে দাফন করা হয়েছে। তিন দিন পর তিনি কবর থেকে বের হয়ে এসেছেন। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনি শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য মানুষদের সামনে এসেছেন। এরপর ঊর্ধ্বালোকে চলে গিয়েছেন।

সন্দেহ নেই যে, এটি একটি মাত্র ঘটনা। পুনঃ পুন সংঘটিত কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু এ ঘটনার বিভিন্ন অংশের বর্ণনায় সুসমাচারগুলোর বর্ণনা এতটাই বিরোধপূর্ণ যে, খোদ ক্রুশবিদ্ধকরণের ঘটনা নিয়েই সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আমরা সুসমাচারগুলোর বিরোধসহ ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

মথি বলেন :

"তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ, যিহূদা, সেই বারোজনের একজন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে অনেক লোক খড়গ ও যষ্টি লইয়া প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিবে। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। ...

আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে মহাযাজক কায়াফার কাছে লইয়া গেল; সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হইয়াছিল। তখন প্রধান ... যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু অনেক মিথ্যাসাক্ষী আসিয়া যুটিলেও তাহা পাইল না। অবশেষে দুই জন আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। তাহারা উত্তর করিয়া কহিল ..., এ মরিবার যোগ্য। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুসি মারিল; আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের নিকটে ভাববাণী বল, কে তোকে মারিল?

...প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের[৩৬৬] নিকটে সমর্পণ করিল।...

---

[৩৬৬] পিলাত ২৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ইহুদিদের ওপর শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। মসিহ আলাইহিস সালামের কয়েক বছর পর পর্যন্ত তার শাসন বিদ্যমান ছিল। তার মৃত্যু সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। বলা

ইতিমধ্যে যীশুকে দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে? ...আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পর্বের সময়ে তিনি জনসমূহের জন্য এমন একজন বন্দিকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত। সেই সময়ে তাহাদের একজন প্রসিদ্ধ বন্দি ছিল, তাহার নাম বারাব্বা। অতএব তাহারা একত্র হইলে পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাহাকে মুক্ত করিব? বারাব্বাকে, না যীশুকে, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে? কারণ তিনি জানিতেন, তাহারা হিংসাবশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। ...আর প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকসমূহকে প্রবৃত্তি দিল, যেন তাহারা বারাব্বাকে চাহিয়া লয় ও যীশুকে সংহার করে। তখন দেশাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া দিব? তাহারা কহিল, বারাব্বাকে। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি কহিলেন, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। পীলাত যখন দেখিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল, বরং আরও গোলযোগ হইতেছে, তখন জল লইয়া লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝিবে। তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিল, উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্তুক। তখন তিনি তাহাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।...

তখন দেশাধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সমুদয় সেনাদল একত্র করিল। আর তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখানি লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক গাছি নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'যিহূদী-রাজ, নমস্কার!' আর তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল, এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল।

হয়ে থাকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কারও কারও মতে তাকে স্বীয় পদ থেকে বরখাস্ত করে ফ্রান্সে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে একজন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল। পরে গল্‌গথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে চাহিলেন না। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার বস্ত্র সকল গুলিবাঁটপূর্বক অংশ করিয়া লইল; এবং সেখানে বসিয়া তাঁহাকে চৌকি দিতে লাগিল। আর উহারা তাঁহার মস্তকের উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল, 'এই ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের রাজা'।...

পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" ...

আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর হইতে দেখিতেছিলেন; তাঁহারা যীশুর পরিচর্যা করিতে করিতে গালীল হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মারইয়াম, যাকোবের ও যোষির মাতা মারইয়াম, এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন।...

পরদিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরদিবস, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরি-দল আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর। তাহাতে তাহারা গিয়া প্রহরি-দলের সহিত সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর রক্ষা করিতে লাগিল।

বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে, মগ্দলীনী মারইয়াম ও অন্য মারইয়াম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ, মহা-ভূমিকম্প হইল; কেননা, প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখানি সরাইয়া দিলেন, এবং তাহার উপরে বসিলেন। তাঁহার দৃশ্য বিদ্যুতের ন্যায়, এবং তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

তাঁহার ভয়ে প্রহরীগণ কাঁপিতে লাগিল, ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়জনকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কেননা, আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এখানে নাই; কেননা, তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন; আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন, এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে; দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিলাম। তখন তাঁহারা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন।...

তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, প্রহরি-দলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর যদি এই কথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব। তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কার্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা অদ্য পর্যন্ত রহিয়াছে। পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন।"[৩৬৭]

এই হলো ক্রুশবিদ্ধকরণ, কবর থেকে উত্থান, গালিলে গমন এবং শিষ্যদের দেখা দেওয়া সংক্রান্ত সুসমাচারের বর্ণনা। এ পর্যায়ে আমরা এই ঘটনার বিভিন্ন অংশের বিরোধ বিশ্লেষণ করব।

প্রথম

মথি, মার্ক ও লুকের বর্ণনা অনুযায়ী মসিহকে চেনার লক্ষণ ছিল যিহুদা কর্তৃক মসিহকে চুম্বন করা। মসিহ নিজ থেকে পরিচয় প্রকাশ করেননি।

অথচ যোহন বলছেন, "অতএব যিহূদা সেনাদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সেখানে আসিল। তখন যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া

[৩৬৭] *মথি*, অধ্যায় : ২৬,২৭,২৮; *মার্ক*, অধ্যায় : ১৪,১৫,১৬; *লুক*, অধ্যায় : ২২,২৩,২৪; *যোহন*, অধ্যায় : ১৮,১৯,২০,২১।

বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে পড়িল। পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। যীশু উত্তর করিলেন, আমি ত তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে দাও- যেন তিনি এই যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয়, 'তুমি আমাকে যে সকল লোক দিয়াছ, আমি তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।"[৩৬৮]

যোহনের বক্তব্যকে যদি সঠিক ধরা হয় তাহলে এটা হবে মসিহ আলাইহিস সালামের অন্যতম মুজিযা। সেক্ষেত্রে সুসমাচারের লেখকগণের এই মুজিযার বিবরণ দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল।

এ ছাড়াও এক্ষেত্রে যিহুদাকে কীভাবে দোষ দেওয়া যায়! সে তো সৈনিক ও প্রধান যাজকদের হাতে মসিহ আলাইহিস সালামকে ধরিয়ে দেয়নি বরং মসিহ আলাইহিস সালাম নিজেই নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

দ্বিতীয়

মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে, "তখন তাহার সকল শিষ্যগণ তাহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।"

এদিকে মার্ক বলছেন, "তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। আর, একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে ধরিল, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল।"

পক্ষান্তরে লুক এবং যোহন শিষ্যদের পালানোর বিষয়টি উল্লেখই করেননি। যদি তারা না পালিয়ে থাকেন তাহলে মসিহকে গ্রেফতারের সময় তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

---

[৩৬৮] *যোহন,* অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ৩-৯।

তৃতীয়

মথির বর্ণনা অনুযায়ী মসিহকে গ্রেফতার করে লোকেরা প্রধান যাজক কায়াফার কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

মার্ক এবং লুক কায়াফার নাম উল্লেখ করেননি।

অপরদিকে যোহনের ভাষ্যমতে, "তখন সেনাদল, এবং সহস্রপতি ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল, ও তাঁহাকে বন্ধন করিল, এবং প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল; কারণ যে কায়াফা সেই বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন তাঁহার শ্বশুর। এ সেই কায়াফা, যিনি যিহূদিগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রজালোকদের জন্য একজনের মরণ ভাল।"[৩৬৯]

কায়াফা আরামি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পাথর। কায়াফা ছিলেন ২৭-৩৬ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে ইহুদিদের প্রধান যাজক। শুরুতে প্রধান যাজকগণ আমৃত্যু স্বপদে বহাল থাকতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রোমান শাসকগণ পদটিতে নিজেদের ইচ্ছেমতো লোক বসাত কিংবা বরখাস্ত করত।

হানন হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে যিহোবা তাকে অনুগ্রহ করেছেন। হানন জেরুজালেমের প্রধান যাজক ছিলেন। কিন্তু মসিহের গ্রেফতারের সময় তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন না।

যাই হোক, এখানে প্রশ্ন হলো গ্রেফতারের পর কার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? যোহনের ভাষ্যমতে হাননের কাছে? নাকি মথির ভাষ্যমতে কায়াফার কাছে?

চতুর্থ

মথি ও লুকের বর্ণনা অনুযায়ী প্রধান যাজকগণ, নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলে যিশুকে হত্যার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য তালাশ করছিল।

অপরদিকে লুক এবং যোহন মিথ্যা সাক্ষীর বিষয়টি উল্লেখই করেননি। বরং প্রধান যাজকের সামনে তার মসিহ হওয়ার দাবি করাটাই তারা যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। এজন্যই তারা বলেছেন, "এরপর আর কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। কেননা, আমরা তার মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছি।"

মসিহের অপরাধ কী ছিল? নিজেকে মসিহ হিসেবে দাবি করা? নাকি উপাসনাগৃহের ধ্বংস কামনা করা? এটা কোন পর্যায়ের অপরাধ যদ্দরুন তিনি হত্যার উপযুক্ত হলেন?

---

[৩৬৯] *যোহন*, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৪।

পঞ্চম

মথি ও মার্কের বক্তব্য অনুযায়ী লোকেরা মসিহকে নিয়ে পিলাতের কাছে অর্পণ করল। পিলাত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি যিহুদিদের বাদশা?...

এদিকে লুক বলছেন, "আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এই ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়াইয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা।"[৩৭০]

পক্ষান্তরে যোহনের বর্ণনা একেবারে ভিন্ন। তিনি বলছেন, "পরে লোকেরা যীশুকে কায়াফার নিকট হইতে রাজবাটীতে লইয়া গেল; তখন প্রত্যূষকাল; আর তাহারা যেন অশুচি না হয়, কিন্তু নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করিতে পারে, এই জন্য আপনারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল না। অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে গেলেন ও বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ করিতেছ? তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্মকারী না হইত, আমরা আপনার হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন,তোমরাই উহাকে লইয়া যাও, এবং আপনাদের ব্যবস্থামতে উহার বিচার কর। যিহূদিগণ তাঁহাকে কহিল, কোনো ব্যক্তিকে বধ করিতে আমাদের অধিকার নাই।"[৩৭১]

পিলাত মসিহ এর সাথে কথা বললেন প্রকৃতই তিনি দোষী কি না তা নির্ণয় করতে। শেষে তিনি ইহুদিদের বললেন, আমি তো তার কোনো দোষ দেখি না।

ষষ্ঠ

মথির ভাষ্যমতে পিলাত যখন মসিহের নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারলেন তখন তিনি সকলের সামনে নিজের হাত ধুয়ে বললেন, "আমি এই নিরাপরাধ ব্যক্তির হত্যার দায় থেকে মুক্ত।"

এই বক্তব্য অন্য কোনো সুসমাচারে স্থান পায়নি।

সপ্তম

এককভাবে লুকের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে, পিলাত যখন জানতে পারলেন যে, যিশু গালিলের লোক। আর গালিল হলো হেরোড এর শাসনাধীন এলাকা। তখন তিনি যিশুকে দণ্ডিত করার পূর্বে হেরোডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে বলা হয়েছে,

---

[৩৭০] *লূক*, অধ্যায় : ২৩, অনুচ্ছেদ : ২।
[৩৭১] *যোহন*, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ২৮-৩১।

"যিশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা, তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃত কোনো চিহ্ন দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যিশু তাঁহাকে কোনো উত্তর দিলেন না। আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়াইয়া উগ্রভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল। আর হেরোদ ও তাঁহার সেনারা তাঁহাকে তুচ্ছ করিলেন, ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং জমকাল পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে পীলাতের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইলেন। সেই দিন হেরোদ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হইয়া উঠিলেন, কেননা, পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে শত্রুভাব ছিল।"[৩৭২]

অষ্টম

যোহনের বর্ণনায় এসেছে, "তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি নিজে ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া 'মাথার খুলির স্থান' নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গল্‌গথা বলে।"[৩৭৩]

পক্ষান্তরে মথি, মার্ক ও লুকের বর্ণনা অনুযায়ী তারা সিকান্দারের পিতা শিমোন নামক একজন কুরনিয় ব্যক্তিকে যিশুর পিছু পিছু ক্রুশ বহনের জন্য নিয়ে গিয়েছিল।

লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডেনিস এরিক নিনেহাম (Dennis Eric Nineham) তার বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য গসপেল অব সেইন্ট মার্ক* (The Gospel of Saint Mark) এ বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "সাধু মার্ক তার সুসমাচারটি যে গির্জার জন্য রচনা করেছিলেন তারা এই দু'ব্যক্তিকে তথা সিকান্দার ও রুষকে ভালোভাবেই চিনত। তাই এদের সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন পড়েনি। সুসমাচারের এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো শিমোন কর্তৃক ক্রুশ বহনের বিষয়টির বিশুদ্ধতা যাচাই করা।"

যোহনের সুসমাচারে এই অনুচ্ছেদ তথা শিমোন কুরনিয় কর্তৃক ক্রুশ বহনের বিষয়টি বিলুপ্ত করার কারণ হলো, এই চতুর্থ সুসমাচারটি[৩৭৪]যখন রচিত হয় তখন খ্রিষ্টানদের মাঝে এই দাবিটি ব্যাপকতা লাভ করে যে, শিমোন যিশুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং যিশুর পরিবর্তে তাকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

---

[৩৭২] *লুক*, অধ্যায় : ২৩, অনুচ্ছেদ : ৮-১২।

[৩৭৩] *যোহন*, অধ্যায় : ১৯, অনুচ্ছেদ : ১৭।

[৩৭৪] রচনার সময়কাল বিবেচনায় যোহনের সুসমাচারকে চতুর্থ সুসমাচার বলা হয়। এটি ১০০-১২৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে রচিত হয়েছে।-অনুবাদক

পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি পাওয়া খ্রিষ্টান জ্ঞানবাদীদের নিকট ধারণাটি আজও প্রচলিত।[৩৭৫]

নবম

শুধু যোহনের বর্ণনায় এসেছে যে, ক্রুশের নিকট অবস্থানরত গালিল থেকে আসা মহিলাদের সাথে যিশুর মাতাও ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে যিশুর খালা, ক্লোপার স্ত্রী এবং মারইয়াম মিগদলি ছিলেন। তারা সবাই ঘটনাস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মসিহ যখন স্বীয় মাতা এবং প্রিয় শিষ্যকে দেখলেন তখন মাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে নারী, ঐ দেখ তোমার পুত্র।" আবার শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে বৎস, ঐ দেখ তোমার মাতা।"

প্রশ্ন হলো, এই শিষ্য কোত্থেকে এল? ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যিশুকে গ্রেফতারের পর শিষ্যগণ সবাই মৃত্যুভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

দশম

মথি, মার্ক ও লুকের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাত নয়টায় যিশু চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! আপনি কেন আমায় ত্যাগ করলেন? এই বলে তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন।

চিৎকারের বিষয়টি যোহন উল্লেখ করেননি। বরং এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা অন্য কোনো সুসমাচারে দেখা যায় না।

একাদশ

মথি এবং যোহনের বর্ণনামতে, মারইয়াম মিগদলি এবং অন্য এক মারইয়াম বিশ্রামদিনের পরদিন সকালে কবর দেখার জন্য এসেছিলেন। পক্ষান্তরে লুক ও মার্কের বর্ণনা অনুযায়ী মারইয়াম মিগদলি এবং যাকোবের মাতা মারইয়াম সুগন্ধিদ্রব্য কিনেছিলেন যিশুর গায়ে মাখানোর জন্য।

দ্বাদশ

কবরে প্রবেশ করার পর মারইয়াম সেখানে একজন যুবককে দেখতে পেলেন। এটা হলো মথি ও মার্কের বর্ণনা। পক্ষান্তরে লুক ও যোহনের বর্ণনামতে কবরের ভেতর যুবকের সংখ্যা ছিল দুইজন।

৩৭৫] *আল-মাসিহ ফিল মাসাদিরিল আকাইদিল মসিহিয়্যাহ*, ২৭২

ত্রয়োদশ

মথি বলেছেন, যিশু তাদেরকে বললেন! তোমরা ভয় কর না। তোমরা যাও এবং আমার ভাইদেরকে গালিলে যেতে বল। সেখানেই তারা আমাকে দেখতে পাবে।

পক্ষান্তরে মার্ক এবং লুকের বর্ণনামতে কথা বলা ব্যক্তিটি যিশু ছিলেন না। অন্য কেউ তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, "মসিহ্ উঠে গেছেন। তিনি এখানে নেই।"

চতুর্দশ

যোহন বলেন, "সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মগ্দলীনী মারইয়াম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন, কবর হইতে পাথরখানি সরান হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়াইয়া শিমোন পিতরের নিকটে, এবং যীশু যাহাকে ভালবাসিতেন, সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে; তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে, আমরা জানি না।"[৩৭৬]

পঞ্চদশ

মথি বলেন, "বিশ্রামদিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে, মগ্দলীনী মারইয়াম ও অন্য মারইয়াম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেখ, মহা-ভূমিকম্প হইল; কেননা, প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখানি সরাইয়া দিলেন, এবং তাহার উপরে বসিলেন।"[৩৭৭]

পক্ষান্তরে মার্কের বর্ণনা হলো, "তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার হইতে কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরাইয়া দিবে? এমন সময় তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, পাথরখানি সরান গিয়াছে; কেননা, তাহা অতি বৃহৎ ছিল।"[৩৭৮]

উভয়ের বর্ণনা কাছাকাছি। ফিরিশতারা নারীদের উপস্থিতিতেই কবরের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লুক এবং যোহনের বর্ণনা ভিন্ন। তাদের ভাষ্যমতে মহিলারা দেখল পাথর পূর্বেই সরানো হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই দুই বর্ণনার কোনো একটি ভুল।

---

[৩৭৬] *যোহন*, অধ্যায় : ১৯, অনুচ্ছেদ : ১-২।

[৩৭৭] *মথি*, অধ্যায় : ২৮, অনুচ্ছেদ : ১-২।

[৩৭৮] *মার্ক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ৩-৪।

যিশুর কবর থেকে উত্থানসংক্রান্ত বর্ণনায় মথি বলেন, "তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন-কার্য দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর[৩৭৯] চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"[৩৮০]

কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই চিহ্ন দুটি সংঘটিত হয়নি। কেননা, সুসমাচারগুলোর বর্ণনামতে মসিহকে দাফন করা হয়েছিল জুমাবার সন্ধ্যায়। এরপর শনিবার সারা দিন এবং পরবর্তী রাত তিনি কবরে ছিলেন। পরদিন ভোরে তিনি কবর থেকে উঠে আসেন। সে হিসেবে তার কবরে অবস্থানকালীনের ছিল এক দিন দুই রাত।

একইভাবে বলা হয়েছিল, কবর থেকে উত্থানের বিষয়টি দুষ্ট জাতির নিদর্শন হবে। কিন্তু এটাও হয়নি। দুষ্ট জাতির জন্য নিদর্শন হওয়া তো দূরের কথা, এটি স্বয়ং শিষ্যদের জন্যও নিদর্শন হতে পারেনি। কেননা, তাদের অধিকাংশই সন্দেহের মধ্যে ছিল বাস্তবেই যিশু কবর থেকে উঠেছে কি না?

মথি বলেন, "পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন।"[৩৮১]

মার্ক বলেন, "তৎপরে সেই এগার জন ভোজনে বসিলে তিনি তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; কেননা, তিনি উঠিলে পর যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই।"[৩৮২]

এই হলো শিষ্যদের অবস্থা। অপরদিকে ইহুদিরা লোকদের মাঝে এ কথা প্রচার করল যে, শিষ্যগণ মসিহের লাশ চুরি করেছে। এই সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের কেউই বিশ্বাস করেনি।

---

[৩৭৯] এখানে ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা বলা হচ্ছে। খ্রিষ্টানদের গ্রন্থগুলোর বাংলা অনুবাদে নবী শব্দের অনুবাদে ভাববাদী লেখা হয়েছে।—নিরীক্ষক।

[৩৮০] *মথি*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ৩৮-৪০।

[৩৮১] *মথি*, অধ্যায় : ২৮, অনুচ্ছেদ : ১৬-১৭।

[৩৮২] *মার্ক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৮।

মথি বলেন, “তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, প্রহরি-দলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর যদি এই কথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব। তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কার্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা অদ্য পর্যন্ত রহিয়াছে।”[৩৮৩]

এভাবেই মসিহের মৃত্যু থেকে উত্থান পর্যন্ত বর্ণনার সূচনা হয় এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মজার বিষয় হলো, মসিহের উত্থান এর ঘোষণাটিও ছিল বিলম্বিত। পিতর ও অন্যান্যদের অস্বীকৃতির কারণে ঘোষণা দিতে ছয় সপ্তাহ বিলম্ব করা হয়। ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ দিন পর সাধারণ খ্রিষ্টানদের মাঝে এটি প্রচারিত হয়। যিশুর ঊর্ধ্বারোহণের ষাট বছর পর লিখিত প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লুক বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সপ্তদশ

উক্ত ঘটনায় শুধু মথির বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, প্রধান যাজকগণ ও ফরিশিরা পিলাতের কাছে গিয়ে তিন দিন কবর পাহারা দেওয়ার জন্য একজন লোক চেয়েছিল। কিন্তু পিলাত অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, “তোমাদের নিকটে প্রহরী-দল আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করো।”[৩৮৪]

এটি একটি বিরোধপূর্ণ বানোয়াট ঘটনা। কেননা, ইহুদিরা নিজেরাই ছিল কবরের পাহারাদার। অথচ অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে, “তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও

---

[৩৮৩] *মথি,* অধ্যায় : ২৮, অনুচ্ছেদ : ১১-১৫। অর্থাৎ, মথি কর্তৃক সুসমাচারটি লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত চুরির বিষয়টি ইহুদিদের মাঝে প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য, মথির সুসমাচারটি লিপিবদ্ধ হয় খ্রিষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে। সুতরাং, দুষ্ট জাতির জন্য এটি নিদর্শন হয়নি। খ্রিষ্টানদের উচিত এর যথার্থ কোন ব্যাখ্যা দেয়া।

[৩৮৪] বাইবেলের আরবি অনুবাদে এভাবেই বর্ণনা এসেছে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো বাংলা অনুবাদে এসেছে, “তখন পীলাত তাঁদের বললেন, পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন সেইভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।”-অনুবাদক।

যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"[৩৮৫]

প্রশ্ন হলো, ইহুদিরা নিজেরাই যদি পাহারাদার হয়ে থাকে তাহলে এই ঘুষের কী প্রয়োজন ছিল? কাকেই বা এই ঘুষ দেওয়া হলো? সৈনিকগণই বা কোত্থেকে এল? পিলাত তো ইহুদিগণ কর্তৃক কবর পাহারা দেওয়ার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আমি অবাক হই সুসমাচারের লেখকের ওপর। রচনার সময় সাধারণ বিষয়গুলো পর্যন্ত তিনি খেয়াল রাখেননি।

অষ্টাদশ

মার্ক তার সুসমাচারের শেষে বলেন, "আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও ব্যাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।"[৩৮৬]

এই ঘটনায় সত্য-মিথ্যার মিশেল রয়েছে।

সত্য অংশ হলো, আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ইনজিল নামক একটি কিতাব নাজিল করেছেন। তিনি তার অনুসারীদের এই ইনজিলের সুসংবাদ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের সেই ইনজিল তাদের কাছে এখন আর নেই। তাদের কাছে রয়েছে বিরোধপূর্ণ চারটি সুসমাচার। এই চারটি সুসমাচার চারজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রচনা করেছেন। এই চারটির একটিও প্রকৃত ইনজিল নয়। এগুলোর প্রত্যেকটি ঈসা আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের বহু পরে রচিত হয়েছে।

মিথ্যা অংশ হলো, বিশ্বাসীদের যে নিদর্শনের কথা মার্ক বলেছেন সেগুলো।

ইবনে হাজম বলেন, "স্পষ্টতই এটি একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কেননা, তাদের কেউই এমন ভাষায় কথা বলেনি, যে ভাষা সে শিখেনি। কাউকেই অপবিত্র অবস্থায় দেশান্তরিত

[৩৮৫] *মথি*, অধ্যায় : ২৮, অনুচ্ছেদ : ১২-১৩।
[৩৮৬] *মার্ক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৮।

করা হয়নি। বিষপান করে আক্রান্ত না হওয়ার কোন ঘটনাও ঘটেনি। বরং তারা স্বীকার করে থাকে যে, সুসমাচারের লেখক যোহন নিজেই বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা তো নয়ই কোনো নবিও কোনোদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। তারা প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা ব্যর্থও হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, সুসমাচারের লেখকদের জন্য মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা একেবারে নস্যি।"[৩৮৭]

এভাবেই ক্রুশের ঘটনা, মসিহের কবর এবং সেখান থেকে উত্থানের ঘটনায় সুসমাচারগুলো বিভ্রান্তিমূলক ও বিরোধপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে। বিরোধগুলো একেবারে সুস্পষ্ট। কেননা, এটি একাধিকবার সংঘটিত কোনো ঘটনা নয়। একটিমাত্র ঘটনার বর্ণনায় এত বৈপরীত্য কীভাবে সম্ভব? এই বড় বড় বৈপরীত্যগুলো ক্রুশের ঘটনায় খ্রিষ্টানদের বর্ণনার প্রতি আস্থা রাখার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নড়বড়ে করে দেয়। অথচ এই বর্ণনাগুলোই আজকের খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই খ্রিষ্টানরা সুসমাচারগুলোর এই বিরোধ ও বৈপরীত্যেকে স্বীকার করে আসছে। যেমন তাদের একজন প্রসিদ্ধ লেখক হাবিব সাইদ বলেন—

"কোনো চলচাতুরির আশ্রয় না নিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই বর্ণনাগুলোতে অবশ্যই বিরোধ, অসংগতি ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই বিষয়গুলো নজরে এসেছে। বিদ্বেষীরা এটাকেও ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনার বিষয়ে পরিণত করেছে। সে সময়ের সমালোচনা শুধু মথি ও লুক কর্তৃক বর্ণিত যিশুর বংশপরম্পরা এবং যোহন কর্তৃক বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিকতার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ সুসমাচারগুলোর লেখকগণ কখনোই ইনজিলের বর্ণনাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সঠিক দাবি করেননি। যুগে যুগে লেখকদের ক্ষেত্রে যা হয় ঠিক তেমনি তারাও নিজেদের বুদ্ধি ও মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সুতরাং এ সুসংবাদগুলোর মাঝে সামান্যতম নয়, বরং বড় রকমের অসংগতি আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আর সেসব বৈপরীত্যের কার্যকারণ বের করাও কঠিন কোনো কাজ নয়। পরবর্তী যুগের পণ্ডিতগণ এ সসম্যাগুলোর সমাধানে দারুণ সব কাজ করে গেছেন।"[৩৮৮]

এই কয়েকটি লাইনই সেই ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বংশনামা বর্ণনার ক্ষত্রে খ্রিষ্টবাদের যৌক্তিকতার মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। অথচ তারা সেসব কিতাব ও লেখকদেরকে পুতঃপবিত্র এবং সাধুজ্ঞান করে থাকে।

---

[৩৮৭] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল*, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৫৬।

[৩৮৮] *আদইয়ানুল আলাম*, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

আমি মনে করি, যারা সুসমাচারগুলোর বর্ণনার বৈপরীত্য ও অসংগতিগুলোকে হালকা করে দেখাতে চান তাদের দাবিকে খণ্ডন করার জন্য এই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোর ব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট।

চার্লস গিজেনবার্ট (Charles Guiguenbert) বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "সুসমাচারগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে ক্রুশের ঘটনার অনেক কিছুই বিশ্বাসীদের স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এর লেখকগণ প্রাচ্যের বিভিন্ন রূপকথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।"[৩৮৯]

এরপর তিনি বলেন, "এভাবেই আমরা ঈসার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম নই। একইভাবে তার জীবনের ঘটনাপ্রবাহের রেফারেন্সসমৃদ্ধ সুনিপুণ বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়।"[৩৯০]

নব খ্রিষ্টবাদের জনক পোল এর দাবি এসবকিছুকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। তিনি বলেন, "তাহার পরে তিনি একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে। তাহার পরে তিনি যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দেখা দিলেন।"[৩৯১]

এখান থেকে বোঝা যায়, মসিহের কবর থেকে উত্থানবিষয়ক আকিদায় প্রথম যুগ থেকেই অনুসারীদের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। পোল ছিলেন এই আকিদার অন্যতম আহ্বায়ক। সুসমাচারের লেখকগণ এই আকিদাটি তার কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, পোলের চিঠিগুলো[৩৯২] সুসমাচারগুলোর কয়েক দশক আগে লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম চিঠিটি ছিল করিন্থিয়বাসীদের প্রতি লেখা। সেখানে পোল কবর থেকে উত্থানের আকিদা অস্বীকারকারীদের তুমুল সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও ত উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আবার আমরা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে;

---

[৩৮৯] *আল-মসিহিয়্যাহ ওয়া নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা*, পৃষ্ঠা : ২৯।

[৩৯০] প্রাগুক্ত।

[৩৯১] *করিন্থিয় ১ম*, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ৬-৮, বিষয়টি হলো, খ্রিষ্টানদের বর্ণনাগুলোর মতে মসিহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিলেন। অথচ পোল খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন পঁয়ত্রিশ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ মসিহের ঊর্ধ্বারোহণের সাত বছর পর।

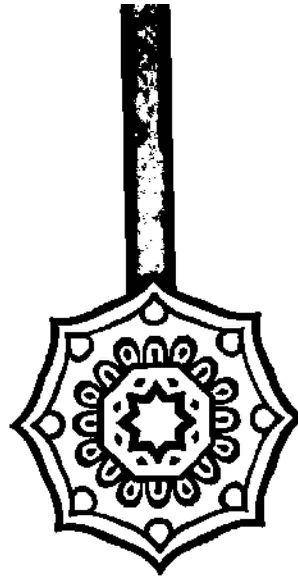
[৩৯২] কোনো কোনো খ্রিষ্টান লিখকের মতে এই চিঠিগুলো ৫০-৬০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথম সুসমাচারটি লিখিত হয় ৭০ খ্রিষ্টাব্দে। *আদইয়ানুল আলাম*, পৃষ্ঠা : ২৭২।

কারণ, আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই।"[৩৯৩]

এই বক্তব্যে তিনি মূলত মসিহের প্রিয় শিষ্য শিমোন পিতরকে উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা, পিতর মসিহের কবর থেকে উত্থানের বিষয়কে অস্বীকার করতেন। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়ার মহাসভার আগ পর্যন্ত এই আকিদাটি গ্রহণ করা নিয়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে বড় দ্বন্দ্ব ছিল। উক্ত মহাসভায় তারা অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে কবর থেকে উত্থানের আকিদাসহ আরও অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই মহাসভা-সংক্রান্ত আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।



[৩৯৩] *করিন্থিয় ১ম,* অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৫।



মসিহ আলাইহিস সালামের
ঊর্ধ্বারোহণের পর খ্রিষ্টানদের অবস্থা

মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের পর তার অনুসারীরা ইহুদিদের জুলুমের ভয়ে ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে যায়। কেননা, তাদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র তখনো শেষ হয়ে যায়নি। তারা সম্রাট হেরোড এর উত্তরাধিকারী প্রথম হেরোড অ্যাগ্রিপা (৪১-৪৪ খ্রি.)-এর দরবারে ধরনা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা মসিহের শিষ্য পিতরকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আরেক শিষ্য যাকোবকে তারা হত্যা করে। যাকোবের মৃত্যুর পর যাকোব বিন যোসেফ[৩৯৪] এর হাতে ধর্মীয় নেতৃত্ব আসে।

---

[৩৯৪] যাকোব বিন যোসেফ = তার বংশ পরিচয় নিয়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে তিনি যোসেফ এর পূর্বের স্ত্রীর সন্তান। আবার অনেকে মনে করেন তিনি মারইয়ামের বোনের সন্তান। কারও কারও মতে তিনি যোসেফের ভ্রাতুষ্পুত্র। আবার তাদের অনেকে বলে থাকেন, তিনি যোসেফ-মারইয়ামের সন্তান। মসিহের পর তার জন্ম হয়। এসব বর্ণনার মধ্যে বিশুদ্ধ কোনটি তা আল্লাহই ভালো জানেন। খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।

এই ব্যক্তি মসিহের জীবদ্দশায় তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি। যোহন, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৫। মসিহ এর ঊর্ধ্বারোহণের পর জেরুজালেমে পোল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ১৩। অতঃপর পোল তাকে নিজের খ্রিষ্টবাদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে যুক্ত করেন। এজন্যই আমরা যাকোবকে পোলের মতবাদ প্রতিষ্ঠার বড় সহযোগী হিসেবে দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, তাদের একটি চিন্তাধারা এই ছিল

তখন থেকে জেরুজালেমে খ্রিষ্টানগণ দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলের মত হলো, অ-ইহুদি থেকে যারা পোলের খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদের জন্য মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের প্রতিপালন জরুরি নয়। পক্ষান্তরে আরেক দলের বক্তব্য হলো, যারাই মসিহের আনীত ধর্মে প্রবেশ করবে তাদেরকে অবশ্যই মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের প্রতিপালন করতে হবে। বিশিষ্ট শিষ্য পিতর ছিলেন এই দ্বিতীয় মতের সমর্থক। আর প্রথম মতের প্রচারক ছিলেন পোল। এ নিয়ে পিতর ও পোলের বাদানুবাদ হয়। পোল পিতরকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের মত নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মত আচরণ কর, তবে কেন পরজাতিগণকে যিহূদীদের মত আচরণ করিতে বাধ্য করিতেছ?"[৩৯৫]

এদিকে ইহুদি এবং মসিহের অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ তখনো শেষ হয়নি। তাই দেখা যায় সম্রাট ক্লডিয়াস (Claudius)-এর সময়ে ৫১/৫২ খ্রিষ্টাব্দে রোমে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে দাঙ্গা হয়। এমনকি তাদের এই বৈরিতার বিপজ্জনক পরিণতি নিয়ে সম্রাট নিজেও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন। এরপর রোমান সম্রাট নিরো (Nero) ক্ষমতায় বসে ৬৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পোল এবং তার কতেক অনুসারীকে বন্দি করেন। এরপর তাদেরকে হিংস্র জানোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করেন। জানোয়ারগুলো তাদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। তার ক্রোধ প্রচণ্ডাকার ধারণ করে যখন তিনি জানতে পারেন যে, খ্রিষ্টানরা পৌত্তলিক রোমানদের অপছন্দ করে। অতঃপর তার নির্দেশে বন্দিদের শরীরে আলকাতরা মাখানো হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে মশাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর পোলকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।

বলা হয়ে থাকে, নিরোর এমন নৃশংস অত্যাচারের মূল কারণ ছিল একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডে বিভিন্ন গ্রিক শিল্পকলা, উপাসনাগৃহ এবং বড় বড় প্রাসাদ পুড়ে গিয়েছিল। চোদ্দটি গ্রামের মধ্যে মাত্র চারটি গ্রাম রক্ষা পেয়েছিল। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দায় চাপানো হয় খ্রিষ্টানদের ওপর। কেননা, তারা পৌত্তলিক উপাসনাগৃহ ও মূর্তির ঘরগুলোকে অপছন্দ করত।

যে, ইহুদি ছাড়া অন্য যারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে তাদের জন্য মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের প্রতিপালন জরুরি নয়। ৬২ খ্রিষ্টাব্দে যাকোব বিন যোসেফকে তার গুরু পোলের মতোই পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

[৩৯৫] *গালাতিয়*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ১৪।

নিরোর পর যুগ যুগ ধরে চলা এই নিপীড়নের এটিই একমাত্র কারণ বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাই নিপীড়নের এই ইতিহাস বর্ণনার পূর্বে এর কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি। নিম্নে কারণগুলো তুলে ধরা হলো।

এক

রোমান শাসনের অধীনে ইহুদিরা ছিল একটি সুগঠিত সংঘবদ্ধ জাতি। সেখানে খ্রিষ্টবাদ নতুন একটি দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহুদিদের কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তি থাকলেও রোমানরা তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ঐতিহ্যগত রীতি-নীতি পালনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু নতুন একটি দলের উত্থান এবং স্বাধীনভাবে তাদের মতাদর্শ বাস্তবায়ন করতে দিতে তারা রাজি ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করত, এই নতুন ধর্ম গ্রহণের কারণে খ্রিষ্টানগণ বড় ধরনের অন্যায় করে ফেলেছে। এ ছাড়াও রোমান শাসকগোষ্ঠীকে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার পেছনে ইহুদিদেরও দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ছিল।

খ্রিষ্টান লেখক হাবিব সাইদ বলেন—

"যেহেতু ইহুদিরা স্থানীয়দের পূজনীয় দেব-দেবীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ছেড়ে দিয়েছিল এবং নিজেরা নিজেদের অসামাজিক ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ভোগ করছিল তাই বলা যায় এখানে অন্যকিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। মসিহ-শিষ্যদেরকে এমন সব বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল যেগুলো থেকে ইবরাহিমের বংশধররা নিষ্কৃতি পেয়েছিল। উভয় জাতির মাঝে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট। প্রাচীনদের দৃষ্টিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আর তা হলো ইহুদিরা ছিল একটি জাতি। আর খ্রিষ্টানরা ছিল একটি উপদল।"[৩৯৬][৩৯৭]

দুই

প্রথমদিকের খ্রিষ্টানরা রোমান সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রোমানদের যাবতীয় দেব-দেবতার সাথে সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল। কেননা, মসিহ তাদেরকে যাবতীয় শিরক ও পৌত্তলিকতা ছেড়ে নিখাদ তাওহিদের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। ফলে

---

[৩৯৬] *তারিখুল মসিহিয়্যাহ-ফজরুল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৩।

[৩৯৭] যেহেতু খ্রিষ্টবাদের উদ্ভবটাই ইহুদিদের মধ্য থেকে তাই ইহুদিদের একটি জাতি বিবেচনায় নিয়ে খ্রিষ্টানদেরকে তাদের একটি বিচ্ছিন্ন উপদল বিবেচনা করা হত। আর স্বয়ং মাসিহ নিজেই বলেছেন যে, তিনি বনি ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং গবেষকগণ খ্রিষ্টবাদকে ইহুদি ধর্মের ভিত্তির উপর গড়ে উঠা একটি মতবাদ এবং খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদিদের একটি উপদল বিবেচনা করা আশ্চর্যের কিছু নয়। -অনুবাদক

পৌত্তলিকগণ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে এবং তাদেরকে ধর্মত্যাগী ও কাফির আখ্যায়িত করতে শুরু করে।

তিন

প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে কিছু মারাত্মক ভুল সংঘটিত হয়েছিল। পৃথিবীর নশ্বর হওয়া এবং শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস যখন তাদের মনে গেঁথে গেল এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো কেয়ামত দিবসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের প্রতি তাদের গুরুত্বারোপ লোপ পেল। ফলে আসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আন্তরিক মহব্বত স্পষ্টতই রোমান সাম্রাজ্যের কল্যাণকামিতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। উদাহরণস্বরূপ, সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়াকে তারা সিংহের বাসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অহেতুক প্রাণ বিসর্জন দেওয়া মনে করত। এককথায় অক্ষমতার অজুহাতে তারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। তাদের স্লোগান ছিল, “আমি সমাজকে ত্যাগ করলাম।” দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক টরটেলিয়ান (Tertullian) তাঁর রচনায় এ কথা স্বীকার করেছেন যে, “খ্রিষ্টানদের অনেকেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু স্বীয় দায়িত্ব পালনে তারা একনিষ্ঠ ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব থেকে যারা গা বাঁচিয়ে চলে এবং রাষ্ট্রের সেবা করতে অনাগ্রহী তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমার চোখে দেখে না। টরটেলিয়ান তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সামরিক দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করতে। তার এই পরামর্শ মোতাবেক অনেকেই সামরিক দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল।”[৩৯৮]

চার

রোমান হুকুমত প্রজাদের ওপর একধরনের কর আরোপ করেছিল। অন্যরা এটি আদায় করলেও খ্রিষ্টানরা পৌত্তলিক নেতার হাতে তা সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তারা শীঘ্রই পৃথিবী ধ্বংসের অপেক্ষা করছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী ধ্বংসের এই আকিদার প্রবর্তক ছিলেন পোল। খ্রিষ্টবাদের সূচনাতেই সে এই আকিদা ছড়িয়ে দেয়। এই আকিদা এবং অদ্যাবধি এর বাস্তবায়ন না হওয়ায় খ্রিষ্টানরা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমনকি তারা নিজেরাই গির্জাবিরোধী হয়ে ওঠে। এমনকি অনেকেই ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণকারীতে পরিণত হয়।

---

[৩৯৮] *কিসসাতুল হাদারাহ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭২।

পাঁচ

রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিষ্টবাদের যতটা না বিরোধিতা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি বিরোধিতা হয়েছিল সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে। কেননা, শাসকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও মার্জিত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ খ্রিষ্টানদের এই বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষা দীক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়কে মেনে নিতে পারেনি। তারা এ সমস্ত ধর্মদ্রোহী ও দেবতা অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতে শাসকদেরকে উৎসাহ দেয়। টরটেলিয়ান জনতার এই ব্যাপক ঘৃণার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৩৯৯]

এসব কারণ তো ছিলই। এর বাইরেও বিভিন্ন কারণে খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। নির্যাতনের এই ধারা চলতে থাকে কয়েক শতাব্দী।

দ্বিতীয় শতাব্দী

দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে ১০৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ট্রাজান (Trajan) রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার সময়ে খ্রিষ্টানদের ওপর নানাবিধ শাস্তির খড়গ নেমে আসতে শুরু করে। প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক, যোহনের শিষ্যবৃন্দ এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের তিনি হত্যা করেন। নির্যাতনের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল যে, খ্রিষ্টানরা গোপনে তাদের ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করতে বাধ্য হয়। সালাত, ওয়াজ-নসিহত, মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত ইনজিলের তেলাওয়াত সবই গোপনে করতে হতো।

এ সম্পর্কে *তারিখুল হাদারাহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, “একজন এশিয়ান শাসক ব্লেইন (Blaine) সম্রাট ট্রাজানের কাছে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি খ্রিষ্টানদের সাথে তার আচরণের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন : খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হিসেবে অভিযুক্তদের সাথে আমি নিম্নোক্ত আচরণ করেছি। প্রথমেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তারা খ্রিষ্টান কি না? নিজেদেরকে খ্রিষ্টান দাবি করলে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মতো জিজ্ঞেস করি এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাই। এরপরও যদি তারা অটল থাকে তখন আমি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিই। কেননা, আমি মনে করি তাদের এই জঘন্য অপরাধ ও কঠোর একগুঁয়েমির শাস্তি এটাই হওয়া উচিত। আমি আরও অনেকের ব্যাপারে খ্রিষ্টান হওয়ার অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু তারা নিজেদের খ্রিষ্টান হওয়াটাকে অস্বীকার করেছে। আমি তাদের সামনে দেবতাদের নাম উল্লেখ করেছি। তারা তাদের

---

[৩৯৯] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭২।

পুজো দিয়েছে। তাদের সামনে আমি দেবতাদের প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেছি। তারা সেগুলোর সামনে প্রসাদ ছড়িয়েছে এবং ধুপ জ্বালিয়েছে। এমনকি তারা মসিহকেও গালি দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে প্রকৃত খ্রিষ্টানদের বাধ্য করা কঠিন। তাদের অনেকেই নিজেদেরকে খ্রিষ্টান হিসেবে স্বীকার করে। কিন্তু তারা এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, তাদের অপরাধ হলো কোনো কোনো দিন তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রভু হিসেবে মসিহের ইবাদতের জন্য সমবেত হয়। তার সম্মানে তারা শ্লোক পাঠ করে। এরপর তারা শপথ নেয় যে; চুরি করবে না, মানুষ হত্যা করবে না, যিনা করবে না, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। বাস্তবতা উদঘাটনের জন্য আমি দুজন নারীকে শাস্তি দিলাম যাদের ব্যাপারে বলা হতো যে এরা গির্জাকে ভয় করে। কিন্তু আমি দেখলাম তাদের এগুলো সব কাল্পনিক ও অতিরঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৪০০]

এ যুগে খ্রিষ্টানদের অপবিত্রজ্ঞান করা হতো। গোসলখানা এবং জনসমাবেশস্থলে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অনেক সময় তাদেরকে হিংস্র জন্তুর সামনে ছেড়ে দেওয়া হতো। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য মানুষ জড়ো হতো এবং এই হিংস্রতা উপভোগ করত।[৪০১]

খ্রিষ্টানদের পেছনে এসব ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিল ইহুদিরা। *সদর হাদরু-রদস*[৪০২] গ্রন্থে বলা হয়েছে, "রাব্বি যিহুদা রোমান সম্রাটের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি নাসেরিদের[৪০৩] সম্পর্কে সম্রাটের কাছে প্রোপাগান্ডা চালান। তিনি সম্রাটকে বলেন, এরাই ছোঁয়াচে রোগের কারণ। এর ওপর ভিত্তি করে হিব্রু ৩৯১৫ সাল মোতাবেক ১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সকল নাসেরিদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, "সম্রাট মার্ক অরেল (Mark Aurel) ইহুদিদের যোগসাজশে সকল নাসেরিদের হত্যা করেন।"

তৃতীয় শতাব্দী

তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট ডেসিয়াস (Decius) (২৪৯-২৫১খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রিষ্টানদের প্রতি নির্যাতন ও জুলুমের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের সকলকে

---

[৪০০] *মুহাদারাত ফিন নাসরানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৩৫-৩৬।

[৪০১] *আল-ইদত্তিহাদুদ দীনি ফিল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৩৫।

[৪০২] একটি গ্রন্থের নাম। তবে শব্দটির বানান ও উচ্চারণে সন্দেহ রয়ে গেল। নানা উৎস ঘাঁটাঘাঁটি করেও নিশ্চিত হওয়া গেল না।— সম্পাদক।

[৪০৩] ঈসা আলাইহিস সালাম গালিলের নাসরত এলাকাকে কেন্দ্র করে তার দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন বিধায় তার অনুসারীদেরকে নাসেরি নামে অভিহিত করা হয়। -অনুবাদক

ছাড়িয়ে যান। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ যিনি ডেসিয়াসের নির্যাতন ও ধড়পাকড় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি বর্ণনা দেন যে, "অতিমাত্রায় ভয়ের কারণে আমরা দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে পারছিলাম না। আমাদের পূর্ববর্তী শাসকের চেয়ে পরবর্তী শাসক আরও বেশি নিষ্ঠুর ও দয়াহীন হতো। যাই হোক, শাসকের পরিবর্তন হলো। সিংহাসনে বসতে না বসতেই সে আমাদের দিকে নজর দিলো। শুরু করল নিপীড়ন। জারি করল অন্যায়মূলক কঠিন থেকে কঠিনতর নির্দেশ। ফলে আমাদের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। সকলের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই পালিয়ে গেল। এই শাসক যোগ্যতার বিবেচনা না করেই রাষ্ট্রীয় সমস্ত দায়িত্ব থেকে খ্রিষ্টানদেরকে অব্যাহতি দিলো। ত্বরিৎ একেকজনকে ধরে আনত। তাকে তাদের উপাসনাগৃহে প্রবেশ করাত। বাধ্য করত দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও নৈবেদ্য প্রদান করতে। বলি প্রদানে কেউ অস্বীকৃতি জানালে মূর্তির সামনে তাকেই বলি দেওয়া হতো। দুর্বল ঈমানদাররা ধর্ম ত্যাগ করল। অনেকেই ঈমান রক্ষায় পালিয়ে গেল। আবার অনেকেই বন্দি হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।"

ডেসিয়াসের পর শাসন ক্ষমতায় আসলেন ডায়োক্লেটিয়াস (Diocletius)। তিনি লোকমুখে দিকিয়ানুস নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অন্যদের মতো কঠোর ছিলেন না। খ্রিষ্টানরা তার কাছ থেকে ভালো কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। কারণ, তার বিশেষ ব্যবস্থাপক ছিলেন একজন খ্রিষ্টান। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিশরের খ্রিষ্টানরা রোমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করতে লাগল। একজনকে তাদের নেতাও বানিয়ে নিল। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর জানতে পেরে দিকিয়ানুস ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে মিশরে এসে পৌঁছান। শুরু করলেন খ্রিষ্টানদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান। তাদের গির্জাগুলো ধ্বংস করলেন। ধর্মীয় পুস্তকগুলো পুড়িয়ে ফেললেন। গির্জার যাজক ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ২৮৪ খ্রিষ্টাব্দের এই ঘটনায় প্রায় তিন লক্ষ লোক নিহত হয়।

এই সময়টাতে তাওহিদবাদী মুমিনদের একটি দল পালিয়ে পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফে বলা হয়েছে—

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا . إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا .

আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে, তখন দুআ করে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ৯-১০]

পরবর্তীতে সম্রাট দ্বিতীয় থিউডোসিয়াস (2nd Theodosius)-এর সময়ে এদের ঘুম ভাঙে। উল্লেখ্য, সম্রাট থিউডোসিয়াস ৪০৮-৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মেও দীক্ষিত হন। তার সময়কালে ৪৪৫ কিংবা ৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এই যুবকগণের ঘুম ভাঙে।[৪০৪]

এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্যপত্র হলো সিরীয় খ্রিষ্টান পাদরি জেমস স্রোজি এর বর্ণনা। যিনি ৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে গুহাবাসীদের জেগে ওঠার দু-বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।[৪০৫] তিনি ছিলেন শাম অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট পাদরি। ৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার নসিহতগুলোকে সুরিয়ানি ভাষায় সংকলন করেন। তার এই বর্ণনা আল্লামা তাবারিসহ আরও অনেক মুফাসসিরিনের হস্তগত হয়। তাফসিরের কিতাবে গুহাবাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা এই বর্ণনা থেকেও অনেক কিছুই উল্লেখ করেছেন। জেমস এর এই বর্ণনা ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদদের জন্য গুহাবাসীদের ঘটনার একমাত্র রেফারেন্স বই হলো এটাই।

---

[৪০৪] এ হিসেবে তাদের গুহায় অবস্থানকাল ছিল ১৬৬ বছর। কিন্তু সেক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। কেননা কুরআনে তাদের অবস্থানকাল তিনশ আরও অতিরিক্ত নয় বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এটাই উদ্দিষ্ট ও সঠিক সংখ্যা যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে অবহিত করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুফাসসিরের মত হলো সংখ্যাটা আহলে কিতাবের বর্ণনা, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন। এখানে আহলে কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। প্রকৃত সময়কাল বিবৃত করা উদ্দিষ্ট নয়। তাই তো কুরআনে এর পরেই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, 'قل الله أعلم بما لبثوا' অর্থাৎ, 'আপনি বলে দিন, আল্লাহই ভালো জানেন তারা কতদিন অবস্থান করেছিল।" যদি উল্লিখিত সংখ্যাটাই নির্ভুল সময়কাল হতো তাহলে পরে এই কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহসহ আরও অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন *তাফসিরে ইবনে জারির তাবারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৫২

[৪০৫] একটু আগেই লেখক উল্লেখ করেছেন গুহাবাসীরা ৪৪৫/৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জেগে উঠেছিল। আর জেমসের জন্ম বলা হচ্ছে ৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে। সে হিসেবে গুহাবাসীদের জেগে উঠার কমপক্ষে ছয় বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে সময়ের পার্থক্য মাত্র দু-বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হয়তো টাইপিং মিসটেক নতুবা লেখকের অসতর্কতায় হয়ে গিয়েছে বলে আমরা মনে করি।-অনুবাদক

এ শতাব্দীতে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক নিজেদের দ্বীন রক্ষার্থে খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত নিয়ে ইরানে হিজরত করেন। জরাথ্রুস্টীয় কাউকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত না করার শর্তে ইরানি শাসকবর্গ তাদেরকে ধর্মমত প্রচারের অনুমতি দেন।

খ্রিষ্টানদের এই গ্রুপটি নিরাপত্তার সাথে ইরানে অবস্থান করতে থাকে। রোমান সম্রাট কনস্টানটিন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কনস্টানটিন ছিলেন খ্রিষ্টানদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ। তিনি সকল খ্রিষ্টান বন্দিকে মুক্তি দেন। এমনকি খ্রিষ্টধর্মকে রোমানদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। পৌত্তলিক রোমান সাম্রাজ্যকে খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যে পরিণত করার জন্য বহু খ্রিষ্টানকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত করেন।

এদিকে ইরানে অবস্থানরত খ্রিষ্টানরা যখন রোম সম্রাটের খ্রিষ্টানপ্রীতি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা নিজেরাও সম্রাটের প্রতি আগ্রহী ও আন্তরিক হয়ে উঠল। কিন্তু রোমান ও ইরানিদের মাঝে ছিল তুমুল বৈরীভাব। সেই সূত্র ধরে ইরানি সরকার নিজেদের দেশে অবস্থানরত খ্রিষ্টানদের ওপর রোম সম্রাটের সাথে সম্পর্কের অপরাধে নির্যাতন শুরু করে। পরিশেষে ৩৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উভয় সাম্রাজ্যের মাঝে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হলে এই দুঃসময়ের ইতি ঘটে।

ইরানে যাপিত সময়টা খ্রিষ্টানদের আকিদা-বিশ্বাসে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে। পরিবেশের প্রভাবে জরাথ্রুস্টীয় বিভিন্ন পৌত্তলিক আকিদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ-সম্পর্কিত আলোচনায় এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ শতাব্দী

চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সম্রাট কনস্টানটিন এর খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠোর প্রকৃতির ছিল হলিক্রস, যার উদ্দেশ্য ছিল মসিহকে অস্বীকারকারী সকল রোমানদের মূলোৎপাটন করা। দীর্ঘ তিন শতাব্দী যাবৎ জুলুমের শিকার হয়ে আসা খ্রিষ্টানরা পৌত্তলিক রোমানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। এ সময়ে তারা হিংস্রতার দিক থেকে বিগত সময়ের রোমানদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। এমনকি এ সময়টাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বীভৎস সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই জুলুম-নির্যাতন শুধু কাফির ও পৌত্তলিকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বকে অস্বীকারকারী খ্রিষ্টানরাও এই নিপীড়নের শিকার হয়। কেননা, রোমান সম্রাট কনস্টানটিনপোল কর্তৃক প্রচারিত খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাই বিরুদ্ধবাদীদের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চলতে শুরু করে।

এজন্যই দেখা যায়, এ শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে পোল ও অন্যান্য কিছু ইহুদির উদ্দেশ্যমূলকভাবে খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশের পরই আকিদাগত এই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

তাওহিদবাদী খ্রিষ্টান বিশ্বাসীগণ এবং মসিহ এর প্রভুত্বের দাবিদার পোলের অনুসারীদের মাঝে দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। জুলুম-নির্যাতনের সময়ে রচিত কিতাবগুলো পোলের মতবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। বিশেষ করে সুসমাচারসমূহ এবং পত্রাবলি। এজন্যই আমরা এগুলোতে অর্থ ও বাচনভঙ্গি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিরোধ দেখতে পাই। এমনকি এ সময়ে এই পুস্তকগুলোর সনদও হারিয়ে যায়।

শায়খ রহমতুল্লাহ কিরানবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ইযহারে হকে* বলেন, "আমরা বহুবার তাদের বিশেষজ্ঞ উলামাদের কাছে তাদের গ্রন্থগুলোর অবিচ্ছিন্ন সনদ উপস্থাপনের দাবি করেছিলাম। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমার এবং তাদের মাঝে সংঘটিত বিভিন্ন বিতর্ক সভায় তাদের অনেক পাদরি এ ব্যাপারে অপারগতা পেশ করেছেন। তারা বলেছেন দীর্ঘ তিনশ তেরো বছর যাবৎ খ্রিষ্টানদের ওপর আপতিত নানা ফিতনা ও মুসিবতের সময় আমাদের কাছ থেকে সনদ বা বর্ণনাসূত্র হারিয়ে গেছে।

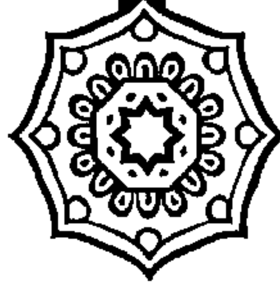
তাদের কাছে রক্ষিত বর্ণনাসূত্রগুলোতেও আমরা নজর বুলিয়েছি। দেখতে পেলাম সেগুলো কিছু ধারণাপ্রসূত বর্ণনাসূত্র বৈ কিছু নয়। কিছু ইঙ্গিতসূচক বিষয় এবং ধারণার ওপর নির্ভর করেই তারা এগুলো বর্ণনা করে থাকে। আমি বলেছি এমন নাজুক বিষয়ে ধারণাপ্রসূত কিছু উপযুক্ত নয়। এখন পর্যন্ত তারা উপযুক্ত কোনো প্রমাণ, অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারেনি। আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তারা আসছে না। কেননা, দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা তাদের দায়িত্ব। আমাদের নয়।"

বাস্তবতা হলো নির্যাতনের সময়টাতে তারা পুস্তকগুলো রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের ইচ্ছেমতো সেখানে সংযোজন-বিয়োজন করে ও হাওয়ারিদের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্যের অবতারণা করে। এ ধরনের সংযোজন, বিয়োজন ও মিথ্যা থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র থাকা। অথচ এগুলোতে তা একেবারেই অনুপস্থিত।

একইভাবে প্রথম শতাব্দীতে রোমান ও মিশরীয়দের অনেকগুলো দল খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর আগ থেকেই রোমান ও গ্রিক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টানরাও এসব ভিনদেশি দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব ও ত্রিত্ববাদের মতো আকিদার অনুপ্রবেশ ঘটায়।

এজন্যই প্রাচ্যবিদ গোথিয়ার (Gauthier) তার গ্রন্থ *'আল-মাদখাল লি-দিরাসাতিল ফলসাফাতিল ইসলামিয়া'* গ্রন্থে দাবি করেন যে, ত্রিত্ববাদ খ্রিষ্টানদের থেকে উদ্ভব হয়নি। এটি গ্রিক দর্শন থেকে এসেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমরা ত্রিত্ববাদ-সম্পর্কিত আলোচনায় উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।





আল-কুরআনে মসিহ আলাইহিস সালাম

নিউ টেস্টামেন্ট তথা বাইবেলের নতুন নিয়মের বর্ণনা অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত এবং তার দাওয়াতি কার্যক্রমের বর্ণনা দেওয়ার পর এ পর্যায়ে আমরা কুরআনের আলোকে তার বৃত্তান্ত তুলে ধরাটা উত্তম মনে করছি। কেননা, কুরআনই সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। কুরআনই বিশ্বজগতের জন্য হিদায়াতের চূড়ান্ত আলোকবর্তিকা।

মাতা মারইয়াম ও তার জীবন—

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَ اِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ اِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕۚ كُلَّمَا

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

ইমরানের স্ত্রী যখন বলল-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোই জানেন। সেই কন্যার মতো কোনো পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন 'মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?' তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৫-৩৭]

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ، يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ، ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ .

আর যখন ফেরেশতা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্বনারী- সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা করো এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু করো। এ হলো গায়েবি সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি

তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪২-৪৪]

মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا، قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا، قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا، فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا، فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، وَ هُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فَكُلِيْ وَ اشْرَبِيْ وَ قَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۚ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا، يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۖ.

এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল, আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বলল, আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। মারাইয়াম বলল, কীরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? সে বলল,

এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন, হায়, আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। তখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল করো। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিয়ো : আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল, হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুন-ভগ্নি, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। [সুরা মারইয়াম আয়াত : ১৬-২৮]

মসিহ আলাইহিস সালামের মুজিযা

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا . يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا . فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا . قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا .

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল, হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুন-ভগ্নি, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল, যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বলল, আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবি করেছেন। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৭-৩০]

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ .

আর বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দিই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدٗا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٗ مِّنكَۖ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ. قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيۡكُمۡۖ فَمَن يَكۡفُرۡ بَعۡدُ مِنكُمۡ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابٗا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدٗا مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ.

ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুজি দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুজিদাতা। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৪-১১৫]

وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ .

আমি মারইয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মুজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তি দান করেছি। [সুরা বাকারাহ, আয়াত : ৮৭]

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ.

যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনি-ইসরাইলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ১১০]

বনি ইসরাইলের নবি ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাম

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ.

আর বনি ইসরাইলের জন্যে রাসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ .

স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববতী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ.

সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনি ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৫৯]

মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ .

তারা কাফির, যারা বলে যে, মারইয়াম-তনয় মসিহই আল্লাহ; অথচ মসিহ বলেন : হে বনি ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭২]

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ .

আর এটি পূর্ববতী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তাওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দিই কোনো কোনো বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার

অনুসরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব তার ইবাদত করো, এটাই হলো সরল পথ। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫০-৫১]

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا۟ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ .

ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা মান। নিশ্চয় আল্লাহই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তার ইবাদত করো। এটা হলো সরল পথ। [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৬৩-৬৪]

۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّٰهِدِينَ .

অতঃপর ঈসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথিরা বলল : আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাজিল করেছ, আমরা রাসুলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫২-৫৩]

মসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও অন্যান্য রাসুলগণের মতো একজন রাসুল

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ .

নিঃসন্দেহে মারইয়ামপুত্র মসিহ ঈসা আল্লাহর রাসুল এবং তার বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রুহ-তারই কাছ থেকে আগত। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭১]

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ.

মারইয়াম-তনয় মসিহ রাসুল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসুল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন সৎ-খাঁটি ঈমানদার। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৫]

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

মসিহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোনো লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭২]

قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللهِ ءَاتَىٰنِىَ الْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا. وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا . وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا . وَالسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ .

সন্তান বলল, আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবি করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩০-৩৪]

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ .

সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনি ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ। [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৫৯]

মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত কিতাব ইনজিল

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ الْإِنجِيلَ.

অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রাসুলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মারইয়াম-তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইনজিল। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৭]

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَٰهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ.

আমি তাদের পেছনে মারইয়াম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইনজিল প্রদান করেছি। এতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। [সুরা মায়েদাহ, আয়াত : ৪৬]

মসিহ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ.

স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহমদ। অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এ তো এক প্রকাশ্য জাদু। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

অতঃপর এই রাসুল যখন আগমন করলেন তারা অস্বীকার করে বসল

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ .

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৯]

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুল আগমন করলেন—যিনি ওই কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল- যেন তারা জানেই না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১০১]

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

আহলে কিতাবের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [সুরা বাকারাহ, আয়াত : ১০৯]

মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের দাবিদারেরা কাফের

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ.

নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে, মসিহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল যদি আল্লাহ মসিহ ইবনে মারইয়াম, তার জননী এবং ভূমন্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১৭]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ النَّارُ ۖ.

তারা কাফির, যারা বলে যে, মারইয়াম-তনয় মসিহই আল্লাহ; অথচ মসিহ বলেন, হে বনি ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭২]

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ.

যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বলবেন, আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে,

আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন। আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৬-১১৭]

اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ.

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মারইয়ামের পুত্রকেও। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৩১]

মসিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারী আহলে কিতাবদের প্রতি কুরআনের নিন্দা

يَٰٓأَهْلَ الْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِاللهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ انتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى السَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

হে আহলে কিতাব, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সংগত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়াম পুত্র মসিহ ঈসা আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রুহ তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলগণকে মান্য করো। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার করো; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর জন্য উপযুক্ত বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭১]

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ.

বলুন : হে আহলে কিতাব, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ওই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৭]

মসিহ আলাইহিস সালামের পিতাবিহীন জন্ম আহলে কিতাবের মধ্যে চরম বিরোধের কারণ। কেননা, ইহুদিরা মনে করে তিনি জারজ সন্তান এবং তাঁর মা ব্যভিচারিণী। এদিকে নাসারারা মনে করে তিনি মানবাকৃতির প্রভু। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে আদি পাপের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিতে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেছেন। উভয় জাতির এই বিভ্রান্তিকর আকিদার অপনোদন করে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং বলছে যে, উভয়ে মসিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বিপথগামীতার শিকার।

মসিহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে :

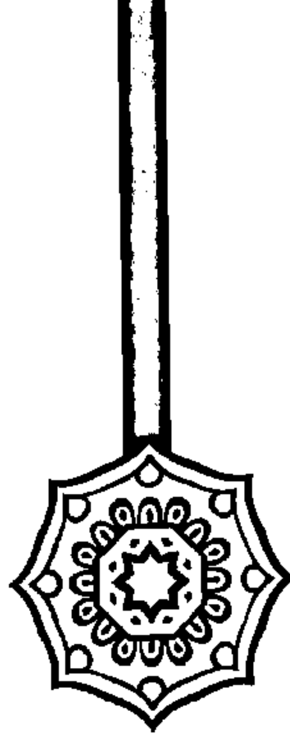
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا . بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয় তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭-১৫৮]

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا .

আর প্রত্যেক আহলে কিতাব ঈমান আনবে ঈসার ওপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৯]





খ্রিষ্টধর্মে ইহুদি পোলের প্রভাব এবং তাওহিদ (একত্ববাদ) থেকে পৌত্তলিকতার দিকে যাত্রা

অন্যান্য নবিদের মতো মসিহ আলাইহিস সালামও নির্ভেজাল তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া হাওয়ারি ও শিষ্যগণও এই তাওহিদের ওপরেই অটল ছিলেন। এরপর পোল খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করেন। খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশের পূর্বে তিনি ছিলেন খ্রিষ্টানদের কট্টর বিরোধী ফরিশি ইহুদিদের একজন। তিনি তারসুস (TARSUS)-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং জেরুযালেমে বেড়ে ওঠেন। তার প্রকৃত নাম ছিল সৌল।[৪০৬]

এই কট্টর ইহুদি মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য কিংবা সহচর ছিলেন না। এমনকি জীবনে তিনি মসিহ আলাইহিস সালামকে কখনো দেখেনওনি। মসিহ আলাইহিস সালামের কোনো নসিহত শোনারও সুযোগ তার হয়নি। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে

---

[৪০৬] পোলের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না; শুধু বিভিন্ন চিঠিপত্রে তিনি নিজে যা বলেছেন তা-ই একমাত্র সম্বল। যেমন তিনি বলেন, "আমি অষ্টম দিনে ত্বকছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল-জাতীয় বিন্যামীন বংশীয়, ইব্রীয়-কুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী, উদ্যোগ সম্বন্ধে মণ্ডলীর তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্মিকতা সম্বন্ধে অনিন্দনীয় গণ্য ছিলাম।" *ফিলিপীয়*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ৬।

তার পিতা গ্রিক নাগরিকত্ব ভোগ করতেন। তারসুস ছিল সে সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এখানেই গড়ে ওঠে জেনোবাদ (Stoicism)। গ্রিক দর্শনের এই পরিবেশেই পোল বেড়ে ওঠেন এবং এই দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার এই দর্শনের প্রভাব প্রতিফলিত হয় খ্রিষ্টধর্মে।

তিনি নিজেই এ কথা বলেছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী জেরুজালেম থেকে তিনি দামেশকে সফর করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, খ্রিষ্টানদেরকে ধরে এনে জেলে দেওয়া। তার নিজস্ব কিছু স্বীকারোক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। "সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে যিহূদীয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। আর কয়েক জন ভক্ত লোক স্তিফানের কবর দিলেন, ও তাঁহার নিমিত্ত মহাবিলাপ করিলেন। কিন্তু শৌল মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে টানিয়া আনিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতে লাগিলেন।"[৪০৭]

২। "তোমরা ত যিহূদী-ধর্মে আমার পূর্বকার আচার ব্যবহারের কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম; আর পরমপরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোক অপেক্ষা যিহূদী-ধর্মে উত্তর উত্তর অগ্রসর হইতেছিলাম।"[৪০৮]

৩। "শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন ও হত্যার নিশ্বাস টানিতেছিলেন; তিনি মহাযাজকের নিকটে গিয়া, দম্মেশকস্থ সমাজ সকলের প্রতি পত্র যাচ্ঞা করিলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রী যে সমস্ত লোককে পান, তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া যিরূশালেমে আনিতে পারেন।"[৪০৯]

৪। "ভ্রাতারা ও পিতারা, আমি এক্ষণে আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের কাছে কথা কহিতেছেন শুনিয়া তাহারা আরও শান্ত হইল। পরে তিনি কহিলেন, আমি যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নগরে আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি, পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি; আর আপনারা সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম। আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের প্রতি উপদ্রব করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম। এই বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত প্রাচীনবর্গও আমার সাক্ষী; তাঁহাদের নিকট হইতে আমি ভ্রাতৃগণের

---

[৪০৭] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ১-৩।

[৪০৮] *গালাতিয়*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৪।

[৪০৯] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ১-৩।

সমীপে পত্র লইয়া, দম্মেশকে যাত্রা করিয়াছিলাম; যাহারা তথায় ছিল, তাঁহাদিগকেও বাঁধিয়া যিরূশালেমে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, যেন তাঁহাদের দণ্ড হয়।"[৪১০]

খ্রিষ্টানদের ওপর জুলুম, হত্যা ও ধাওয়া করাটাই ছিল এই ইহুদির চরিত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন খ্রিষ্টান বিশ্বাসীদের অন্তর থেকে তিনি ধর্মের মূলোৎপাটন করতে পারলেন না তখন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। তার এই নতুন কৌশলে খ্রিষ্টানদের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে গেল।

তিনি কোনো ধরনের পূর্ব আলোচনা ছাড়াই আকস্মিক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে বসেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, "আর যাইতে যাইতে দম্মেশকের নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে হঠাৎ আকাশ হইতে মহা আলো আমার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম, ও শুনিলাম, এক বাণী আমাকে বলিতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? আমি উত্তর করিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে কহিলেন, আমি নাসরতীয় যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। আর যাহারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না। পরে আমি বলিলাম, প্রভু, আমি কি করিব? প্রভু আমাকে কহিলেন, উঠিয়া দম্মেশকে যাও, তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে। পরে আমি সেই আলোর তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে আমার সঙ্গীরা হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চলিল, আর আমি দম্মেশকে উপস্থিত হইলাম।"[৪১১]

পোলের খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ সম্পর্কে লুক বলেন, "পরে তিনি যাইতে যাইতে দম্মেশকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন হঠাৎ আকাশ হইতে আলোক তাঁহার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রতি এই বাণী হইতেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? তিনি কহিলেন, প্রভু, আপনি কে? প্রভু কহিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ; কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। আর তাঁহার সহপথিকেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে শৌল ভূমি হইতে উঠিলেন, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; আর

[৪১০] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ১-৬।

[৪১১] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ৭-11।

তাহারা তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে লইয়া গেল। আর তিনি তিন দিন পর্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন, এবং কিছুই ভোজন কি পান করিলেন না।"[৪১২]

এই ঘটনা বর্ণনার শেষে লুক এমন একটি বাক্য জুড়ে দিয়েছেন যা খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসের গতিপথকে পুরোই পাল্টে দিয়েছে। সেই বাক্যটি হলো, "এবং অমনি সমাজ-গৃহে যীশুকে এই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিল, তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল, বলিতে লাগিল, এ কি সেই ব্যক্তি নয়, যে, এই নামে যাহারা ডাকে, তাহাদিগকে যিরূশালেমে উৎপাটন করিত, এবং এখানে এই জন্যই আসিয়াছিল, যেন তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যায়?"[৪১৩]

পোলের দাওয়াত মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য এবং হাওয়ারিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। পোলের বক্তব্য এবং তার দাওয়াতি কার্যক্রমকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতেন। ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি বলেন, "পোলকে খ্রিষ্টবাদের বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করা হয়। জ্যাক (Jacques)[৪১৪] এর সাথে আল-কুদসে অবস্থানরত মসিহের পরিবার ও সহচরবৃন্দ তাকে এই বিশেষণে অভিযুক্ত করেছে। কেননা, পোল খ্রিষ্টবাদকে গঠন করতে গিয়ে ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিলেন, যাদেরকে মসিহ স্বীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজের পাশে জড়ো করেছিলেন। যেহেতু পোল জীবদ্দশায় মসিহকে দেখেননি তাই নিজের প্রেরিত হওয়ার দাবিকে আইনসিদ্ধ করতে গিয়ে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, কবর থেকে উত্থানের পর দামেস্কের পথে মসিহ তার সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন।[৪১৫]

জার্মান গবেষক আর্নেস্ট ডি যোনা তার *আল-ইসলাম (দি ইসলাম)* নামক গ্রন্থে বলেন, "ক্রুশ এবং যীশুর আত্মোৎসর্গকরণের ঘটনা পোল এবং তার মতো কপট ব্যক্তিদের বানানো বর্ণনা।"

মুহাম্মদ যকিউদ্দিন আন-নাজ্জার (যিনি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তী সময় ইসলামে দীক্ষিত হন।) তার বিরচিত গ্রন্থ *আল-ইসলামু নাওয়ারাল আকওয়ান* (ইসলাম বিশ্বকে আলোকিত করেছে)-এ বলেন—

---

[৪১২] *প্রেরিত,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ৪-৯।

[৪১৩] *প্রেরিত,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ২০-২১।

[৪১৪] জ্যাক ছিলেন মসিহরে আত্মীয়। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টানদের নেতা হয়েছিলেন।

[৪১৫] *দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসাহ,* পৃষ্ঠা : ৭৩।

"ইহুদিদের একটি আশ্চর্যজনক কাজ এই যে, সৌল নামক তাদের এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বিশ্বাসীদের হত্যা করে। হাওয়ারিদের কষ্ট দেয়। এত জুলুম নির্যাতনের পরও যখন খ্রিষ্টানদের বিনাশ সম্ভব হচ্ছিল না, বিশ্বাসীদের তাদের বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছিল না তখন তিনি এমন একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন যা তাদের ধর্মের ভিত্তিটাই ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজেকে মসিহের অনুসারী দাবি করেন। সবার কাছে পোল নামে পরিচিত হন। এরপর আকিদাগত বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে পথহারা করেন। এটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকের বর্ণনা।[৪১৬] অথচ একই সময়ে তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মসিহ সম্পর্কে নসিহত করতে গিয়ে বলতেন, তিনি আল্লাহর পুত্র।[৪১৭]

পোলের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে শিষ্যগণ সন্দেহ করতেন। কারণ, তার কাছ থেকে দ্বিমুখী কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেত। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে তিনি খ্রিষ্টানদের নির্যাতন করেছিলেন। তাদেরকে ধরে ধরে রোমান প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। এরপর আকস্মিক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তথাপি বরনাবা তাদেরকে পোলের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং তিনি কীভাবে পথিমধ্যে প্রভুর দর্শন লাভ করেছেন তার বর্ণনাও দিয়েছিলেন। তখন থেকে বরনাবার পৃষ্ঠপোষকতায় পোল খ্রিষ্টবাদের দাওয়াতের জন্য একটি কার্যকরী শক্তি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে পোলের বিদআত ও কুসংস্কারের বিরক্ত হয়ে বরনাবাও তার সঙ্গ ত্যাগ করেন।

বরনাবা তার সুসমাচারে উল্লেখ করেন যে, "যারা মসিহের শিক্ষার প্রচারের নামে মারাত্মক পর্যায়ে কুফুরি শিক্ষার প্রচারণা চালায় তারা তাকওয়া ও ঈমানহীন। এরা মসিহকে আল্লাহর পুত্র বলে। আল্লাহর বিধান খৎনাকে অস্বীকার করে। সব ধরনের মাংস হালাল মনে করে। এসব পথভ্রষ্টদের মধ্যে একজন হলেন পোল।"[৪১৮]

একইভাবে প্রধান হাওয়ারি পিতরও তার *দ্বিতীয় পত্রে* পোলের দাওয়াতের বিরোধিতা করেন। সেখানে তিনি বলেন, "অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপেক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়! আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ জ্ঞান কর; যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই

[৪১৬] *প্রেরিত,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ২০।
[৪১৭] *আন-নাসরানিয়্যাহ ওয়াল-ইসলাম,* পৃষ্ঠা : ২৭৩।
[৪১৮] *বরনাবার সুসমাচারের ভূমিকা,* পৃষ্ঠা : ৩-৭।

প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোনো কোনো কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে।”[৪১৯]

বরনাবা ও পিতরের এই বিরোধিতার কারণে প্রাচ্যের খ্রিষ্টানগণ পোলের দাওয়াতে প্রভাবিত হননি। তাই পোল ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর কাছে আশ্রয় নেন। এরপর তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজের মতবাদ ছড়িয়ে দিতে থাকেন। সকল ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেন। মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা রহিত করেন। ফলে তার আদর্শ ইউরোপিয়ান পৌত্তলিকদের মনঃপুত হয়। জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও তার অনুসারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একারণেই এশিয়াবাসীদের নিন্দা করে পোল তার সহযোগী তিমথিয়কে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে বলেন, “তুমি জানো এশিয়াতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে।”[৪২০]

পোলের খ্রিষ্টধর্মীয় জ্ঞানের উৎস

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে পোল মসিহের শিষ্য ছিলেন না। তাঁর কোনো নসিহতও কোনো দিন শোনেননি। বরং মসিহ আলাইহিস সালামের পুরো জীবদ্দশায় তিনি কুফরি এবং বিরোধিতাই করেছেন।[৪২১] খ্রিষ্টধর্মের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থেও পোলের ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তার চিঠির সংখ্যা চৌদ্দটি। এই চিঠিগুলো তাদের *কিতাবুল মুকাদ্দাস* এর বিরাট অংশ দখল করে আছে। এগুলোতে রয়েছে খ্রিষ্টানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিধিবিধান, আকিদা-বিশ্বাস ও দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ। রয়েছে তাসবিহ, আধ্যাত্মিক গীত প্রভৃতি। এতে আরও সন্নিবেশিত হয়েছে বিবাহ, তালাক প্রভৃতি পারিবারিক ও সামাজিক বিধানসমূহ। এত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পাওয়া সত্ত্বেও এই জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়নি। তবে বলা হয়ে থাকে এসব মূলনীতি ও বিধিবিধানগুলো পোল ওহির মাধ্যমে সরাসরি মসিহ থেকে শিক্ষা করেছেন। এ দাবি

[৪১৯] *পিতর ২য়,* অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১৪-১৬।

[৪২০] *তিমথিয় ২য়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৫।

[৪২১] তাই মসিহ আলাইহিস সালামের শিক্ষা সরাসরি গ্রহণ করার সুযোগ পোলের ছিল না। একইভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্যগণ থেকেও শেখার সুযোগ হয়নি। কেননা পোল ছিলেন তাদের শত্রু। আকস্মিক তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং নেতৃত্বের আসনে চড়ে বসেন। -অনুবাদক।

তিনি নিজেই করেছেন। তিনি বলেছেন, "কেননা, হে ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা মানুষের মতানুযায়ী নয়। কেননা, আমি মানুষের নিকট হইতে তাহা গ্রহণও করি নাই, এবং শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি।"[৪২২]

কিন্তু পোলের এই মূলনীতিগুলো গবেষণা করলে দেখা যায় তিনি এগুলোর কতেক পৌত্তলিক রোমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, যারা সূর্য ও আগুনের পূজা করত। আর কিছু নিয়েছেন প্রভুর তিন সত্তায় বিশ্বাসী হিন্দু ব্রাহ্মণদের থেকে। কিছু কিছু আবার গ্রিক দর্শন থেকেও ধার করেছে।

এভাবেই কট্টর এই ইহুদি সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্ম আবিষ্কার করেন এবং নিজেই এ ধর্মের প্রধান শিক্ষকে পরিণত হন। তিনি দাবি করেন, মসিহ নিজেই তাকে এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। তার এই পৌত্তলিক নীতির বিপরীতে অল্পসংখ্যক খ্রিষ্টানই তাওহিদের ওপর অটল ছিলেন। পিতর ও বরনাবার মতো অনেকেই মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের বিষয়টি অস্বীকার করতেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে তাওহিদের এই পতাকা বহন করছিলেন মিশরীয় যাজক আরিয়ুস বা আরিয়ানুস (ARIUS) (মৃ. ৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)। তার অনুসারীদের আরিসি বলা হয়। আরিয়ুস ছিলেন চার্চ অব আলেকজান্দ্রিয়ার যাজক। তিনি মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতেন। মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভু কিংবা প্রভুর পুত্র না হওয়া এবং একজন সৃষ্ট মাখলুক হওয়ার স্বপক্ষে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ পেশ করতেন। তিনি সুসমাচারগুলোতে বর্ণিত মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের ইঙ্গিত বহনকারী সকল বক্তব্যের বিরোধিতা করতেন। যেহেতু এই সুসমাচারগুলোর সবগুলোই মুলহিদ পোলের চিঠিগুলোর পরেই সংকলিত, হয়েছে তাই এটা অসম্ভব নয় যে সুসমাচারগুলোর লেখকগণ এই পত্রগুলো থেকে বাক্য চয়ন করেছেন। এজন্যই দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট সাধু সেন্ট জাস্টিন সুসমাচারগুলোকে প্রেরিতদের প্রতিবেদন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে পোল এবং আরিয়ুসের অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। উভয় গ্রুপের সংঘর্ষে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়। এমন সংঘাতময় সময়ে রোমান সম্রাট কনস্টানটিন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একটি ধর্মীয় মহাসভার আয়োজন করেন। খ্রিষ্টান বিশ্বের সকল চার্চের

[৪২২] *গালাতিয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১১-১২।

প্রতিনিধিগণ এ মহাসভায় উপস্থিত হন। নিকিয়াতে (NICAEA) অনুষ্ঠিত এই মহাসভায় দুই হাজার আটচল্লিশ জন যাজক যোগদান করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা ব্যর্থ হন।

সম্রাট কনস্টানটিন এর সামসময়িক ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস কায়সারি (Eusebius Caesarea) এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "এই ভারসাম্যহীনতা দিক-দিগন্তে বিরাজমান ছিল। কেননা, আলেকজান্দ্রিয়ায় এ দ্বন্দ্ব উস্কে দেওয়া ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রদেশের যাজকদের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন যারা কোনো এক পক্ষকে সমর্থন করতো। ফলে তারাও একই বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।"[৪২৩]

এ সময়কার খ্রিষ্টান জাতির অবস্থা সম্পর্কে একই লেখক বলেন, "প্রত্যেক শহরে যাজকগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তারা একে অপরের সাথে রূপকথার পাথরের ন্যায় সংঘর্ষ বাধাতে লাগলো। এমনকি উত্তেজনাবশত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে বিবেকবর্জিত কাজ করতে শুরু করে দিল।"[৪২৪]

নিকিয়ার মহাসভায় কোন কোন যাজক দাবি করলেন, " ঈশ্বর নন। মসিহ এবং মারইয়ামই হলেন প্রভু।"

আবার অনেকে বলল, "পিতার তুলনায় মসিহ আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত হলো আগুনের শিখার মতো। আগুনের একটি শিখা অপরটিকে প্রজ্জ্বলিত করে। কিন্তু এতে করে প্রথম শিখাটিতে কোনো ঘাটতি আসে না।"

কারও কারও বক্তব্য হলো, "মারইয়াম নয় মাস গর্ভধারণ করেননি। বরং তাঁর উদরের ভেতর দিয়ে একটি নূর এমনভাবে অতিক্রম করেছে যেভাবে নালা দিয়ে পানি গড়িয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহর কালিমা তাঁর কান দিয়ে প্রবেশ করে লজ্জাস্থান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।"

আবার অনেকে তিন খোদার অস্তিত্বের মত প্রকাশ করেন। তিন খোদার একজন ভালো, আরেকজন মন্দ, আর তৃতীয় জন হলেন মধ্যপন্থী।

কেউ কেউ বলেন, " আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক হলেন যিশু।"

---

[৪২৩] *হায়াতু কিসতিনতিন আল-আজিম,* পৃষ্ঠা :৭৩।

[৪২৪] *হায়াতু কিসতিনতিন আল-আজিম,* পৃষ্ঠা : ৮৫।

আবার কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে, "মসিহ হলেন মানুষ। তবে তিনি সৃষ্টি হয়েছেন ঐশ্বরিক সত্তা থেকে। বাহ্যিকভাবে তিনি আমাদের মতোই। পুত্রের সূচনা মারইয়াম থেকে। তাকে নির্বাচন করা হয়েছে মানবতাকে নিষ্কৃতি দিতে। সাথে ছিল তাঁর ইলাহি অনুকম্পা। সেখান থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে প্রেম ও ইচ্ছেশক্তি। এজন্যই তাকে আল্লাহর পুত্র বলা হয়।"

তাদের কারও কারও মতামত হচ্ছে, "আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তবে এরা তাকে তিন নামে নামকরণ করে থাকে। পবিত্র বাক্য, পবিত্র আত্মায় তারা বিশ্বাস করে না।"

আবার কারও কারও বক্তব্য হলো, "মসিহ সত্য প্রভু এবং সত্য মানব। তাঁর দ্বৈত সত্তা এবং দ্বৈত ইচ্ছাশক্তি।"

এর বিপরীতে অনেকের মত হলো, "মসিহ একক সত্তা ও একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।"[৪২৫]

মসিহ সম্পর্কে এরূপ আরও বহু মতামত তারা ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকে নিজের মতের সমর্থনে বিতর্ক করেন। অন্যদের বিরোধিতা করেন। এমনকি বিরোধী মতাবলম্বীদেরকে কাফির বলেও অভিহিত করেন। একসময় বিরোধ এতটাই তুঙ্গে পৌঁছে যায় যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে লানত করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনশ আঠারোজন যাজক ব্যতীত বাকিরা ফিরে আসে।

একথা স্পষ্ট যে কনস্টানটিন মসিহ আলাইহিস সালাম প্রভুত্বের দাবিদারদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। কেননা, ইতিপূর্বে তিনি পৌত্তলিক ছিলেন। সেখান থেকেই খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করেন। ফলে তার পৌত্তলিক চিন্তাধারা মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়।[৪২৬] উপস্থিত যাজকগণের মধ্য থেকে তিনি তিনশ

---

[৪২৫] *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২-২৩।

[৪২৬] ঐতিহাসিকগণ আজ অবধি কনস্টানটিনের আস্থাবান হয়ে খ্রিষ্টান ধর্মে প্রবেশের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। অধিক সম্ভব তিনি রাজনৈতিক কারণে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় বিজয় লাভ করেছিলেন। এদিকে তার মাতা হেলেনা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সন্তানকে খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকেন। খ্রিষ্টানদের মনোতুষ্টির জন্য ধর্মান্তর হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় তার সামনে ছিল না। তাই মৌখিকভাবে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘোষণা দিলেও আকিদাগত দিক থেকে তিনি পৌত্তলিকই রয়ে গিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি সর্বদা নিজেকে পৌত্তলিক দার্শনিক বিজ্ঞজনদের দ্বারা বেষ্টিত রাখতেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নিকিয়া মহাসভা। এখানে তিনি খ্রিষ্টধর্মের জন্য তাওহিদের নীতি বাদ দিয়ে পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করেছেন। শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে উঠে আসা ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমনটাই আশা করা যায়। একইভাবে তিনি রীতি অনুযায়ী নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানদেরকে মতো ব্যাপ্টিজম করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আঠারোজন যাজককে একত্রিত করেন, যারা এ মতের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে ছিলেন। এদেরকে নিয়ে তিনি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন এবং এই দ্বন্দ্বের সমাধানের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করেন। তিনি নিজের আংটি, তলোয়ার ও রাজদণ্ড তাদেরকে প্রদান করেন এবং বলেন : বিশ্বাসীদের ধর্মীয় ব্যাপারে আপনারা যা ভালো মনে করেন সেটিই সিদ্ধান্ত নেবেন। এ ব্যাপারে আজ আপনাদেরকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হলো।

নবগঠিত কমিটির লোকেরা সম্রাটকে অভিবাদন জানায় এবং দায়িত্ব অর্পণ এর নিদর্শনস্বরূপ তার গলায় তলোয়ার পরিয়ে দেয়। তারা বলে, "আপনি খ্রিষ্টধর্মকে সমুন্নত করুন এবং একে হেফাজত করুন।" তারা সম্রাটের সামনে বিধিবিধান সম্বলিত চল্লিশটি পুস্তক উপস্থাপন করে। এগুলো ছিল সম্রাটের জন্য বাস্তবায়ন উপযোগী। সর্বশেষ তারা বেশকিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের স্বীকৃতি, আরিয়ুস ও তার অনুসারীদের কাফির ঘোষনা করা, যে সব গ্রন্থ মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে সেগুলোর পঠন নিষিদ্ধ করা, আরিয়ুসের সকল কিতাব পুড়িয়ে ফেলা, নিষিদ্ধ কিতাবগুলোর কোনো অংশ লুকিয়ে রাখাকে অপরাধ বিবেচনা করা এবং লুকিয়ে রাখার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।"[৪২৭]

বুসতানুল আযহার ফি তাফসিরিশ শিআর[৪২৮] এর লেখক থিওফিলাস (Theophilos) বলেন, "মসিহ এর ওফাতের সত্তর বছর পর যখন মার্ক তার সুসমাচার রচনা শুরু করেন তখন থেকেই তার সাথে বিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তখন পূর্ব-পশ্চিম সব জায়গা থেকে খ্রিষ্টানদের সমস্ত দল-উপদলগুলোকে একটি সম্মেলনে একত্র করা হয়। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর তারা আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

সবার ঐকমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

১। তিন সত্তা তথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

---

[৪২৭] *কিসসাতুল হাদারাহ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯৬।

[৪২৮] এই পাণ্ডুলিপিটি মাকতাবাতুদ দিয়ারিল মুহাররাক এর ১০৩ নং পাণ্ডুলিপি হিসেবে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি কিবতি ভাষায় রচিত। এর প্রতিটি পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠায় আরবি অনুবাদ সংযোজিত আছে।

২। উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসা আদিপাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই মসিহ দুনিয়াতে এসেছেন।

৩। ব্যাপ্তাইজমকে খ্রিষ্টধর্মের মূল ভিত্তিগুলোর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। চাই সেটা পানি ছিটানোর মাধ্যমে হোক কিংবা দেহের বৃহদাংশ পানিতে ডোবানোর মাধ্যমে হোক। এটি মূলত যোহন ব্যাপ্তাইজক (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) কর্তৃক মসিহকে জর্ডান নদীতে ব্যাপ্তাইজমের দিকে সম্বন্ধ করে করা হয়।

৪। ভোজ উৎসব: উৎসর্গকৃত সকল বস্তু মসিহের দেহের প্রতীক। আর উৎসবে মদপান ক্রুশে মসিহের প্রবাহিত রক্তের ইঙ্গিত বহন করে।[৪২৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "রোমান পোপ নিজের পক্ষ থেকে দুজন লোক প্রেরণ করেন। এরপর তারা সবাই আরিয়ুস এবং তার সাথিদেরকে বিতাড়নের ব্যাপারে একমত হন। আরিয়ুস ও তার অনুসারীদেরকেও তারা লানত করেন। তারা এ কথা সাব্যস্ত করেন যে, সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পুত্র পিতা থেকে জন্মেছেন। আর পিতা-পুত্র একই প্রকৃতির। পুত্র মাখলুক নন। তারা এ কথার ওপরও একমত হন যে, খ্রিষ্টানদের ঈদুল ফেসাখ ইহুদিদের ঈদুল ফেসাখের পরদিন অর্থাৎ রবিবারে।"

এরপর শাইখুল ইসলাম বলেন : সম্রাট কনস্টানটিন তিনটি রীতির প্রবর্তন করেন।

এক, মূর্তিভাঙা এবং মূর্তিপূজারিদের হত্যা করা।

দুই, সরকারি দফতরে শুধু খ্রিষ্টানরাই থাকবে। তারাই হবে আমির ও সেনাপতি।

তিন, মানুষেরা জুমাতুল ফেসাখ ও পরবর্তী জুমা পালন করবে। এ সময়ে তারা কোনো কাজ করবে না। যুদ্ধেও জড়াবে না।[৪৩০]

আর এভাবেই আসিয়ুত, মেসিডোনিয়া ও ফিলিস্তিন চার্চের পতন ঘটে। এই চার্চগুলো আরিয়ুসের মত অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালামের মানবত্ব ও মাখলুক হওয়ার দাওয়াত দিত। এ সময়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করা প্রচুর ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। গির্জার ফটকে শুকর জবাই করে তার গোশত বণ্টন করা হতো। ঈদুল ফেসাখের দিন যে কেউ গির্জা থেকে বের হলে এক লোকমা শুকরের গোশত খাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কেউ খেতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হতো।

---

[৪২৯] *আল-আদইয়ান ফি কিফফাতিল মিযান,* পৃষ্ঠা : ৪৫।

[৪৩০] *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫।

আরিয়ুসের অনুসারীরা কিছুদিন তরবারির ভয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। কনস্টানটিন এর মৃত্যুর পর তারা দ্রুত সংঘটিত হয়। এরপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নতুন সম্রাট তথা সম্রাট কনস্টানটিন এর পুত্রের কাছে এসে বলেন, "নিকিয়া সম্মেলনে জড়ো হওয়া তিনশ আঠারোজন যাজকের নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। পিতা ও পুত্রকে একই হিসেবে অভিহিত করে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আপনি এ বক্তব্যকে নিষিদ্ধ করুন। কেননা, এটা ভুল। সম্রাট তাদের কথা বাস্তবায়নের ইচ্ছেও করেছিলেন।[৪৩১] কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশপের চিঠি পেয়ে তিনি মত পাল্টে ফেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, "আপনার সম্মানিত পিতার যুগে ক্রুশ মধ্যগগনে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি ছড়িয়েছিল। আপনার সময়ে ক্র্যানিয়ন (গলগথা) এর উপরে নুরের ক্রুশ প্রকাশিত হয়েছে। যার আলোকচ্ছটা সূর্যের আলোকে হার মানিয়েছে।" বিশপ আরও লিখেন, "আরিয়ুসের অনসারীরা সত্য থেকে বিচ্যুত। তিনশ আঠারোজন যাজক তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তাদের বক্তব্য সমর্থনকারীদেরকেও অভিসম্পাত করেছেন।" সম্রাট এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেন।"[৪৩২]

খ্রিষ্টানদের এই সম্মেলনগুলো সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

এক. শরিয়তের কোনো নসের ভিত্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে এই মহাসভাগুলো হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার রাখে কিনা?

দুই. খ্রিষ্টধর্মের ঘোষণা দেওয়া একজন বাদশার মতামতের মূল্য কতটুকু যিনি কোনো পুরোহিতও নন, কোনো সেইন্ট বা সাধুপুরুষও নন?

তিন. দ্বিতীয় কনস্টানটিন এর কাছে লেখা চিঠিতে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশপ কর্তৃক আকাশে ক্রুশ দেখা যাওয়ার দাবিতে আমরা কতটুকু আস্থা রাখতে পারি?

চার. যাজক ইউসেবিয়ুসের উপরই বা আমরা কীভাবে আস্থা রাখতে পারি, যিনি সম্রাটের সামনে তলোয়ারের ভয়ে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন? এরপর আবার মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বকে অস্বীকারকারী আরিয়ুসের মাযহাবের পক্ষে দাওয়াত দিতে শুরু করেন!

এই মহাসভায় পবিত্র আত্মার প্রভুত্বের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তাই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে মসিহ আলাইহিস সালামের অনুসারীদের মধ্যে প্রবল

---

[৪৩১] *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯।

[৪৩২] *আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০।

বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অতঃপর সম্রাট থিয়োডোসিয়াস (Theodosius the Great)-এর নির্দেশে ৩৮১ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপোলে আরেকটি মহাসভার আয়োজন করা হয়। এই মহাসভার সদস্যসংখ্যা ছিল একশ পঞ্চাশজন।

সদস্যগণ মেসিডোনিস (Mecedonius)[৪৩৩] কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তার মতবাদ ছিল পবিত্র আত্মা প্রভু নন। তিনি মাখলুক তথা সৃষ্ট। উক্ত মহাসভায় আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ বলেন, "পবিত্র আত্মা ঈশ্বরেরই আত্মা। ঈশ্বরের আত্মা চিরঞ্জীব। যদি আমরা পবিত্র আত্মাকে মাখলুক বলি তখন তার হায়াতকেও মাখলুক বলতে হবে। আর তার হায়াতকে মাখলুক বলার অর্থ হলো তাকে নশ্বর সাব্যস্ত করা। আর এটা তার সাথে কুফরি করা বৈ কিছু নয়। তার এই বক্তব্যের পর সদস্যগণ মেসিডোনিসের মতবাদের অনুসারীদের অভিসম্পাত করে। পাশাপাশি এই মহাসভায় আরও অন্যান্য কিছু মতাবলম্বীদেরও অভিসম্পাত করা হয়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পবিত্র আত্মা নিজেই খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। মাখলুক নন। তিনি ঈশ্বরের সম্ভূত ঈশ্বর। তিনি পিতা-পুত্রের একই সত্তার অন্তর্ভুক্ত। নিকিয়ার মহাসভায় স্থিরকৃত সিদ্ধান্তে তারা একথাও যোগ করেন যে, "আমি পিতার সমভূত জীবনদাতা পরম প্রভুর পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি পিতা-পুত্রের সমতুল্য স্তুতির আধার, আরাধনার ভাজন।"

পবিত্র আত্মার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে এই মহাসভার সমাপ্তি ঘটে। তারা ঘোষণা করেন যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা স্বতন্ত্র তিন সত্তা। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তারা তিনের ভেতরে এক। একের ভেতরে তিন। মেসিডোনিস ও তার মতানুসারী যাজকগণের নিন্দা জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মহাসভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

শাহরাসতানি তার গ্রন্থ *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* -এ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়কে নিম্নোক্ত ইবারতে উল্লেখ করেছেন।

"আমরা এক ঈশ্বর পিতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা দৃশ্য-অদৃশ্য এর সৃষ্টিকর্তা। আমরা আরও বিশ্বাস স্থাপন করি, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিষ্টের ওপর। সমগ্র সৃষ্টিজগতের পূর্বে তিনি পিতা থেকে জন্মলাভ করেছেন। তিনি মাখলুক নন। তিনি ঈশ্বর। তার পিতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকেই তার অস্তিত্ব। যে পিতা নিজ হাতে সমগ্র জগৎকে সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জন্য। মানুষের কল্যাণে। আমাদের মুক্তির জন্য তিনি আসমান থেকে অবতরণ

[৪৩৩] মেসিডোনিস হলেন কনস্টানটিনোপোল এর বিশপ। তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে এ কথা প্রচার করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মাও অন্যান্য মাখলুকের মতো মাখলুক।

করেছেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দেহ ধারণ করেছেন। মানবাকৃতি ধারণ করেছেন। কুমারী মাতা মরিয়মের গর্ভস্থ হয়েছেন। তার থেকেই জন্ম নিয়েছেন। পিলাতের সময়ে তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এরপর সমাহিত করা হয়। তৃতীয় দিন তিনি পুনরুত্থিত হয়ে আকাশে গমন করেন। অতঃপর পিতার ডান পাশে উপবিষ্ট হন। তিনি মৃত ও জীবিতদের মাঝে ফয়সালা করার নিমিত্ত আবার আগমন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এক পবিত্র আত্মার উপর। তিনি পিতা থেকে উদ্ভূত। আমরা বিশ্বাস করি একটি ব্যাপ্তাইজম সকল গুনাহের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি দেহের পুনরুত্থানে এবং স্থায়ী জীবন দ্বারা চিরঞ্জীব হওয়ায়।[৪৩৪]

এভাবেই খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ স্থান লাভ করে নেয়। একত্ববাদী ধর্ম থেকে বেরিয়ে পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হয়। ত্রিত্ববাদের আকিদা তাদের নিয়মতান্ত্রিক আকিদার রূপ লাভ করে। প্রত্যেক খ্রিষ্টানের ওপর এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক করা হয়। আর বিরুদ্ধচারীদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

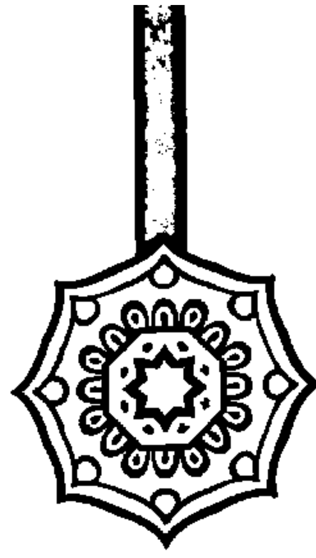
এই দুটি মহাসভার আলোচনা-পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী অতিবাহিত হয়। খ্রিষ্টানদের নিকট এই যুগ মহাসভার যুগ (Age of Councils Period) হিসেবে পরিচিত।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য, মূলত পৌত্তলিক সাম্রাজ্য, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়। পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার মধ্যে রয়েছে বলকান, গ্রিক, মিশর, হাবসা ও এশিয়ার কিছু অঞ্চল। এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের প্রধানকে বলা হতো বিশপ।

আর পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো। এর রাজধানী ছিল রোম। এখানকার চার্চের প্রধানকে বলা হতো পোপ। এরপরেই দুই চার্চের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা বিষয়ে ভীষণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলাম তার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা দিয়ে পূর্বাঞ্চল থেকে পৌত্তলিকতা দূর করে দেয়। বিশেষ করে জাযিরাতুল আরবকে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।



[৪৩৪] *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৪।



খ্রিষ্টধর্মে পোল কর্তৃক উদ্ভাবিত বিদআতসমূহ

এক. তাওহিদ থেকে ত্রিত্ববাদে রূপান্তর।

দুই. মসিহ এবং পবিত্র আত্মার প্রভুত্বের দাবি।

তিন. পাপ মোচনের জন্য উৎসর্গের কাল্পনিক গল্পের অবতারণা।

চার. ইহুদিদের শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে পবিত্র দিন ঘোষণা করা। কেননা, তাদের দাবি অনুসারে এই দিন মসিহ আলাইহিস সালামের কবর থেকে পুনরুত্থান হয়েছিল।

পাঁচ. নবি-রাসুলদের পরে আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গের জন্য শরিয়ত প্রণয়নের বৈধতা প্রদান। একইভাবে মহাসভাগুলোকে দ্বন্দ্ব নিরসনের অধিকার প্রদান। এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এরূপ মহাসভার সংখ্যা হলো বিশটি। প্রথমটি ছিল ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়ার মহাসভা। আর সর্বশেষটি ছিল ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমের মহাসভা। শেষোক্ত মহাসভায় পোপের নিষ্পাপ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন থেকে পোপ রোমান চার্চের পিতরের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তার সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত হয়। রোমান চার্চ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম হলো ইহুদিদেরকে মসিহ আলাইহিস সালামের হত্যার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া।

ছয়. ইহুদি এবং খ্রিষ্টান উভয় শ্রেণির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পোল তাওরাতকে রহিত করেন। এটি ছিল খ্রিষ্টধর্মে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর ভূমিকাস্বরূপ। কেননা, তাওরাত ছিল পোলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায়। তিনি প্রত্যেকের সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন মুক্তির জন্য মসিহের ওপর বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট।

গালাতিয়বাসীদের প্রতি লিখিত পত্রে তিনি বলেন, "কিন্তু ব্যবস্থার[৪৩৫] দ্বারা কেহই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হয় না, ইহা সুস্পষ্ট, কারণ "ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে"। কিন্তু ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়, বরং "যে কেহ এই সকল পালন করে, সে তাহাতে বাঁচিবে"। খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্ত শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা, লেখা আছে, "যে ব্যক্তিকে গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"; যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।[৪৩৬]

তাওরাতকে রহিতকরণের মাধ্যমে পোল এমন কতগুলো বিধানকে অকার্যকর করতে সক্ষম হন যেগুলো ইহুদি এমনকি মসিহ আলাইহিস সালামের কাছেও স্বীকৃত ছিল। তন্মধ্যে একটি হলো খতনা বা ত্বকচ্ছেদ।

পোল বলেন, "দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। যে কোন মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য।"[৪৩৭]

তিনি আরও বলেন, "যে সকল লোক মাংসে সুরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে; ইহার অভিপ্রায় এই মাত্র, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি তাড়না না ঘটে। কেননা, যাহারা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিজেরাও ব্যবস্থা পালন করে না; বরং তাহাদের ইচ্ছা এই যে, তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও, যেন তাহারা তোমাদের মাংসে শ্লাঘা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত। কারণ ত্বক্‌ছেদ কিছুই নয়, অত্বক্‌ছেদও নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার।"[৪৩৮]

---

[৪৩৫] ব্যবস্থা থেকে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরাত। কিতাবুল মুকাদ্দাস তথা বাইবেলে শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।-অনুবাদক

[৪৩৬] *গালাতিয়,* অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১১-১৪।

[৪৩৭] *গালাতিয়,* অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২-৩।

[৪৩৮] *গালাতিয়,* অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ১২-১৫।

এভাবেই পোল খতনাকে অকার্যকর করেন। একইভাবে মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানদের জন্য শুকর খাওয়ার বৈধতা প্রদান করেন।[৪৩৯]

খ্রিষ্টধর্মে পোলের কার্যক্রম ছিল এরকমই। তিনি তাওরাতকে রহিত করেছেন। তাওরাতের বিধানাবলিকে অকার্যকর করেছেন। অথচ মসিহ আলাইহিস সালাম নিজেই ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি তাওরাতকে রহিত করার জন্য আসেননি। যেমন মসিহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য মথি এভাবে উল্লেখ করেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"[৪৪০]

সপ্তম হিজরির বিশিষ্ট ইহুদি ব্যক্তিত্ব সাইদ ইবনে মনসুর কিমুনি তার রচিত *তানকিহুল আবহাস লিল মিলালিস সালাস* নামক গ্রন্থে বলেন : শুকর হালাল হওয়া, খতনা ত্যাগ করা তাওরাতের সাথে সাংঘর্ষিক প্রভৃতি বিধানগুলো হাওয়ারিগণ থেকে বর্ণিত। মসিহ থেকে বর্ণিত নয়। কেননা, মসিহ গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত তাওরাতের বিধানের অনুগামী ছিলেন। মানুষকেও তিনি সেভাবে নির্দেশনা প্রদান করতেন। তিনি বলতেন, "আমি তাওরাতকে রহিত করতে আসিনি।" এমনকি তার ব্যাপারে তাওরাতের বিধানাবলীতে শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ করা হলে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, এটা শৈথিল্য প্রদর্শন নয়। সুসমাচারগুলোতে এ সংক্রান্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মসিহ এর শিষ্যগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই আদর্শের ওপর অটল ছিলেন। পরবর্তীতে তারা এর উল্টো নীতি গ্রহণ করেন এবং তাওরাত রহিত হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা দেন। তারা জানেন যে, মসিহ এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এর আবশ্যকীয়তা ছিল। এখন আর তা বাকি নেই রহিতকরণের এই সিদ্ধান্তটি মূলত পোলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছিল।[৪৪১]

পূর্বাঞ্চলীয় ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর পোল ইউরোপিয়ান অঞ্চলের দিকে মনোনিবেশ করলেন। খ্রিষ্টধর্মে তিনি নতুন এক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটালেন। খ্রিষ্ট এবং খ্রিষ্টবাদকে বৈশ্বিক হিসেবে দাবি করে বসলেন। অথচ মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ছিল শুধু ইহুদিদের জন্য।

---

[৪৩৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন *মথি*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৬, *পিতরের ২য় পত্র*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২২। প্রভৃতি।

[৪৪০] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৭-১৮।

[৪৪১] *তানকিহুল আবহাস লিল মিলালিস সালাস*, পৃষ্ঠা : ৫৪।

কোনো কোনো পৌত্তলিক তাদেরকে মসিহের দিকে সম্বন্ধ করে তিরস্কারের সুরে মসিহি বা খ্রিষ্টান বলত। তখন পিতর খ্রিষ্টানদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া দুঃখভোগ করে, তবে সে লজ্জিত না হউক; কিন্তু এই নামে ঈশ্বরের গৌরব করুক।"[৪৪২]

এজন্যই আমরা দেখি কোরআন এই নামটি ত্যাগ করেছে এবং তাদের প্রকৃত গুণবাচক 'নাসারা' নামেই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

অতঃপর ঈসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, 'কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?' সঙ্গী-সাথিরা বলল, 'আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫২]

অনেক খ্রিষ্টান আলেম দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেছেন যে, সত্তর খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদিদের একটি উপদল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ উপদলের নাম ছিল নাসারা।[৪৪৩]

বর্তমানে খ্রিষ্টানদের কাছে স্বীকৃত সুসমাচারগুলোতেও মসিহের ভাষায় একথা ঘোষিত হয়েছে যে, তিনি ইহুদিদের সংশোধনের জন্য আগমন করেছেন। যেমন মথির সুসমাচারে এসেছে, "তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[৪৪৪]

বরনাবার সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে, "ঈশ্বর আমাকে ইসরাইল কুলের নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন দুর্বলদের সুস্থ করার নিমিত্ত।" এজন্য মসিহ আলাইহিস সালাম ইহুদিদের বার গোত্রে বারো জন শিষ্য নির্বাচন করেছিলেন। যেমন, মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে,

---

[৪৪২] *পিতর ১ম*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১৬।

[৪৪৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন ক্রস কর্তৃক রচিত *ফজরুল মসিহিয়্যাহ* কিতাবটি। এ ছাড়াও *History of Christianity* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৩৭৭। চার্লস গিজেনবার্ট বলেন, "খ্রিষ্টবাদ মূলত একটি ইহুদি আন্দোলন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এটি শুরুতে ইহুদিদের ধর্মীয় বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহুদিদের গণ্ডির বাইরে এর বাস্তবায়ন কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।" আল-মসিহিয়্যাহ নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা, পৃষ্ঠা : ২৫।

[৪৪৪] *মথি*, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ২৪।

"তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি; আমরা তবে কি পাইব? যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র[৪৪৫] আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।"[৪৪৬]

মথির সুসমাচারে আরও বলা হয়েছে, "এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন-তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।"[৪৪৭]

কুরআনুল কারিম বিভিন্ন আয়াতে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। যেমন বলা হয়েছে—

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

আর বনি ইসরাইলের জন্যে রাসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন।[সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.

স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বলল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

এভাবে আরও বহু আয়াতে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ইহুদিদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। পোলের আগমনের আগ পর্যন্ত

[৪৪৫] এখানে মসিহ মনুষ্যপুত্র বলতে নিজেকেই বুঝিয়েছেন। কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র মাখলুক ছিলেন। প্রভু ছিলেন না যেমনটা খ্রিষ্টানরা দাবী করে থাকে।]

[৪৪৬] *মথি*, অধ্যায় : ১৯, অনুচ্ছেদ : ২৭-২৮।

[৪৪৭] *মথি*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৫-৬।

হাওয়ারি আর শিষ্যগণ এই নীতির ওপরই অটল ছিলেন। পোল এসে এই নিয়মকে পরিবর্তন করেন। খ্রিষ্টান লেখকগণ তাদের বিভিন্ন লিখনিতে বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

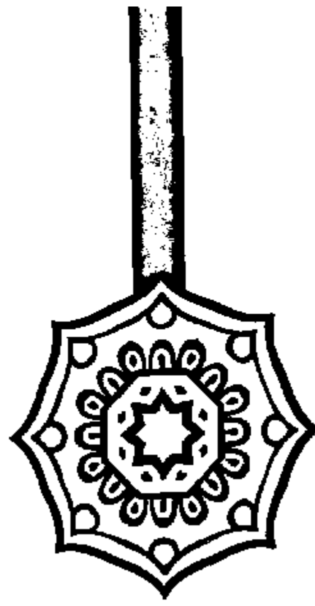
কট্টরপন্থী খ্রিষ্টান লেখক হাবিব সাইদ তার *আদইয়ানুল আলাম* গ্রন্থে বলেন, "প্রকৃতিগতভাবে সুসমাচার একটি পূর্ণাঙ্গ মিশন। এটি কোনো জাতি, বর্ণ বা শ্রেণির জন্য খাস নয়। প্রথমদিকের শিষ্যগণ শুরুতে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেননি। তারা বুঝতে পারেননি ইহুদিদের সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে গেছে। মহান দূত পোলই সর্বপ্রথম মিশনের এই দুর্বল দিকটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন, এই মিশন ইহুদি, অ-ইহুদি বর্বর, গ্রিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। মসিহের ব্যাপারে ঈশ্বরের ঘোষণা সকল সংকীর্ণতা ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে। এটি সমগ্র মানবতাকে শামিল করে। সুসমাচার হলো সমগ্র মানবতার জন্য মুক্তির নির্দেশিকা।"[৪৪৮]

উইলিয়াম ব্যাটন তার *আদইয়ানুল আলমিল কুবরা* গ্রন্থেও একই মত প্রকাশ করেছেন।

পোল খ্রিষ্টাব্দের বৈশ্বিক হওয়ার দাবি করলেও এই দাবির স্বপক্ষে মসিহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে বর্ণিত কোনো বক্তব্য দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেননি।



[৪৪৮] *আদইয়ানুল আলাম*, পৃষ্ঠা : ২৮৪।



খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ

পঞ্চম শতাব্দী সূচনালগ্নে খ্রিষ্টানগণ সাতাশটি পুস্তককে নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এগুলোই পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। সম্মিলিতভাবে এই পুস্তকগুলোকে তারা নতুন নিয়ম (New Testament) নামকরণ করে। মূলত ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের সমষ্টি পুরাতন নিয়ম (Old Testament) -এর বিপরীতে এ নামকরণ করা হয়।

উভয় নিয়মের পুস্তিকাগুলোকে একত্রে *কিতাবুল মুকাদ্দাস* (Holy Bible) বলা হয়। খ্রিষ্টানরা নিজেদেরকে *কিতাবুল মুকাদ্দাস* তথা বাইবেলে বিশ্বাসী বলে দাবি করে থাকে।

ইতিপূর্বে আমরা পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা নতুন নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করব। নতুন নিয়মের দুটি পুস্তক ব্যতীত অবশিষ্ট পুস্তকগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

১ম শ্রেণি : চার সুসমাচার।

২য় শ্রেণি : পোলের চিঠিসমূহ। এর সংখ্যা চৌদ্দটি।

৩য় শ্রেণি : ক্যাথলিক পত্রসমূহ। এর সংখ্যা সাতটি।

অবশিষ্ট পুস্তক দুটি হলো—

এক. লুক কর্তৃক রচিত প্রেরিতদের কার্যবিবরণী।

দুই. যোহন ভাববাদীর স্বপ্ন বা প্রকাশিত বাক্য।

খ্রিষ্টানদের এই ধর্মীয়গ্রন্থগুলো ইতিহাসের অন্ধকারে রচিত হয়েছে। এগুলোর লিপিবদ্ধকরণের সঠিক তারিখ জানা যায় না। এর মৌলিক কারণ দুটি।

প্রথম কারণ : খ্রিষ্টবাদের ওপর নেমে আসা ধারাবাহিক বিপর্যয়।

দ্বিতীয় কারণ : পোল কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ।

খ্রিষ্টানদের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা থেকেই খ্রিষ্টানগণ রোমান শাসক ও ইহুদি জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। এক পর্যায়ে মসিহ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশও জারি করা হয়। মসিহ আলাইহিস সালামের যুগ শেষ হয়ে গেলেও নির্যাতন থেমে যায়নি। বরং চতুর্থ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত এই জুলুম নির্যাতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

এই তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতির সুযোগে লেখকগণ ধর্মীয় গ্রন্থে নিজেদের ইচ্ছামাফিক হস্তক্ষেপ করেন। তারা নিজেদের মতো করে গ্রন্থগুলো রচনা করেন। অনেক কিছুই সেখান থেকে মুছে দেন। খ্রিষ্টীয় সমাজের পক্ষ থেকে তাদের ওপর নজরদারির কোনো সুযোগ ছিল না। এসব মিথ্যুক লেখক ও ইতিহাসবিদদের তাদের এই হীনকর্ম থেকে বাধা দেওয়ারও কেউ ছিল না।

কোনো কোনো খ্রিষ্টান সুসমাচারগুলোর উদ্ভট ও বিরোধমূলক আলোচনার পক্ষে এই বলে সাফাই গেয়েছেন যে, এগুলো খ্রিষ্টধর্মের প্রথমদিকের দুর্যোগকালীন সময়ে রচিত হয়েছে।

পোল কর্তৃক খ্রিষ্টানদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ

পোল নিজেকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মিথ্যা দাবি করেন। রোমানদের পৌত্তলিক ধর্ম সম্পর্কে তার যথেষ্ট অবগতি ছিল। একইভাবে জেনোর বৈরাগ্যবাদী দর্শনের (Stoicism) সাথেও ছিল তার সখ্য। জেনোর মতবাদটি তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। সেখান থেকে রোমান উপনিবেশগুলোতে এটি ছড়িয়ে পড়ে।

এই মতবাদে বিশ্বাসীরা এমন এক আত্মায় বিশ্বাস করে যা বিশ্বজগতের পরিচালক। তাদের মতে এই আত্মা বিশ্বজগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আত্মাটি জগতের সকল বস্তুতে

এমনভাবে বিরাজ করে, যেভাবে গাছের মধ্যে পানি এবং অঙ্গারের মধ্যে আগুন বিরাজ করে। তাদের মতবাদের সর্বশেষ বক্তব্য হলো, জগতের মধ্যে আত্মা এবং দেহের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। উভয়ে মিলে একক অস্তিত্বের অধিকারী। একটি ছাড়া অপরটি কল্পনা করা যায় না। এটিই হলো বাস্তব অস্তিত্ব। জেনোর বৈরাগ্যবাদী মতবাদে এই বিশ্বাসকে 'ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ' নামে অভিহিত করা হয়।

খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশের পূর্বে পোলের এই মতবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগতি ছিল। তাই সে একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টধর্মের সাথে পৌত্তলিকতার মিশেল ঘটায়। তার পত্র এবং উপদেশসমূহ জেনোর এই নাস্তিক্যবাদী বৈরাগ্যের দর্শনে পরিপূর্ণ।

সুসমাচারের লেখকগণ কেউই মসিহ আলাইহিস সালামের সরাসরি শিষ্য ছিলেন না। তারা পোলের পৌত্তলিক ও ধর্মদ্রোহী চিন্তাধারা থেকে অনেক কিছুই তাদের রচনায় গ্রহণ করেন। নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত খ্রিষ্টানদের অসতর্কতার সুযোগে তারা এগুলোকে মসিহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেন। কেননা, খ্রিষ্টানদের কাছে সমাদৃত চারটি সুসমাচার তথা মথির সুসমাচার, মার্কের সুসমাচার, লুকের সুসমাচার ও যোহনের সুসমাচার তৃতীয় শতাব্দীর সূচনাতেই পরিচিতি লাভ করে। এগুলোর বিষয়ে প্রথম কথা বলেছেন আরিয়ুনুস ২০৯ খ্রিষ্টাব্দে। এ কারণেই সুসমাচারগুলোসহ খ্রিষ্টানদের যাবতীয় ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর থেকে আস্থা উঠে যায়।

প্রাচীন খ্রিষ্টানগণ এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন এটি মসিহ আলাইহিস সালামের তাওহিদের দাওয়াতকে পৌত্তলিকতায় বদলে দেবে। তবে তাদের এই চিন্তা হুকুমত কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেনি। ফলে সূচনাতেই খ্রিষ্টধর্মের ওপর ধেয়ে আসা এই বিধ্বংসী তরঙ্গের সামনে তা ধ্বসে পড়ে। অনেকগুলো সুসমাচার, পত্র, ওয়াজ, নসিহত হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া এই পুস্তকগুলোতেই ছিল মসিহ আলাইহিস সালামের বিশুদ্ধ দাওয়াতের বর্ণনা। যদি বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত এগুলোতে না থাকত তাহলে পৌত্তলিক ইহুদি পোলের অনুসারীরা এগুলো লুকিয়ে ফেলত না।

আল-ফাসিল বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল গ্রন্থের লেখক বলেন, "হে প্রবঞ্চিত! বল দেখি, তোমাদের ধর্মের বর্ণনাকারীদের সততার ব্যাপারে কী নিশ্চয়তা আছে? তোমাদের আদর্শিক বক্তব্যের সত্যতার আছে কি কোনো প্রমাণ? তোমরা ভালোভাবেই জান এবং স্বীকারও কর যে, ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে কখনো কলম ধরেননি। লিখিত কোনো কিছুই তিনি রেখে যাননি। তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য কাউকে দায়িত্বও দেননি। কোনো মানুষকে দিয়ে তার শরিয়ত লিখিয়ে নেননি। তার সকল বক্তব্য ও নসিহত ছিল মৌখিক। তার জীবদ্দশায় এগুলো কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হয়নি। এমনকি তিনি চলে যাওয়ার পর কাছাকাছি সময়েও এগুলোর কোনো সংকলন তৈরি হয়নি। কেননা,

তোমাদের ধর্ম বেড়ে উঠেছে নাসরতে স্বল্পসংখ্যক মৎস্যজীবীদের মাঝে। ইহুদিদের সাথে সংমিশ্রণ এবং নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মসিহ আলাইহিস সালামের কোনো বক্তব্য সংকলনের সামর্থ্য তাদের ছিল না।”[৪৪৯]

এরপর সুসমাচারগুলোর বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধী বক্তব্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “সুসমাচারগুলোর প্রথম লিপিবদ্ধকরণের কাজ হয়েছিল ৬০-১২০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে। এরপর দীর্ঘ দুই শতাব্দী যাবৎ এগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃতির শিকার হয়। জাতির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এগুলোর বর্ণনার মাঝে আনা হয় ব্যাপক পরিবর্তন। প্রথম শতাব্দীর লেখকগণ এই সুসমাচারগুলো থেকে কখনোই উদ্ধৃতি দিতেন না।”[৪৫০]

পাঠক সমীপে এ পর্যায়ে আমরা খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন পুস্তক ও চিঠিপত্রের আনুমানিক রচনাকাল চার্ট আকারে তুলে ধরছি।

ক্রমিক	পুস্তক/চিঠি	রচনাকাল	প্রকার
১	থিষলনিকিয়দের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্র	৫০ খ্রিষ্টাব্দ	
২	থিষলনিকিয়দের প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় পত্র	৫০ খ্রিষ্টাব্দ	
৩	গালাতিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্র	৫০-৫১ খ্রিষ্টাব্দ	
৪	করিন্থিয়দের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্র	৫৫ খ্রিষ্টাব্দ	পোল কর্তৃক লিখিত পত্র
৫	করিন্থিয়দের প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় পত্র	৫৫ খ্রিষ্টাব্দ	
৬	রোমিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্র	৫৬ খ্রিষ্টাব্দ	
৭	ফিলিপিয়দের প্রতি	৫৯-৬০	

[৪৪৯] ড. মুহাম্মদ শামা কর্তৃক তাহকিককৃত আবু উবাইদা আল-খাজরাযির রচিত পুস্তক *বাইনাল ইসলাম ওয়াল মাসিহিয়্যাহ* থেকে চয়নকৃত। পৃষ্ঠা : ১৭৪।

[৪৫০] *কিসসাতুল হাদারাহ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৭।

	প্রেরিত পত্র	খ্রিষ্টাব্দ	
৮	ফিলিমনীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্র	৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ	
৯	কলিসিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্র	৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ	
১০	ইফিষিয়দের প্রতি লিখিত পত্র	৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দ	অধিকাংশ সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী
১১	মার্কের সুসমাচার	৬৮ খ্রিষ্টাব্দ	
১২	লুকের সুসমাচার	৯০ খ্রিষ্টাব্দ	
১৩	প্রেরিতদের কার্যবিবরণী	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	
১৪	মথির সুসমাচার	৯৫-১১২ খ্রিষ্টাব্দ	ক্যাথলিক পত্রসমূহ
১৫	যোহন ভাববাদীর স্বপ্ন/প্রকাশিত বাক্য	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	
১৬	ইবরিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্র	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	
১৭	পিতরের প্রথম পত্র	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	
১৮	যিহুদার পত্র	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	
১৯	যাকোবের পত্র	৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	দাওয়াতি পত্র
২০	তিমথিয়ের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্র	১০০ খ্রিষ্টাব্দ	
২১	তিমথিয়ের প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় পত্র	১০০ খ্রিষ্টাব্দ	

২২	তিতের প্রতি প্রেরিত পত্র	১০০ খ্রিষ্টাব্দ	জ্ঞানবাদীদের (Gnosticism)[৪৫১] বিরুদ্ধে লিখিত পত্র
২৩	যোহনের সুসমাচার	১০০-১২৫ খ্রিষ্টাব্দ	
২৪	যোহনের প্রথম পত্র	-	
২৫	যোহনের দ্বিতীয় পত্র	-	
২৬	যোহনের তৃতীয় পত্র	-	
২৭	ইগনাটিউসের পত্র	১১০-১১৫ খ্রিষ্টাব্দ	
২৮	পলিকার্টের পত্র	-	
২৯	বরনাবার পত্র	১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ	প্রেরিতদের বিলম্বিত পুস্তক
৩০	বারোজন প্রেরিতের শিক্ষা		
৩১	পিতরের দ্বিতীয় পত্র	১৫০ খ্রিষ্টাব্দ	
৩২	সুসমাচার চতুষ্টয়ের বিধিসম্মতকরণ	১৫০ খ্রিষ্টাব্দ	
৩৩	ক্লেমেন্টের দ্বিতীয় পত্র		

ফ্রেডরিক গ্র্যান্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই চার্টটিতে বর্ণিত সময়কাল পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এখানে অনিশ্চিতভাবে কাছাকাছি একটি রচনাকাল বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৪৫২]

এই তালিকার ওপর অধ্যাপক আহমদ আব্দুল ওয়াহ্হাব একটি পর্যালোচনা লিখেছেন। তিনি বলেন, "এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো এমন কিছু

---

[৪৫১] মসিহ আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে প্রকাশিত একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এটি খ্রিষ্টধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। শিষ্যদের যুগে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সিমোন। তার অনুসারীরা তাকে মসিহ বলত। এই লোকটি জাদুর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করত। ফলে প্রথমদিকের অনেক খ্রিষ্টান তার মতাদর্শের অনুসারী হয়।

[৪৫২] *আল-মসিহ ফি মাসাদিরিল আকাইদিল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৩১।

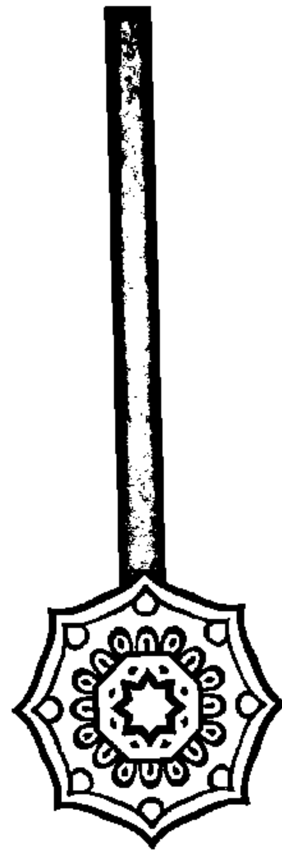
ব্যক্তিবর্গের সংকলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যারা তালিকায় বর্ণিত তারিখের কয়েক দশক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা নিহত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, পিতর এবং পোলের কথাই ধরা যাক। তারা উভয়ে ৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই নিহত হন। অথচ তালিকায় পিতরের প্রথম পত্রের রচনাকাল লেখা হয়েছে ৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। আর পিতরের দ্বিতীয় পত্রের রচনাকাল লেখা হয়েছে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ। একইভাবে তিমথিয়বাসীদের নিকট লিখিত পোলের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং তিতের কাছে লিখিত পত্রের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে ১০০খ্রিষ্টাব্দ।"

এরপর লেখক বলেন, "আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবীতে মসিহ আলাইহিস সালামের শেষ সময় এবং ঊর্ধ্বারোহণের আনুমানিক সময়কাল হলো ৩৩ খ্রিষ্টাব্দ। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় সবচেয়ে প্রাচীন সুসমাচার (মার্ক) লিখিত হয়েছে মসিহের ঊর্ধ্বারোহণের পঁয়ত্রিশ বছর পর। আর সবচেয়ে নতুন সুসমাচারটি (যোহন) লিখিত হয়েছে মসিহ পরবর্তী ৭০ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে। এসব কিছু হয়েছে এমন একটা যুগে যে যুগে কঠোরতা ও পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৪৫৩]

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ সম্পর্কে ভূমিকাস্বরূপ এ কয়েটি কথা আলোচনার পর আমরা এ পর্যায়ে নতুন নিয়মের পর্যালোচনা শুরু করব। নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলো তিন প্রকার।



[৪৫৩] প্রাগুক্ত



প্রথম প্রকার : চার সুসমাচার

মথির সুসমাচার

এই সুসমাচারটির লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেন করগ্রাহী মথি। তিনি বারোজন হাওয়ারির একজন। মসিহ আলাইহিস সালামের সংস্পর্শে আসার পূর্বে তিনি কেপারনিয়াম গ্রামে রোমানদের হয়ে রাজস্ব আদায় করতেন। মসিহ আলাইহিস সালাম তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে তিনি ঈমান আনেন। অতঃপর মসিহ আলাইহিস সালাম তাকে নিজের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। যেমন, সুসমাচারটিতে বর্ণিত হয়েছে, "আর সেই স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক এক ব্যক্তি করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া আছে; তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আসো। তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। পরে তিনি গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিয়াছেন, আর দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত বসিল। তাহা দেখিয়া ফরীশীরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, তোমাদের গুরু কী জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের সহিত ভোজন করেন? তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে।"[৪৫৪]

[৪৫৪] *মথি*, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ৯-১২। অনুচ্ছেদটির বর্ণনাভঙ্গি আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে যে, হাওয়ারি মথি নিজেই এই সুসমাচারের লেখক কিনা?

ইহুদিরা রাজস্ব আদায়কারীদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। কেননা, তারা প্রজাদের ওপর জুলুম করত। দখলদার রোমানদের শাসনকে মজবুত করতে তাদের পক্ষ হয়ে ইহুদিদের মধ্য থেকেই একজন প্রতিনিধি রাজস্ব আদায়ের কাজটি করত।

মথি তার সুসমাচার লিখতে গিয়ে দুটি উৎসের ওপর নির্ভর করেছেন।

প্রথম উৎস : লুকিয়া। এটি মসিহ আলাইহিস সালামের নসিহতের সংকলন। ইতিপূর্বে মথি নিজেই এটি সন্নিবেশ করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই এটি হারিয়ে যায়। তার কিছু অংশ মথি স্বীয় সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় উৎস : মার্কের সুসমাচার। অনেকগুলো অনুচ্ছেদই তিনি মার্কের সুসমাচার থেকে গ্রহণ করেছেন।[৪৫৫] বরং মার্কের সুসমাচারের ছয়শ ষাটটি অনুচ্ছেদের মধ্য থেকে ছয়শ ছয়টি অনুচ্ছেদই মথি তার সুসমাচারে উদ্ধৃত করেছেন।[৪৫৬]

মসিহ আলাইহিস সালামের উর্ধ্বারোহণের পর তার দাওয়াতের মিশন নিয়ে মথি দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। একসময় তিনি হাবশায় গিয়ে থিতু হন। সেখানে তেইশ বছর অবস্থানের পর ৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এই সুসমাচারের ভাষা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক আরব ঐতিহাসিকের মতে মথি এটি হিব্রু ভাষায় রচনা করেছিলেন।[৪৫৭] ইবনে খালদুনসহ আরও অনেকেই এই মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "মথি তার সুসমাচারটি বাইতুল মুকাদ্দাসে বসে হিব্রু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর সিবদিয়ের পুত্র যোহন এটিকে ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তর করেন।"

কিন্তু আমাদের হাতে মথির যে সুসমাচারটি পৌঁছেছে সেটি গ্রিক ভাষার অনুবাদ। এটি মূল রচনার অব্যবহিত পরেই একই বছর অর্থাৎ ৬০ খ্রিষ্টাব্দে অনূদিত হয়েছে।

এই অনুবাদক কে ছিলেন তা নির্ধারণ করতে গিয়ে আলেমগণ নানান মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মথি নিজেই এটি গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইবনে খালদুন, ইবনে বিতরিক এবং তৃতীয় হিজরির একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক মনে করেন এই অনুবাদটি যোহনের, যিনি নিজেও একটি সুসমাচারের রচয়িতা।

---

[৪৫৫] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৯।

[৪৫৬] *আযলিয়্যাতুল আনাজিল*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৭। সঠিক তথ্য হলো, মার্কের সুসমাচারের অনুচ্ছেদ সংখ্যা হলো ছয়শ আটষট্টিটি। আর মথির সুসমাচারের অনুচ্ছেদের সংখ্যা হলো দশ হাজার একাত্তরটি।

[৪৫৭] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের* লেখকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের মাঝে আরেকটি মতভেদপূর্ণ বিষয় এই যে, মথি কর্তৃক রচিত সুসমাচারটি কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে নাকি রক্ষা পেয়েছে?

ইউরোপিয়ান লেখকগণ মনে করেন, সুসমাচারটির সঠিক পরিণতি জানা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত সুসমাচারটি কোনো এক অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক রচিত। ১৭৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে এটির কোনো পরিচয়ই ছিল না। প্রফেসর হ্যারিং এই মতটিই পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, "মথির সুসমাচারটি ৮০-১০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে রচিত হয়েছে। লোকেরা মনে করে এটি হাওয়ারি মথির রচনা। অথচ বিশুদ্ধ মত হলো এটি অন্য কোনো ব্যক্তি রচনা করেছেন যিনি অজানা কোনো উদ্দেশ্যে নিজেকে গোপন রেখেছেন।"[৪৫৮]

আরিয়ুনুস বিশ্বাস করেন এই সুসমাচারটি হাওয়ারি মথির রচনা নয়। কেননা, এতে মার্কের সুসমাচার থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি মথির কোনো এক শিষ্য ৮৫-৯০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে রচনা করেছেন।[৪৫৯] সংকলনের ইতিহাস এবং অনুবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রচলিত এই সুসমাচারের ওপর আস্থা নষ্ট করে দেয়।

শায়খ আবু যুহরা বলেন, "সন্দেহ নেই যে সংকলন ইতিহাস, মূল হিব্রু কপি, অনুবাদক, অনুবাদকের সততা, ধর্মীয় জ্ঞান, ভাষাজ্ঞানের মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এর ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একজন গবেষক সংকলন-ইতিহাস ও অনুবাদসংক্রান্ত বিষয়ে ছাড় দিলেও বর্ণনার ধারাবাহিকতার অপূর্ণাঙ্গতাকে তিনি কোনোভাবেই ছাড় দিতে পারেন না। বিশেষত যখন অনুবাদ সম্পর্কেই জানা যায় না। অনুবাদের এই ত্রুটির কারণে আমরা মূল গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করেছি। যাতে করে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে নাকি বিকৃতি ঘটেছে? অনুবাদক বাক্যের যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা? অনুধাবনটা বাক্যের বাহ্যিক অর্থ, কিংবা ইশারা থেকে হোক অথবা লেখকের সামগ্রিক উদ্দেশ্য থেকেই আঁচ করা হোক না কেন। কিন্তু মূল গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৪৬০]

মথির সুসমাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একদিক থেকে পুরাতন নিয়মের বর্ধিতাংশের মতো। বিশেষত একথা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যে, মসিহ আলইহিস সালাম বনি ইসরাইলের ইতিহাসকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই আগমন করেছেন। তাইতো সুসমাচারটির বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসিহ আলাইহিস সালাম শিষ্যগণকে

---

[৪৫৮] *তারিখুস সুহুফিস সামাবিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১১১।

[৪৫৯] *কিসসাতুল হাদারাহ,* খণ্ড : ১১ পৃষ্ঠা : ২০৮।

[৪৬০] *মুহাদারাতুন ফিন নাসরানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৪।

শুধু ইহুদিদের নিকটই পাঠিয়েছিলেন। এবং তাদেরকে সামেরিয়ানদের শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

ড. মরিস বুকাইলি মথির সুসমাচারটি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তের সারনির্যাস এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "সবকিছু ছাপিয়ে মথির সুসমাচার সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, এটি একদল ইহুদির সুসমাচার।"[৪৬১]

মার্কের সুসমাচার

মার্কের প্রকৃত নাম যোহন। ল্যাটিন ভাষায় তার উপাধি মার্ক। এর অর্থ হচ্ছে হাতুড়ি। তিনি জেরুযালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত। *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস* গ্রন্থের লেখক বলেন, "ধারণা করা হয় মার্ক হলেন সেই যুবক যিনি শত্রুহস্তে সমর্পণের রাতে মসিহ এর পিছু পিছু অনুসরণ করেছিলেন।"[৪৬২] পিতর তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন।[৪৬৩] তিনি সাইপ্রাস ও এশিয়া মাইনরের দাওয়াতি সফরে পোল ও বরনাবার সাথে ছিলেন। এরপর প্রধান হাওয়ারি পিতরের সাথে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি সময় অতিবাহিত করেন। এবং তার অনুগামী হয়ে রোমে গমন করেন।

মার্কের ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস ছিলেন পোল এবং শিষ্যবৃন্দ। তিনি ছিলেন বরনাবার ভাগিনা। পোল কলসিয়দের প্রতি তার লিখিত পত্রে বলেন, "আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বরনাবার কুটুম্ব, মার্ক- যাঁহার বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও।"[৪৬৪]

মার্ককে কেন্দ্র করে পোল এবং বরনাবার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। যেমন, প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, "কতক দিন পরে পৌল বরনাবাকে কহিলেন, চল, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে এখন ফিরিয়া গিয়া ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তাহারা কেমন আছে। আর বারনাবা চাহিলেন, যোহন যাঁহাকে মার্ক বলে, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন; কিন্তু পৌল মনে করিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কার্যে গমন করে নাই, এমন লোককে সঙ্গে করিয়া লওয়া উচিত নয়। ইহাতে এমন বিতণ্ডা হইল যে,

---

[৪৬১] *দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসাহ ফি দ্বওইল মাআরিফিল হাদিসাহ,* পৃষ্ঠা : ৮৩।

[৪৬২] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস,* পৃষ্ঠা : ৮৫৩।

[৪৬৩] *পিতর ১ম,* অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৩।

[৪৬৪] *কলসিয়,* অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১০। কলসিয় হলো এশীয় মাইনরের একটি ফ্রিজিয়ান (Phrygia) নগরী। এটি লাওডোসিয়া (Laodicea) থেকে বারো মাইল দূরে লাইকাস (Lycus) নদী ও তার শাখা মায়েনদর (Maendr)-এর মিলনকেন্দ্রে অবস্থিত।

তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইলেন; বরনাবা মার্ককে সঙ্গে করিয়া জাহাজে কুপ্রে (সাইপ্রাস) গমন করিলেন।"[৪৬৫]

এরপর মার্ক আবার পোলের কাছে ফিরে যান। নিজেকে পোলের সেবায় নিয়োজিত করেন।[৪৬৬]

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লেখক লুক মতবিরোধের এই বিষয়টি অত্যন্ত হালকাভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ঘটনার বর্ণনায় তার ব্যবহৃত শব্দটি রহস্যময়। যদ্দরুন বোঝা যায় মতবিরোধের ভিত্তি এর চেয়ে বড় কিছুই ছিল।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর ব্যাখ্যাকার ব্লেইকলক (Blaiklock) বলেন, "লুক এ পর্যায়ে পোল এবং বরনাবার মাঝে সংঘটিত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো (Paraxusmus) আর ইংরেজি অনুবাদক জেমস এখানে (Sharp) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এরপর পোল এবং বরনাবা আরও একবার মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছেন।"[৪৬৭]

লুক মতবিরোধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বরনাবার চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। বরনাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াতি সফরে মার্ক তাদের সাথে থাকবেন। কিন্তু পোল এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু এই ছোট্ট কারণে তারা পৃথক হয়েছেন বলাটা বোধগম্য নয়। বরং এখানে আরও কিছু কারণ ছিল, যা সুসমাচারের লেখকগণ গোপন রেখেছেন। স্পষ্ট করে বলতে গেলে মতবিরোধের অন্যতম কারণ ছিল মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পোলের ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বি. সি. বি. (মৃত : ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ) তার গ্রন্থ *তারিখুল কানিসাহ*-তে মার্কের সুসমাচারের আলোচনা এনেছেন। তিনি নিকিয়ার মহাসভায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শামের বিশপ। ইতিহাসগ্রন্থে তিনি বলেন, "মার্ক গ্রিক ইহুদিদের বংশোদ্ভূত। তিনি পোল এবং বরনাবার সাথি। পরবর্তীতে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি তাদেরকে ত্যাগ করে পিতরের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। নিরোর অত্যাচারে পিতর নিহত হওয়ার পর তিনি মসিহের জীবনী লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন।" এই ঐতিহাসিক এসব ঘটনাবলি দ্বিতীয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্যাপিয়াস (Papias) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। প্যাপিয়াস ১৪০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত তার রচনায় বলেন, "আমি এই বর্ণনাগুলো প্রথম শতাব্দীর একজন ব্যক্তি

[৪৬৫] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ৩৬-৩৯।

[৪৬৬] *ফিলিমন*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ২৪।

[৪৬৭] *Commentary on Acts*, page : ১১৭, উর্দু ভাষায় রচিত *মা হিয়াল মসিহিয়্যাহ* গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

থেকে শুনেছি। কিন্তু প্যাপিয়াস ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ করেননি।[৪৬৮] ইতিহাসবিদগণ মনে করেন এই ব্যক্তিটি হলেন মার্ক।

প্যাপিয়াস আরও বলেন, "মার্ক তার সুসমাচারটি পিতরের স্মৃতিচারণ উপদেশাবলি থেকে রচনা করেছেন।"[৪৬৯] তবে মার্ক তার সুসমাচারে মসিহ আলাইহিস সালামের পুনরুত্থান এবং ঊর্ধ্বারোহণের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। এজন্যই ওয়েস্ট ক্যাট, হার্টসহ বিংশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিকই বলেছেন, মসিহ আলাইহিস সালামের পুনরুত্থান ও ঊর্ধ্বারোহণের গল্পটি মার্কের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পোলের হত্যাকাণ্ডের পর মার্ক প্রথমে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে গমন করেন। সেখান থেকে মিশরে গিয়ে তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করেন। মিশরে তিনি 'স্কুল অব আলেকজান্দ্রিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কিবতিদের অধীনে। তারা নিজেদেরকে মার্কের প্রতিনিধি বিবেচনা করে থাকেন।

মার্ক ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মিশরেই নিহত হন। বলা হয়ে থাকে মার্কের দিকে সম্বন্ধিত এই সুসমাচারটি রোম নগরীতে ৬৩ কিংবা ৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। কোনো কোনো খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মতে মার্ক মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য ছিলেন না। তিনি পিতর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। সম্রাট নিরোর সময়ে পিতর নিহত হওয়ার পর মার্ক খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষাগুলোকে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রোম নগরীতে বসে তিনি লেখালেখির কাজটি সম্পাদন করেন। কিন্তু এটি হারিয়ে যায়। পরবর্তিতে তিনি এটিকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেন। বর্তমানেও এই অনুবাদটি আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে। এই গ্রিক অনুবাদ থেকেই পরবর্তীতে সুসমাচারটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এই গ্রিক অনুবাদের বেশ কিছু সুস্পষ্ট ভুলের কথা স্বীকার করে থাকেন। আরিয়ুনুসের মতে এই ভুলগুলো এখনো বিদ্যমান। বলা হয়ে থাকে মার্ক এবং তার গুরু পিতর মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বকে অস্বীকার করতেন। এজন্যই ওয়েলস (Wells) বলেন, "সমালোচকদের মতে মসিহের জীবনীসংক্রান্ত আলোচনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ সুসমাচার হলো মার্কের সুসমাচার।"

লুকের সুসমাচার

প্রফেসর বারাকাত তার গ্রন্থ *তারিখুল ইনজিলে* লুক সম্পর্কে বলেন, "ইনি গ্রিক বংশোদ্ভূত। পৌত্তলিক ধর্ম থেকে তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত পোলের

[৪৬৮] *তারিখুস সুহুফিস সামাবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১৮।
[৪৬৯] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৭।

সান্নিধ্যে থাকেন। প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি তার সুসমাচারটি এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী রচনা করেন।"[৪৭০]

লুক এন্টিয়ক (Antioch)-এ জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ পেশাতেই মনোনিবেশ করেন। অতঃপর খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি পোলের সাথে অনেক দাওয়াতি সফরে অংশ নেন। পোল তাকে 'প্রিয় ডাক্তার' বলে সম্বোধন করতেন। যেমন কলসিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে তিনি বলেন, "তোমাদিগকে প্রিয় ডাক্তার লুক অভিবাদন জানাচ্ছে।"

এর দ্বারা বোঝা যায়, লুক মসিহ কিংবা শিষ্যগণের শিষ্যও ছিলেন না। তিনি ছিলেন পোলের অনুসারী। রোমান সাগরের তীরে ট্রাউস (Trowse) নগরীতে পৌঁছলে তিনি পোলের বক্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তার দিকে সম্বন্ধিত সুসমাচারটি খ্রিষ্টানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুসমাচার হিসেবে বিবেচিত।

লুক সুসমাচারটি কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিয়ে অদ্যাবধি বিরোধ বিদ্যমান। এটি কি গ্রিক ভাষায় রচিত হয়েছে নাকি ল্যাটিন ভাষায়? তবে এটি ৬৩ কিংবা ৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। সুসমাচারটি তিনি এমন একটি বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় সম্রাট থিওফিলাস (Theophilos)-এর উদ্দেশ্যেই তিনি এটি রচনা করেছেন। বাক্যটি হলো, "প্রথম অবধি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং বাক্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করিয়াছেন, তদনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই জন্য আমিও প্রথম হইতে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে আনুপূর্বিক বিবরণ লেখা বিহিত বুঝিলাম; যেন, আপনি যে সকল বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে পারেন।"[৪৭১]

সুসমাচারের সূচনা থেকে বোঝা যায় এটি প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে রচিত হয়েছে। মসিহ আলাইহিস সালামের বাণীর সংকলন এটি নয়। এতদসত্ত্বেও সুসমাচারটিতে মসিহ আলাইহিস সালামের অনেকগুলো বাণী স্থান পেয়েছে।

লুক তার সুসমাচারে মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত ঘটনাবলির মাঝে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। এটি রচনার পেছনে ইহুদিদের হিদায়াতের চেয়ে অ-ইহুদি

---

[৪৭০] *তারিখুস সুহুফিস সামাবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১২০।

[৪৭১] *লুক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-৪।

কাফির সম্প্রদায়ের হিদায়াতই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি মার্কের সুসমাচার থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করেছেন। মার্কের সুসমাচরে অনুচ্ছেদ রয়েছে ছয়শ একষট্টিটি। লুক সেখান থেকে তিনশ পঞ্চাশটি নিজ সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন। লুকের সুসমাচারের কতগুলো অনুচ্ছেদ মথির সুসমাচারের সাথে মিল পাওয়া গেলেও মার্কের সুসমাচারে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি এগুলো মথি থেকেই উদ্ধৃত করেছেন কিংবা তিনি এবং মথি উভয়ে তৃতীয় কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন, যে উৎস সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।[৪৭২]

যোহনের সুসমাচার

যোহন ছিলেন শীর্ষ বারোজন হাওয়ারির একজন। তার পিতা ছিলেন একেবারে প্রথম দিকের খ্রিষ্টান এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক। মসিহ আলাইহিস সালাম যোহনকে ভালোবাসতেন এবং 'প্রিয় হাওয়ারি' বলে সম্বোধন করতেন। চারটি সুসমাচারের একটি তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই সুসমাচারটি তিনি ৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছেন। সুতরাং সংকলন বিবেচনায় সবচেয়ে নতুন সুসমাচার এটি। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর প্রায় ত্রিশ বছর পর এটি রচিত হয়েছে।

কিন্তু মসিহ আলাইহিস সালামের হাওয়ারি যোহনের দিকে সম্বন্ধিত এই সুসমাচারটি যোহন নিজে লিখেছেন নাকি অন্য কেউ রচনা করেছেন তা নিয়ে খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের মাঝে রয়েছে তুমুল বিতর্ক। প্রাচীন খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এটিকে যোহনের দিকে সম্বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা এর লেখক বলেন, "সন্দেহাতীতভাবে যোহনের সুসমাচারটি একটি জাল পুস্তক। এর লেখক মূলত দুজন সাধু তথা যোহন[৪৭৩] এবং মথির মাঝে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রতারক লেখক পুস্তকের বিবরণীতে নিজেকে মসিহের প্রিয় হাওয়ারি বলে দাবি করেছেন। তারপরও ত্রুটিপূর্ণ এই বাক্যটিকে চার্চগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে। দৃঢ়তার সাথে স্বীকৃতিও দিয়েছে যে, এই লেখক হলেন হাওয়ারি যোহন। এমনকি পুস্তকের ওপর তার নামও সেঁটে দিয়েছে। অথচ এ কথা নিশ্চিত যে, এর লেখক হাওয়ারি যোহন ভিন্ন অন্য কেউ। এটি তাওরাতের ওই সমস্ত পুস্তকের মতো যেগুলোর সাথে লেখক হিসেবে সম্বন্ধিত

[৪৭২] *কিসসাতুল হাদারাহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৯।

[৪৭৩] এখানে যোহন থেকে মার্ক উদ্দেশ্য। কেননা মার্কের প্রকৃত নাম ছিল যোহন যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ব্যক্তির কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের করুণা হয় ওই সব ব্যক্তিবর্গের ওপর যারা এই পুস্তকের সাথে কথিত লেখকের সম্পর্ক খোঁজার জন্য বৃথা চেষ্টা ব্যয় করেছেন। তারা এই পুস্তকের লেখক ব্যক্তিটির সাথে গালিলের মৎস্যজীবী হাওয়ারি যোহনের সম্পর্ক প্রমাণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছেন। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

দাইরাতুল মাআরিফিল ফারানসিয়্যাহ যেটি *লা রওসুল করনিল ইশরিন* নামে পরিচিত তাতে লিখা হয়েছে, "যোহনের দিকে এই সুসমাচার ও নতুন নিয়মের আরও তিনটি পুস্তক সম্বন্ধ করা হয়। কিন্তু আধুনিক ধর্মতত্ত্ব গবেষণা এই সম্বন্ধকরণের শুদ্ধতা খুঁজে পায়নি।" একইভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এই সুসমাচারটিকে হাওয়ারি যোহনের দিকে সম্বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অস্বীকৃতি এসেছে আরিনুসের পক্ষ থেকে। আরিনুস ছিলেন যোহনের সরাসরি শিষ্য পলিকার্পের (Polycarp) শাগরিদ।

একইভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে অ্যালেগিন নামক একটি খ্রিষ্টান উপদলও এই সুসমাচারটিসহ যোহনের দিকে সম্বন্ধিত সকল পুস্তককে অস্বীকার করত। *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার* লেখক মনে করেন এই সুসমাচারটি শ্রিনটাস এর রচনা।[৪৭৪]

যোহনের সুসমাচার নিয়ে খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারণ হলো আকিদা-সংক্রান্ত কিছু বিষয়। মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব, ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি আকিদার আলোচনা প্রথম এই সুসমাচারটিতেই স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলো তথা মথি, লুক ও মার্ক কেউই এই আকিদাগুলোর আলোচনা তাদের সুসমাচারে আনেননি। তবে এগুলোর পরবর্তী যুগের অনুবাদগুলোতে মূল অর্থকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে, যা এই ভ্রান্ত আকিদার ইঙ্গিত বহন করে।

এ কারণেও যোহনের সুসমাচারের লেখকের পরিচয় অদ্যাবধি রহস্যের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে। ধর্মতত্ত্ব গবেষকগণ এই সুসমাচারটির রচনাকাল নিয়েও একমত হতে পারেননি। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, কোনো এক গ্রিক দার্শনিক এটি রচনা করেছেন। মসিহ আলাইহিস সালামের হাওয়ারিদের কেউই এটি রচনা করেননি। এই দাবির কারণ হলো সুসমাচারটিতে গ্রিক দেব-দেবী সংশ্লিষ্ট অনেক আলোচনা স্থান

---

[৪৭৪] *দাইরাতুল মাআরিফিল ব্রিতানিয়্যাহ*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৯৮।

পেয়েছে। বিশেষ করে ইহুদি দার্শনিক ফিলোর (Fhilo)[৪৭৫] দর্শন এখানে স্থান পেয়েছে। অথচ গবেষকগণের কাছে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হাওয়ারি যোহন নিরক্ষর ছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, "তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখিয়া এবং ইহারা যে অশিক্ষিত সামান্য লোক ইহা বুঝিয়া তাহারা আশ্চর্যজ্ঞান করিলেন।"[৪৭৬]

একইভাবে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এর লেখক ইহুদিদের উচ্চশ্রেণির কেউ ছিলেন।[৪৭৭] অথচ যোহন ছিলেন মৎস্যজীবী। এ ছাড়াও এই সুসমাচারটি বক্তব্যের ধরন, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি প্রভৃতি দিক থেকে অন্যান্য সুসমাচার থেকে ভিন্ন। জেমস মাইক ক্যানন এ কথা স্বীকার করে বলেন, "লেখকগণ হাওয়ারি যোহন ও এই সুসমাচারের লেখক মহামতি যোহনের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।"

পাকিস্তানি খ্রিষ্টান পণ্ডিত সাধু বরকতুল্লাহ বলেন, "এই সুসমাচারটি হাওয়ারি যোহনের রচনা হওয়া অসম্ভব। কেননা, সুসমাচারটির বিষয়বস্তু সাক্ষ্য দেয় যে, এর লেখক চার্চের প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি হবেন।" এরপর তিনি নিজ দাবি প্রমাণের জন্য সুসমাচারটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন।[৪৭৮]

যোহনের সুসমাচারের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এর লেখককে মসিহ আলাইহিস সালাম ভালোবাসতেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদগুলো সম্পর্কে সুসমাচারের ব্যাখ্যাকার ওয়েস্ট কোর্টের মন্তব্য হলো, "এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্ছেদগুলো পরবর্তীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।" আধুনিক যুগে বিশপ গোরেও (Gore) একই মত পোষণ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো সুসমাচারটির সিনাই কপিতে এই অনুচ্ছেদগুলো নেই। ওয়েস্ট কোর্ট তো সুস্পষ্টভাবে বলেই দিয়েছেন যে, মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বে বিশ্বাসীগণ বিরুদ্ধবাদীদের সামনে নিজেদের দাবি প্রমাণ করার জন্য এই অনুচ্ছেদগুলো বাড়িয়ে নিয়েছে।

অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত দিয়ে আলোচনা শুরু করলেও যোহন তা করেননি। উইল ডুরান্ট বলেন, "তিনি (যোহন)

---

[৪৭৫] ফিলো নামক এই ইহুদি মসিহ আলাইহিস সালামের সামসময়িক ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় তার দর্শনের বেশ প্রচার-প্রসার ছিল। গ্রিক দর্শনের আদলে তার নিজস্ব দর্শনের বিশেষ স্কুলও ছিল।

[৪৭৬] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১৩।

[৪৭৭] উদাহরণস্বরূপ দেখুন *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৬; অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১; অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৫; অধ্যায় : ১৯, অনুচ্ছেদ : ৩৮; অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৪৫, অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ৪৭ প্রভৃতি।

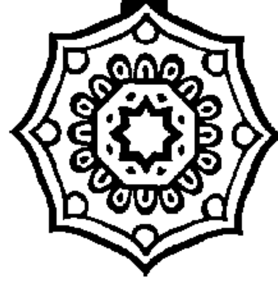
[৪৭৮] *আযলিয়াতুল আনাজিলিল আরবাআ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩১।

ঈশ্বরের কালিমা, জগতের সৃষ্টিকর্তা, মানবতার পরিত্রাণদাতা প্রভৃতি গুণ বর্ণনার দ্বারা মসিহকে ইলাহরূপে উপস্থাপন করেছেন। এটি অন্যান্য সুসমাচারের সাথে সাংঘর্ষিক। এই সুসমাচারে "বিশ্বাস নয়, জ্ঞানেই মুক্তি" ধারণা ও ম্যাটাফিজিক্সের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় সমর্থন থাকায় গবেষকগণ এই সুসমাচার সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন যে, এটি বাস্তবে যোহনের রচনা কি না?"[৪৭৯]

উপর্যুক্ত আলোচনার তথ্যগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, এর লেখক পোলের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এবং পোল কিংবা তার কোনো শিষ্যের ইশারায় এটি রচনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল পোলের বিরুদ্ধবাদীদের নিবৃত্ত করা। কালের বিবর্তনে খ্রিষ্টানরা তাদের অভ্যাসমতো ভুল-ভ্রান্তিসহ এই সুসমাচারটিকে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।



[৪৭৯] *কিসসাতুল হাদারাহ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৯।



সুসমাচারের বিষয়বস্তু

সুসমাচারগুলোর পরিচিতি ও এগুলোর লেখক সম্পর্কে আলোচনা করার পর এবার সংক্ষিপ্তাকারে এগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। সুসমাচারগুলোতে মৌলিকভাবে পাঁচটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে : ঘটনাবলি, আকিদা-বিশ্বাস, বিধিবিধান, আখলাক ও পরিবার।

এক. ঘটনাবলি

প্রতিটি সুসমাচারের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ। যেমন, মারইয়ামের ঘটনা, তার গর্ভধারণ, মসিহের জন্ম, স্বীয় ধর্মের প্রতি দাওয়াত প্রভৃতি।

লেখক ও ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও এই সুসমাচারগুলোকে মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনী জানার জন্য সবচেয়ে বড় জ্ঞানকোষ বিবেচনা করা হয়।

দুই. আকিদা-বিশ্বাস

আকিদার দিক থেকে সুসমাচারগুলোর প্রত্যেকটিতে মসিহের প্রভুত্ব এবং ঈশ্বরপুত্র হওয়ার আলোচনা স্থান পেয়েছে। একইভাবে আলোচিত হয়েছে প্রভুর তিন সত্তা তথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে। আদিপাপের প্রায়শ্চিত্ত করার নিমিত্ত মসিহ

আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও এই সুসমাচারগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে।

সুসমাচারগুলোর আকিদাসংক্রান্ত আলোচনা এই কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তথাপি মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব বিষয়টি যেহেতু প্রথম শতাব্দীর খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত মত ছিল না এবং পিতর ও বরনাবার মতো মসিহ আলাইহিস সালামের সান্নিধ্য পাওয়া এবং তাঁর প্রভুত্বকে অস্বীকারকারী হাওয়ারি যেহেতু তখনো জীবিত ছিলেন, তাই সুসমাচারগুলোতে আমরা এমন কিছু অনুচ্ছেদ দেখতে পাই যেগুলোতে মসিহ আলাইহিস সালামের মানবসত্তার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যেমন কিছু স্থানে বলা হয়েছে, "তিনি ঈশ্বরপুত্র নন।" এ কারণেই মিথ্যুক ও বিকৃতিসাধনকারীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুসমাচারগুলোতে মসিহ আলাইহিস সালামের মানুষ হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

মসিহ আলাইহিস সালাম স্বীয় মাতা মারইয়ামকে সম্বোধন করে বলেন, "যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা, এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাইতেছি।"[৪৮০]

এই অনুচ্ছেদে "আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর" শব্দগুচ্ছ মসিহ আলাইহিস সালামের ঈশ্বর হওয়ার বিষয়টিকে বাতিল করে দেয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে—

> مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
>
> আমি তো তাদেরকে শুধু সে কথাই বলেছি, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করো, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৭]

---

[৪৮০] *যোহন*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১৭।

মসিহ আলাইহিস সালাম আরও বলেন, "কিন্তু পিতা আমা অপেক্ষা মহান।" এই বাক্য দ্বারা মসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর মহত্ত্বের ঘোষণার পাশাপাশি নিজেকে আলাদা সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ইসরাইলি প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে পুত্র শব্দটি প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

অন্য জায়গায় মসিহ আলাইহিস সালাম বলেন, "আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"[৪৮১]

এভাবে সুসমাচারের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে মসিহ আলাইহিস সালাম নিজেকে মনুষ্যপুত্র, আদম-সন্তান, মারইয়াম-তনয় প্রভৃতি শব্দে আখ্যায়িত করেছেন।

তিন. শরিয়ত তথা বিধিবিধান

সুসমাচারগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় ঈসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে পুরাতন নিয়মের বিধি-বিধান ও মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ইহুদিদের জন্য প্রবর্তিত বিধিবিধানকে স্থির রাখা হয়েছে। ইহুদিদের বিধিবিধান থেকে খুব অল্প সংখ্যক বিধানকেই রহিত করা হয়েছে কিংবা পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রদত্ত প্রসিদ্ধ অসিয়তের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, "আর উক্ত হইয়াছিল, "যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক"। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।"[৪৮২]

"তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।"[৪৮৩]

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী এক দেহ এক সত্তায় পরিণত হয়। ফলে পরবর্তী সময় তারা আর সত্তাগতভাবে আলাদা হতে পারে না। মসিহ আলাইহিস সালাম বলেন, "অতঃপর ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।"[৪৮৪]

[৪৮১] *যোহন,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২৪।
[৪৮২] *মথি,* অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৩১-৩২।
[৪৮৩] *মার্ক,* অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ১১-১২।
[৪৮৪] *মার্ক,* অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৯।

কিসাসের ব্যাপারে তিনি বলেন, "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, ''চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না।"[৪৮৫]

ব্যভিচারিণীর রজমের ব্যাপারে যোহন বর্ণনা করেন, "পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। আর প্রত্যুষে তিনি পুনর্বার ধর্মধামে আসিলেন; এবং সমুদয় লোক তাঁহার নিকটে আসিল; আর তিনি বসিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃত একজন স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে, সেই ক্রিয়াতেই, ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশি এই প্রকার লোককে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; তবে আপনি কি বলেন? তাহারা তাঁহার পরীক্ষা ভাবেই এই কথা কহিল, যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করিবার সূত্র পাইতে পারে। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। পরে তাহারা যখন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তিনি মাথা তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারুক। পরে তিনি পুনর্বার হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তখন তাহারা ইহা শুনিয়া, এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া, একে একে বাহিরে গেল, প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্যন্ত গেল; তাহাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। তখন যীশু মাথা তুলিয়া, স্ত্রীলোকটি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে কহিলেন, হে নারি, যাহারা তোমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? কেহ কি তোমাকে দোষী করে নাই? সে কহিল, না, প্রভু, কেহ করে নাই। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন অবধি আর পাপ করিও না।"[৪৮৬]

এর অর্থ হলো মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়ত অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম করার বিষয়টিকে মসিহ আলাইহিস সালাম রহিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এ অধিকার তার ছিল না। কেননা, তিনি মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তকে পরিপূর্ণ করতে এসেছেন। রহিত করতে নয়।

---

[৪৮৫] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৩৮-৪২।

[৪৮৬] *যোহন*, অধ্যায় : ৮, অনুচ্ছেদ : ১-১১।

মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে আপনজনকে মহব্বত ও শত্রুকে ঘৃণার কথা কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মসিহ আলাইহিস সালাম বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে বলেছেন। যেমন মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে, "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করিবে," এবং 'তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভালো-মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক-অধার্মিকগণের উপরে জল বর্ষান। কেননা, যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে?"[৪৮৭]

মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে নরহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মসিহ আলাইহিস সালাম আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়ার চিন্তাকেও নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে, তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও না," আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্বোধ,' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, 'রে মূঢ়,' সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।"[৪৮৮]

চার. বিবাহ ও পরিবার গঠন

সাধারণভাবে সুসমাচারগুলো বিবাহের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন এবং সন্ন্যাসব্রত ও কৌমার্যের প্রতি উৎসাহিত করে।

করিন্থিয়দের প্রতি লিখিত পত্রে পোল বলেন, "কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং আপনি আপন ইচ্ছা সম্বন্ধে কর্তা, সে যদি আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। অতএব যে আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।"[৪৮৯]

পোল আরও বলেন, "আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ, তাহার বিষয়ে- স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের ভাল।"[৪৯০]

---

[৪৮৭] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৪৩-৪৬।

[৪৮৮] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২১-২২।

[৪৮৯] *করিন্থিয়*, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৩৭-৩৮।

[৪৯০] প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : 1।

তবে যে নিজের ব্যাপারে অপরাধের ভয় করে সে বিয়ে করে নিতে পারে। অন্যত্র তিনি বলেন, “পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের কাছে আমার কথা এই, তাহারা যদি আমার মত থাকিতে পারে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই ভাল; কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক; কেননা, আগুনে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।”[৪৯১]

এরই মাধ্যমে আমরা দল-উপদল নির্বিশেষে খ্রিষ্টানদের নিকট সমাদৃত চারটি সুসমাচার সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। এ পর্যায়ে আমরা খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য উৎস তথা পবিত্র পুস্তকসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। এই পুস্তকগুলো তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : পোলের চিঠিসমূহ। এর সংখ্যা চৌদ্দটি।

দ্বিতীয় প্রকার : ক্যাথলিক চিঠিসমূহ। এর সংখ্যা সাতটি।

তৃতীয় প্রকার : দুটি পুস্তক। একটি হলো প্রেরিতদের কার্যবিবরণী। অপরটি হলো যোহনের স্বপ্ন বা প্রকাশিত বাক্য।

প্রথম প্রকার

এই চিঠিগুলো পোল ৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়ে ৬৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন। তিনি চিঠিগুলোর কতেক লিখেছেন বিভিন্ন শহর কিংবা জাতির প্রতি আর কতেক লিখেছেন তার কোনো কোনো শিষ্যকে লক্ষ্য করে। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা* এর লেখক মনে করেন, পোলের নামে প্রচারিত এই চৌদ্দটি পত্রের মধ্যে চারটি পত্র তার কোনো এক শিষ্য পোলের মৃত্যুর বিশ বছর পর রচনা করেছেন।[৪৯২]

চিঠিগুলো সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নে পাঠক সমীপে তুলে ধরা হলো।

এক. রোমিয়দের প্রতি লিখিত চিঠি

রোমা একটি প্রাচীন নগরী। ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বে রোমিয়নস এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। এই ছোট্ট রাজ্যটি পরবর্তীতে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এমনকি পুরো ভূমধ্যসাগরের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। আজকের রোমই হলো তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমা। পোল রোমান নাগরিকত্ব

[৪৯১] প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৮–৯।
[৪৯২] *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৪৭৬।

লাভ করেন এবং খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত নিয়ে তথায় গমন করেন। ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই তিনি হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

দুই ও তিন. করিন্থিয়বাসীদের প্রতি লিখিত দুটি চিঠি

করিন্থিয় হলো গ্রিকদের একটি ভ্রাতৃপ্রতিম অঞ্চলের রাজধানী। ৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পোল এই চিঠিগুলো লিখেন। মূলত মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব বিষয়ে পিতরের অনুসারীদের সাথে তার অনুসারীদের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তিনি এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন।

চার. গালাতিয়বাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি

গালাতিয় এশিয়া মাইনরের একটি অঞ্চল। এই চিঠিটি পোল ৫৫ কিংবা ৫৭ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে লিখেছিলেন। এ অঞ্চলের লোকজন যখন তার অধর্মীয় চিন্তাধারার কারণে তাকে কাফির আখ্যা দিচ্ছিল এবং তিনি মসিহ আলাইহিস সালামের শিক্ষা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে সমালোচনা করতে শুরু করেছিল, তখনই তিনি এই চিঠিটি প্রেরণ করেন। লোকেরা বলত, পোল হলো অনুপ্রবেশকারী। সুসমাচার সম্পর্কে তার সরাসরি কোনো জ্ঞান নেই।

পাঁচ. ইফিস শহরের অধিবাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি

ইফিস গ্রিক শব্দ। এর অর্থ হলো আকাঙ্ক্ষিত, প্রিয়। এটি কায়েস্তার (Cayster) নদীর তীরে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের একটি শহর। ৬২ খ্রিষ্টাব্দে পোল এই চিঠিটি রোম থেকে প্রেরণ করেন। এর বিষয়বস্তু ছিল মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব ও ঈশ্বরপুত্র হওয়া এবং মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে শুধু মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাসই যথেষ্ট হওয়া।

ছয়. ফিলিপি নগরের অধিবাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি

ফিলিপি রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মেসিডোনিয়া প্রদেশের একটি নগরী। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী পোল এই পত্রটি ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন। এই পত্রে তিনি ফিলিপিয়দের মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং সুসমাচারের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে পোলের উদ্দেশ্য ছিল তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা নিফাক ও কুফুরি যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

সাত. কলসিয় নগরের অধিবাসীদের নিকট লিখিত চিঠি

কলসিয় এশিয়া মাইনরের লাইকুস (Lycus) নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরীর নাম। এই চিঠিটি পোল ৬২ খ্রিষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করেন। চিঠিতে তিনি কলসিয়দেরকে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। একইভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের ইলাহ হওয়ার বিষয়টিও চমকপ্রদভাবে তুলে ধরেন। এমনকি মসিহ আলাইহিস সালামের ইলাহ সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনকে মুক্তির শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আট ও নয়. থিসলনিকিয় নগরের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত দুটি চিঠি

থিসলনিকি (Theisaloniki) রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর গ্রিসের মেসিডোনিয়ার রাজধানী শহর। পোল এখানকার অধিবাসীদের প্রতি প্রথম চিঠিটি লিখেন ৫২ খ্রিষ্টাব্দে। আর প্রথম চিঠির ব্যাখ্যাস্বরূপ দ্বিতীয় চিঠিটি প্রায় একই সময়ে লিপিবদ্ধ করেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু হলো মসিহ আলাইহিস সালামের পুনরুত্থান। মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেকেই ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর পুনরুত্থিত হবে। আর এই পুনরুত্থান সন্ধ্যা ও দ্বিপ্রহরে সংঘটিত হবে।

দশ ও এগারো. তিমথিয়ের প্রতি লিখিত দুটি চিঠি

তিমথিয় ছিলেন পোলের সহচর ও সাহায্যকারী। পোল তাকে পুত্র ও প্রিয় বলে সম্বোধন করতেন। এই ব্যক্তিটি পোলের প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন সফরে তার সহচর হিসেবে গমন করে।

বারো. তিতের প্রতি প্রেরিত চিঠি

তিত ছিলেন পোলের সহচর। পোল তাকে করিন্থ নগরে প্রেরণ করেন এবং তাকে সেখানকার খ্রিষ্টানদের দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর তাকে ক্রিটে প্রেরণ করেন। তিতের কাছে প্রেরিত এই চিঠিতে পোল নিজের উদ্ভাবিত কিছু কাল্পনিক বিধানের বিবরণ দিয়েছেন।

তেরো. ফিলিমনের প্রতি লিখিত চিঠি

ফিলিমন ছিলেন পোলের আদর্শে দীক্ষিত একজন খ্রিষ্টান। ফিলিমনের এক দাস ওনিসিমকে কেন্দ্র করে পোল এই চিঠিটি লিখেন। ওনিসিম তার মনিব ফিলিমনের কিছু সম্পদ চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল। রোমে পৌঁছার পর পোলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।

পোলের কথায় প্রভাবিত হয়ে সে তার কৃতকর্ম থেকে তাওবা করে। পোল তাকে নিজের কাছে রেখে দিতে চাইলে মনিবের মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে সে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর মনিবের কাছে গেলে মনিব তাকে ক্ষমা করে দেন।

চৌদ্দ. ইবরিয়দের প্রতি প্রেরিত চিঠি

ইস্টার্ন চার্চ ও ওয়েস্টার্ন চার্চের মধ্যে এই চিঠিটির লেখক নির্ধারণে মতদ্বৈততা রয়েছে। ইস্টার্ন চার্চ মনে করে এটি পোলের পত্র। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক টারটেলিয়ান (Tertullian) বলেন, "এটি বরনাবার চিঠি। অপরদিকে লুথার মনে করেন এটি আপল্লো[৪৯৩] রচনা করেছেন। চিঠিটির বিষয়বস্তু হলো মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং পুরাতন নিয়মের গুরুত্বহীন হওয়া।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলতে গেলে এই চিঠিগুলো খ্রিষ্টধর্মের আকিদা, ইবাদাত, আখলাক সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করে। পাশাপাশি মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব ও ঈশ্বরপুত্র হওয়া এবং ত্রিত্ববাদের প্রাথমিক ধারণা এই চিঠিগুলোতে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান যুগের খ্রিষ্টানগণ অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের চেয়ে এই চিঠিগুলোর ওপর বেশি আস্থা রাখে। এমনকি প্রেরিত রাসুলের বাণী বলতে তারা খ্রিষ্টান দাবিদার এই ইহুদি পোলের বক্তব্যকে বুঝিয়ে থাকে।

নিকিয়ার মহাসভায় এই পত্রগুলোকে সুসমাচারসমূহের ব্যাখ্যা ও মসিহ আলাইহিস সালামের ইলাহ হওয়ার বিষয়ে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার : ক্যাথলিক পত্রসমূহ

এক. যাকোবের পত্র

যাকোব হলেন আলফেয়ের পুত্র। তিনি ছিলেন মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য। কারও কারও মতে এই পত্রের লেখক হলেন যোসেফের পুত্র যাকোব। এই পত্রটি ৫০-৬০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে লেখা হয়েছে। লেখক পোলের চিন্তাধারায় দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। জেমস মাইক মনে করেন বিভিন্ন প্রমাণাদির দ্বারা বোঝা যায়, এই চিঠিটির লেখক যাকোব নন।

---

[৪৯৩] আপেল্লো ছিলেন পোলের বন্ধু। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়ায় এই ব্যক্তিটি খ্রিষ্টধর্মের পক্ষে বক্তব্য দিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু। নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে তার নাম স্থান পেয়েছে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।—অনুবাদক।

দুই ও তিন. পিতরের দুটি চিঠি[৪৯৪]

মসিহ আলাইহিস সালামের পর হাওয়ারিদের প্রধান ছিলেন পিতর। এই চিঠি দুটি তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কিন্তু বিশ্লেষকগণ চিঠি দুটিকে পিতরের দিকে সম্বন্ধ করতে দ্বিধান্বিত। কেননা, পিতর ছিলেন মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব ও পুনরুত্থান আকিদার ঘোর বিরোধী। একইভাবে তিনি পোলের অধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতেন।[৪৯৫]

চার, পাঁচ ও ছয়. যোহনের তিনটি চিঠি

এই তিনটি চিঠি সুসমাচার লেখক যোহনের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কথিত আছে ৯০-১০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে চিঠিগুলো লেখা হয়। এই চিঠিগুলোতে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব, তার পুনরুত্থান এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাগমন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে পত্রগুলো যোহনের সুসমাচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চিঠিগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, একদল বিশ্বাসী মসিহের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তাওহিদের আকিদাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তারা পোলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই চিঠিগুলো তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এই চিঠিগুলোর লেখক যোহন প্রকৃতপক্ষে হাওয়ারি ছিলেন না। যা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

সাত. যিহূদার পত্র

যিহূদা হলেন যাকোবের ভাই। ইনি এবং যিহূদা *ইস্করিয়োতি* ভিন্ন ব্যক্তি। এটি একটি ধর্মীয় বিতর্কমূলক চিঠি। প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি লিখিত হয়েছে। চিঠিটি লেখা হয়েছে খ্রিষ্টানদেরকে ওইসব ব্যক্তিবর্গ থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, যারা বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের দিকে মানুষকে আহ্বান করে।

সারকথা হলো, এই সাতটি চিঠি নানা সময়ে লিখিত। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনটি লেখা হয়েছে ৫০ খ্রিষ্টাব্দে এবং সর্বশেষটি লেখা হয়েছে ৯০ খ্রিষ্টাব্দে। ওপরে প্রদত্ত ধারাবাহিকতা অনুসারে পত্রগুলো নতুন নিয়মে স্থান পেয়েছে। এগুলোতে আখলাক সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। একইভাবে পোলের পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার

---

[৪৯৪] *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার* লেখক মনে করেন, প্রথম চিঠিটি পোলের মৃত্যুর পর লেখা হয়েছিল। খণ্ড:১৭, পৃষ্ঠা: ৬৪৬।

[৪৯৫] এই পত্রদ্বয়ে পিতরের নীতি-আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য স্থান পাওয়ায় বিশ্লেষকগণ এগুলোকে তার দিকে সম্বন্ধ করার ব্যাপারে সন্দিহান।

সাথে সাযুজ্যপূর্ণ খ্রিষ্টধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনাও স্থান পেয়েছে এ চিঠিগুলোতে।

এই পত্রগুলোকে সামষ্টিকভাবে 'নতুন নিয়মের শিক্ষাপুস্তক' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, এগুলোতে শরিয়তের বিধি-বিধান স্থান পেয়েছে।

প্রথমদিকে খ্রিষ্টানজগৎ এই পত্রগুলীর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিল। এমনকি নিকিয়ার মহাসভাতেও এসব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। খ্রিষ্টানগণ পরবর্তী সময় এই চিঠিগুলোকে ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে সম্মত হন। খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রিক ও রোমান পৌত্তলিকতায় ধাবিত করতে এই সম্মতি বিরাট প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় প্রকার

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

পুস্তকটি সুসমাচার লেখক লুকের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তিনি সুসমাচার এবং এটি একই বছর তথা ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এ পুস্তকটিতে হাওয়ারি, একদল শিষ্য ও তাদের অনুসারীদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।

এখানে প্রেরিতগণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে—বারোজন হাওয়ারি, যাদেরকে মসিহ আলাইহিস সালাম দীনের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এই বারোজনের সাথে তারা পোলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ তিনি মসিহ আলইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের পর খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দাবি করেন।

আর কার্যবিবরণী থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই প্রেরিতগণের ইতিহাস বা তাদের কর্মসমূহ। হাওয়ারিদের জীবনসংক্রান্ত এই ঐতিহাসিক বর্ণনার সূচনাতে খ্রিষ্টীয় আকিদা-বিশ্বাস ও অনেকগুলো ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকে লুক বিশেষভাবে পোলের জীবনবৃত্তান্ত, খ্রিষ্টধর্মে তার অবদান ও তার হাতে প্রকাশিত মুজিযাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি পুস্তকের অর্ধেকটাই পোলের জীবনসংক্রান্ত আলোচনা স্থান করে নিয়েছে।

পুস্তকের ভূমিকা থেকে বোঝা যায়, সুসমাচারের মতো এই পুস্তকটিও তিনি থিয়ফিলকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছেন। পুস্তকের সূচনাতেই তিনি থিয়ফিলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে থিয়ফিল, প্রথম প্রবন্ধটি আমি সেই সকল বিষয় লইয়া রচনা করিয়াছি, যাহা যীশু সেই দিন পর্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ২. যে

দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্ধ্বে নীত হইলেন। ৩. আপন দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন।"[৪৯৬]

এভাবেই এই পুস্তকে লুক আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়তের বিধানাবলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

যোহনের স্বপ্ন বা প্রকাশিত কালাম

এই পুস্তকটি সুসমাচার লেখক যোহন ৮১-৯৬ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে রচনা করেছেন। বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কতগুলো স্বপ্নের বর্ণনা। যোহনের দাবি মোতাবেক এই স্বপ্নগুলোর মাধ্যমে তাকে খ্রিষ্টধর্মের হাকিকত এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। পুস্তকটিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি স্থান পেয়েছে :

এক, মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব সাব্যস্তকরণ।

দুই, আকাশে মসিহের কর্তৃত্ব, সেখান থেকে গির্জা ও গির্জার দায়িত্বশীলগণকে পর্যবেক্ষণ, ফিরিশতাদের কর্মকাণ্ড ও মসিহের প্রতি তাদের আনুগত্য।

তিন, লোকেরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে এবং মসিহের সামনে উপস্থাপিত হবে। তিনিই তাদের আমলের হিসাব নেবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করবেন আর মন্দ লোকদের শাস্তি দেবেন।

চার, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কিছু ঘটনা যার কিছু কিছু সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির সাথে সম্পৃক্ত আর কিছু খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতাকারে প্রদত্ত।

৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গির্জা এই পুস্তকগুলোর ওপর আস্থা প্রকাশ করে। এর আগে পুস্তকগুলীর বাস্তবতা ও যোহনের দিকে সম্বন্ধকরণের শুদ্ধতার ব্যাপারে সকলেই সন্দিহান ছিলেন। এমনকি ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়ার মহাসভায় এগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হয়। বর্তমানেও অনেক গবেষক যোহনের দিকে এগুলোর সম্বন্ধকরণের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। ইমাম ইবনে হাজম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পুস্তকগুলোকে যোহনের দিকে সম্বন্ধকরণের বিষয়টি তুমুল যুক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এগুলোকে মিথ্যা, বিরোধপূর্ণ, বিকৃত, কুফুরি প্রভৃতি অভিধায় অভিযুক্ত করেছেন।

---

[৪৯৬] প্রেরিত, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-৩।

পুরো নতুন নিয়মের সংকলন ও বিধিসম্মত হতে প্রায় ৩৫০ বছর সময় লেগেছে। এর পূর্বে চতুর্থ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত এগুলোর বিধিসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড জটিলতা বিরাজমান ছিল।

আরিয়ুনুস এই পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি পুস্তকগুলোকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম স্তর : সর্বজন সমাদৃত পুস্তকাবলি।

দ্বিতীয় স্তর : অনেকের কাছে সমাদৃত, অথচ বিতর্কপূর্ণ পুস্তক।

তৃতীয় স্তর : প্রত্যাখ্যাত বা অগ্রহণযোগ্য পুস্তক।

প্রথম স্তর তথা সর্বজন সমাদৃত পুস্তকাবলি

১। চার সুসমাচার

২। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

৩। পোলের পত্রসমূহ

৪। পিতরের প্রথম পত্র

৫। যোহনের প্রথম পত্র

৬। যোহনের স্বপ্ন বা প্রকাশিত কালাম। পুস্তকটিকেও কখনো কখনো এ স্তরে রাখা হয়।

দ্বিতীয় স্তরের পুস্তকাবলি

১। যাকোবের পত্র

২। যিহুদার পত্র

৩। পিতরের দ্বিতীয় পত্র

৪। যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

তৃতীয় স্তরের পুস্তকসমূহ

১। পোলের কার্যবিবরণী-সংক্রান্ত পত্রসমূহ

২। রাখাল হারমোসের পুস্তক

৩। পিতরের স্বপ্ন

৪। যোহনের আরও কিছু স্বপ্ন[৪৯৭]

খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কিতাবগুলোর খুব অল্পই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা এ তালিকা অনেক দীর্ঘ। এ পর্যায়ে আমরা *এনসাইক্লোপিডিয়া অব অ্যামেরিকা* থেকেও প্রত্যাখ্যাত পুস্তকের একটি তালিকা তুলে ধরছি।

১। টমাসের সুসমাচার

২। মিথ্যুক মথির সুসমাচার

৩। ইবরীয়দের সুসমাচার

৪। নাসেরিদের সুসমাচার

৫। বারোজনের সুসমাচার

৬। ইবোনীয়দের সুসমাচার

৭। মিশরীয় সুসমাচার

৮। পিতরের সুসমাচার। এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাংশে মানুষের কাছে পরিচিত ছিল।

৯। বসিলের সুসমাচার। এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ছিল।

১০। মার্কীয় সুসমাচার

১১। ইবিল্ল এর সুসমাচার

১২। নায়সানের সুসমাচার

১৩। ফিলিপের সুসমাচার

১৪। মেরিটাসের সুসমাচার

১৫। মারইয়ামের সুসমাচার

১৬। বরথলময়ের সুসমাচার

১৭। নিকোডেমাসের সুসমাচার

১৮। গামালিয়েলের সুসমাচার

১৯। যথার্থ সুসমাচার

---

[৪৯৭] *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৪।

২০। আন্দ্রেয় এর সুসমাচার

২১। বরনাবার সুসমাচার

২২। ইনকারাতিনের সুসমাচার

২৩। হোসিশিয়াসের সুসমাচার

২৪। যিহুদার সুসমাচার

২৫। থদ্দেয়ের সুসমাচার

২৬। সত্য সুসমাচার[৪৯৮]

নতুন নিয়মের পত্রগুলো নিয়ে গবেষণার পর কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসে।

এক. এই পত্রগুলো কোন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে? ইলহাম বা ইলাহি নির্দেশনায় নাকি লেখকদের নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে? যদি ইলহামের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে পত্রলেখকগণের ইলহামপ্রাপ্তির প্রমাণ কী? বিশেষত পোলের কথাই ধরা যাক, তিনি তো হাওয়ারি ছিলেন না। অনেকে তো তার মসিহ আলাইহিস সালামের সংস্পর্শ পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। আর যদি নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে লিখে থাকেন তাহলে প্রশ্ন জাগে ইজতিহাদের ভিত্তিতে লিখিত পত্র ধর্মের মৌলিক উৎস হতে পারে কি না?

যদি উত্তর হ্যাঁসূচক হয় অর্থাৎ ইজতিহাদ তথা গবেষণালব্ধ রচনা ধর্মের মৌলিক উৎস হতে পারে, তাহলে বলতে হবে, গবেষণার এই ধারা চলমান থাকা আবশ্যক এবং প্রত্যেক যুগে এ ধরণের চিঠি, গবেষণাপত্র ধর্মীয় উৎস হিসেবে যোগ হতে থাকবে।

দুই. ধর্মীয় উৎস হিসেবে এই পত্রগুলোর বৈধতা কবে থেকে স্বীকৃত হলো? উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়ার মহাসভার আগ পর্যন্ত এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব ছিল। উক্ত মহাসভায় পোলের কিছু চিঠিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট পত্রগুলো ৩৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত লোডেসিয়ার মহাসভায় (Council of Laodicea) স্বীকৃত হয়। যেমন: ইবরীয়দের প্রতি পোলের পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যাকোবের পত্র, যিহুদার পত্র, প্রকাশিত কালাম প্রভৃতি।

খ্রিষ্টবাদের সূচনা থেকে তিন শতাব্দীরও বেশি সময় পর্যন্ত ধর্মের মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া এই পুস্তকগুলোর মূল্যই বা কতটুকু?

---

[৪৯৮] *এনসাইক্লোপিডিয়া অব আমেরিকা*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৭০-৭১।

তিন. এই পুস্তকগুলোর কোনো অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র নেই। ২০০ খ্রিষ্টাব্দে আরিয়ুনুস এবং ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লেমেনের মুখেই এগুলোর আলোচনা প্রথম শোনা যায়।

চার. এই পত্রগুলোকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশ গরমিল ও স্ববিরোধী বক্তব্য এগুলোতে স্থান পেয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব? বিরোধগুলো শুধু বিধানের ক্ষেত্রে নয়; বরং এমন সব ঘটনার বর্ণনাতেও বিরোধ বিদ্যমান, যেগুলো একাধিকবার সংঘটিত কোনো ঘটনা নয়।

পাঁচ. এই পত্রগুলো খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন চার্চের মাঝে বিদ্যমান বিরোধের প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব এবং মানবসত্তা-সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধের আলোচনাও স্থান পেয়েছে। পত্রগুলোর ভাষ্য কোনোরূপ গবেষণা ছাড়াই গ্রহণ করা এবং অন্যদের মতের সাথে তুলনা করে দেখারও প্রয়োজন বোধ না করা কি যৌক্তিক হতে পারে? কখনোই না। এই প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া একজন গবেষকের জন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

উক্ত উৎসগুলোতে পোলের চিন্তাধারার প্রভাব

এ পর্যায়ে উক্ত ধর্মীয় উৎসগুলোতে পোলের চিন্তাধারার প্রভাব কতটুকু তা খতিয়ে দেখা দরকার। এজন্য আমাদেরকে প্রথমে এগুলোর লেখকের সাথে পোলের সম্পর্কের ধরণ নিয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

১। মথির সুসমাচার : লেখক হাওয়ারি ছিলেন না। মার্কের সুসমাচার থেকে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে তিনি সুসমাচারটি রচনা করেন।

২। মার্কের সুসমাচার : লেখক বিভিন্ন সফরে পোলের সঙ্গী ছিলেন।

৩। লুক : পোলের প্রিয়ভাজন।

৪। যোহন : লেখক হাওয়ারি ছিলেন না। মসিহের প্রভুত্ব সম্পর্কে পোলের নাস্তিক্যবাদী দর্শনকে যোহন তার সুসমাচারে পেশ করেছেন।

৫। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী : পোলের প্রিয়ভাজন লুক কর্তৃক রচিত।

৬। পোলের পত্রসমূহ : পোল নিজেই লেখক।

৭। যাকোবের পত্র : পোলের চিন্তা-দর্শনের ব্যাখ্যা।

৮। পিতরের পত্র : পোলের চিন্তা-দর্শনের ব্যাখ্যা।

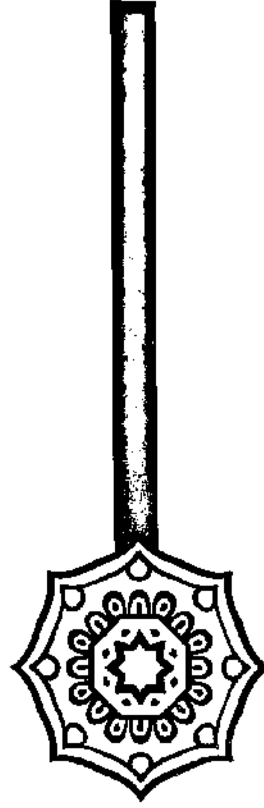
৯। যোহনের পত্র : পোলের চিন্তা-দর্শনের ব্যাখ্যা।

১০। যিহুদার পত্র : পোলের চিন্তা-দর্শনের ব্যাখ্যা।

এত এত আলোচনা, গবেষণা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পর এ কথা বলা কি যৌক্তিক হতে পারে যে, খ্রিষ্টানরা যে ধর্ম পালন করে, তা মসিহ্ আলাইহিস সালাম আনীত ধর্ম? না, কখনোই না, বরং এটি হলো চরম বিকৃত ও অপব্যাখ্যাকারী ইহুদি পোলের আবিষ্কৃত ধর্ম।[৪৯৯]



[৪৯৯] পাঠক বিস্তারিত জানতে ড. মুহাম্মদ নাদের সিদ্দিকি কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত *আল-মসিহিয়্যাতু ফি পাকিস্তান* গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।



পুরাতন ও নতুন নিয়মের নুসখা

সকল খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ একমত যে, পুরাতন নিয়মের মূল ভাষার কোনো নুসখার (কপি) অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। শুধু অনূদিত কপিরই খোঁজ পাওয়া যায়। আর অনুবাদগুলোও মূল কিতাব অবতীর্ণের চার শতাব্দী পর সম্পন্ন হয়েছে। অনূদিত এই নুসখাগুলোর মধ্যে তিনটি নুসখা[৫০০] প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রথম. ভ্যাটিক্যান সংস্করণ

প্রায় পাঁচশ বছর আগে খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এই নুসখাটি সম্পর্কে অবগত হন। এটির রচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রফেসর হেগ মনে করেন, এটি চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপরদিকে সেইন্ট মার্শ এর মত হলো এটি পঞ্চম শতাব্দীর সংকলন। মাউন্ট নিকনের মতে পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক ভাষায় এটি লেখা হয়।

এই কপিটিতে বেশ কিছু অনুচ্ছেদের ঘাটতি রয়েছে। যেমন,

[৫০০] *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায়* Bible শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পুরাতন নিয়মের

#আদিপুস্তকের শুরু থেকে ৪৬ অধ্যায় পর্যন্ত।

#গীতপুস্তকের একশত পাঁচ থেকে একশত সাইত্রিশতম (১০৫-১৩৭) শ্লোক।

নতুন নিয়মের

#ইবরিয়দের প্রতি পোলের পত্রের নবম থেকে চতুর্দশ (৯-১৪) অধ্যায়।

#তিত ও ফিলিমনের কাছে লিখিত পোলের পত্র এবং যোহনের স্বপ্ন বা প্রকাশিত কালাম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে কেউ একজন এগুলোকে যুক্ত করেছেন।

#মার্কের সুসমাচারে লেখক ষোড়শ অধ্যায়ের নবম থেকে বিংশ (৯-২০) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত স্থান সাদা রেখে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়, আলেকজান্দ্রিয়া সংস্করণ (Alexandrian version) :

এই সংস্করণের কপিটি ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম চার্লসের হাতে পৌঁছায়। বর্তমানে এটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই সংস্করণেও বেশ কিছু অংশ অনুপস্থিত। যেমন:

#মথির সুসমাচারের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শুরু থেকে নিয়ে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

#যোহনের সুসমাচারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চাশত অনুচ্ছেদ থেকে অষ্টম অধ্যায়ের বায়ান্ন নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

তৃতীয়, সিনাই সংস্করণ

এই সংস্করণটি নিয়ে একটি অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। সিনড্রোফ (Tischendorf) নামক জনৈক জার্মান গবেষক *কিতাবুল মুকাদ্দাসের* প্রাচীন কপি অনুসন্ধানে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। একবার তিনি সিনাই সফর করছিলেন। সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে একটি খানকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আকস্মিক তার নজরে পড়ল পাদরিগণ আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা গ্রহণের জন্য কিছু পুরাতন কাগজ জড়ো করে রেখেছে। তিনি দ্রুত গিয়ে কাগজগুলো নিলেন। পরে নিশ্চিত হলেন যে, এগুলো সেপ্তুজিয়ান্ট কপির কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ। তিনি পাদরিগণকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন তাকে কাগজগুলো দেওয়ার জন্য। আরও অনুরোধ করলেন, কোথায় পাওয়া গেছে তা বলার জন্য।

তার এই পীড়াপীড়ির কারণে পাদরিরা বুঝতে পারলেন যে এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান কাগজ। তারা সিনড্রোফের আবদারকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর সিনড্রোফ খুব দ্রুত দেশে ফিরে যান এবং পুনরায় মিশর সফরে আসেন। এসে তিনি মিশরের শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কপিটি হস্তগত করার কোনো সহজ ব্যবস্থা শাসক করতে পারেননি। তখন তিনি রাশিয়ান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে কাগজগুলো সম্পর্কে অবহিত করেন।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ান দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে তিনি সিনাই সফর করতে সক্ষম হন। সেখানে গিয়ে খানকার লাইব্রেরিতে তিনি নুসখাটি তালাশ করতে থাকেন। শেষমেশ প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি কপিটি হস্তগত করতে সক্ষম হন। কপিটি নিয়ে তিনি রাশান সম্রাটকে অর্পণ করেন। অবশেষে সম্রাটের নির্দেশে কপিটি রাশিয়ার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

গবেষকগণ মনে করেন, এই কপিটি চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে। এতে পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়ম উভয়টা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অ্যাপোক্রিফা বা গোপন পুস্তক

এই কপিটিতে মার্কের সুসমাচারের শেষ অধ্যায় অষ্টম অনুচ্ছেদে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর কোনো খালি জায়গা না রেখেই লুকের সুসমাচার শুরু করা হয়েছে। তাই গবেষণার মাধ্যমে অনেক পণ্ডিতই দাবি করেছন যে, মার্কের সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের অষ্টম অনুচ্ছেদের পর বর্ণিত মসিহ আলইহিস সালামের কবর থেকে উত্থানের বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। মার্কের সুসমাচারের নামে এই অংশটি জালিয়াতির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর এই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ বিষয়টি বিবৃত করেছেন।[৫০১]

এই প্রাচীন নুসখাটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর খ্রিষ্টানরা 'ইকরাফা ও লুহিয়া' রচনার কাজে পুরোদমে নেমে পড়ে। এই গ্রিক শব্দটির অর্থ হলো অগ্রন্থিত মৌলিক বর্ণনা।

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে মসিহ আলাইহিস সালামের বাণীগুলোকে সুসমাচারের লেখকগণ গুরুত্ব দিয়ে লিপিবদ্ধ করেননি। মসিহ আলাইহিস সালামের ইতিহাসকে তারা যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তার বাণীগুলোকে সেভাবে গুরুত্ব দেননি। তাই তাদের অনেকেই ঈসা

---

[৫০১] *তারিখুস সুহুফিস সামাবিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৭।

আলাইহিস সালামের দিকে সম্বন্ধিত এই মৌখিক বর্ণনাগুলো একত্র করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকাশকালে মসিহ আলাইহিস সালামকে ঘিরে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। সিনাই কপিটি আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক লেখক এগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।[৫০২]

* * *

[৫০২] বিস্তারিত দেখুন : *হিকমাতুল আদইয়ান*, পৃষ্ঠা : ৮৬।

ঈসা আলাইহিস সালামের ইনজিল

আমরা মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ তাআলা নবি ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর একটি গ্রন্থ নাজিল করেছেন। নাম ইনজিল।[৫০৩] অর্থাৎ সুসমাচার বা ভবিষ্যদ্বাণী। ঈসা আলাইহিস সালাম শহর-গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষকে এই সুসংবাদ জানাতেন। বিদ্যমান সুসমাচারগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট একটি ইনজিল বা সুসমাচার ছিল। যেমন মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে, 'পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন।'[৫০৪] এখানে রাজ্যের সুসমাচার শব্দটি ইনজিল শব্দের ভাবানুবাদ।

মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে, 'আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল;তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'[৫০৫]

সন্দেহ নেই যে, মথি ও মার্ক কর্তৃক ওপরে বর্ণিত সুসমাচারটি প্রচলিত সুসমাচারগুলোর চেয়ে ভিন্ন। এটি বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ তথা মার্ক, যোহন, মথি, লুক প্রমুখের দিকে সম্বন্ধিত সুসমাচারগুলো নয়। এটি এমন এক ইনজিল বা সুসমাচার যা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছেই বিদ্যমান ছিল। তিনি গ্রামে-গঞ্জে মানুষকে ইনজিলের দাওয়াত দিতেন। সুসমাচারগুলোর লেখকগণ মসিহ আলাইহিস সালামের ইনজিল থেকে কিছু অংশ

---

[৫০৩] ইনজিল শব্দটি গ্রিক উনজেলিন থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে ভালো খবর, সুসংবাদ, সুসমাচার, আনন্দদায়ক সংবাদ প্রভৃতি। শব্দটির ইংরেজি হলো Good Spell। যার অর্থ হচ্ছে উত্তম সংবাদ বা ভালো খবর।

[৫০৪] *মথি*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ২৩।

[৫০৫] *মার্ক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৪-১৫।

নিজেদের সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এমনটিও অসম্ভব নয়। এর মাধ্যমে মূলত তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়েছেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের ইনজিলের অস্তিত্বের ব্যাপারে কুরআনের পর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো পোলের চিঠির নিম্নোক্ত বাক্যটি, যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রথমতঃ আমি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তোমাদের সকলের জন্য আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে ঘোষিত হইতেছে। কারণ ঈশ্বর, যাঁহার আরাধনা আমি আপন আত্মাতে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে করিয়া থাকি, তিনি আমার সাক্ষী যে, আমি নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।'[৫০৬]

একইভাবে করিন্থিয়বাসীদের প্রতি লিখিত প্রথম পত্রে তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি আরও অধিকার নাই? তথাপি আমরা এই কর্তৃত্ব ব্যবহার করি নাই, বরং সকলই সহ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোনো বাধা না জন্মাই।'[৫০৭]

তিনি আরও বলেন, 'সেইরূপে প্রভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে হইবে।'[৫০৮]

তিনি অন্যত্র বলেন, 'আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাঁহার সহভাগী হই।'[৫০৯]

এই বাক্যগুলো আমরা খ্রিষ্টানদের কাছে বিদ্যমান সুসমাচারগুলো থেকে উদ্ধৃত করেছি। এই নামটি (ইনজিল বা সুসমাচার) সেগুলোতে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।[৫১০] এই সুসমাচারটি নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান সুসমাচারগুলোর কোনোটিই নয়। এগুলোর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট লেখকের দিকে সম্বন্ধিত সুসমাচার। বর্তমানে ঈসা আলাইহিস সালামের ইনজিল বা সুসমাচারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ একটি সংক্ষিপ্ত চিঠির কথা স্বীকার করেছেন, যেটাতে মসিহ আলাইহিস সালামের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। এটিই ছিল প্রকৃত

---

[৫০৬] *রোমিয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৮-9।

[৫০৭] *করিন্থিয় ১ম,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : 12।

[৫০৮] *করিন্থিয় ১ম,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : 14।

[৫০৯] *করিন্থিয় ১ম,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : 23।

[৫১০] পাঠক উদাহরণস্বরূপ দেখুন : *রোমিয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১; *থিষলনীকিয় ১ম,* অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ২; *মার্ক,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১; *প্রকাশিত কালাম,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৫,১৬,১৯; *কলিসিয় ১ম,* অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ১২,১৮; *গালাতিয়,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৭ প্রভৃতি।

ইনজিল বা সুসমাচার। তবে এটি ছিল ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা মসিহ আলাইহিস সালামের বাণী নিজ কর্ণে শোনেননি। তার অবস্থা নিজ চোখে দেখেননি। বলা যায়, এই চিঠিটিই ছিল মূল, যেখানে খ্রিষ্টানদের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে লিখিত ছিল।[৫১১] কিন্তু এই চিঠিটি হারিয়ে গেছে কিংবা ইচ্ছাকৃত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, যাতে করে চিঠিটি মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ খাড়া করা না যায়।

সুসমাচারসমূহ, সেগুলোর লেখক আর বিষয়বস্তু নিয়ে পর্যালোচনার পর আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি, এই শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। কেননা, তিনি কখনোই শিরকের আদেশ দিতে পারেন না। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হচ্ছে তাওহিদের দ্বীন। সমস্ত নবি-রাসুলকে তিনি তাওহিদ-প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। তারপরও খ্রিষ্টানরা দাবি করে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে! আমরা মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মসিহ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের একজন রাসুল ছিলেন। তার ওপর ইনজিল অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে হত্যা করা হয়নি। শূলেও চড়ানো হয়নি। বরং তাদের কাছে ঈসা আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

মারইয়াম-তনয় মসিহ রাসুল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসুল অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর তার জননী একজন সত্যবাদী নারী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কীরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা কী ভুলে ঘুরপাক খাচ্ছে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৫]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

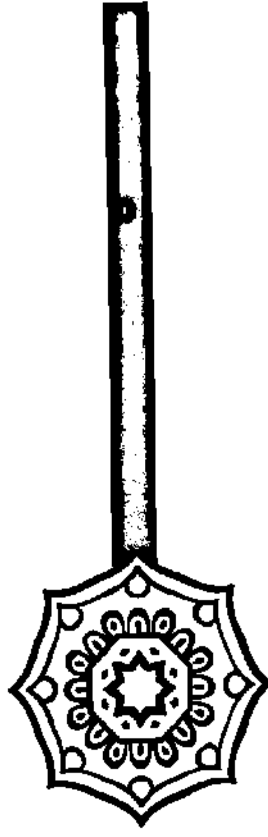
---

[৫১১] *মুহাদারাতুন ফিন নাসরানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৬৬।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ.

আমি তাদের পরবর্তীতে মারইয়াম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইনজিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৪৬]





বরনাবা ও তার সুসমাচার

বরনাবা

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি মসিহ আলাইহিস সালামের একজন শিষ্য ছিলেন। তার সুসমাচারে তিনি নিজেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তার নাম ছিল যোসেফ বিন লেবি বিন ইবরাহিম। সাইপ্রাসের অধিবাসী ইহুদিদের উপদল লেবীয় বংশের তিনি। পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনয়নের পর নিজের সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করেন। দেশে-বিদেশে সর্বদা মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে থাকতেন। যদ্দরুণ হাওয়ারিগণ তার নাম দেন বরনাবা। এটি আরামীয় ভাষার শব্দ, যার অর্থ নসিহতকারীর সন্তান।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, 'আর যোসেফ, যাঁহাকে প্রেরিতেরা বরনাবা নাম দিয়াছিলেন- অনুবাদ করিলে, এই নামের অর্থ প্রবোধের সন্তান- যিনি লেবীয় এবং জাতিতে কুপ্রীয় (সাইপ্রাস অঞ্চলীয়), তাঁহার একখণ্ড ভূমি থাকাতে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিলেন।'[৫১২]

---

[৫১২] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ৩৬-৩৭।

রেভারেন্ড ফাদার আব্দুল মসিহ বলেন, 'মসিহ আলাইহিস সালামের কাছে পরিচয় দেওয়ার পর তিনি বরনাবাকে সেই সত্তরজন দূতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যাদেরকে তিনি প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বরনাবা জেরুজালেমে বেশিদিন অবস্থান করেননি। সাইপ্রাস থেকে সংবাদ আসার প্রেক্ষিতে তিনি তথায় সফর করতে বাধ্য হন। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন তার পিতা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করে সমাহিত হয়েছেন। পিতা মৃত্যুর সময় সন্তানের জন্য প্রচুর সম্পদ রেখে যান।"[৫১৩]

বরনাবা সেই ব্যক্তি যিনি শিষ্যগণকে পোলের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করেছেন। ইতিপূর্বে পোলের অত্যাচারের কারণে শিষ্যগণ তাকে ভয় করতেন।[৫১৪] দীর্ঘদিন বরনাবা পোলের সাথে একত্রে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করেন। অতঃপর পোল কর্তৃক আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের ব্যাপারে মিথ্যা রটনার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পর তিনি তাকে ত্যাগ করেন। অতঃপর স্বীয় ভাগ্নে সুসমাচার লেখক মার্কের সাথে মিলিত হন। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় পুস্তকগুলো বরনাবার যোগ্যতা, ঈমান ও তাকওয়ার সাক্ষ্য দেয়।[৫১৫]

সুসমচারগুলোর বর্ণনা মতে পোল কর্তৃক মার্ককে দাওয়াতি সফরে না নেওয়ার কারণে বরনাবা পোলকে ত্যাগ করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটিই মূল কারণ নয়। কেননা, পরবর্তী সময় মার্ক নিজেই পোলের অন্যতম সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এদিকে বরনাবা পোল এবং তার অধর্মীয় দাওয়াতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। পোল কর্তৃক উদ্ভাবিত বিষয়গুলো প্রতিহত করার জন্য তিনি সুসমাচার লিখতে শুরু করেন। তিনি নিজেই বলেন, 'প্রিয় সুধী! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহান ও চমৎকার। এই দিনগুলোতে আমরা তার নবি যিশুকে হারিয়েছি। হারিয়েছি তার শিক্ষাকে। তার শিক্ষা এবং মুজিযাগুলোকে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাকওয়ার নামে তারা কুফরি শিক্ষা দিচ্ছে। মসিহকে আল্লাহর পুত্র হওয়ার দাবি করেছে। আল্লাহ তাআলার বিধান খতনাকে রহিত করেছে। নাপাক মাংসকে হালাল বানিয়েছে। এই পথহারাদের অন্যতম হলো পোল। তার ব্যাপারে আমার দুঃখভরে কথা বলতে হয়।'[৫১৬]

---

[৫১৩] *হায়াতু বরনাবা*, পৃষ্ঠা : ১৫।

[৫১৪] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ২৬।

[৫১৫] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ২৩-২৪।

[৫১৬] বরনাবার সুসমাচারের ভূমিকা থেকে চয়নকৃত।

এরপর তিনি সুসমাচার লিপিবদ্ধ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এ কারণেই আমি সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। যে সত্য যিশুর সান্নিধ্যে থেকে অবলোকন করেছি এবং নিজ কর্ণে শুনেছি। আমি লিখছি তোমাদের মুক্তির জন্য এবং শয়তান যাতে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।'[৫১৭]

এই ভূমিকার মাধ্যমে বরনাবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যার বিবরণ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি হলো, পৌত্তলিক ধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের জন্য মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের কিছু বিধান তথা খতনা ও শুকরের মাংসের নিষিদ্ধতা রহিত করা।

জেরুজালেমের প্রথম ধর্মসভায় বরনাবা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উপস্থিতমণ্ডলীর সামনে তিনি তার সফরবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। এ ছাড়াও পৌত্তলিকদের খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ সংক্রান্ত তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেন। অতঃপর তিনি সাইপ্রাস ফিরে যান এবং সেখানে খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ইহুদিরা তার ওপর খেপে যায়। তারা তাকে বন্দি করে সালামিসের (Salamis) শাসক হাইপাটিউস (Hypatius) এর সামনে উপস্থাপন করে। কিন্তু হাইপাটিউস তাকে আরোপিত সব অভিযোগ থেকে রেহাই দেন। এরপর ইহুদিরা তাকে শহরের বাইরে মাঠে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে যায়। তারা তাকে ভীষণ প্রহার করে এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করে। কেউ কেউ আগুনে জ্বালিয়ে তার দেহ পুড়িয়ে ফেলারও চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তারা পোড়ানো থেকে নিবৃত্ত হয়। বিষয়টি জানতে পেরে মার্ক ময়দানে যান। তিনি বরনাবার দেহকে কাপড়ে মুড়িয়ে শহরের বাইরে একটি গুহায় রেখে দেন।[৫১৮] ফেরার সময় মৃতদেহের বুকের উপর সুসমাচারের একটি কপিও রেখে আসেন। এটি ছিল ৬১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের ঘটনা। বরনাবার ইতিহাসের এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

৪০১খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাইপ্রাসের মহাসভার পর খ্রিষ্টানরা বরনাবার কবরটি আবিষ্কার করেন। এসময় মার্ক কর্তৃক মৃতদেহের বুকের ওপর রাখা সুসমাচারটিও তাদের হস্তগত হয়। এই সংবাদ সাইপ্রাসের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন সম্রাট সুসমাচারটি দেখার ইচ্ছা করেন। তখন যাজক এন্থমিউস পুস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দেন। কবরটি আবিষ্কারের পেছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যাজকের। তিনি সাইপ্রাসের মহাসভাতেও অংশ নিয়েছিলেন। এই বিষয়টি খ্রিষ্টানগণ তাদের বইপুস্তকে ব্যাপক হারে

---

[৫১৭] বরনাবার সুসমাচারের ভূমিকা থেকে গৃহীত।

[৫১৮] *হায়াতু বরনবা*: ৬৭-৬৮।

বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু সত্য গোপন করার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে একটি বাক্য যুক্ত করেন। তারা লিখেন, বরনাবার কবরে যে পুস্তকটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি মূলত মথির সুসমাচার। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে বরনাবার দেহের ওপর রাখা এই সুসমাচারটি মথির সুসমাচার হতে পারে না। যথা:

১। মথির সুসমাচার রচনাকালের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো, মথির সুসমাচারটি ৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত হয়েছে।[৫১৯]

২। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে মথির সুসমাচারটি আরও পূর্বে রচিত হয়েছে। তথাপি হাওয়ারি বরনাবার এই সুসমাচার পড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেননা, মার্ক নুসখাটি বরনাবার দেহের ওপর রাখার সময় বলেছিলেন, “সে (বরনাবা) এটি পড়তে ভালোবাসত।” একজন হাওয়ারি নিশ্চয় ঐ সুসমাচারটি পড়তে পছন্দ করবেন না, যেটি এমন ব্যক্তি রচনা করেছেন যিনি মসিহকে দেখেননি। মসিহের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিও প্রত্যক্ষ করেননি।

৩। সম্রাট দ্রুত সুসমাচারটি তলব করেছিলেন। এই তড়িঘড়ির কারণ হয়তো এটি প্রকাশের পর ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায়, নতুবা এই নতুন সুসমাচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগতির জন্য। যদি এটি মথির সুসমাচার হয়ে থাকে তাহলে এই তাড়াহুড়োর হেতু কী? মথির সুসমাচার তো সবার কাছেই পরিচিত ছিল।

৪। অতঃপর রাজপ্রাসাদেই সুসমাচারটি হারিয়ে যায়।

প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে বরনাবার সুসমাচার

বরনাবার কবর থেকে সুসমাচারটি উদ্ধারের পর আপামর জনতার কাছে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। পণ্ডিত ও ওয়ায়েজগণ তাদের দাওয়াতি কাজে এটির রেফারেন্স দিতে শুরু করেন। ফলে খ্রিষ্টান পরিমণ্ডলে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম গিয়াসিয়াস (Geiasius) পোপের পদে আসীন হয়ে বরনাবার সুসমাচারটির অধ্যয়ন হারাম ঘোষণা করেন। কেননা, এই সুসমাচারের অনেকগুলো মাসআলাই অন্যান্য প্রচলিত সুসমাচারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষত মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব এবং ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায়।

---

[৫১৯] ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বরনাবা ৬১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ইহুদিদের হাতে নিহত হন। আর মথির সুসমাচারটি লিখিত হয় ৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে। সুতরাং ৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে লিখিত একটি কিতাব বরনাবার হস্তগত হওয়া বা তার মৃতদেহের ওপর স্থাপন করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। —অনুবাদক

কখন পাওয়া গিয়েছিল বরনাবার সুসমাচার?

অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সুসমাচারটি লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়। এরপর ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুশিয়ার[৫২০] সম্রাটের একজন উপদেষ্টা ক্রেমার ইতালিয়ান ভাষায় এই সুসমাচারটি আবিষ্কার করেন। অতঃপর ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্রেমারের লাইব্রেরির অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে এই কপিটিও ভিয়েনার রাজকীয় প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়। এরপর মূল ইতালিয়ান কপি থেকে এটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে এই সুসমাচারটি প্রকাশ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সুসমাচারটির একটি স্প্যানিশ কপি পাওয়া যায় যেটি ইতালিয়ান কপি থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ জর্জ শেল তার কুরআন অনুবাদের ভূমিকাতে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[৫২১]

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কিং কলেজ অব অক্সফোর্ডের শিক্ষা কমিশনের একজন সদস্য ড. ম্যানকোস এই স্প্যানিশ কপি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেন। এরপর অনুবাদ ও মূল কপি তুলে দেন বিখ্যাত অধ্যাপক হুইটের হাতে। হুইট সুসমাচারটির কিছু অংশ ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করেন।

ড. খলিল সাদাত এই অংশগুলো অধ্যয়ন করেন এবং ইতালিয়ান কপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পান।[৫২২] এরপর ইউরোপে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এই কপিটির বিতরণ বন্ধ থাকে। বরনাবার সুসমাচারের আরবি অনুবাদের শুরুতে ড. খলিল সাদাত কর্তৃক লিখিত বিস্তারিত ভূমিকা থেকে বোঝা যায় ইতালিয়ান কপি এবং ইংরেজি কপির ওপর ভিত্তি করেই সুসমাচারটির আরবি অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে।

ইতালিয়ান কপিটি জনসম্মুখে নিয়ে আসার কৃতিত্ব একজন ইতালিয়ান পাদরির, যিনি ফ্রিম্যান নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে তিনি আইরেনিয়াসের (Irenaeus) পত্রগুলো উদঘাটন করেছিলেন। সেখানে একটি পত্রে বরনাবার সুসমাচারের বরাতে সেন্ট পোলের সমালোচনা করা হয়েছিল। তখন থেকে তার মধ্যে এই সুসমাচারটি উদঘাটনের প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফ্রিম্যান একসময় পোপ পঞ্চম সিক্সটাস (Sixtus)-এর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। একদিন তিনি পোপের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেন। ইত্যবসরে পোপ কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তখন ফ্রিম্যান পোপের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন শুরু করেন। আকস্মিক তিনি এই সুসমাচারটি হাতের নাগালে পেয়ে যান। এই আবিষ্কারে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কপিটি

---

[৫২০] প্রাচীন উত্তর জার্মানির একটি রাজ্য। এর রাজধানী ছিল বার্লিন।

[৫২১] মাওলানা মওদুদি কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত *আল-ইহুদিয়্যাহ ওয়ান নাসরানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৪৬১।

[৫২২] পাঠক বিস্তারিত জানতে দেখুন ড. খলিল সাদাত কর্তৃক লিখিত *বরনাবার সুসমাচারের* আরবি অনুবাদের ভূমিকা।

জামার আস্তিনে লুকিয়ে ফেলেন। পোপ জাগ্রত হওয়ার পর প্রস্থানের অনুমতি নিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন এই মহামূল্যবান রত্নটি। পরে নির্জনে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তিনি এটি অধ্যয়ন করেন। এরপরই তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[৫২৩]

ড. খলিল সাদাত স্প্যানিশ কপি ও ইতালিয়ান কপির মধ্যে তুলনা করে দেখেছেন। উভয় কপির মধ্যে তিনি হুবহু মিল দেখতে পেয়েছেন। তবে ছোট্ট দুটি বিষয়ে উভয় কপির মধ্যে ভিন্নতা ছিল। যেমন ইতালিয়ান কপিতে বলা হয়েছে, "গাদ্দার যিহুদা যখন যিশুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য রোমান সৈনিকদের সাথে আগমন করল তখন যিশু বাগানে প্রার্থনারত ছিলেন। পাশের কক্ষে শিষ্যগণ ঘুমোচ্ছিলেন। সৈনিকদের আগমন টের পেয়ে যিশু ভয় পেলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তার চারপাশ ঘিরে আসা বিপদ দেখে আল্লাহ তাআলা চারজন ফিরিশতা প্রেরণ করলেন। ফিরিশতারা তাকে খিড়কি পথে/জানালা দিয়ে বের করে তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। এরপর যিহুদা কক্ষে প্রবেশ করলে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরত দ্বারা তার আকৃতি ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে দিলেন। ফলে সে পুরোপুরি যিশুর মতোই হয়ে গেল। শিষ্যগণ ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে পেলেন। তার যিশু হওয়ার ব্যাপারে তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেন নি।" স্প্যানিশ কপিতেও এই ঘটনাটি হুবহু ইতালিয়ান কপির মতো বিবৃত হয়েছে। শুধু একটি কথা বাড়তি যোগ করা হয়েছে যে, "পিতর ব্যতীত"। অর্থাৎ পিতর ব্যতীত আর কেউই ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেননি। এটি হলো প্রথম ভিন্নতা।

দ্বিতীয় ভিন্নতাটি হলো যিশুকে নিতে আসা ফিরিশতাদের নামের ক্ষেত্রে। স্প্যানিশ কপিতে একজন ফিরিশতার নাম বলা হয়েছে আজরাইল। পক্ষান্তরে ইতালিয়ান কপিতে এই ফিরিশতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে উরাইল।

সুসমাচারের লেখক হওয়ার জন্য হাওয়ারি হওয়া শর্ত?

ইনজিলু বরনবা মুযাইয়াফুন গ্রন্থের লেখক শিমিয়ন বলেন, "তর্কের খাতিরে যদিও আমরা মেনে নিই যে তিনিই (বরনাবা), বর্তমান সময়ে তার নামে প্রচারিত সুসমাচারটির রচয়িতা। তথাপি দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকে সত্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, সুসমাচারের সত্যতার জন্য মৌলিক শর্ত হলো এর লেখক মসিহের শিষ্য, কিংবা সহচর হওয়া; যিনি স্বচক্ষে তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন।"[৫২৪]

---

[৫২৩] ড. খলিল সাদাত থেকে চয়িত।

[৫২৪] *ইনজিলু বরনবা মুযাইয়াফুন*, পৃষ্ঠা : ৬৩।

শিমিয়ন এবং অন্যান্য খ্রিষ্টানগণকে কি আমরা এই প্রশ্নটা করতে পারি যে, লুকের সুসমাচারের ক্ষেত্রে এই শর্তটির প্রয়োগ কোথায়? লুক তো মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য ছিলেন না। *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের* লেখকের মতে তিনি পোলের সাথি ছিলেন। কলিসিয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে তিনি উভয়কে যৌথভাবে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। পোল তাকে "প্রিয় ডাক্তার", "আমার সহযোগী" প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করতেন। সুতরাং খ্রিষ্টানদের জন্য এমন একটি সুসমাচারে বিশ্বাস স্থাপন করা কীভাবে সংগত হয়, যার লেখক হাওয়ারিও নন, শিষ্যও নন? অথচ এই পুস্তকটিকেই তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ *কিতাবুল মুকাদ্দাসের* তৃতীয় সুসমাচার বিবেচনা করে। সুসমাচারটির লেখক হাওয়ারি তো ছিলেনই না বরং তিনি ছিলেন খ্রিষ্টান দাবিদার ইহুদি পোলের সঙ্গী।

খ্রিষ্টানগণ দ্বিতীয় সুসমাচারের রচয়িতা মার্কের ব্যাপারে কী বলবেন? তার মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্য হওয়ার বিষয়টিও সন্দেহযুক্ত। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, তিনি মসিহের সমর্পণের দিন তার অনুসারী হয়েছেন। যার অর্থ তিনি মসিহের কোনো বক্তৃতা, কোনো ওয়াজ শ্রবণ করেননি। মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের পর দীর্ঘদিন তিনি পোলের সঙ্গেই ছিলেন। এরপর পোলের দুরাচার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সম্পর্কে মিথ্যাচারের কারণে তাকে ত্যাগ করেন। এরপর খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াতি কাজে বরনাবার সঙ্গে মিলিত হন। প্রশ্ন হলো, ক্ষণিকের সাহচর্য কি মার্ককে সুসমাচার লেখার মতো যোগ্য করে তুলতে পেরেছে? তিনি তো মসিহের জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেননি। তার এই সুসমাচার কি মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত জানার মূল উৎস হতে পারে?

কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের লেখক বলেন,"মার্ক স্বীয় সুসমাচারে যে বিষয়ে কথা বলেছেন, বিস্তারিত বলেছেন। তিনি মসিহের জীবনবৃত্তান্ত, কার্যক্রম, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থান বিষয়ে আলোচনা করেছেন।... মার্ক মসিহের শিক্ষার চেয়ে তার কর্মের দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার সুসমাচারে মসিহের প্রবচন উল্লেখ করেছেন মাত্র চারটি। মুজিযা বর্ণনা করেছেন আঠারোটি। বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন একটি। এখানে উল্লেখ্য যে, এসব ঘটনাবলির সঠিক বর্ণনার জন্য অকুস্থলে উপস্থিত থাকা এবং প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মার্ক তো এসব ঘটনা নিজে দেখেননি। সুতরাং খ্রিষ্টানগণ কীভাবে এই সুসমাচারের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে?

এ থেকে প্রমাণিত হয় শিমিয়ন কর্তৃক সুসমাচারের লেখক হওয়ার জন্য হাওয়ারি হওয়ার শর্তারোপ করা সঠিক নয়। অথচ এই শর্তের ওপর ভর করেই তিনি বরনাবার সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেন।

সুসমাচারের লেখক হওয়ার জন্য শিমিয়ন কর্তৃক আরোপিত শর্তটিকে যদি আমরা যথার্থ হিসেবে মেনেও নিই তাহলে বলতে হয় এই শর্তটি শুধু বরনাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। হ্যাঁ, শুধু বরনাবাই এই শর্তটি পূরণ করতে পেরেছেন। অন্য কোনো সুসমাচারের লেখক নন। বরনাবা মসিহ আলাইহিস সালামের জীবদ্দশাতেই ঈমান এনেছেন। তাঁর সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলি এবং মুজিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে নিজ কানে মসিহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শ্রবণ করেছেন। মসিহ আলাইহিস সালাম তাকে অসিয়ত করে গেছেন ঊর্ধ্বারোহণের পর মসিহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে সাফাই গাওয়ার জন্য। অসিয়ত করেছেন মানুষকে তাঁর দাওয়াত ও রিসালাতের হাকিকত বর্ণনা করতে। পাঠক, বরনাবার সুসমাচারে দুইশ একুশ নং অধ্যায়টি পড়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে,"যিশু ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন যে লিখছিল। অতঃপর বললেন,"হে বরনাবা! তুমি অবশ্যই আমার সুসমাচার লিখবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে আমাকে নিয়ে যা ঘটেছে তাও লিখবে। যিহুদার সাথে কী হয়েছে সেটাও লিখবে যাতে বিশ্বাসীগণ প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়।" প্রত্যেকে যাতে হককে সত্যায়ন করতে পারে। তখন লিখনকার্যে রত ব্যক্তিটি বললেন,"হে গুরু! আল্লাহ চাহেন তো আমি অবশ্যই তা করবো। কিন্তু যিহুদার সাথে কি হয়েছে তা আমার জানা নেই। কেননা, আমি সবকিছু দেখিনি।" তখন জবাবে যিশু বললেন, "এই যে যোহন এবং পিতর, তারা সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে। তারাই তোমাকে বলবে কী ঘটেছিল।" এরপর যিশু আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তার একনিষ্ঠ শিষ্যগণকে ডাকার জন্য যাতে করে তারা যিশুকে দেখতে পায়। তখন যাকোব, যোহন, নিকোডেমাসসহ (Nicodemus) সাত শিষ্য, যোসেফ এবং আরও অনেকে; সব মিলিয়ে মোট বাহাত্তর জন আসলেন। তারা সবাই যিশুর সাথে আহার করলেন। তৃতীয় দিন যিশু বললেন,"তেমরা আমার মায়ের সাথে যায়তুন পর্বতে যাও। আমি সেখান থেকেই আসমানে উঠে যাব।"[৫২৫]

বরনাবার সুসমাচারের পাঠকরা খ্রিষ্টানদের অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক ও সুসমাচারগুলোর সঙ্গে এর বাচনভঙ্গি, শব্দ, অনুভূতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মিল দেখতে পাবে। কোনো মুসলিম আল্লাহ তাআলাকে "রুহ" হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে না। কেননা, রুহ মাখলুক (সৃষ্টি)। আল্লাহ তাআলা খালিক (স্রষ্টা)। একইভাবে আল্লাহ তাআলার শানে "বরকতপ্রাপ্ত" শব্দের ব্যবহার করা যায় না। কেননা, তিনি যদি বরকতপ্রাপ্ত হন তাহলে তাকে বরকত প্রদানকারী নিশ্চয় অন্য কেউ রয়েছে। এটা তো হতে পারে না। বাস্তবতা হলো আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবেও বরকতময়। যেমন তিনি কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

فتبارك الله أحسن الخالقين.

---

[৫২৫] *বরনাবা*, অধ্যায় : ২২১।

নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১৪]

শিক্ষার দিক থেকে এই সুসমাচার কুরআন থেকেও অনেক ভিন্ন। তাই এর লেখককে আমরা মুসলিম বলতে অপারগ।

সুসমাচারটিকে খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক বরনবার রচনা হিসেবে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন

সুসমাচারটি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপক হৈ চৈ পড়ে যায়। বিশেষ করে সুসমাচারটির কিছু বক্তব্য কুরআনের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় খ্রিষ্টান শিবিরে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। তাদের লেখক, গবেষক, বক্তা সকলে একযোগে সর্বশক্তি দিয়ে এটির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বরনাবার দিকে সম্বন্ধিত পুস্তকটিকে জাল প্রমাণের জন্য তাদের অনেকেই পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন খ্রিষ্টান লেখক শিমিয়ন। শিমিয়ন আরব বিশ্বে খ্রিষ্টবাদের প্রচারক ও মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও সমর্থনে প্রচুর গ্রন্থও রচনা করেছেন। পাঠক, তার গ্রন্থ *ইনজিলু বরনাবা ইনজিলুন মুযাইয়াফুন* (إنجيل برنابا إنجيل مزيف) অধ্যয়ন করতে পারেন। এখানে আমরা বরনাবার সুসমাচার সম্পর্কে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদের বক্তব্যের অংশটুকুর পর্যালোচনা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরছি।[৫২৬]

১। যদি ধরে নেওয়া হয়, ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্নে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন কর্তৃক লিখিত সুসমাচারগুলোর পাশাপাশি বরনাবার সুসমাচারটিও বিদ্যমান ছিল তাহলে কুরআন বরনাবার সুসমাচারকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করত, অন্য সুসমাচারকে নয়।

২। অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে; যে সময়ের মধ্যে ইবনু জারির তাবারি এবং ইবনু কাসিরের মতো বড় বড় মুফাসসিরের আবির্ভাব হয়েছে, সে সময় যদি এই সুসমাচারটির অস্তিত্ব থাকত তাহলে মুফাসসিরগণ মসিহের পরিবর্তে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটির পরিচয় নির্ণয়ে মতবিরোধ করতেন না। বরং বরনাবার সুসমাচারের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে তারা সবাই একমত হতেন যে, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটি যিহুদা ইস্করিয়োতি।

৩। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া সকল মুসলিম ঐতিহাসিক খ্রিষ্টানদের সুসমাচার হিসেবে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচারের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদের কারোর রচনাতে বরনাবার সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন মাসউদি

---

[৫২৬] খ্রিষ্টানগণ দাবি করে থাকেন প্রচলিত বরনাবার সুসমাচারটি কোনো মুসলিম জালিয়াতি করে রচনা করেছে। এটি হাওয়ারি বরনাবার রচনা নয়। তাদের সেই দাবির স্বপক্ষে তারা বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে থাকে। লেখক এখানে তাদের দাবির পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো প্রথমে তুলে ধরেছেন। এরপর এগুলোর খণ্ডন করেছেন।—অনুবাদক

কর্তৃক রচিত *মুরুজুয যাহাব*, ইবনে কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, মাকরিজি কর্তৃক রচিত *আলকওলুল ইবরিযি*, ইবনুল আসির কর্তৃক রচিত *আল-কামিল* প্রভৃতি।

৪। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মসিহের শিষ্যদের তালিকায় বরনাবার নাম উল্লেখ করেননি। অথচ বরনাবা তার সুসমাচারে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যেমন ১৬, ২৫, ৬৭, ৬৯, ১১২, ১৩৮, ১৫৫, ১৬৮, ১৭১, ২৪৬, ৩২৩ প্রভৃতিতে নিজেকে মসিহের শিষ্য দাবি করেছেন। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মসিহের শিষ্য হিসেবে শুধু তাদের নামই উল্লেখ করেছেন, যাদের উল্লেখ লুক ও অন্যান্যরা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় চতুর্দশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বরনাবার সুসমাচারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।—সংক্ষেপিত

ড. খলিল সাদাত মনে করেন, এই লেখক[৫২৭] স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত একজন ইহুদি। প্রথমে তিনি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হয়ে সুসমাচারগুলো সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। ড. খলিল সাদাত তার এই দাবির স্বপক্ষে বরনাবার সুসমাচারের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন।

১। যিশু তাঁর প্রভুত্ব ও ঈশ্বরপুত্র হওয়াকে অস্বীকার করেন।

২। ইবরাহিম আল্লাহর জন্য ইসমাইলকে কুরবানি দিতে চেয়েছেন। ইসহাককে নয়।

৩। প্রতিশ্রুত পরিত্রাণদাতা যিশু নন, বরং মুহাম্মাদই হলেন প্রতিশ্রুত পরিত্রাণদাতা। এমনকি সুসমাচারটিতে সরাসরি মুহাম্মাদ শব্দটি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বারংবার উল্লেখ হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। আদম জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে দেখতে পান, তাঁর দরজায় নুরের হরফে লেখা রয়েছে,“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।”

৪। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি। তাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক যিহুদাকে। তাকে যিশুর আকৃতিতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। এই বক্তব্য হুবহু কুরআনের সঙ্গে মিলে যায়—

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ .

আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা

[৫২৭] তাদের দাবী অনুযায়ী বরনাবার সুসমাচারের প্রকৃত লেখক।-অনুবাদক

করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে, বরং তাদের কাছে এরূপ সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছিল। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭]

৫। খতনার বিধান।

সংক্ষিপ্তাকারে এই হলো বরনাবার সুসমাচারের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি।

এটিকে বরনাবার সুসমাচার বলা সঠিক নাকি ভুল তা নিয়ে আমরা মুসলিমরা তেমন একটা চিন্তিত নই। আমাদের জন্য বিষয়টি তেমন একটা গুরুত্ব বহন করে না। কেননা, কুরআন আমাদেরকে মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম, তাঁর দাওয়াত, জীবদ্দশায় যেসব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি হয়েছেন তার বর্ণনা এবং পৃথিবীতে তাঁর শেষ সময় কেমন কেটেছিল ইত্যাদি সবকিছুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। একইভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত ইনজিলে কেমন বিকৃতি ও পরিবর্তন হয়েছে তাও বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

সুসমাচারটিকে বরনাবার দিকে সম্বন্ধ করা বা না করা নিরেট অ্যাকাডেমিক বিষয়। আমরা বলতে চাই, এই সুসমাচারটি খ্রিষ্টানদের পরিমণ্ডলেই উদঘাটিত হয়েছে। এটি তাদেরই এক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে, যেখানে খ্রিষ্টান পণ্ডিত ব্যতীত আর কারো পৌঁছার সুযোগ নেই। একইভাবে এটির আবিষ্কার, ইতালিয়ান ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ, আবার ইংরেজি থেকে আরবি অনুবাদ সকল কৃতিত্ব খ্রিষ্টানদেরই। কোনো মুসলিমের সেখানে হাত ছিল না। সুতরাং কীসের তাড়নায় তারা এটিকে বরনাবার সুসমাচার বলে মেনে নিতে পারছে না? স্বয়ং খ্রিষ্টানরা নিজেরাই স্বীকার করে যে ৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ হিসেবে অভিষেক হওয়া প্রথম গ্যালাসিয়াস এক ফরমান জারি করে কিছু পুস্তক অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিষিদ্ধ সেই পুস্তকগুলোর তালিকায় বরনাবার সুসমাচারটিও ছিল, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এর অর্থ কি এই নয় যে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষ তথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের এক শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত সুসমাচারটি প্রচলিত ছিল? এমনকি এটির পঠন-পাঠনও হতো। এরপর পোপ গ্যালাসিয়াস এসে এটি নিষিদ্ধ করেন। কেননা, এতে পোল-প্রচারিত খ্রিষ্টবাদ তথা পোলবাদের আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এসব সাংঘর্ষিক বিষয়ের অন্যতম হলো মসিহের প্রভুত্ব। এরপর এই সুসমাচারটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ যে, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণায় মুসলমানদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বিশেষত দ্বিতীয় হিজরির শেষ থেকে নিয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া পর্যন্ত সময়কালে। এ সময়ে ইবনে জারির তাবারি, আল-ইয়াকুবি, মাসউদি, আল-বেরুনি, ইবনে হাজম, শাহরাসতানি প্রমুখ জাতি-ধর্মবিষয়ক প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তারা কেউই এই নিষিদ্ধ গ্রন্থটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। যদি এই

সুসমাচারটি ড. খলিল সাদাতের দাবি অনুযায়ী ইসলামি যুগের রচনা হতো তাহলে এসব লেখক ও ইতিহাসবিদগণ এই গ্রন্থটি সম্পর্কে অবগত হতেন। খ্রিষ্টানদেরকে প্রতিরোধ করতে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত তাদের দাবি খণ্ডন করতেন এই সুসমাচার থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। বরনাবার সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও তারা ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটিকে নির্ণয় করতে গিয়ে মতবিরোধ করেছেন। সে যুগের মুসলিমরা যদি সুসমাচারটি সম্পর্কে জানতেন তাহলে তারা কখনোই মতবিরোধ করতেন না।

ড. খলিল সাদাতের আপত্তি ছিল 'খতনা প্রভৃতি বিষয়ে বরনবার সুসমাচারের বক্তব্য ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ'। তার এই আপত্তির জবাবে আমরা তাকে প্রশ্ন করতে চাই, খতনা নিষিদ্ধ করল কে? মসিহ আলাইহিস সালাম নাকি পোল? নিশ্চয় পোলই খতনা নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা, প্রসিদ্ধ আছে যে খতনা ইবরাহিম, ইসমাইল, মুসা, ঈসা আলাইহিস সালাম—সকলের সুন্নত। পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মে এর বর্ণনা এসেছে। যেমন গালাতিয়দের প্রতি লিখিত চিঠিতে পোল বলেন, দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্‌ছেদ (খতনা) প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। যে কোনো মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য।'[৫২৮]

করিন্থিয়দের প্রতি লিখিত চিঠিতে তিনি বলেন, কেহ কি ছিন্নত্বক্ হইয়া আহূত হইয়াছে? সে ত্বক্‌ছেদ লোপ না করুক। কেহ কি অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। ত্বক্‌ছেদ কিছু নয়, অত্বক্‌ছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই সার।'[৫২৯]

এ থেকে বোঝা যায় বরনাবার বক্তব্য ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুসমাচারে খতনার উল্লেখ থাকায় এটিকে একজন মুসলমানের রচনা বলে যে দাবি ড. খলিল সাদাত করেছেন তা সঠিক নয়। আমরা বলব, এর লেখক মসিহ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। আর মসিহ আলাইহিস সালাম খতনাকে রহিত করেননি। অনুসারীদের জন্য বিধিবদ্ধ রেখে গিয়েছেন।

বরনাবার সুসমাচারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম কোনো ধরনের ইশারা-ইঙ্গিতের আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে ড. খলিল সাদাত সংশয় প্রকাশ করেছেন। তার জবাবে আমরা বলব—

---

[৫২৮] *গালাতিয়,* অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ২-৩।

[৫২৯] *করিন্থিয় ১ম,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ১৮-১৯।

১। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—

> وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ.
>
> স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলবে : এ তো এক প্রকাশ্য জাদু। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

সুতরাং বরনাবা কর্তৃক নবিজির নাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে বাধা কোথায়? তিনি তো ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে সরাসরি জ্ঞান আহরণ করেছেন।

২। নামটি এমন কোনো শব্দ নয় যা ভিনদেশি ভাষা থেকে অনূদিত হয়ে এসেছে, যার আরবি অর্থ আহমদ বা মুহাম্মাদ। অনেক ইংরেজ পণ্ডিত এমনটাই দাবি করেছেন। যেমন: উডেন জোনস তার গ্রন্থ *নাশআতুদ দিয়ানাতিল মসিহিয়্যাহ*-তে বলেন, খ্রিষ্টানদের এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লিখিত 'পারাক্লিত' শব্দের অর্থ মুহাম্মাদ।'

এই পণ্ডিত অবশ্য দাবি করেন যে, মুসলিমরাই এই শব্দগুলো খ্রিষ্টানদের অগোচরে সুসমাচারগুলোতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে পাঠক বরনাবার সুসমাচারের শুরুতে ড. রশিদ রেজার ভূমিকাটিও পড়ে নিতে পারেন। এটি তিনি ড. খলিল সাদাতের দাবি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন। তিনি বলেন—

'শেখ মুহাম্মাদ বৈরাম একজন ইংরেজ পরিব্রাজক সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ভ্যাটিকানের পোপের লাইব্রেরিতে হিময়ারি কলমে লিখিত সুসমাচারের একটি কপি দেখতে পান। সেখানে মসিহ বলেন,'...এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পর আগমন করবেন। তার নাম হবে আহমদ।' এই বক্তব্যটি কুরআনের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু

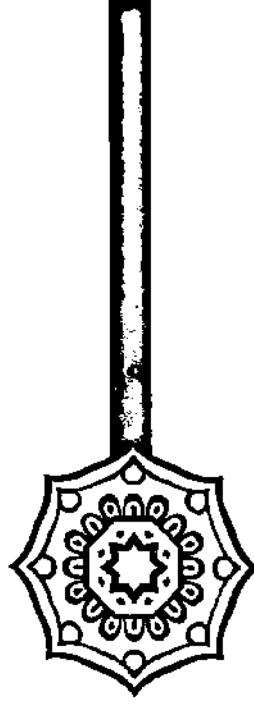
মুসলমানদের কেউ সুসমাচারগুলোতে নবিজি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পেয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেননি।

এ থেকে বোঝা যায়, ভ্যাটিকানের লাইব্রেরিতে ওইসব পুস্তক ও সুসমাচারের কিছু অংশ রক্ষিত ছিল, যেগুলোর পাঠ প্রথম শতাব্দীগুলোতে নিষিদ্ধ ছিল। এগুলো প্রকাশ করা গেলে বরনাবার সুসমাচারসংক্রান্ত সকল সন্দেহের নিরসন হতো। বরনাবা সুস্পষ্টভাবে 'মুহাম্মাদ' শব্দটি অনুবাদ হিসেবে লিপিবদ্ধ করাও অসম্ভব কিছু নয়। মূল গ্রন্থে এটি এমন শব্দে ছিল যার অর্থ দাঁড়ায় মুহাম্মাদ। যেমন পারাক্লিত শব্দটি। অনুবাদের ক্ষেত্রে এমন ছাড় দেওয়াটা খ্রিষ্টানদের মধ্যে স্বীকৃত প্রচলিত বিষয় ছিল। যেমনটি শায়খ রহমতুল্লাহ কিরানবি তার গ্রন্থ *ইযহারুল হকে* বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি নতুন নিয়মের দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণীও উল্লেখ করেছেন।[৫৩০]

উপর্যুক্ত আলোচনার জের ধরে আমরা এ পর্যায়ে পুরাতন ও নতুন নিয়মের এমন কিছু অনুচ্ছেদ তুলে ধরব, যেগুলো শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।



[৫৩০] *ইযহারুল হক,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩১।



পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ

ভবিষ্যদ্বাণী এক

সাইয়েদুনা মুসা আলাইহিস সালাম বলেন—

'আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করিলেন, তাহা এই। তিনি কহিলেন,

সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন,

সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন;

পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন,

অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন;

তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।'[৫৩১]

এখানে সুস্পষ্টভাবে তিনজন নবির রিসালাতের ইঙ্গিত রয়েছে। তারা হলেন মুসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সম্ভবত এটি কুরআনের ওই আয়াতের সত্যায়ন যেখানে বলা হয়েছে—

[৫৩১] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৩৩, অনুচ্ছেদ : ১-২।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ.

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, এবং এই নিরাপদ নগরীর। [সুরা তীন, আয়াত : ১-৩]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যেখানে হিজরত করেছেন, মসিহ আলাইহিস সালাম যে ভূমিতে জন্ম নিয়েছেন সেখানেই তিন ও যায়তুন উৎপন্ন হয়। মুসা আলাইহিস সালামের বাণী 'সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন' থেকে এটাই উদ্দেশ্য। তুরে সিনা হলো আল্লাহর সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালামের আলাপের স্থান। আর পারান হলো মক্কা। পারান ভূমি থেকে যে নবিজির জন্মস্থান মক্কা নগরী উদ্দেশ্য তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে তাওরাতের একটি বর্ণনা। সেখানে স্ত্রী হাজেরার সঙ্গে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আচরণ এবং সারার ঘর থেকে হিজরতসংক্রান্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,'আর মিশরীয়া হাগার অব্রাহামের নিমিত্ত যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস করিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; কেননা, আমার পুত্র ইসহাকের সহিত ঐ দাসীর পুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। এই কথায় অব্রাহাম আপন পুত্রের বিষয়ে অতি অসন্তুষ্ট হইলেন। আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ঐ বালকের বিষয়ে ও তোমার ঐ দাসীর বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইও না; সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুন; কেননা ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে। আর ঐ দাসীপুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব, কারণ সে তোমার বংশীয়। পরে অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া রুটি ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালকটিকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বের্-শেবা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল। পরে কুপার জল শেষ হইল, তাহাতে সে এক ঝোপের নিচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল; আর আপনি তাহার সম্মুখ হইতে অনেকটা দূরে, অনুমান এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকটির মৃত্যু আমি দেখিব না। আর সে তাহার সম্মুখ হইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন; আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটি যেখানে আছে, ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনিলেন; তুমি উঠিয়া বালকটিকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর; কারণ আমি উহাকে এক মহাজাতি করিব। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন, তাহাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল, আর তথায় গিয়া কুপাতে জল পূরিয়া বালকটিকে পান করাইল। পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। সে পারান প্রান্তরে বসতি করিল। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।'[৫৩২]

[৫৩২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৯-২১।

ভবিষ্যদ্বাণী দুই

নবি যিশাইয় বর্ণনা করেন,

‘আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না। দেখ, পূর্বকার বিষয় সকল সিদ্ধ হইল; আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই।’

‘হে সমুদ্রগামীরা ও সাগরস্থ সকলে,
হে উপকূলসমূহ ও তন্নিবাসীরা,
তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও,
পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তাঁহার প্রশংসা গাও।
প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক,
কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক,
শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক,
পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক;
তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক,
উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক।
সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন,
যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন;
তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হাঁ, মহানাদ করিবেন;
তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন।’[৫৩৩]

‘সদাপ্রভু আপন ধর্মশীলতার অনুরোধে ব্যবস্থাকে মহৎ ও সমাদরণীয় করিতে প্রীত হইলেন। তথাপি তাহারা অপহৃত ও লুণ্ঠিত জাতি; তাহারা সকলে গর্তে পাশবদ্ধ ও কারাগারে লুক্কায়িত হইয়াছে; তাহারা অপহৃত হইয়াছে, উদ্ধারকর্তা কেহ নাই; লুণ্ঠিত হইয়াছে, কেহ বলে না, ফিরাইয়া দেও।’[৫৩৪]

---

[৫৩৩] *যিশাইয়,* অধ্যায় : ৪২, অনুচ্ছেদ : ৮-13।
[৫৩৪] *যিশাইয়,* অধ্যায় : ৪২, অনুচ্ছেদ : ২১-২২।

জাযিরাতুল আরবে একজন নবির আগমনের ব্যাপারে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়েও স্পষ্ট। কেননা :

(ক) তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নতুন গীত গাও,

এখানে নতুন গীত থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন শরিয়ত। এ কথা প্রসিদ্ধ যে মসিহ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ আলাদা কোনো শরিয়ত নিয়ে আসেননি। তিনি এসেছিলেন মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অনেকগুলো কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর যথার্থ প্রয়োগ শোভা পায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে। উল্লিখিত বর্ণনা তার সঙ্গেই মিলে যায়।

(খ) প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক,

কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক।'

একথা সর্বজনবিদিত যে কেদর বা কায়দার হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বড় সন্তান। তিনি জাযিরাতুল আরবে বসবাস করতেন। সুতরাং নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমনকারী নবি জাযিরাতুল আরবেই আগমন করবেন—সেটাই সংগত ও সুস্পষ্ট। আর তার নবুওয়তপ্রাপ্তিতে আরবের অধিবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির দ্বারা এটি বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

(গ) 'শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক,

পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক;

তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক,

উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক।'

অভিধান অনুযায়ী শেলা বা সিলা মদিনার একটি পর্বতের নাম। এই অনুচ্ছেদটিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এতে আরাফার পর্বত, উপত্যকা প্রভৃতির একটি প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এটাও বলেছেন যে, 'হজ হলো আরাফার নাম।' এ হাদিসে আরাফা থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে আরাফার ময়দানে অবস্থান। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজিগণ তাসবিহ, তাহলিল ও রোনাজারিতে লিপ্ত থাকেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সর্বপ্রথম যারা হজ করেছিলেন তারা ছিলেন সিলা পর্বতের অধিবাসী তথা মদিনাবাসী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সিলা তথা মদিনায় বসবাস করতেন। বিদায় হজের সময় তিনি প্রথমবারের মতো সঙ্গী-সাথি

নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা ইহরাম বেঁধে এসেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথিদের নিয়ে আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। আর সেখানেই এই কথায় বাস্তবায়ন হয়, 'শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক, পর্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক; তাহারা সদাপ্রভুর গৌরব স্বীকার করুক, উপকূল সমূহের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক।"

(ঘ) 'সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন,

যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন;

তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হাঁ, মহানাদ করিবেন;

তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন।'

এখানে মুসলিমদের শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার শুরু ছিল মদিনা। অতঃপর তারা ইসলামের শত্রুকে পরাহত করেছে। আগে পশ্চিমারা বলত, 'ইসলাম যোদ্ধাবেশে পরাক্রমশালীরূপে দণ্ডায়মান হয়েছে। এরপর উচ্চধ্বনি তুলে শত্রুর ওপর জয়লাভ করেছে।'

(ঙ)'আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই।'

আলোচনার শুরুতে যিশাইয় এ কথাটি বলেছেন। এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই এটি বাস্তবায়িত হয়েছে। তার হাতে নতুন শরিয়ত তথা শরিয়তে ইসলামি এসেছে। আরবদের মর্যাদা বুলন্দ হয়েছে। পৃথিবীর দিকদিগন্তে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের শত্রুদের ওপর তারা বিজয়ী হয়েছেন।

ভবিষ্যদ্বাণী তিন

যিশাইয় আরও বর্ণনা করেন,

'ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত; আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম; তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়বিচার উপস্থিত করিবেন। তিনি চিৎকার করিবেন না, উচ্চশব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না; সধূম শলিতা নির্বাপিত করিবেন না; সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি নিস্তেজ হইবেন না,

নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন; আর উপকূলসমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।

সদাপ্রভু ঈশ্বর, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি ভূতল ও তদুৎপন্ন সমস্তই বিছাইয়াছেন, যিনি তন্নিবাসী সকলকে নিশ্বাস দেন, ও তথাকার সমস্ত জঙ্গমকে জীবাত্মা দেন, তিনি এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু ধর্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আর আমি তোমার হস্ত ধরিব, তোমাকে রক্ষা করিব; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে, তুমি কারাকূপ হইতে বন্দিদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসীগণকে বাহির করিয়া আনিবে।'[৫৩৫]

আবু উবাইদা (মৃত : ৫৮২ হিজরি) এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার গুণাবলি সম্পর্কিত বিবৃতি। এটিই যথেষ্ট। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা তোমাদের জন্য অসম্ভব।'[৫৩৬]

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো থেকে বোঝা যায়, এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে।

(ক) "তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়বিচার উপস্থাপন করিবেন"

এই কথাটি মসিহ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, তিনি জাতিগণ তথা অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত হননি। তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।'[৫৩৭]

একইভাবে হাওয়ারিগণকে রিসালাতের বাণী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণকালে তিনি একই কথা বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে, 'এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন, 'তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।'[৫৩৮]

---

[৫৩৫] *যিশাইয়,* অধ্যায় : ৪২, অনুচ্ছেদ : ১-৭।

[৫৩৬] *বাইনাল ইসলাম ওয়াল মসিহিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২২৫

[৫৩৭] *মথি,* অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ২৪-২৬।

[৫৩৮] *মথি,* অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৫-৬।

অপরদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি। যেমন: ইমাম বুখারি তার সহিহ্ গ্রন্থের কিতাবুস সালাতের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেন 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি : আমার জন্যে জমিনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে।' এই অধ্যায়ের হাদিসে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি। আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। সমস্ত জমিন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। আমার জন্য গনিমত হালাল করা হয়েছে। অন্যান্য নবি নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে সার্বজনীন সুপারিশের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।'

(খ) 'তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎসাহিত হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন'

এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, যিশাইয় কর্তৃক যে নবির ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে তিনি পূর্ণশক্তি দিয়ে শত্রুর সকল চ্যালেঞ্জের সামনে দণ্ডায়মান হবেন এবং তাদের ওপর বিজয়ী হবেন। পৃথিবীতে হককে বিজয়ী করবেন। খ্রিষ্টানগণ মসিহ্ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রয়োগ করে। অথচ মসিহ্ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস হলো তিনি রোমান শাসক কর্তৃক পরাভূত হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এরচেয়ে বড় দুর্বলতা আর কি হতে পারে!?

(গ) 'উপকূলসমূহ তাহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে'

এই অংশটিও প্রতীক্ষিত নবির বৈশ্বিক হওয়াটা স্পষ্ট করে। তা ছাড়া এটা তো প্রসিদ্ধ যে, ইহুদিরা সেই নবির অপেক্ষায় জাযিরাতুল আরবে গমন করেছিল এবং ইয়াসরিবের আশেপাশে বসতিও স্থাপন করেছিল।

(ঘ) 'আমি তোমাকে রক্ষা করিব; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব'

এখনে স্পস্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে প্রতীক্ষিত নবি আল্লাহর হেফাজত ও সুরক্ষায় থেকে তার রিসালাতকে পৌঁছে দেবেন। কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবে না। একইভাবে তার রিসালাত হবে ব্যাপক। বনি ইসরাইলের জন্য এবং অন্যদের জন্যও। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ইতিপূর্বেই আমরা সেটি উল্লেখ করেছি।

ভবিষ্যদ্বাণী চার

তিনি আরও বর্ণনা করেন,

'উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত,
সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।
কেননা, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে, ঘোর তিমির জাতিগণকে, আচ্ছন্ন করিতেছে,
কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হইবেন,
এবং তাঁহার প্রতাপ তোমার উপরে দৃষ্ট হইবে।
আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে,
রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে।
তুমি চারিদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ,
উহারা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে।
তোমার পুত্রগণ দূর হইতে আসিবে,
তোমার কন্যাগণ কক্ষে করিয়া আনীত হইবে।
তখন তুমি তাহা দেখিয়া দীপ্যমানা হইবে,
তোমার হৃদয় স্পন্দন করিবে ও বিকশিত হইবে;
কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার দিকে ফিরান যাইবে,
জাতিগণের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসিবে।
তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ,
মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ;
শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে;
তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে,
এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে।

কেদরের[৫৩৯] সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে,

নবায়োতের[৫৪০] মেষগণ তোমার পরিচর্যা করিবে;

তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে,

আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব।”

এই বাক্যগুলো থেকে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় :

(ক) মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক বর্ণিত নববি সিলসিলা হলো, 'আপন আপন নাম ও গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের সন্তানদের নাম এই, ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, পরে কেদর, অদ্‌বেল, মিবসম, মিশ্‌ম, দুমা, মসা, হদদ, তেমা, যিটুর, নাফীশ ও কেদমা।'[৫৪১]

উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে যিশাইয় তাদের মধ্য থেকে নবায়োত ও কায়দারের (কেদর) নাম বিশেষ কিছু ইঙ্গিতসহ উল্লেখ করেছেন। ইঙ্গিতগুলো আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গেই খাপ খায়। ইঙ্গিতগুলো হলো :

১. উটের আধিক্য।

২. কায়দারের মেষের আধিক্য।

৩. নবায়োতের মেষের আধিক্য।

৪. 'জাতিগণের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসিবে' অর্থাৎ বিজিত জাতির ধনভাণ্ডার।

৫. 'তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে।' এখানে ইয়াওমুন নাহার তথা কুরবানির দিন মিনার প্রান্তরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচ

দানিয়েলের পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে,

---

[৫৩৯] কেদর বা কায়দার = *আদিপুস্তকের* পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী কায়দার হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র। এটি একটি সেমেটিক শব্দ। কামুসুল *কিতাবিল মুকাদ্দাসে* বলা হয়েছে, তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গোত্রের পূর্বপুরুষ। তাদের আবাসভূমিকেও কায়দার বলা হয়। এরা প্রচুর পরিমাণে চতুষ্পদ জন্তুর মালিক ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা বিশেষত তিরন্দাজিতে তাদের জুড়ি ছিল না।

[৫৪০] নবায়োত = *আদিপুস্তকের* পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী ইনি ইসমাইল আলাইহিস সালামের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। তার দিকে একটি আরবীয় গোত্রকে সম্বন্ধ করা হয়, যারা প্রচুর চতুষ্পদ জন্তুর মালিক ছিলেন।

[৫৪১] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ২৫, অনুচ্ছেদ : ১৩-১৫

'হে মহারাজ, আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষ ও বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়; তাহার জঙ্ঘা লৌহময় এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেইগুলি চূর্ণ করিল। তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সেই সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না। আর যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।

স্বপ্নটি এই; এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে ইহার তাৎপর্য জ্ঞাত করি। হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন। আর যে কোন স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে, সেই স্থানে তিনি মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন; আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক। আপনার পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; কারণ লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করে ও পাড়িয়া ফেলে, লৌহ যেমন এই সকল চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই রাজ্য সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। আর আপনি দেখিয়াছেন, দুই চরণ ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বুঝায়; কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি কর্দমে মিশ্রিত লৌহ দেখিয়াছেন। আর চরণের অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃন্ময় ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে। আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না। আর সেই রাজগণের সময়ে[৫৪২] স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না;

[৫৪২] স্বপ্নের এই শেষাংশটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যে পাথরটিকে আপনি দেখলেন সেটি বড় মূর্তিটিকে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল। তিনি হলেন একজন নবি। আসমান ও জমিনের মাবুদ একটি শক্তিশালী রাজ্য থেকে তাকে দাঁড় করাবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর সকল জাতির সকল রাজাগণকে বিচূর্ণ করে দেবেন। তার উম্মতে পুরো পৃথিবী ভরে যাবে। এই সুলতানের রাজত্ব কিয়ামত অবধি স্থায়ী হবে। *আলজাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩-৪।

তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। কারণ আপনি ত দেখিয়াছেন, পর্বত হইতে একখানি প্রস্তর বিনা হস্তে খনিত হইল এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল; মহান ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন; স্বপ্নটি নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য সত্য।'[৫৪৩]

এখানে সম্রাট বুখতে নসরেরর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। স্বপ্নটি দেখে তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাই পুরোহিত, জাদুকর ও গণকদেরকে ডেকে তিনি এর ব্যাখ্যা তলব করেন। সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারলে তাদেরকে হত্যারও হুমকি দেন। পাশাপাশি তিনি (নিজ থেকে স্বপ্নটি বর্ণনা না করে) তাদেরকে স্বপ্নটির বর্ণনা দিতে বলেন যাতে স্বপ্নব্যাখ্যায় তাদের যোগ্যতা ও সত্যতা প্রকাশ পায়। কিন্তু কেউই জবাব দিতে পারলেন না। ফলে সম্রাট তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই সংবাদ আল্লাহর নবি দানিয়েলের কাছে পৌঁছায়। তিনি ছিলেন মুসার শরিয়তের চারজন বড় নবির একজন। দানিয়েল সঠিক ব্যাখ্যা অবগত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, যাতে কাউকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে না হয়। এরপর তিনি সম্রাটের কাছে গিয়ে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা দিলেন। ব্যাখ্যা শুনে সম্রাট ভীষণ আনন্দিত হলেন। এই ব্যাখ্যায় দানিয়েল শেষ জমানায় ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যেমন :

(ক) দানিয়েলের বক্তব্য অনুযায়ী এই স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা সত্য। তিনি যেসব যুগের কথা বলেছেন ইতিহাসে আমরা সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমরা দেখি :

১. ৭০১ খ্রিষ্টপূর্বে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য। বুখতে নসরের রাজত্বকালীন এই সময়টিকে তিনি সাংকেতিক ভাষায় স্বর্ণময় মস্তক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২. ৬১২ খ্রিষ্টপূর্বে মিডাসের সময়কালীন ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্য। সাংকেতিক ভাষায় এটিকে রৌপ্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের গ্রিক সাম্রাজ্য। সাংকেতিক ভাষায় এটিকে পিতল দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪. ৫৩ খ্রিষ্টপূর্বের রোমান সাম্রাজ্য। সাংকেতিক ভাষায় এটিকে লৌহ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৫. ৬১২ খ্রিষ্টাব্দের পশ্চিমের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং প্রাচ্যের সাসানি সাম্রাজ্য।

৬. ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ইসলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজা-বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ, শত্রুর মোকাবিলায়

[৫৪৩] *দানিয়েল*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৩১-৪৫।

মুসলমানদের প্রতিরোধযুদ্ধ এবং পশ্চিমের বায়জান্টাইন ও পূর্বের পারস্য সাম্রাজ্যের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া।

ভবিষ্যদ্বাণী ছয়

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে বলা হয়েছে—

'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে।আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"[৫৪৪]

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে—

'ইনি সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ একজন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন।"[৫৪৫]

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুসা আলাইহিস সালামের উপদেশ ও নসিহতের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। সমস্ত বনি ইসরাইলের সামনেই তিনি এগুলো ঘোষণা করেছেন। যেমন *দ্বিতীয় বিবরণের* প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,'যর্দনের পূর্বপারস্থিত প্রান্তরে, সূফের সম্মুখস্থিত অরাবা তলভূমিতে, পারণ, তোফল, লাবন, হৎসেরোৎ ও দীষাহবের মধ্যস্থানে মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে এই সকল কথা কহিলেন।... সদাপ্রভু যে যে কথা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিতে মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে মোশি চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।...যর্দনের পূর্বপারে

[৫৪৪] *দ্বিতীয় বিবরণ,* অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ১৫-২০।

[৫৪৫] *প্রেরিত,* অধ্যায় : ৭, অনুচ্ছেদ : ৩৭।

মোয়াব দেশে মোশি এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন...'[৫৪৬]

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'এক্ষণে, হে ইস্রায়েল, আমি যে যে বিধি ও শাসন পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিই, তাহা শ্রবণ কর; যেন তোমরা বাঁচিতে পার...'[৫৪৭]

এই নসিহতমালায় মুসা আলাইহিস সালাম শরিয়তের যে বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে আজিমুশশান এক প্রতীক্ষিত নবির ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। খ্রিষ্টানগণ ভবিষ্যদ্বাণীটি মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে মিলাতে চেষ্টা করেছে। যেমন পিতর বলেন,...এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। মোশি ত বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।'[৫৪৮]

মসিহ আলাইহিস সালাম যদি মুসা আলাইহিস সালামের সদৃশ হতেন তাহলে তাদের এই দাবি মেনে নিতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। একমাত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হওয়া ছাড়া মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের তেমন কোনো সাদৃশ্যই নেই। যেমন :

(ক) মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে...'। এখানে ভ্রাতৃগণ বলতে নিশ্চয় বনি ইসরাইলের পিতৃকুলের দিক থেকে উৎপন্ন কোনো বংশধরদেরকেই বোঝানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ভ্রাতৃগণ শব্দটি এই অর্থে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন *গণনাপুস্তকে* বলা হয়েছে, 'পরে মোশি কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল কহিতেছে, আমাদের যে সমস্ত কষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।'[৫৪৯]

এখানে 'তোমার ভ্রাতা ইসরাইল' থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরাইল জাতি তথা ইয়াকুব বিন ইসহাকের বংশধর। কেননা ইদোমিয় সম্রাট ছিলেন এষৌ বিন ইসহাকের বংশধর।[৫৫০]

---

[৫৪৬] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-৬।
[৫৪৭] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ১।
[৫৪৮] *প্রেরিত*, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ২০-২৩।
[৫৪৯] *গণনা পুস্তক*, অধ্যায় : ২০, অনুচ্ছেদ : ১৪।
[৫৫০] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে শব্দটি এই অর্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আর তুমি লোক সমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর-নিবাসী তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ এষৌ-সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে...।'[৫৫১]

এ থেকে বোঝা যায় প্রতীক্ষিত নবি ইসরাইল তথা ইয়াকুব বিন ইসহাকের বংশধর নন। কেননা, যদি প্রতীক্ষিত নবি ইয়াকুবের বংশধর হতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালাম 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' না বলে 'তোমাদের মধ্য হইতে' বলতেন। একইভাবে প্রতীক্ষিত এই নবি এষৌ বিন ইসহাকের বংশেরও হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, ঐতিহাসিকগণ একমত যে এষৌর বংশে কোনো নবির আগমন ঘটেনি। সুতরাং 'তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে' কথাটি একমাত্র মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কেননা তিনি পূর্বপুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মাধ্যম হয়ে বনি ইসরাইলের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(খ) 'আমার সদৃশ' বা 'তোমার সদৃশ' শব্দগুচ্ছ দ্বারা বুঝা যায় প্রতীক্ষিত নবি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসা আলাইহিস সালামের পর প্রেরিতদের মধ্যে তিনিই একমাত্র নবি, যার ক্ষেত্রে "আমার সদৃশ" বা "তোমার সদৃশ" শব্দগুচ্ছগুলোর যথার্থ প্রয়োগ করা যায়। কেননা :

১. মুসা আলাইহিস সালাম পূর্ণাঙ্গ ও নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন। অনুরূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পূর্ণাঙ্গ ও নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন। পাশাপাশি পূর্ববর্তী শরিয়তগুলোকেও রহিত করেছেন। অপরদিকে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।'[৫৫২]

২. মুসা আলাইহিস সালাম রিসালাতপ্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তার সন্তান সন্ততিও ছিল। যেমন *যাত্রাপুস্তকে* বলা হয়েছে, 'তখন মোশি আপন স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গর্দভে চড়াইয়া মিশর দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং মোশি আপন হস্তে ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইলেন।'[৫৫৩]

একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তারও সন্তানসন্ততি ছিল। অপরদিকে ঈসা

[৫৫১] *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৪।
[৫৫২] *মথি*, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৭।
[৫৫৩] *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ২০

আলাইহিস সালাম ছিলেন অবিবাহিত। এ অবস্থাতেই তাকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে।

৩. রিসালাত-প্রাপ্তির পর মুসা আলাইহিস সালাম একাধিক বিবাহ করেছেন। তার প্রথম স্ত্রী ছিলেন মিদিয়নিয় যাজকের কন্যা সাপ্পোরা। এরপর তিনি একজন কুশিয় রমণীকে বিবাহ করেন। এতে করে হারুন ও তার বোন মারইয়াম আপত্তি তোলেন।[৫৫৪] তখন প্রভু মুসার পক্ষে জবাব প্রদান করেন। একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একাধিক বিবাহ করেন। যদ্দরুণ অদ্যাবধি ইহুদি-খ্রিষ্টান ও তাদের চেলা-চামুণ্ডারা তার বহুবিবাহ নিয়ে কটাক্ষ করে থাকে। অপরদিকে ঈসা আলাইহিস সালাম বিয়েই করেননি।

৪. মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন যোদ্ধা। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বনি ইসরাইলের নেতৃত্বও দিয়েছেন।[৫৫৫] অপরদিকে ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন, 'কৈসরের যাহা যাহা কৈসরকে দেও, আর ইশ্বরের যাহা যাহা ইশ্বরকে দেও।'[৫৫৬]

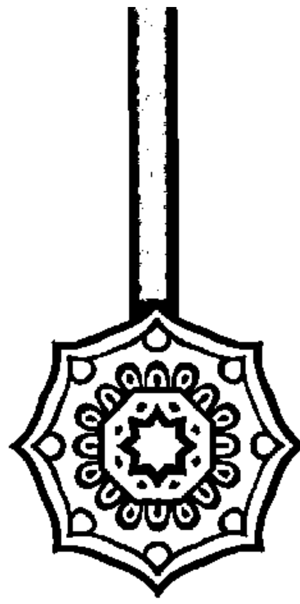
৫. মুসা আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক নিয়মে পিতার ঔরশে, মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম ছিল পিতাবিহীন মাতৃগর্ভে। এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং আল্লাহর কুদরত।



[৫৫৪] *গণনাপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ১-৪।

[৫৫৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন : *যাত্রাপুস্তক*, অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ৮-১১; *গণনাপুস্তক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১-৩, ২১, ২১-২৪, *দ্বিতীয় বিবরণ*, অধ্যায় : ১০, অনুচ্ছেদ : ৪১-৪৪।

[৫৫৬] *মথি*, অধ্যায় : ২২, অনুচ্ছেদ : ২১।



নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ

সুসমাচার লেখক যোহন তার সুসমাচারে যোহন ব্যাপ্তাইজক (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেন—

'আর যোহনের সাক্ষ্য এ ম খন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালে হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন, আমি 'প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর,' যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রিষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি; তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া আছেন, যাঁহাকে তোমরা জান না, যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন

খুলিবারও যোগ্য নহি। যর্দনের অন্য পারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, সেখানে এই সকল ঘটিল।'[৫৫৭]

উল্লেখ্য, বনি ইসরাইল তিন জন নবির আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তারা হলেন মসিহ, ইলিয়াস[৫৫৮], নবি।

এরপর সুসমাচার লেখক যোহন অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উল্লেখ করেন। তিনি তার সুসমাচারের চতুর্দশ অধ্যায় থেকে নিয়ে ষোড়শ অধ্যায় পর্যন্ত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

'তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা'[৫৫৯]

তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দেবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন।'[৫৬০]

'আর তোমাদের সহিত আমি অধিক কথা বলিব না; কারণ, জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।'[৫৬১]

'যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন, সেই সহায় যখন আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।'[৫৬২]

'তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ, আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবেন।'[৫৬৩]

---

[৫৫৭] *যোহন,* অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৯-২৮।

[৫৫৮] দ্বিতীয় নবি হলেন ইলিয়াস আলাইহিস সালাম।

[৫৫৯] *যোহন,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ১৫-১৭।

[৫৬০] *যোহন,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ২৫-২৬।

[৫৬১] *যোহন,* অধ্যায় : ১৪, অনুচ্ছেদ : ৩০-৩১।

[৫৬২] *যোহন,* অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ : ২৬।

[৫৬৩] *যোহন,* অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ৭-৮।

তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।'[৫৬৪]

যোহন কর্তৃক স্বীয় সুসমাচারে বর্ণিত এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ভাষ্য একেবারে সুস্পষ্ট। এগুলো বুঝার জন্য তেমন একটা চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। বরং পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ .

স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বলল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এ তো এক প্রকাশ্য জাদু। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভবিষ্যদ্বাণীটির মিলসমূহ :

এক

মসিহ আলাইহিস সালাম প্রতীক্ষিত নবির গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সেই সহায় তার পরেই আগমন করবেন। এ কথা সবাই জানে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অব্যবহিত পরেই আগমন করেছেন। তাদের উভয়ের মাঝে অন্য কোনো নবি ছিলেন না। কুরআন মসিহ আলাইহিস সালামের বাণী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

[৫৬৪] *যোহন*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১২-১৪।

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

এবং আমি এমন একজন রসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

বনি ইসরাইলের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি ঈমান আনে তাহলে তাদের পূর্বের নেক আমলগুলো রহিত হবে না। বরং সেই আমলের সাওয়াব তারা পাবে। এমনকি দ্বিগুণ সাওয়াবের কথাও তিনি বলেছিলেন। মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনয়নের সাওয়াব এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনয়নের সাওয়াব।

দুই

প্রতীক্ষিত নবির ব্যাপারে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এসে জগৎকে দোষী করবেন। কেননা, তারা তার (মসিহ আলাইহিস সালামের) ওপর ঈমান আনেনি। বাস্তবিকই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রমাণাদির দ্বারা মসিহ আলাইহিস সালামের নবুওয়তের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর যারা তার ওপরে ঈমান আনে না তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের ওপর জয়ী করে রাখব। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৫]

এর পর তিনি বলেন—

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.

অতএব যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৬]

একইভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের প্রত্যাগমন বিষয়ে তিনি জগৎকে তিরস্কার করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا.

আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়ামপুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে, বরং তাদের জন্য এরূপ সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয় তাঁকে তারা হত্যা করেনি। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭]

তিন

মসিহ আলাইহিস সালাম আরও বলেন, 'তোমাদেরকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে...।' এখান থেকে বুঝা যায় মসিহ আলাইহিস সালামের শরিয়ত পূর্ণাঙ্গ ছিল না। কেননা, মানবজাতির বিবেচনা তখনো পরিপক্ব হয়নি। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। মসিহ আলাইহিস সালামের ভাষায় সত্যের আত্মা নিয়ে তিনি আগমন করলেন। আগমন করলেন মসিহ আলাইহিস সালামের শরিয়তকে পূর্ণতা দিতে এবং সেই শরিয়তকে সত্যায়ন করতে। তিনি স্থান ও কালের ভিন্নতা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় বিধানগুলোকে বহাল রাখলেন। যেমন তাওহিদ, আল্লাহর গুণাবলি, পৃথিবীর নশ্বরতা, জান্নাত-জাহান্নামের বাস্তবতা প্রভৃতি। আর স্বল্প কিংবা দীর্ঘ সময়ের অস্থায়ী বিধানাবলিকে রহিত করলেন। কেননা, এগুলোর উপযুক্ততা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান নিয়ে এলেন।

মসিহ আলাইহিস সালাম আরও বলেন, তিনি নিজ থেকে কিছু বলবেন না। এখানে সুস্পষ্টভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে সংবাদ দেবেন। নিজ থেকে বলবেন না। যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে—

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.

এ হলো গায়েবি সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। মারইয়ামকে কে প্রতিপালন করবে, এ নিয়ে তারা যখন তাদের কলমগুলো নিক্ষেপ করেছিল, আপনি তখন তাদের কাছে ছিলেন না। ছিলেন না যখন তারা ঝগড়া করেছিল তখনও। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৪][৫৬৫]

মসিহ তাদেরকে আরও বলেন, 'যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত'? এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে। আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।'

ফরীশী এবং গণক প্রধানগণ যখন এ কথা শুনিলেন, বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে বলিতেছেন।[৫৬৬]

এই অনুচ্ছেদগুলোতে মসিহ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের মন্দ চরিত্র, মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের প্রতি অমনোযোগিতা, অন্যান্য নবিদের আনীত বিধানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া, আল্লাহর বিধানের অবাধ্যাচরণ প্রভৃতি বিষয়ে কথা বলেছেন। মসিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেবেন। অন্য জাতিকে সেই রাজত্ব দান করবেন। কেননা, সেই জাতি আল্লাহর প্রদত্ত শরিয়ত অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার

---

[৫৬৫] এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের সুরা নজমে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থ্যাৎ, এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। ওইটি শুধু ওহি, যা প্রত্যাদেশ হয়। [সুরা নজম, আয়াত : ৩-৪]

[৫৬৬] *মথি*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৪২-৪৫।

ফল অর্জন করবে। নিশ্চয় এই জাতি হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। মসিহ আলাইহিস সালাম ইহুদিদের কর্মকাণ্ড ও মন্দ আচরণের জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'আর একটি দৃষ্টান্ত শুন; একজন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। আর ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। আবার তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের প্রতিও তাহারা সেই মতো ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দেবেন, যাহারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে।'[৫৬৭]

এই দৃষ্টান্তটি উপস্থাপনের পরেই মসিহ আলাইহিস সালাম পূর্বের বর্ণিত কথাটি বলেছিলেন। এই মর্মে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি সহিহ হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আগেকার উম্মতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হলো আসর হতে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ন্যায়। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুযায়ী কাজ করতে লাগল; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আর ইনজিল অনুসারীদেরকে ইনজিল দেওয়া হলো। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হলো। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। আমাদের দুই দুই কীরাত করে দেওয়া হলো।'[৫৬৮]

---

[৫৬৭] *মথি*, অধ্যায় : ২১, অনুচ্ছেদ : ৩৩-৪১।

[৫৬৮] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৫৫৭।

ইতিপূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের যে বক্তব্য আমরা উপস্থাপন করেছি, সেখানকার কিছু বিষয় সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১। 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল।'

বলা হয়ে থাকে, এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসমাইল বিন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম।[৫৬৯] বাক্যের পূর্বাপর থেকে বুঝা যায় ইহুদিদের প্রত্যাখাত পাথর থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত। কেননা, নবিদের সিলসিলা নবুওয়াতের প্রাসাদের দেয়ালের মতো। ইটের উপর ইট রেখে দেয়াল তৈরি হয়। এ ধারা যখন ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আসলো বনি ইসরাইল তখন হয়ে পড়ল বেখবর। তাদের মন্দ কর্মের কারণে তারা এর ভার বইতে পারল না। এরপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। নবুওয়তের প্রসাদের সেই শূন্যতাকে পূর্ণতা দিলেন। তার মাধ্যমেই রিসালাতের ধারার সমাপ্তি ঘটল। পূর্ববর্তী শরিয়তগুলো রহিত হলো। সকল নবি-রাসুলগণের ওপর তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেন। সুতরাং তার ব্যাপারে এ কথা বলা যথার্থ, 'যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল।'

এদিকেই ইঙ্গিত করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার দৃষ্টান্ত ও আমার পূর্বেকার নবিগণের দৃষ্টান্ত সে লোকের মতো, যে কতকগুলো গৃহ বানাল, তা সুন্দর করল এবং সুদৃশ্য করল এবং পূর্ণাঙ্গ করল; কিন্তু তার কোনো একটির কোণে একটি ইটের স্থান ছাড়া (খালি রাখল)। লোকেরা সে ঘরগুলোর চারদিকে চক্কর দিতে লাগল আর সে ঘরগুলো তাদের মুগ্ধ করতে লাগল। পরিশেষে তারা বলতে লাগল, এখানে একখাটি ইট লাগালেন না কেন? তাহলে তো আপনার অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ হত! অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আমি-ই হলাম সে ইটখানি।'[৫৭০]

অদ্যাবধি খ্রিষ্টানগণের দাবি হলো যোহন কর্তৃক প্রতীক্ষিত নবির ব্যাপারে সুসমাচারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি গ্রিক শব্দ Paracletus। এর অর্থ হলো কোনো স্থানের দিকে আহ্বানকারি, কারও সাহায্যার্থে আহ্বানকৃত ব্যক্তি, সতর্ককারী প্রভৃতি। করও কারও মতে এর অর্থ হলো প্রবোধ দানকারী। সুসমাচারের লেখকগণ শব্দটির অর্থ নির্ধারণে একমত হতে পারেননি। তাই অরিগেন (Origen) কখনো শব্দটির অর্থ

[৫৬৯] *মুহাম্মদ ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজিলি ওয়াল কুরআন*।

[৫৭০] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং : ৫৮৫৪।

করেছেন Consolator অর্থাৎ সান্ত্বনা প্রদানকারী। আবার কখনো এর অর্থ করেছেন Deprector অর্থাৎ অনুনোমোদিত। কিন্তু পরবর্তী অনুবাদকগণ এই অর্থটি গ্রহণ করেননি। কেননা, এটি গ্রিক ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত অর্থ। তাই কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন Teacher অর্থাৎ শিক্ষক। টরটেলিয়ান এবং অগাস্টিন শব্দটির অর্থ হিসেবে Advocate শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যার অর্থ সমর্থক। আবার কেউ কেউ Assistant (সহযোগী), comforter (সান্ত্বনাদানকারী), consoler (সান্ত্বনাদানকারী) প্রভৃতি শব্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রিক ভাষায় আরেকটি শব্দ পাওয়া যায় Periclytos। এই শব্দ এবং মুহাম্মাদ শব্দের একই অর্থ। এর শব্দমূল Paracletus এর কাছাকাছি।[৫৭১]

মসিহ আলাইহিস সালাম শব্দটি বলেছেন সুরিয়ানি ভাষায়। সুসমচারের লেখকগণ সেটিকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সুতরাং প্রশ্ন হলো, মসিহ আলাইহিস সালাম নিজ ভাষায় ঠিক কোন শব্দটি ব্যবহার করেছেন? প্রচলিত সুসমাচারগুলো এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসবেত্তারা শব্দটি উদঘাটনের জন্য মাঠ পর্যায়ে গবেষণা চালিয়েছেন। সেই গবেষণায় দেখা গেল, শব্দটি 'মুনহাম্মানা'।

ইবনে ইসহাক মসিহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, আমাকে দ্বেষ করে সে আমার প্রতিপালককেও দ্বেষ করে। যেরূপ কার্য কেউ কখনো করেনি সেরূপ কার্য যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম তবে তাদের পাপ হতো না। কিন্তু এখন তারা অহমিকা করেছে এবং ধারণা করেছে তারা আমার এবং প্রভুর সহায় হয়েছে। কিন্তু এমন হলে যাতে ব্যবস্থায় লিখিত এই বাক্য পূর্ণ হয়, 'তারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করেছে। অতঃপর যদি মুনহাম্মানা সেই সত্যের আত্মা আসেন প্রভুর পক্ষ থেকে-যখন তিনি বের হয়ে আসবেন- তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। তোমরাও সাক্ষী। কেননা তোমরা অতীত থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। আমি তোমাদেরকে বললাম যাতে তোমরা সন্দেহে পড়ে না যাও।[৫৭২]

ইবনে ইসহাক বলেন সুরিয়ানি ভাষায় 'আল-মুনহাম্মানা' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো মুহাম্মাদ। রোমানদের ভাষায় এটাকে বলা হয় পারাক্লিত। সুতরাং এ কথা আশ্চর্যের নয় যে, মসিহ আলাইহিস সালাম সুরিয়ানি ভাষায় 'মুনহাম্মানা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন

---

[৫৭১] *আল-ইহুদিয়্যাহ ওয়াল মসিহিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৪৫৯।

[৫৭২] *আর-রওজুল উনুফ ফি শরহিস সিরাতিন নাবাবিয়্যা,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৭৫

যার আরবি হলো মুহাম্মাদ এবং গ্রিক ভাষায় হলো পারাক্লিত। তাদেরই একজন এ বিষয়ে সাক্ষ্যও দিয়েছেন। হাবশার সম্রাট নাজ্জাশি বলেছেন, 'খোশ আমদেদ! তোমাদের জন্য। খোশ আমদেদ! ওই মহান ব্যক্তির জন্য যার পক্ষ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রাসুল। তিনিই সেই ব্যক্তি যার আলোচনা আমরা ইনজিলে পাই। ঈসা ইবনে মারইয়াম তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই রাজ্যের দায়িত্ব যদি আমার না থাকত তাহলে আমি নিজে গিয়ে তার জুতো বহন করতাম।[৫৭৩]

শায়খ মওদুদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এসব এসব ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ঠিক করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে মসিহ আলাইহিস সালামের যুগে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের ভাষা কি ছিল? তাদের ভাষা ছিল আরামিয় থেকে উদগত সুরিয়ানি ভাষা। কেননা হিব্রু ভাষা মসিহ আলাইহিস সালামের আড়াইশ বছর আগে সেলুকিয়দের যুগে হারিয়ে গেছে। এদিকে গ্রিক ভাষা ছিল রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত শিক্ষিত মহলের ভাষা। সাধারণ ফিলিস্তিনিরা সুরিয়ানি ভাষার একটি বিশেষ উপভাষায় কথা বলত। এ থেকে বুঝা যায় বর্তমান সুসমাচারগুলো পরবর্তীকালে গ্রিক ভাষায় সংকলিত হয়েছে। মসিহ আলাইহিস সালামের বাণীসমূহ তার আসল ভাষা তথা সুরিয়ানি ভাষায় লিখা হয়নি। তাই বলা যায় সুসমাচারের লেখকগণ লোকমুখে চর্চিত বর্ণনার ভিত্তিতে সুসমচার রচনা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানেরর ভাষা গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো প্রতীক্ষিত নবি সম্পর্কে নাজাশির এই অবগতির উৎস কী? সেটা কি যোহনের সুসমাচার নাকি অন্য কিছু?

এ প্রশ্নের দুটি জবাব হতে পারে।

প্রথম : হয়তো যোহনের সুসমচারে মূল কপিটি বাদশাহ নাজাশির যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকেই তিনি অবগত হয়েছেন। অথবা তার সময়ের শতবর্ষ পূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত বরনাবার সুসমাচারের কোনো কপি তার কাছে পৌঁছেছিল। সেখানে তিনি এই নবির নাম, বিবরণ প্রভৃতি পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় : এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তার অবগতির উৎস হলো মৌখিক বর্ণনা। একজন সত্যান্বেষীর জন্য এ সবকিছুই সম্ভব। সত্যান্বেষী অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাস্তবতাকে তুলে আনে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই সত্য সমাধান নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত।

---

[৫৭৩] ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনান গ্রন্থের *কিতাবুল জানাইযে* (জানাযা সংক্রান্ত আলোচনায়) এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। *মুসনাদে আহমদেও* এরূপ হাদিস রয়েছে।

আমরা আবারো বরনাবার সুসমাচারে সুস্পষ্টভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ বিষয়ে ড. খলিল সাদাতের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেছেন, 'মুসলিমদের নবির আগমনের বিষয়টি যদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হতো তাহলে সেটাই লক্ষ্য অর্জনে অধিক উপযুক্ত হতো।' আমরা বলব সুসমাচারটি বরনাবার হওয়ার ব্যাপারে এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, ড. সাদাতের ভাষায় এর লেখক উঁচু পর্যায়ের বিচক্ষণ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সুতরাং তিনি যদি মিথ্যুক হতেন তাহলে এই মামুলি বিষয়টি নিশ্চয় তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না।[৫৭৪]

বরনাবার সুসমাচার থেকে কিছু উদ্ধৃতি

ইতিমধ্যে আমরা বরনাবার সুসমাচারের ইতিহাস এর আবিষ্কার, এবং এটিকে বরনাবার দিকে সম্বন্ধকরণের শুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। এ পর্যায়ে আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার জন্য এই সুসমাচার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যথার্থ হবে বলে মনে করছি।

১। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত সুসংবাদ

সুসমাচারটির তেতাল্লিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :[৫৭৫]

'মসিহ নিচে অপেক্ষমান আট শিষ্যের কাছে নেমে আসলেন।[১] চারজন আটজনকে সেসব কিছু বর্ণনা করলেন যা তারা দেখেছিলেন।[২] এভাবেই সেদিন তাদের যিশুর ব্যাপারে তাদের সকল সন্দেহ দূরিভূত হলো যিহুদা ইস্করিয়োতি ব্যতীত, যে তখনো কোন কিছুই বিশ্বাস করেনি।[৩] যিশু পাহাড়ের পাদদেশে বসলেন এবং ফল খেলেন কেননা, তার কাছে রুটি ছিল না।[৪] তখন অন্দ্রেয় বললেন, আপনি আমাদেরকে পরিত্রাণদাতা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছেন। এখন আমাদেরকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলুন।[৫] তখন যিশু বললেন, প্রত্যেকেই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আর সেখানেই সে প্রাচুর্যতা খুঁজে পায়।[৬] এজন্যই আমি তোমাদেরকে বলছি : হাকিকতে আল্লাহ তাআলা কামালাতের অধিকারী। তার কোন প্রাচুর্যতার প্রয়োজন নেই।[৭] কেননা প্রাচুর্যতা তার থেকেই আসে।[৮] এভাবেই তিনি যখন সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন তিনি সর্বাগ্রে তার সেই রাসুলের আত্মাকে সৃষ্টি করলেন যার জন্য তিনি

---

[৫৭৪] *আল-মাসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

[৫৭৫] লক্ষণীয় যে— বরনাবার সুসমাচারের উদ্ধৃতিগুলোতে ফুটনোটের নাম্বারের মতো যে নাম্বার দেখা যাচ্ছে, সেগুলো ফুটনোটের নাম্বার নয়, বরং বরনাবার নানা অনুচ্ছেদের নাম্বার। মূল আরবিতে যেভাবে আছে সেভাবে আমরা রেখে দিয়েছি।— সম্পাদক।

সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন।[৯] যাতে সমগ্র জগৎ আল্লাহর বরকত ও আনন্দ লাভ করে।[১০] এবং তার রাসুলও সৃষ্টিজগৎ দ্বারা আনন্দিত হন যারা তার গোলাম হতে সক্ষম।[১১] আল্লাহর ইচ্ছা না হইলে ইহা কীভাবে হবে?[১২] সত্য আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করছি : প্রত্যেক নবি যখন আগমন করেন তখন তিনি একটি মাত্র জাতির জন্য আল্লাহর রহমতের নিদর্শন বহন করেন।[১৩] তাই তাদের কথা ঐ জাতিকে অতিক্রম করে না যে জাতির প্রতি তারা প্রেরিত হয়েছেন।[১৪] কিন্তু আল্লাহর রাসুল যখন আগমন করবেন তখন তাকে আল্লাহ তাআলা সমাপ্তির নিদর্শন দান করবেন।[১৫] অতঃপর তিনি তার শিক্ষাকে ধারণকারী সকল জাতির জন্য রহমত ও মুক্তির দায়িত্ব বহন করবেন।[১৬] তিনি জালিমের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবেন।[১৭] মূর্তিপূজার বিনাশ ঘটাবেন এতে শয়তান লাঞ্ছিত হবে।[১৮] কেননা এভাবেই আল্লাহ ইবরাহিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : দেখ, আমি তোমার বংশে জগতের জাতিসমূহকে বরকতময় করবো। যেভাবে তুমি মূর্তির সংহার করেছিলে সেভাবে তোমার বংশধরও করবে।[১৯] যাকোব জবাব দিলেন : হে গুরু! আমাদেরকে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির রক্ষাকবচ জানিয়ে দিন।[২০] কেননা ইহুদিরা বলে তিনি ইসহাককুলের।[২১] ইসমাইলিরা বলে তিনি ইসমাইলকুলের।[২২] যিশু বললেন, দাউদ কার সন্তান ও কার বংশধর?[২৩] যাকোব জবাব দিলেন : ইসহাকের কুলের। কেননা ইসহাক যাকোবের পিতা আর যাকোব যিহুদার পিতা যার বংশ থেকে দাউদ জন্ম নিয়েছেন।[২৪] তখন যিশু বললেন, আল্লাহর রাসুল যখন আসবেন তখন কার বংশে আসবেন?[২৫] শিষ্যগণ জবাব দিলেন : দাউদের বংশে।[২৬] তখন যিশু প্রতিউত্তর করে বললেন, নিজেদেরকে প্রবঞ্চিত করো না।[২৭] কেননা দাউদ রুহজগতে তাকে মনিব বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন, আমার ডানে বস যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুকে তোমার পদতলে এনে দেই।[২৮] প্রভু তার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করবেন যা তার শত্রুরে মাঝে কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।[২৯] যদি পরিত্রাণদাতা দাউদ সন্তান হন তবে দাউদ কীভাবে তাকে মনিব বললেন?[৩০] আমার কথা তোমরা সত্যায়ন কর কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য বলি। প্রতিশ্রুতি ইসমাইলকুলে পূর্ণ হবে। ইসহাককুলে নয়।[৩১]'

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'শিষ্যগণ তখন বললেন, হে গুরু! এভাবেই মুসার কিতাবে লিখা রয়েছে প্রতিশ্রুতি ইসহাককুলেই পূর্ণ হবে।[১] তখন যিশু আফসোসের সুরে বললেন, এভাবেই লিখিত আছে।[২] কিন্তু এটা মুসাও লিখেননি। যিশুও লিখেননি।[৩] বরং আমাদের পণ্ডিতগণ লিখেছেন যার আল্লাহকে ভয় করেন না।[৪] সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি : যদি তোমরা

ফিরিশতা জিবরাইলের কথার দিকে নজর দাও তাহলে আমাদের লেখক ও ফকিহগণের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।[৫] কেননা ফিরিশতা বলেছিলেন : হে ইবরাহিম পুরো জগৎ জানতে পারবে আল্লাহ তোমাকে কিরূপ মহব্বত করেন।[৬] কিন্তু আল্লাহর প্রতি তোমার মহব্বতের কথা জগৎ কীভাবে জানবে?[৭] বাস্তবিকই তোমার জন্য উচিত আল্লাহর মহব্বতে কিছু করা।[৮] তখন ইবরাহিম প্রতিউত্তরে বললেন, এই তো গোলাম প্রস্তুত আল্লাহর ইচ্ছের প্রতিপালন করতে।[৯] আল্লাহ তখন ইবরাহিমের সাথে কথা বললেন, তোমার প্রথমজাত সন্তান ইসমাইলকে নাও। এবং তাকে উৎসর্গ করার নিমিত্ত পর্বতে আরোহণ কর।[১০] ইসহাক কীভাবে প্রথমজাত সন্তান হবেন! তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ইসমাইলের বয়স সাত বছর।[১১] তখন শিষ্যগণ বললেন, ফকিহগণের প্রতারণার বিষয়টি স্পষ্ট।[১২] তাই আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি বলুন কেননা আমরা জানি আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।[১৩] অতঃপর যিশু তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি : শয়তান সর্বদা আল্লাহর বিধানকে অকার্যকর করতে চায়[১৪] তাই অপবিত্র সে, তার অনুসারীগণ, কপটিরা এবং আজকের যারা মন্দ কর্মে লিপ্ত।[১৫] প্রথমোক্ত শ্রেণি মিথ্যা শিক্ষাও কারণে আর শেষোক্তগণ অনৈতিক জীবনযাপনের কারণে।[১৬] তাই তারা সত্যকে নিকটবর্তী পায় না।[১৭] ধ্বংস হোক কপটিরা, এই জগতের প্রশংসা তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও জাহান্নামের শাস্তিতে পরিণত হবে।[১৮] তাই আমি তোমাদেরকে বলছি : নিশ্চয় আল্লাহর রাসুল উজ্জ্বল জ্যোতি যা শীঘ্রই আল্লাহর কর্মে চমকিত হবে।[১৯] কেননা, তিনি বোধ, পরামর্শ, দূরদৃষ্টি ও ইনসাফের দ্বারা শোভিত।[২০] তিনি প্রজ্ঞা ও শক্তির আত্মা।[২১] তিনি ভীতি ও ভালোবাসার চেতনা।[২২] দূরদৃষ্টি ও ইনসাফের প্রেরণা।[২৩] তিনি ভালোবাসা ও রহমত দ্বারা শোভিত।[২৪] আদল ও তাকওয়ার আত্মা।[২৫] কোমলতা ও সবরের প্রেরণা যে সবর আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের তিন গুণ তিনি ধারণ করেছেন।[২৬] কতই না সৌভাগ্যবান সে যুগ যে যুগে তিনি ধরাধামে আগমন করবেন![২৭] তোমরা আমাকে সত্যায়ন কর, নিশ্চই আমি তাকে দেখেছি এবং তার তরে সম্মান প্রদর্শন করেছি যেভাবে সকল নবিই তাকে দেখেছেন।[২৮] কেননা আল্লাহ তাদেরকে তার নবুওয়তের চেতনা দান করেছেন।[২৯] আমি যখন তাকে দেখলাম তখন নিজেকে প্রবোধ দিয়ে আমি তাকে বললাম : হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমি যাতে আপনার জুতার ফিতা খোলার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।[৩০] কেননা আমি যদি এই সুযোগ পেয়ে যাই তাহলে আমি মহান ও পুন্যশীল নবি হতে পারবো।[৩১] যিশু যখন এটা বললেন আল্লাহ তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিলেন।[৩২,]

চুয়ান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

(কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটিতব্য বিষয়াবলির বর্ণনার পর) অতঃপর যখন এই নিদর্শনসমূহ অতিবাহিত হবে তখন সমগ্র পৃথিবী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তখন কেউই জীবিত থাকবে না এক আল্লাহ্ ব্যতীত যার সম্মান ও মর্যাদা স্থায়ী।[১] এরপর চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তার রাসুলকে জীবিত করবেন যিনি সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হবেন। তবে তার জ্যোতি হবে হাজার সূর্যের সমান।[২] অতঃপর তিনি বসবেন, কিন্তু কথা বলবেন না, কেননা অচিরেই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায্য হয়ে পড়বেন।[৩] শীঘ্রই আল্লাহ নৈকট্যপ্রাপ্ত চার ফিরিশতাকে উঠাবেন যারা আল্লাহ্র রাসুলের তালাশ করবে।[৪] এরপর তারা তাকে পেয়ে তার চতুর্পার্শ্বে পাহারাদার হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।[৫] এরপর আল্লাহ্ সমস্ত ফিরিশতাকে জীবিত করবেন যারা দ্রুত মৌমাছির ন্যায় আগমন করবেন এবং আল্লাহ্র রাসুলকে বেষ্টন করে নেবেন।[৬] অতঃপর আল্লাহ্ সমস্ত নবিকে জীবিত করবেন। তারা আদমের পিছু পিছু আগমন করবেন।[৭] তারা এসে আল্লাহ্র রাসুলের হাত চুম্বন করবেন এবং তার সুরক্ষার জন্য নিজেদের সত্তাকে পেশ করবেন।[৮] অতঃপর আল্লাহ্ সকল পরিশুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে জীবিত করবেন যারা সকলে চিৎকার করতে থাকবে : হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে স্মরণে রেখ।[৯] তখন তাদের চিতকারে আল্লাহ্র রাসুলের মনে দয়ার উদ্রেক হবে।[১০]'

পঞ্চান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'আর আল্লাহ্ তার রাসুলের সাথে কথা বলবেন, খোশ আমদেদ! হে আমার আমানতদার বান্দা।'[১৬] আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।[১৭] তখন আল্লাহ্র রাসুল জবাবে বলবেন, হে প্রভু! আমার মনে পড়ে, আপনি আমাকে সৃষ্টি করার সময় বলেছিলেন আমার ভালোবাসায় আপনি বিশ্বজগৎ, জান্নাত, ফিরিশতা, মানুষ সকল কিছু আমার ভালোবাসার নিমিত্ত সৃষ্টি করতে চান যাতে তারা আমার মাধ্যমে আপনার মর্যাদা প্রকাশ করে। আমি আপনারিই বান্দা।[১৮] তাই আমি আপনার কাছে মিনতি করি -হে প্রভু,মাবুদ, দয়াবান, ইনসাফগার বান্দাকে দেওয়া আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন।[১৯] তখন আল্লাহ্ রসিকতা করে বলবেন যেভবে বন্ধু বন্ধুর সাথে রসিকতা করে থাকে : হে প্রিয় মুহাম্মাদ! তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে?[২০] অতঃপর তিনি সম্মানের সাথে বলবেন, হ্যাঁ আমার প্রভু।[২১] তখন আল্লাহ্ বলবেন, যাও হে জিবরাইল, তদের ডেকে নিয়ে আস।[২২] অতঃপর জিবরাইল আল্লাহ্র রাসুলের কাছে এসে বলবেন, জনাব! আপনার সাক্ষীগণ কারা?[২৩] তখন আল্লাহ্র রাসুল বলবেন ; তারা হলেন আদম, ইবরাহিম, ইসমাইল, মুসা, দাউদ ও যিশু বিন মারইয়াম।[২৪] অতঃপর ফিরিশতা প্রস্থান করবেন এবং উল্লিখিত সাক্ষীগণকে ডেকে আনবেন। তারা ভীত অবস্থায় সেখানে

উপস্থিত হবেন।[২৫] তারা উপস্থিত হলে আল্লাহ বলবেন, আমারা রাসুল যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন তা কি তোমাদের স্মরণ আছে?[২৬] তারা বলবেন, কোনো বিষয় হে প্রভু!?[২৭] তখন আল্লাহ বলবেন, আমি সবকিছু তার ভালবাসায় সৃষ্টি করেছি সৃষ্টিজগৎ তার মাধ্যমে আমার প্রশংসা করার জন্য?[২৮] তখন সকলে উত্তর দেবেন : আমাদের জানামতে আমাদের চেয়ে উত্তম তিনজন সাক্ষী আছে।[২৯] আল্লাহ বলবেন, এই তিনজন কারা?[৩০] তখন মুসা বলবেন, প্রথম সাক্ষী ওই কিতাব যা আপনি আমাকে দিয়েছেন। দাউদ বলবেন, দ্বিতীয় সাক্ষী ঐ কিতাব যা আপনি আমাকে দিয়েছেন।[৩১] আর তোমাদের সাথে এই মুহূর্তে যিনি কথা বলছেন তিনি বলবেন, হে প্রভু! শয়তান সমগ্র জগৎকে প্রতারিত করেছে। সে বলেছে : আমি আপনার পুত্র এবং শরিক।[৩২] কিন্তু যে কিতাব আপনি আমাকে দিয়েছেন তা সত্য বলেছে। নিশ্চই আমি আপনার বান্দা।[৩৩] ওই কিতাব সেটাই স্বীকার করে যা আপনার রাসুল সাব্যস্ত করছেন।[৩৪] তখন আল্লাহর রাসুল কথা বলবেন, হে প্রভু! আমাকে যে কিতাব দান করেছেন তাও এমন কথাই বলছে।[৩৫],

ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর পুরোহিত উচ্চ আওয়াজে বললো : যিশু! দাঁড়াও। জাতির প্রশান্তির জন্য তোমার পরিচয় জানা আবশ্যক।[১] জবাবে যিশু ইবনে মারইয়াম বললেন, মৃত দাউদের বংশ থেকে আমি। আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং চাই সম্মান ও মহিমা শুধু আল্লাহকেই প্রদান করা হোক।[২] পুরোহিত জবাবে বললেন, মুসার কিতাবে লিখিত আছে। আমাদের মাবুদ অচিরেই আমাদের জন্য পরিত্রাণদাতা প্রেরণ করবেন, যিনি অচিরেই এসে আল্লাহর অভিপ্রায় আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন এবং তিনি অচিরেই আল্লাহর রহমত হয়ে সমগ্র জগতের জন্য আগমন করবেন।[৩] তাই তোমার কাছে কামনা করি তুমি আমাদেরকে সত্য বল, তুমিই আল্লাহর প্রেরিত পরিত্রাণদাতা কিনা যার প্রতীক্ষা আমরা করছি?[৪] যিশু জবাবে বললেন, সত্যই আল্লাহ এমন প্রশ্রিুতিই দিয়েছেন। কিন্তু আমি সেই ব্যক্তি নই। কেননা তিনি আমার পূর্বে সৃষ্টি হয়েছেন এবং আমার পরে আসবেন।[৫] পুরোহিত জবাব দিলেন : তোমার কথা এবং তোমার নিদর্শন দেখে আমরা বিশ্বাস করি যে তুম আল্লাহর নবি ও সাধু ব্যক্তি।[৬] তাই সমস্ত ইহুদিদের নাম ও ইসরাইলের নামে তোমার কাছে কামনা কারছি, তুমি আমাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার নিমিত্ত তুমি আমাদেরকে জানিয়ে দাও কিরূপে পরিত্রাণদাতা আগমন করবেন?[৭] যিশু জবাব দিলেন : আল্লাহর শপথ যার সামনে আমার সত্তা উপস্থিত! আমি সেই পরিত্রাণদাতা নই যার জন্য পৃথিবীর সকল জাতিগুলো অপেক্ষা করছে। যেভাবে আল্লাহ আমাদের পিতা ইবরাহিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'তোমার বংশে আমি

পৃথিবীর জাতিগুলোকে বরকতময় করবো।[৮] কিন্তু যখন আল্লাহ্ আমাকে উঠিয়ে নেবেন তখন শয়তান দ্বিতীয়বার অভিশপ্ত ফিতনা উস্কে দিবে যা তাকওয়াহীন মানুষকে এ কথা বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করবে যে, আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহর পুত্র।[৯] যদ্দরুণ আমার কালাম, আমার শিক্ষা বিনষ্ট হয়ে যাবে এমনকি ত্রিশজন বিশ্বাসীও আর অবশিষ্ট থাকবে না।[১০] তখন আল্লাহ্ জগতের উপর রহম করবেন। তার রাসুলকে প্রেরণ করবেন। যার নিমিত্ত তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[১১] তিনি দক্ষিণ দিক থেকে শক্তি নিয়ে আগমন করবেন এবং মূর্তি ও মূর্তিপূজারিদের ধ্বংস করবেন।[১২] মনিুষর উপর থেকে শয়তানের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন।[১৩] অচিরেই আল্লাহর অনুগ্রহে তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ মুক্তি পাবেন।[১৩] এবং অচিরেই তার কথায় বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বরকতময় হবেন।'[১৫,]

সাতানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'তখন যিশু বললেন, নিশ্চই তোমার কালাম আমাকে প্রবোধ দিতে পারছে না। কেননা অচিরেই অন্ধকার আসবে যেখানে তোমরা নুরের আশা করছো।[৪] কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে আল্লাহর রাসুল আসবেন যিনি আমার ব্যাপারে সমস্ত মিথ্যা রায়ের বিলোপ করবেন। শীঘ্রই তার দীন বিস্তৃত হবে। পুরো জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। কেননা এভাবেই আল্লাহ্ আমাদের পিতা ইবরাহিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৫] আম এ কথাতে সান্ত্বনা পাই যে, তার দীন নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তার দীনকে বিশুদ্ধরূপে হেফাজত করবেন।[৬] প্রতিউত্তরে পুরোহিত বললেন, আল্লাহর রাসুল আগমনের পর আরও নবি-রাসুল আসবেন কি?[৭] তখন যিশু বললেন, তার পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো সত্য নবি আসবেন না।[৮] কিন্তু প্রচুর সংখ্যক মিথ্যুক নবির আবির্ভাব ঘটবে। আর এ বিষয়টি আমাকে পেরেশান করছে।[৯] কেননা আল্লাহর ইনসাফের ফয়সালা অনুযায়ী শয়তান আমার ইনজিলের নাম ভাঙিয়ে তাদেরকে প্ররোচনা দেবে।[১০] হেরোড বললেন, এই কাফিররা কীভাবে আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ ফয়সালায় আসবে?[১১] যিশু বললেন, ইনসাফ এটাই, যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না সে মিথ্যার উপর আস্থা রেখে অভিশপ্ত হবে। তাই আমি তোমাদেরকে বলি : জগৎ সর্বদা সত্য নবিগণকে অবজ্ঞা করেছে আর মিথ্যুকদের ভালোবাসা দিয়েছে। যেমনটা দেখা গিয়েছে যিশাইয় ও যিরমিয়ের যুগে। কেননা সাদৃশ্য তার সদৃশকেই পসন্দ করে।[১২] তখন পুরোহিত বললেন, পরিত্রাণদাতার নাম কি হবে? আর কি সেই আলামত যা তার আগমনের বার্তা ঘোষণা করবে?[১৩] জবাবে যিশু বললেন, তার নাম বড়ই চমৎকার। কেননা আল্লাহ নিজেই তার নামকরণ করেছেন যখন তিনি তার আত্মা সৃষ্টি করে আকাশের দীপ্তিতে স্থাপন করেছেন।[১৪] আল্লাহ

বলেছেন : হে মুহাম্মাদ! সবুর করুন। আপনার নিমিত্তই আমি জান্নাত, জগৎ এবং প্রচুর সংখ্যক মাখলুক সৃষ্টি করব যাদেরকে আমি আপনাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করব। যাতে করে যারা আপনার মঙ্গলকামী হবে তারাই বরকতময় হবে। আর যারা আপনাকে অভিসম্পাত করবে তারাই হবে অভিশপ্ত।[১৫] আর যখন আপনাকে আমি জগতের জন্য প্রেরন করবো তখন মুক্তির নিমিত্ত আমার রাসুল হিসেবে প্রেরণ করবো। আপনার কথা হবে সত্য। এমনকি আসমান-জমিন শক্তিহীন হতে পারে তথাপি আপনার ঈমান কখনোই দুর্বল হবে না।[১৬] (যিশু বললেন) নিশ্চয় তার বরকতময় নাম হবে মুহাম্মাদ।[১৭] তখন উপস্থিত জনতা উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল : হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আপনার রাসুলকে প্রেরণ করুন। হে মুহাম্মাদ! জগতের মুক্তির জন্য দ্রুত এসে পড়ুন।[১৮]'

একশত ছত্রিশতম অধ্যায়ে মসিহের ভাষায় বলা হয়েছে :

'আমি তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আল্লাহর রাসুল আল্লাহর ইনসাফ প্রত্যক্ষ করুণার্থে সেখানে (জাহান্নামে) গমন করবেন।[১০] তখন তার আগমনে জাহান্নাম ভয়ে প্রকম্পিত হবে।[১১] তিনি মানবদেহের হওয়ায় প্রত্যেক মানবদেহের উপর থেকে শাস্তি তুলে নেওয়া হবে যাদের শাস্তির ফয়সালা হয়েছিল। ফলে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত আল্লাহর রাসুলের অবস্থানকালীন সময়ে তারা শাস্তি ভোগ করা থেকে মুক্ত থাকবে।[১২] কিন্তু তিনি সেখানে চোখের পলক পড়া পরিমাণ সময় অবস্থান করবেন।[১৩] আল্লাহ এটা এজন্যই করবেন যাতে সমস্ত মাখলুক এ কথা জানতে পারে যে, সে আল্লাহর রাসুলের দ্বারা উপকৃত হয়েছে।[১৪] তিনি সেখানে গমন করলে (ছোট) শয়তানগুলো পালিয়ে যাবে এবং জ্বলন্ত আঙ্গারের পেছনে লুকোতে চেষ্টা করবে। আর বলবে : পালাও! পালাও! আমাদের শত্রু মুহাম্মাদ আসছে।[১৫] এটা শুনে (বড়) শয়তান নিজের দুহাতে চেহারা চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে বলবে : আমার অনিচ্ছাতেই এমন হয়েছে। আর এটা সে অন্যায়ভাবে করেছে।[১৬] আর বিশ্বাসীগণ যাদের জন্য রয়েছে বাহাত্তর স্তর তন্মধ্যে শেষ দুই স্তর ভোগ করবে তারা যাদের ঈমান রয়েছে কিন্তু নেক আমল নেই। প্রথম দল নেক আমল না থাকায় পেরেশান থাকবে। আর দ্বিতীয় দল গোনাহ না থাকায় আনন্দিত হবে। তারা জাহান্নামে সত্তর হাজার বছর স্থায়ী হবে।[১৭] এই বছরগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর ফিরিশতা জিবরাইল জাহান্নামে আসবেন এবং তদের কথা শুনবেন। তারা বলবে : হে মুহাম্মাদ! আপনার দীনের আনুসারীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না মর্মে আমাদেরকে প্রদত্ত আপনার সেই প্রতিশ্রুতি কোথায়?[১৮] অতঃপর আল্লাহর ফিরিশতা জান্নাতে ফিরে আসবেন। আল্লাহর রাসুলের নিকটবর্তী হওয়ার পর আদবের সাথে তিনি যা শুনে এসেছেন তা বর্ণনা করবেন।[১৯] তখন রাসুল

আল্লাহর সাথে কথা বলবেন, হে আমার রব! আমার মাবুদ! এই বান্দাকে প্রদত্ত আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন। (প্রতিশ্রুতি এই ছিল যে) আমার দীনকে গ্রহণকারী কেউই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না।[২০] তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন, হে বন্ধু! আপনি কামনা করুন। আমি আপনার চাহিদা পূরণ করব।[২১]'

একশত বেয়াল্লিশতম অধ্যায়ে পুরোহিতগণ, লেখকবৃন্দ ও ফরিশিদের ভাষায় বলা হয়েছে :

'কিন্তু এই ব্যক্তিটি (মসিহ) রাজা হয়ে গেলে মুসা যেভাবে ইবাদতকে বিধিবদ্ধ করেছেন তার অনুরূপ না হলে সে কখনো সন্তুষ্ট হবে না।[১৬] এর চেয়ে জঘন্য কথা হলো এই লোকটি বলে : পরিত্রাণদাতা দাউদের বংশ থেকে আসবেন না। তিনি আসবেন ইসমাইলের বংশ থেকে। তার একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য আমাদেরকে এটা জানিয়েছে।[১৭] প্রতিশ্রুতি ইসমাইলকুলেই কৃত হয়েছে, ইসহাককুলে নয়।[১৮] এই ব্যক্তিকে যদি আমরা জীবন্ত ছেড়ে দেই তাহলে পরিণতি কী হতে পারে?[১৯] নিশ্চিতভাবে তখন ইসমাইলিরা রোমানদের কাছে প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। রোমানরা আমাদের দেশ তাদের হাতে অর্পণ করবে।[২০] এভাবেই ইসরাইলিরা পূর্বের ন্যায় দাসত্বের শিকারে পরিণত হবে।[২১]'

যারা ঈসাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের থেকে দায়মুক্তি :

বায়ান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'আমি অন্তরে থেকে তোমাদেরকে সত্য বলছি : আমি ভয়ে কাঁপছি। কেননা, জগৎ আমাকে প্রভু হিসেবে সম্বোধন করবে।[১০] যার জন্য আমাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে।[১১] আল্লাহর শপথ যার সামনে আমার সত্তা সমর্পিত! নিশ্চই আমিও অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মরণশীল মানব।[১২] যদিও আল্লাহ আমাকে ইসরাইলকুলে নবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন দুর্বলদেরকে সুস্থ ও পাপীদেরকে সংশোধনের জন্য তথাপি আমি আল্লাহর খাদিম।[১৩] তোমরা এ কথার সাক্ষী থেক; কীভাবে আমি এসব নিকৃষ্টদেরকে ঘৃণা করি যারা জগৎ থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের পর শয়তানের প্ররোচনায় আমার ইনজিলের সত্যতাকে অকার্যকর করবে।[১৪] কিন্তু সমাপ্তির পূর্বক্ষণে আমি পুনরায় আগমন করব।[১৫] আমার সাথে আখনু এবং ইলিয়াও আগমন করবেন।[১৬] আমি সাক্ষ্য দিব ঐসব মন্দচারীদের বিরুদ্ধে যাদের আখিরাত হবে অভিশপ্ত।[১৭] কথাগুলো বলার পর যিশু অশ্রু ঝরাতে লাগলেন।[১৮] তার শিষ্যগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদলেন। তারা জোর আওয়াজে বললেন, হে প্রভু! মাবুদ! আপনার নিরপরাধ খাদেমকে রহম করুন।[১৯] তখন যিশু বললেন, আমিন! আমিন![২০]'

তিরানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'তখন যিশু হাত উঁচিয়ে চুপ হতে ইশারা করলেন[১] এবং বললেন, হে ইসরাইলিরা তোমরা মারাত্মকভাবে পথহারা হয়েছ। কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের উপাস্য হিসেবে ডেকেছ। অথচ আমি একজন মানুষ।[২] তাই আমি ভয় করছি আল্লাহ এই পবিত্র নগরীতে কঠিন মহামারি প্রেরণ করবেন। আর একে ভীনদেশিদের দাসত্বে অর্পণ করবেন।[৩] হাজারো অভিসম্পাত সেই শয়তানের উপর যে তোমাদেরকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে।[৪] এই কথা বলে যিশু দুহাতে চেহারা চাপড়ালেন।[৫] এর পরেই প্রচণ্ড কান্নার সুর উঠল। এমনকি যিশু কী বলছেন তা কেউ আর শুনতে পেল না।[৬] তখন তিনি পুনরায় হাত উঁচিয়ে চুপ হতে ইশারা করলেন।[৭] লোকেদের কান্নার রোল ঠান্ডা হয়ে এলে তিনি পুনরায় কথা বললেন।[৮] আমি আকাশের সামনে এবং সবকিছুর সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা আমার সম্পর্কে যা বলেছ তা থেকে আমি মুক্ত।[৯] কেননা আমি একজন মানুষ। একজন নারী থেকেই আমার জন্ম। আমার উপর আল্লাহর হুকুম বর্তায়। আমি সমস্ত মানুষের মতো খওয়া, ঘুম, ঠান্ডা, গরম প্রভৃতির কষ্ট ভোগ করি।[১০] ... অতঃপর যিশু আদবের সাথে পুরোহিতের নিকটবর্তী হলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি যিশুকে সিজদা করতে চাইল।[১৬] তখন যিশু চিৎকার দিয়ে উঠলেন : সাবধান! কি করছেন হে পুরোহিত! আল্লাহ চিরঞ্জীব। আল্লাহর কাছে ভুল করবেন না।[১৭] জবাবে পুরোহিত বললেন, ইহুদিরা আপনার নিদর্শন ও আপনার শিক্ষার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এমনকি তারা প্রকাশ্যে আপনাকে আল্লাহ হিসেবে অভিহিত করেছে। ফলে এই জাতির কারণে আমি রোমান গভর্নর ও সম্রাট হেরোডের সাথে আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।[১৮] আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছি আপনার কারণে যে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা দূর করতে আপনি সম্মত হোন।[১৯] কেননা একদল বলে : আপনিই আল্লাহ। আরেক দল বলে : আপনি আল্লাহর পুত্র। আবার অন্য দল বলে : আপনি নবি।[২০] জবাবে যিশু বললেন, হে পুরোহিত সর্দার! আপনি কেন এই ফিতনা নিভিয়ে দিচ্ছেন না?[২১] আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন?[২২] হে হতভাগা ইহুদি জাতি যাদেরকে শয়তান পথহারা করেছে! নবুওয়াত ও আল্লাহর শরিয়ত কি বিস্মৃত হয়ে গেছে?[২৩]'

চুরানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'যিশু এটি বলার পর পুনরুক্তি করে বললেন, আমি সকল জমিনবাসীকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি মানব সত্তার ঊর্ধ্বে মর্মে লোকেরা যা বলে থাকে তা থেকে আমি মুক্ত।[১] কেননা আমি একজন মানুষ। এজন নারী থেকে আমার জন্ম। আমার উপর আল্লাহর হুকুম বর্তায়। সমস্ত মানুষের মতই আমি জীবনযাপন করি। দুর্ভোগে সাঁতার কাটি।[২] যেই আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত তার শপথ করে বলছি, হে পুরোহিত! আপনার এই

কথা বলে আপনি মহা ভুল করেছেন।[৩] আল্লাহ এই পবিত্র নগরীর প্রতি করুণা করুন। এই ভুলের কারণে যাতে বিরাট শাস্তি চলে না আসে।[৪] তখন পুরোহিত বললেন, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আপনিও আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।[৫] অতঃপর গভর্নর ও হেরোড বললেন, জনাব! আপনি যা করেছেন তা একজন মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব। তাই আপনার কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।[৬] জবাবে যিশু বললেন, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আল্লাহ মানুষের কল্যাণ করেন। শয়তান মানুষের অনিষ্ট করে।[৭] কেননা মানুষ হলো দোকানের মতো। স্বেচ্ছায় যে প্রবেশ করে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বেচা-বিক্রিতে লেগে যায়।[৮] তথাপি আমাকে বলুন হে গভর্নর এবং হে সম্রাট! আপনারা এ কথা বলছেন কেননা আপনারা আমাদের শরিয়তের ব্যাপারে জানেন না। যদি আপনারা নিয়ম অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন মুসা তার ছড়ি দিয়ে সাগরকে রক্ত, ধুলোকে মাছি, শিশিরকে ঘূর্ণিঝড় এবং আলোকে অন্ধকারে পরিণত করেছেন।[৯] তিনি মিসরে ব্যাঙ ও ফড়িং পাঠিয়েছেন। সেগুলো জমিনকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি প্রথমজাত সন্তানকে হত্যা করেছেন। সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছেন। ফিরআউনকে তাতে ডুবিয়ে মেরেছেন।[১০] আর আমি এর কিছুই করিনি।[১১] প্রত্যেকেই স্বীকার করে মুসা এখন একজন মৃত মানুষ।[১২] যিশাইয় সূর্যকে স্থির করেছেন। জর্ডান নদী ভেদ করেছেন। এই দুটি কাজের একটিও আমি এখন পর্যন্ত করিনি।[১৩] প্রত্যেকেই স্বীকার করে যিশাইয় এখন একজন মৃত মানুষ।[১৪] ইলিয়া আকাশ থেকে সবার সামনে আগুন নামিয়েছেন, বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়েছেন। অথচ এগুলোর একটিও আমি করিনি।[১৫] প্রত্যেকেই স্বীকার করে ইলিয়া একজন মানুষ।[১৬] এমন আরও অনেক নবি, পুণ্যবান ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন রয়েছেন যারা আল্লাহর নির্দেশে এমন সব কাজ করেছেন ওইসমস্ত লোকদের বিবেক যার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম নয় যারা অনন্তকালব্যাপি বরকতময়, দয়ালু, পরাক্রমশালি প্রভু সম্পর্কে অবগত নয়।[১৭]'

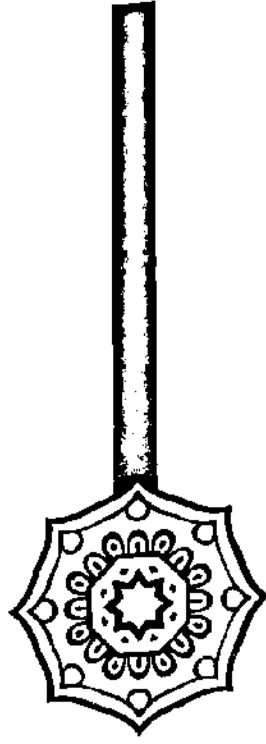
বিশ্বাসঘাতক যিহুদাকেই যিশুর পরিবর্তে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে :

একশত বারোতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,'জেনে রাখ হে বরনাবা! এ কারণেই আমার সতর্ক থাকা চাই। আমারই একজন শিষ্য ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দেবে।[১৩] আমি নিশ্চিত যে আমকে বিক্রয় করবে তাকে আমার নামেই হত্যা করা হবে।[১৪] কেননা আল্লাহ আমাকে জমিন থেকে উঠিয়ে নেবেন। বিশ্বাসঘাতকের আকৃতি পরিবর্তন করে দেবেন। এমনকি সবাই তাকেই মনে করবে আমি।[১৫] এতদসত্ত্বেও সে নিকৃষ্টভাবে মরার পর এই কলঙ্ক নিয়ে আমি দীর্ঘদিন জগতে থাকবো।[১৬] কিন্তু যখন পুতপবিত্র আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ আসবেন আমার উপর থেকে এই কলঙ্ক দূর হবে।[১৭] অচিরেই আল্লাহ এটা করবেন কেননা আমি সেই ত্রাণকর্তা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি যিনি

আমাকে এই উপহার দেবেন অর্থাৎ আমি জীবিত, আমি সেই মৃত্যুর কলঙ্ক থেকে মুক্ত।[১৮]'

একশত উনচল্লিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'আর যিশু পেলেন যে লিখছে (অর্থাৎ, বরনাবা নিজে), যাকোব ও যোহনকে।[১] তারা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন : হে গুরু! কেন আপনি আমাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?[২] আমরা আপনাকে হন্যে হয়ে তালাশ করেছি। বরং শিষ্যগণ সকলেই আপনাকে তালাশ করেছে আর কেঁদেছে।[৩] তখন যিশু জবাবে বললেন, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, শয়তানের একটি দল আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে যা তোমরা একটু পরেই দেখতে পাবে।[৪] অচিরেই প্রধান পুরোহিতগণ, জাতির বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ আমার বিরুদ্ধে খাড়া হবে। তারা রোমান শাসকের কাছে আমাকে হত্যা করার দাবি জানাবে।[৫] কেননা তারা ভয় করে আমি ইসরাইলের রাজত্ব ছিনিয়ে নিব।[৬] এ ছাড়াও আমার এক শিষ্য আমাকে বেঁচে দিবে এবং (শত্রুর হাতে) সমর্পণ করবে যেভাবে মিসরে ইউসুফকে বেঁচে দেওয়া হয়েছিল।[৭] কিন্তু ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তাকে আটকে দেবেন। যেভাবে দাউদ নবি বলেছিলেন : ভাইয়ের জন্য গর্ত খননকারি নিজেই সেই গর্তে পতিত হয়।[৮] কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবেন এবং জগৎ থেকে নিয়ে যাবেন।[৯] তখন তিন শিষ্য ভয় পেলেন।[১০] কিন্তু যিশু তাদেরকে এই বলে প্রবোধ দিলেন : তোমাদের কেউ আমাকে সমর্পণ করবে না। এতে তারা কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন।[১১]'





খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ

ইতিপূর্বেই আমরা যুগে যুগে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাসের পর্যালোচনা করেছি। এতে করে আমরা জানতে পেরেছি যে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মৌলিক দুটি যুগ অতিক্রান্ত করেছে।

১. প্রথম যুগ : ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পর থেকে নিকিয়ার সমাবেশ পর্যন্ত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।

২. দ্বিতীয় যুগ : নিকিয়ার সমাবেশ পরবর্তী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।

উভয় যুগেই আমরা দেখতে পাই যে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ লালন করে।

ক. প্রথম মতাদর্শ : শিরক, বিদআত ও বিভিন্ন কুসংস্কার।

খ. দ্বিতীয় মতাদর্শ : তাওহিদ ও একেশ্বরবাদ (Monotheism)।

তাওহিদের মতাদর্শ লালনকারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ

১. মার্কিয়নী বা মার্সিয়নী সম্প্রদায় (Marcionism) :

এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের একজন যাজকের নামে, যাকে মার্কিয়ন বা মার্সিয়ন (Marcion) নামে অভিহিত করা হত। দ্বৈতবাদ (Dualism) তথা দুই ইশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাকে গির্জা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

তার মতবাদ অনুসারে দুই ঈশ্বর হলেন :

ক. প্রথম ঈশ্বর : ন্যায়বিচারক যিনি মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত নাজিল করেছেন। আর তাঁর অনুসারীদের উৎকৃষ্ট দল বানিয়েছেন।

খ. দ্বিতীয় ঈশ্বর : যিনি ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে আগমন করে মানব জাতিকে সকল ভুল-ভ্রান্তি থেকে দায়মুক্তি দিয়েছেন।

শরিয়া আইনে এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো, সকল অনুসারীর বিয়ে কঠোর নিষিদ্ধ করা।

২. বারবারানী সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায় ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার মাতাকে ঈশ্বর হিসেবে আখ্যায়িত করে। সম্ভবত পবিত্র কুরআনের এই বাণী তাদের দিকে ইঙ্গিত দেয়,

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ .

যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১১৬]

এই বারবারানী সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে যায়। তবে বিলুপ্তির পাশাপাশি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপর নিকৃষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৩. ইলিয়ান সম্প্রদায়

তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর বলে এবং বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর সন্তান। তাঁর প্রকৃতি, মায়ের উদর থেকে প্রসব হওয়া ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এসব ব্যাপারে

তারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি কল্পনা করে বলে যে, তাঁর হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধকরণের বিষয়টি শুধু কল্পনা ও ধারণায়ই ছিল, বাস্তবতা সম্পূর্ণই এর বিপরীত।

৪. ত্রিত্ববাদী সম্প্রদায় (Trinitarian)

এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জা (Church of Alexandria)। তাদের মতাদর্শ অনুসারে ঈশ্বরের তিন রূপ। পিতারূপী ঈশ্বর, পুত্ররূপী ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বর। ত্রিত্ববাদী সম্প্রদায়-ই পরবর্তীতে নিকিয়ার সমাবেশ পরবর্তী সমস্ত খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের জন্যে আনুষ্ঠানিক খ্রিষ্টীয় দল হিসেবে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মতাদর্শ : তাওহিদ ও একেশ্বরবাদ (Monotheism)

ঈসা আলাইহিস সালামের তিরোধানের পর নিকিয়ার সমাবেশ পর্যন্ত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলোতে তাওহিদ ও একেশ্বরবাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সেন্ট পল (Paul the Apostle) খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ে প্রবেশের পর তাওহিদ ও একেশ্বরবাদ নিষ্প্রভ হয়ে আবেদন হারাতে থাকে। অবশেষে নিকিয়ার সমাবেশের পর শিরক, বিদআত ও বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাসীরা তাওহিদে বিশ্বাসী ও একেশ্বরবাদীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

দ্বীনের হেফাজতের নিমিত্ত জুলুম, নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করা তাওহিদে বিশ্বাসী খ্রিষ্টান উপদলগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইবিয়ন সম্প্রদায় (Ebionites)

এরা সাধু ইবিয়নের অনুসারী। এই উপদলটি মুসার শরিয়তের সকল বিধানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ঈসা আলাইহিস সালামকে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত প্রতীক্ষিত মসিহ বিবেচনা করে। মসিহের প্রভুত্বকে তারা অস্বীকার করে। তাকে একজন মানুষ এবং রাসুল হিসেবেই বিবেচনা করে। এই উপদলটির বিশেষ সুসমাচার রয়েছে যার নাম ইবিয়নিদের সুসমাচার। খ্রিষ্টানদের নিকট এটি অগ্রহণযোগ্য ও নিষিদ্ধ সুসমাচারের অন্তর্ভুক্ত। নিকিয়ার মহাসভার সিদ্ধান্তের পর শাসকগোষ্ঠীর চাপে চতুর্থ শতাব্দীর পর এই উপদলটি হারিয়ে যায়।

২. শিমশাতি সম্প্রদায়

২৬০ খ্রিষ্টাব্দে এন্তাকিয়ার বিশিষ্ট সাধু পোল শিমশাতির দিকে এই উপদলটির সম্বন্ধ করা হয়। তিনি মসিহের প্রভুত্বকে অস্বীকার করতেন এবং তাকে একজন মানুষ ও রাসুল হিসেবেই বিবেচনা করতেন। ইবনে হাযম এই সাধু ব্যক্তিটিকে মহান বলে অভিহিত করেছেন। তার মাযহাবকে এভাবে সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি বলতেন : নিশ্চয় ঈসা অন্যান্য নবিগণের ন্যায় আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল। তিনি বলতেন : আমি জানি না কালিমা কী? কিংবা রুহুল কুদসই বা কে?[৫৭৬]

৩. আরিসি সম্প্রদায়

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া চার্চের সাধু আরিয়ুসের দিকে এই উপদলকে সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি মসিহের প্রভুত্ব ও ঈশ্বরপুত্র হওয়ার বিষয়ে আলেকজান্দ্রিয়া চার্চের বিরোধিতা করেন।

খ্রিষ্টানদের প্রসিদ্ধ উপদলসমূহ

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের চেয়ে খ্রিষ্টধর্মে বিভিন্ন দল-উপদলের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। যদি বলা হয় শুধু আমেরিকাতেই খ্রিষ্টানদের আড়াইশ উপদল রয়েছে তাহলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি আফ্রিকায় খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন উপদল নিয়ে অনুসন্ধান চালান। রিপোর্টে তিনি বলেন, এই উপদলগুলোর সংখ্যা মোট এক হাজার চারশত। এতগুলো উপদল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। তাই আমরা খ্রিষ্টধর্মের প্রধান তিনটি উপদল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি। তা ছাড়া অন্যান্য উপদলগুলোর উৎপত্তি অনেকটা এই উপদলগুলো থেকেই।

এক, ক্যাথলিক সম্প্রদায়

এটি গ্রিক Katholikos শব্দ থেকে উদগত। এর অর্থ হচ্ছে ব্যাপক বা বৈশ্বিক। অর্থাৎ, ক্যাথলিক হলো খ্রিষ্টানদের বৈশ্বিক মতবাদ। এই উপদলটিকে পাশ্চাত্যের সাধারণ খ্রিষ্টানদের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তাই এদের চার্চকে ওয়েস্টার্ন চার্চ, ল্যাটিন চার্চ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও এটাকে শীর্ষ হাওয়ারী পিতরের দিকে সম্বন্ধ করে সেন্ট পিটার্স চার্চও বলা হয়। এই উপদলটির সদস্যরা নিজেদেরকে পিতরের

---

[৫৭৬] *আল-ফসলু ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়াই ওয়ান-নিহাল।*

উত্তরাধিকারী মনে করে। তারা পোপবাদের অনুসরণ করে থাকে।[৫৭৭] তাদের মতে বিধানদাতা হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামের পর পোপের অবস্থান। রোমের পোপগণ তার প্রতিনিধি। ক্যাথলিকদের মতে পোপ নিষ্পাপ। তার কোনো গোনাহ হয় না। তার ইচ্ছা ঐশ্বরিক। তার নির্দেশ ঐশ্বরিক নির্দেশের মতো। কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই অনুসারীদের জন্য এগুলো মেনে নেওয়া আবশ্যক। পোপ শব্দটি ল্যাটিন Pope থেকে নির্গত। গ্রিক ভাষায় এটাকে বলা হয় Patriarch। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি* এর লেখক বলেন, '৪২৫খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান বিশ্বে পোপের সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। তন্মধ্যে চার জন পাশ্চাত্যে তথা কুসতুনতিনিয়াহ (প্রাচীন কনস্টান্টিনোপল, বর্তমান ইস্তাম্বুল), জেরুযালেম, এন্টিয়ক ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর পঞ্চম জন হলেন রোমে। বিভিন্ন কারণে ওয়েস্টার্ন চার্চগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় রোমান চার্চের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে রোমের পোপ সমগ্র বিশ্বে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন। পিতরের সমাধির প্রতিবেশিত্বকে প্রমাণ বানিয়ে রোমান চার্চ এই কর্তৃত্ব অর্জন করে। পোপ নিজেকে পৃথিবীর বুকে মসিহের প্রধান শিষ্য বিবেচনা করে থাকেন। যেন মসিহ ঊর্ধ্বারোহণের পর আকিদা ও শরিয়তের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পোপকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসমতে পোপ নিষ্পাপ। কোনো ভুল তার দ্বারা সংঘটিত হয় না।[৫৭৮]

বর্তমানে ভ্যাটিকান চার্চের প্রধানই সমগ্র বিশ্বের ক্যাথলিক চার্চের প্রধান। তার নির্দেশের বিরোধিতা করা কিংবা আপত্তি করা যায় না। ফ্রান্সিস স্যামুয়েল বলেন, 'মসিহ বিধান প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন ও বিচারিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তার এই ক্ষমতা পরবর্তীতে শিষ্যগণের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তাদের প্রতিনিধিদের হাতে। একইভাবে এই ক্ষমতা পোপদের হাতেও কেন্দ্রীভূত হয়।[৫৭৯]

সেন্ট খুরশিদ আলম তার *তারিখু কানিসাতি রোমা* নামক গ্রন্থে বলেন, 'শরিয়তের বিধানকে রহিত করার ক্ষমতা পোপের রয়েছে। তিনি চাইলে পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মের সকল বিধানকে অকার্যকর করে দিতে পারেন। ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্ডিনাল যাবেলা পোপকে প্রভুর উপর স্থান দিয়েছেন।[৫৮০]

---

[৫৭৭] খ্রিষ্টান যাজকদের উপাধিগুলো নিম্নরূপ: (১) শাম্মাস (উপ-পুরোহিত-Deacon) (২) কাসিস (সেন্ট বা পুরোহিত) (৩) আসকাফ (বিশপ) (৪) মিতরান (আর্চবিশপ) (৫) বিতরিক (গির্জাপ্রধান) (৬) পোপ। খ্রিষ্টান ধর্মে পোপই হচ্ছেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

[৫৭৮] *আল-আদইয়ান ফি কিফফাতিল মিযান*, পৃষ্ঠা : ৪৪।

[৫৭৯] *Christ is king*, page no : ৯।

[৫৮০] *তারিখু কানিসাতি রোমা*, পৃষ্ঠা: ৬৬।

হিন্দুস্থানে খ্রিষ্টানদের মিশনারি কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পোপ হলেন স্বর্গ-মর্ত সর্বস্তরের মানুষের বাদশাহ।'[৫৮১]

পদাধিকারের সুযোগে ধর্মীয় নেতা ও পোপগণের মাঝে মদপান, ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি অপরাধ ছড়িয়ে পড়ে।

জেড মানফুলুতি বলেন, 'সেসময়কার অধিকাংশ ধর্মীয় নেতা মাদকাসক্ত ছিলেন। ব্যভিচারসহ নানা অপরাধে তারা লিপ্ত থাকতেন। আরাম-আয়েশ ও স্ফূর্তিতে তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। তারা পার্থিব ভোগবিলাসের পেছনে ছুটতেন। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন।'

তিনি আরও বলেন, 'সে যুগে চার্চের জীবনাচারে পরিণত হওয়া এই মন্দকর্মগুলো থেকে পোপ নিজেও বাঁচতে পারতেন না। ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়ে প্রায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে পোপতন্ত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল।'

এরপর তিনি বলেন, 'বেশ কবছর এই পদটি অখ্যাত কিছু নারীদের হাতে চলে গিয়েছিল। এই নারীরা তাদের পছন্দের পুরুষকে এই পদে আসীন করাত।[৫৮২]

সাধু বরকতুল্লাহ তিন জন পোপের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা ব্যভিচারী ছিল। এমনকি চার্চের বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য তারা আত্মসাৎ করত। তিনি আরও বলেন, 'এদেরকে অধ্যয়ন করলে আমি অবাক হই। এরা ছিল মাদকাসক্ত। ঘুষ গ্রহণ করত। ব্যভিচারে লিপ্ত হতো।'

তাতারদের মাঝে যারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করত তাদের কয়েক জন করে স্ত্রী থাকত। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান স্বীয় পিতার স্ত্রীদের মালিকানা লাভ করত।[৫৮৩]

উইল ডুরান্ট বলেন, '৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ড্যান মাযুনি পোপের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার প্রাসাদটি চোর, ডাকাত. বিদ্রোহী, অশ্লীলতা ও অপকর্মের আখড়াতে পরিণত হয়।[৫৮৪]

খ্রিষ্টান পোপদের অপকর্ম ও ধর্মীয় পদের অপব্যবহারের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।[৫৮৫] সুতরাং বিষয়টি আমরা এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায়।

---

[৫৮১] পৃষ্ঠা : ৩১, ১৯৫৬খ্রি.।

[৫৮২] *তারিখুল মাসিহিয়্যাহ ফিল উসুরিল উসতা,* পৃষ্ঠা : ৪০-৪১।

[৫৮৩] *তারিখু কানাইসি আসিয়া ওয়াল হিন্দ ফিল কুরুনিল উসতা,* পৃষ্ঠা : ৪১৬-৪১৯।

[৫৮৪] *Age of Fifth,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩৮, নিয়ইয়র্ক, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

পোপের দায়িত্ব হলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়াতি মিশনে লোক পাঠানো। ফলে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় চার্চ অব ইংল্যান্ডও পোপের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। পাশ্চাত্যে ক্যাথলিকগণ ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আমেরিকায় কেন্দ্র স্থাপন করে। এ সময় ক্যাথলিক চার্চের অনুসারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়শ মিলিয়ন বা ষাট কোটি প্রায়। পোপের নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দুই হাজার বছর পর ইহুদিদেরকে মসিহের রক্তের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া।

পোপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অপরাধের ক্ষমাপত্র (Indulgence) প্রকাশ। অতীত পাপের ক্ষমাপত্র এবং ভবিষ্যৎ পাপের ক্ষমাপত্র। মুক্তির জন্য এই ক্ষমাপত্রই যথেষ্ট। তওবা অথবা মজলুমকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো কার্য সাধনের জন্য তহবিল গঠনের প্রয়োজন দেখা দিলে তখন পোপ কিছু ক্ষমাপত্র ছাপান। এরপর শেয়ার বাজারের শেয়ারের মতো এই ক্ষমাপত্রগুলো বাজারে বিক্রি হয়। এ ধরনের ক্ষমাপত্র প্রদান মূলত যেকোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সাধারণ অনুমতি দেওয়ার নামান্তর। কেননা, এগুলোর ক্রেতা স্বর্গের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত। Books Thiological Dictionary এর লেখক এই ক্ষমাপত্র সম্পর্কে দুর্লভ কিছু তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষেরা এই ক্ষমাপত্র বিক্রির জন্য প্রতিযোগিতা দিয়ে এজেন্সি খুলত। সেখানে লেখা থাকত, 'হে লোকসকল! ক্ষমাপত্র ক্রয়ের জন্য এসো। স্বর্গের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। এখন প্রবেশ না করলে কখন প্রবেশ করবে? মাত্র বার পেনির বিনিময়ে তোমার পিতাকে স্বর্গে প্রবেশ করাতে পার। তুমি কি এতই কৃপণ?'

এরা আবার প্রত্যেকটি অপরাধের আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করেছিল। যেমন, মিথ্যা সাক্ষ্যের মার্জনার জন্য নয় পাউন্ড। চুরির জন্য বার পাউন্ড। কুমারি মেয়ের সাথে ব্যভিচারের জন্য নয় পাউন্ড। কুমারি ব্যতীত অন্য নারীদের সাথে ব্যভিচারের জন্য সাত পাউন্ড। সেন্ট হান্না মাকার আল-ইসসাবি *মাকানাতুল মিতরান ইনদাল মসিহিয়্যাহ* বা খ্রিষ্টানদের মাঝে বিশপের মর্যাদা' শিরোনামে আবু উবাইদা আল-খাযরাজি (মৃত : ৫৮২) এর কাছে লিখিত পত্রে বলেন, 'ইশ্বর বিশপগণের হাতে এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন যা অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। ইশ্বর আসমানে যা করেন বিশপ দুনিয়াতে ঠিক তাই করেন। আমরা অপরাধ করলে বিশপগণই তাওবা কবুল করে পাপ মার্জনা করেন। জীবিত-মৃত সকলের কল্যাণ তাদের হাতেই নিহিত।[৫৮৬]

---

[৫৮৫] নিজেদের পদ রক্ষার জন্য তারা INQESITION নামক একটি পোপ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। এই আদালতে থেকে তারা ১০৬৫৯ জন বিরোধী জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার রায় প্রদান করে এবং ২৯১৪৫০ জনকে কারাগারে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের রায় প্রদান করে। এসব কিছু ঘটেছিল ১৪২১-১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে।

[৫৮৬] *বাইনাল ইসলামি ওয়াল মাসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা: ৯১।

এ পর্যায়ে আমরা পাঠক সমীপে ক্ষমাপত্রের বিবরণটি তুলে ধরছি।

'আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট তোমাকে দয়া করুন হে ....(এখানে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম বসবে)। তিনি তার পবিত্র সত্তার দুঃখভোগের অধিকারবলে তোমায় অনুমোদন দিন। আমি আমার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তোমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করছি সকল প্রকার দণ্ড, শরিয়তের বিধিবিধান প্রতিপালন এবং চার্চ কর্তৃক আরোপিত বিষয় থেকে। আরও নিষ্কৃতি দিচ্ছি সকল বাড়াবাড়ি, ভুলভ্রান্তি, পাপাচার থেকে যা তুমি ঘটিয়েছ। এগুলো যতই বড় হোক না কেন। এবং নিষ্কৃতি দিচ্ছি সকল ত্রুটি থেকে যদি সেটা পুণ্যাত্মা পোপের জন্য সংরক্ষিত থাকে। আমি মুছে দিচ্ছি সকল পাপের পঙ্কিলতা ও নিন্দার চিহ্নসমূহ যেগুলো তুমি এই সুযোগে অর্জন করে নিয়েছ। তুলে নিচ্ছি সকল দণ্ড যাকে তোমাকে সত্যিই মাথা পেতে নিতে হতো।...পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।'

এই দলের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস

১। এরা বিশ্বাস করে পবিত্র আত্মার উদ্ভব হলো পিতা-পুত্রের সমষ্টি থেকে।

২। এই দলের অনুসারীরা মনে করে পিতা এবং পুত্র উভয়ে সমমর্যাদার।

৩। এরা মসিহের দ্বৈত প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে। একটি ঐশ্বরিক। অপরটি মানবীয়।

৪। এদের বিশ্বাস পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি ছোট্ট জাহান্নাম আছে। যারা জীবদ্দশায় পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদের আত্মাকে সেখানে পোড়ানো হয়। আত্মা পুড়ে পবিত্র হয়ে আকাশের ফিরদাউসের বাসিন্দা হওয়ার উপযুক্ততা লাভ করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি সুসমাচার নয়। বরং এই আকিদার প্রবক্তা হলেন পোপ গ্রেগরিদ্য গ্রেট। ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই আকিদার প্রচার করেন।

৫। চার্চে পাদরিদের প্রার্থনা ক্লিষ্ট আত্মার আজাব দূর করে। এখান থেকেই মূলত ক্ষমাপ্রদান আকিদার উদ্ভব ঘটে। আকিদাটি হলো চার্চের প্রতিনিধিগণ ধ্বংসে নিমজ্জিত আত্মার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে শাস্তি বন্ধ করতে সক্ষম।

৬। পাপ স্বীকারের পদ্ধতি হলো মানুষ পাদরির কাছে গিয়ে নিজের অপরাধের কথা খুলে বলবে। এরপর কৃত অপরাধের ওপর নিজের লজ্জাবোধ এবং ভবিষ্যতে সেই অপরাধ না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করবে। এরপর পাদরি তার সেই বক্তব্যকে গ্রহণ করবেন এবং তার জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করবেন। তার নামে একটি ক্ষমাপত্রও প্রদান করবেন। এই আকিদাটি প্রথমদিকে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছিল না। ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ মহাসভায় এটি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে এ স্বীকৃতিও দেওয়া হয় যে প্যাপাল চার্চ (Papal Charch) ক্ষমা করার অধিকার রাখে এমনকি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারে।

৭। ঈশ্বরভোজ (Eucharist) : ঈশ্বরভোজ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসা আলাহিস সালাম কর্তৃক শিষ্যগণের সাথে ভোজসভা। তারা বিশ্বাস করে যে প্রার্থনাকারীগণ যে রুটি ও শরাব প্রস্তুত করে থাকেন তা মসিহের দেহ এবং রক্তে রূপান্তরিত হয়।

মথির সুসমাচারের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'পরে তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পাতিত হয়।'[৫৮৭]

১৫৪৫ এবং ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত টরেন্টো এর মহাসভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই প্রার্থনা পদ্ধতিকে তথা ঈশ্বরভোজকে আবশ্যক করা হয়। রবিবারে সকলে জড়ো হয়ে পাদরির বক্তব্য শোনেন। এরপর প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নজরানা পেশ করেন। অতঃপর সিজদা সম্পন্ন করে সবাই রুটি-শরাব গ্রহণ করে। তাদের ধারণা এই ঐশ্বরিক ভোজে স্বয়ং মসিহ্ বিরাজমান থাকেন। ভোজসভায় উপস্থিত সকলের অর্ধদিন উপবাস করা আবশ্যক। তবে এই উপবাসকালীন সময়ে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও পানীয় গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আর মুসাফিরদের জন্য এই উপবাস পালন না করার অনুমতি রয়েছে।

৮। ক্যাথলিক চার্চ তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। সমস্যা যত প্রকটই হোক না কেন বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়। এমনকি পরকিয়ার মতো সংকটের ক্ষেত্রেও তালাক বা বিচ্ছেদের কোনো সুযোগ নেই।

৯। ব্যাপ্তাইজম (Paptism) : এটি মূলত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গোসল করানোকে বুঝায়। খ্রিষ্টানদের প্রায় সকল দলই এর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একমত। তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর নবি ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম যিরিহোর (জেরিকো) দক্ষিণে জর্ডান উপত্যকায় ব্যাপ্তাইজম করাতেন। যেমন মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে, 'তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।'[৫৮৮]

ব্যাপ্তাইজমের ব্যাখ্যা হলো পাপীগণের দেহকে গোসলের মাধ্যমে তাওবার দিকে ধাবিত করা। তাদের বিশ্বাসমতে যোহন (ইয়াহইয়া) মসিহকেও ব্যাপ্তাইজম করিয়েছেন।

[৫৮৭] *মথি*, অধ্যায় : ২৬, অনুচ্ছেদ : ২৬-২৮।

[৫৮৮] *মার্ক*, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৪

এজন্যই তাকে যোহন ব্যাপ্তাইজক বলা হয়।[৫৮৯] যিশুর ব্যাপ্তাইজমের পর সম্রাট হেরোড তাকে হত্যা করেন।

মসিহ আলাইহিস সালামের সমকালীন ইহুদি ঐতিহাসিক যোসেফাইন বলেন, 'যোহন ছিলেন বিশাল হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী একজন ব্যক্তি। তিনি ইহুদি জাতিকে পূর্ণতা অর্জনে উৎসাহিত করেছেন। তাদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দিয়েছেন। ভ্রাতাদের সাথে লেনদেনে, আল্লাহর সাথে এবং ব্যাপ্তাইজমের ক্ষেত্রেও।

তখন প্রত্যেক উঁচুনিচু ভূমি থেকে লোকজন তার দিকে ছুটে গেল। এতে করে হেরোড যোহনের কারণে বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল সৃষ্টির ভয় করলেন। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি যোহনকে বন্দি করে ম্যাকারিয়ুস দুর্গে প্রেরণ করেন। সেখানেই তার মস্তকচ্ছেদ করা হয়।[৫৯০]

ব্যাপ্তাইজমের পদ্ধতি হলো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে চার্চের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই কক্ষে পশ্চিম দিকে মুখ করে হাত উপরে তুলে তাকে বলতে হয়, 'হে শয়তান! আমি তোমার থেকে এবং তোমার সকল কর্ম থেকে মুক্ত। অতঃপর পূর্ব দিকে মুখ করে খ্রিষ্টধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসে ইমানের ঘোষণা দিতে হয়। এরপর তাকে অপর একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কক্ষে সে তার পরিধেয় সকল বস্ত্র ত্যাগ করে। অহপর পাদরি তার শরিরে ঝাড়ফুঁক করে তেল মালিশ করেন। এরপর তাকে নির্দিষ্ট হাউজে (Pigmanation bath) ডুব দেওয়ানো হয়। এ সময়ে পাদরি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি পিতা, পুত্র ও পাবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছ?' তখন সে হ্যাঁ-বোধক জবাব দেয়। এরপর পুনরায় তার শরিরে তৈল মর্দন করা হয় এবং সাদা পোষাক পরিধান করানো হয়। সাদা হলো সকল পাপ থেকে পবিত্রতার প্রতিক। এরপর সে ঈশ্বরভোজে অংশ নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠে। তাকে খ্রিষ্টধর্মের একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের কাতারে গণ্য করা হয়।

কিতাবুল উসুল ওয়াল ফুরু এর লেখক ব্যাপ্তাইজম সম্পর্কে বলেন, 'এটি একটি পবিত্র বিধান। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নাম নিয়ে পানি দিয়ে গোসল করা যিশুখ্রিষ্টের রক্ত দিয়ে আত্মাকে পাপ থেকে পবিত্র করার ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাপ্তাইজম হলো এককভাবে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ওপর ঈমান ও আনুগত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা।[৫৯১]

---

[৫৮৯] পাঠক, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কায়রোর দারুশ শাআব থেকে প্রকাশিত আব্দুর রাযযাক নওফেল কর্তৃক রচিত *ইউহান্না আল-মুআম্মিদান* গ্রন্থটি।

[৫৯০] *লামহাতুন মিনাত তারিখ ফিল ইনজিল*, পৃষ্ঠা : ৫৪-৫৫।

[৫৯১] *ইয়াসসু আল-মসিহ*, পৃষ্ঠা : ২১০, ডক্টর শালবি রচিত *আল-মাসিহিয়্যাহ* গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

তবে লক্ষনীয় বিষয় হলো সুসমাচারগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালাম কাউকে ব্যাপ্তাইজম করাননি।[৫৯২]

দুই, অর্থোডক্স সম্প্রদায় (Orthodox)

এটি একটি যৌগিক শব্দ। গ্রিক Ortho এবং Doxa যোগে এটি গঠিত হয়েছে। Ortho এর অর্থ হলো হক বা সত্য। আর Doxa অর্থ হলো মতবাদ। সুতরাং অর্থোডক্স অর্থ সঠিক মতবাদ। এ সম্প্রদায়ের চার্চগুলোকে ইস্টার্ন চার্চ বা গ্রিক চার্চ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেননা, এ মতবাদের অনুসারীরা অধিকাংশই পূর্বাঞ্চলীয়। ১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো বিষয়ে মতবিরোধের জের ধরে এরা ক্যাথলিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই চার্চটি ইকলিরুস পদ্ধতি (The System of Clergy) অনুসরণ করে থাকে। এদের ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ শক্তি ব্যক্তি হলেন বিশপ এবং সর্বশেষ হলেন ডিকন।

সম্প্রদায়টির অনুসারীরা প্রাচ্য, গ্রিক, তুরস্ক এবং রাশিয়ায় বসবাস করেন। বর্তমানে তাদের চার জন বিশপ রয়েছেন। একজন কস্টান্টিনোপোলে। ইনি হলেন প্রধান বিশপ। দ্বিতীয়জন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তৃতীয়জন এন্টিয়কে। চতুর্থজন জেরুজালেমে।

অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের কিছু মূলনীতি

১. এই সম্প্রদায়ের মতে পবিত্র আত্মা শুধু পিতা থেকেই আবির্ভূত।

২. অর্থোডক্স চার্চ পরকীয়াসংক্রান্ত বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়। পাশাপাশি বিচ্ছেদের পর তাদের পুনরায় বিবাহের সুযোগ থাকে না।

৩. কিছু কিছু অর্থোডক্স চার্চের মসিহের একক সত্তার আকিদা পোষণ করে। আর সেই একক সত্তা হলো ঐশ্বরিক সত্তা। পক্ষান্তরে অন্যান্য অর্থোডক্স চার্চের দাবি হলো মসিহের দ্বৈত সত্তা। একটি হলো ঐশ্বরিক, কারণ তিনি ঈশ্বরপুত্র। অপরটি হলো মানবীয় সত্তা, কারণ তিনি মানবসন্তান। তার মধ্যে ঈশ্বর এবং মানবের সমন্বয় ঘটেছে। ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে এই মতটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়।

তিন, বিরুদ্ধবাদী প্রোটেস্টান্ট

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে নিয়ে খ্রিষ্টধর্ম রোমান চার্চের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তির নিমিত্ত একটি ব্যাপক সংস্কারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তার কারণ ছিল—পোপের স্বেচ্ছাচারিতা খ্রিষ্টধর্মকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অন্তসারশূন্য কিছু রীতিনীতিতে পরিণত

[৫৯২] *যোহন*, অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ২।

করেছিল। তাই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। ফলে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোতে বেশ কিছু দলের উদ্ভব হয় যাদের প্রত্যেকে ছিল রোমান চার্চ থেকে মুক্তির চেতনায় উদগ্রীব।

এই দলগুলোর প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন ইতালিতে আলকানার, ট্যাটশেলোম এবং এডান। শেষোক্তজন মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈসা বলে দাবি করেন। ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বন্দি রাখা হয়। আরেকজন নেতা ছিলেন ব্যারোড্রিস যাকে ১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের তুলুস শহরে (Toulouse) জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। একইভাবে ইংল্যান্ডে ইয়ান ভিকব ও ইয়ান হোস নামক রোমান চার্চের দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে খ্রিষ্টান সংস্কারবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত দেশগুলোর প্রচুর মানুষ এই মতের অনুগামী হয়। এমন সময় জার্মানিতে মার্টিন লুথারের উত্থান ঘটে।

লুথার ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তিনি চাইতেন তার সন্তান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। লুথারের সামনে একজন আইন বিশারদ হওয়ার সুযোগ আসে। এতদুদ্দেশ্যে পিতা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু লুথার এই অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন না। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ছিল তার প্রচণ্ড ঝোঁক। এরপর তার মধ্যে ধার্মিকতা প্রবলভাবে চেপে বসে। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু হয়ে ওঠেন। মন্দকর্মের প্রতি ছিলেন কঠোর। চার্চের দায়িত্বশীলগণ তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান। একপর্যায়ে তিনি দর্শনের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।

ধর্মীয় প্রবণতা থেকে তিনি রোমে তীর্থযাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের আশির্বাদ লাভ করা। কিন্তু রোমে পা দিয়েই তিনি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। তার আশা ছিল সেখানে তিনি ইবাদাত, তপস্যা ও চারিত্রিক পবিত্রতা দেখতে পাবেন। কিন্তু তিনি দেখলেন পবিত্র রোম নগরী খেল-তামাশায় ডুবে আছে। নগরীর অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে মত্ত। তারা মনে করে, আসমান-জমিনের চাবিকাঠি তাদের হাতেই। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো তারা মানুষকে ক্ষমা করার অধিকার রাখে। এসব দেখে মার্টিন লুথার মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। এরপর তিনি চার্চের যাবতীয় কীর্তিকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন। তিনি পোপের নিষ্পাপ হওয়া এবং ক্ষমাপত্র প্রণয়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'একজন মাখলুক যতই পুন্যশীল হোক না কেন তিনি কাউকে ক্ষমা করার অধিকার রাখেন না। এবং তার কোনো কৃত পাপও তিনি গোপন করতে সক্ষম নন।'

মার্টিন লুথারের এই আহ্বানে আপামর জনতা প্রভাবিত হয়। কেননা, তিনি এমন সব যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হতেন যা তার যুগের আর কোনো পণ্ডিতই উপস্থাপন করতে পারতেন না।

পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর চেয়ে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিগতভাবে প্রচণ্ড কঠিন এই আন্দোলনের সামনে চার্চ হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। নিষ্পাপ পবিত্র পোপের বিরুদ্ধাচরণ করায় চার্চ লুথারকে বিচারের উদ্দেশ্যে তলব করে। কিন্তু তিনি পোপের আহ্বানে সাড়া দেননি। বিচারের কাঠগড়ায়ও উপস্থিত হননি। কোনো কোনো শাসক তাকে সমর্থন যোগাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পোপ তাকে সমস্ত ধর্মীয় পদ থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দেন। একইভাবে সম্রাটও তাকে সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফরমান জারি করেন। পোপের এমন হস্তক্ষেপে লুথার প্রচণ্ড ক্ষোভে জ্বলে উঠেন। গির্জার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এখান থেকেই এই দলটিকে প্রোটেস্টান্ট বা বিরুদ্ধবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। লুথারের মৃত্যুর পর তার আন্দোলন আরও বিকশিত হয় এবং ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পোপ নিজের ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারে আশঙ্কা করতে থাকেন। ফলে সে সন্ধির জন্য এই দলের লোকদের আহ্বান জানায়। লুথারের মৃত্যর পর এই ঘটনা ঘটে। এরপরই প্রোটেস্টান্ট চার্চ নামে নতুন চার্চের গোড়াপত্তন ঘটে।

প্রোটেস্টান্টদের মূলনীতিসমূহ

১। প্রোটেস্টান্ট চার্চগুলো অপর চার্চের ওপর হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার রাখে না। প্রতিটি চার্চই পরিচালনা, কার্যক্রম, কেন্দ্রীয় চার্চের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীন।

২। কিতাবুল মুকাদ্দাস তথা বাইবেলই খ্রিষ্টধর্মের একমাত্র উৎস।

৩। প্রতিটি খ্রিষ্টানের জন্য কিতাবুল মুকাদ্দাস অধ্যয়ন করা এবং এর অর্থ বোঝার অধিকার রয়েছে। তবে এর আগে তাকে মৌলিক কিছু নিয়ম-কানুন আত্মস্থ করতে হবে। প্রত্যেক জার্মান নাগরিকের কিতাবুল মুকাদ্দাস পড়ার সুবিধার্থে এটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

৪। চার্চ কর্তৃক কারোর পাপ মার্জনা করার অধিকার নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তার এখতিয়ারভুক্ত।

৫। ঈশ্বরভোজে অংশগ্রহণকারীদের দেহে স্বয়ং মসিহ প্রবেশ করার বিষয়টি তারা অস্বীকার করেন। একইভাবে রুটি মসিহের হাড়ে পরিণত হওয়া এবং শরাব তার রক্তে



পরিণত হওয়ার বিষয়টি প্রোটেস্টান্টরা অস্বীকার করে থাকে। তারা ঈশ্বরভোজকে সৃষ্টিজগতের জন্য মসিহের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি বিবেচনা করে।

৬। অন্যান্য চার্চগুলো মসিহের মাতা মারইয়ামকে কেন্দ্র করে যেসব রসম-রেওয়াজ, প্রার্থনা ও পার্বন পালন করে প্রোটেস্টান্ট চার্চ এর সবকটিকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এগুলোকে বিদআত বিবেচনা করে।

৭। এরা চার্চে মূর্তি-ভাস্কর্য রাখে না। কেননা, এগুলো পৌত্তলিকতার বাহ্যিক রূপ। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, এই ধারণাটি খ্রিষ্টান সংস্কারকগণ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছেন।

৮। দুর্বোধ্য ভাষায় প্রার্থনা সম্পাদন না করা। খ্রিষ্টানদের অভ্যাস ছিল প্রার্থনা এমন ভাষায় সম্পাদন করা যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। যেমন ল্যাটিন ভাষা, কিবতি ভাষা প্রভৃতি। কিন্তু লুথার ও তার অনুসারীগণ প্রার্থনাকে বোধগম্য ভাষায় নিয়ে আসেন। কেননা প্রার্থনা বান্দার পক্ষ থেকে মাবুদের প্রতি কায়মনোবাক্যে করা হয়। সুতরাং এটি বান্দার বোধগম্য ভাষাতেই হওয়া উচিত।

৯। মহাসভাসমূহের কতেক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া আর কতেককে প্রত্যাখ্যান করা। সংস্কারকবৃন্দের সামনে বিবেকের দাবি ছিল, মহাসভাগুলোর সিদ্ধান্তগুলো এবং এগুলোর ধর্মীয় মূল্যকে নতুনভাবে বিবেচনা করে দেখা। পাশাপাশি এগুলোকে কিতাবুল মুকাদ্দাসের মানদণ্ডে যাচাই করা। অতঃপর কিতাবুল মুকাদ্দাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানগুলোকে গ্রহণ করা আর সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো ছুড়ে ফেলা। কিন্তু তারা মহাসভাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ এবং তাদের উপর ধার্যকৃত চিন্তা-ফিকিরগুলোর ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডের প্রয়োগ করেনি। কেননা এতে করে তাদের নিকিয়ার মহাসভার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ভয় ছিল। নিকিয়ার এই মহাসভাতেই মসিহ এবং পবিত্র আত্মার প্রভুত্বের বিষয়টি স্বীকৃত হয়।

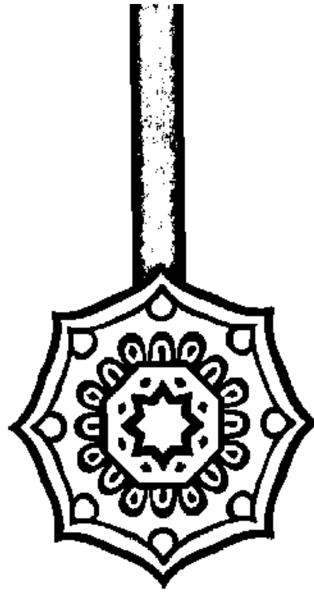
১০। ত্রিত্ববাদ, মসিহের প্রভুত্ব, ঈশ্বরপুত্র হওয়া, ক্রুশবিদ্ধকরণ, পুনরুত্থান এবং আদম কর্তৃক সম্পাদিত আদিপাপের প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি আকিদার ক্ষেত্রে এই দলটি অন্যান্য উপদল থেকে ব্যতিক্রম নয়।

বিবেকের দাবি ছিল প্রোটেস্টান্ট নেতৃবর্গকর্তৃক এই প্রধান বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করা। কেননা, এগুলো কিতাবুল মুকাদ্দাস থেকে গৃহীত কোনো বিষয় নয়। এগুলোর উৎস হলো খ্রিষ্টান দাবিদার ইহুদি পোল। নিজেকে খ্রিষ্টান দাবি করে তিনি খ্রিষ্টীয় শিক্ষা-দীক্ষাকেই বিকৃত করে ফেলেছেন। সেখানে প্রবেশ করিয়েছেন ফরীশীদের রসম-

রেওয়াজ, পুরাতন নিয়মের শিক্ষা, তালমুদের অসার বিধান, জেনোর দর্শন প্রভৃতি। এ সবকিছুই পোল মসিহের নাম ভাঙিয়ে করেছেন। খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এমনকি এই প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ও এই শিক্ষার সামনে অসহায় ছিলেন। অথচ খ্রিষ্টবাদের প্রথমদিকের বিশ্বাসীগণ যেমন পিতর, আরিয়ুস থেকে নিয়ে রায়নান, টলস্টয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রোটেস্টান্টরা ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশ তথা ইংল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে তারা দক্ষিণ সুদান, চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে ক্যাথলিকদের নানা প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতেও তাদের মিশনারি কার্যক্রম পুরোদমে চলছে।





ত্রিত্ববাদ ও তার অসারতা

ত্রিত্ববাদের আকিদা (TRINITARIAN, DOCTRINE)

৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়ার মহাসভার পরই ত্রিত্ববাদের আকিদা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মাঝে স্থির হয়ে যায়। এর পূর্বে এই আকিদাতে খ্রিষ্টানদের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। তাদের অনেকেই তাওহিদে বিশ্বাসী ছিল। তারা তাওহিদের দিকে দাওয়াত দিত। মসিহের প্রভুত্ব এবং ত্রিত্ববাদের আকিদাকে অস্বীকার করত। পোল এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামত। তাদের অভিযোগ ছিল পোল তলোয়ার ও ক্ষমতার বলে খ্রিষ্টধর্মকে দমাতে না পেরে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে খ্রিষ্টান ধর্মে ফেসাদ লাগিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ছুতোয় সে এটিকে তাওহিদ থেকে পৌত্তলিকতার দিকে নিয়ে গেছে।

পোলের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইহুদিবাদ, পৌত্তলিকতা, দর্শন প্রভৃতি নানান কিসিমের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া মসিহ আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে হাজার বছর ধরে শাম ও মিশরের পথ ধরে আর্যদের হিজরতেরও সুস্পষ্ট প্রভাব এতদঞ্চলে বিরাজমান ছিল। আর্যদের ধর্ম শেষের দিকে ত্রিত্ববাদে গিয়ে স্থির হয়। তাদের এই ত্রিত্ববাদের প্রকৃতি হলো; প্রভু অস্তিত্বের পূর্বেও ছিলেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিজগৎকে নিজের পরিচয় দিতে চাইলেন। এরপর তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন

এবং নিজের নাম রাখলেন ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর জগতের দেখভাল ও হেফাজতের নিমিত্ত তার থেকে দ্বিতীয় প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। এই স্তরে তিনি নিজের নাম রাখেন বিষ্ণু। জগৎ যেহেতু সৃষ্টিকর্তার ন্যায় স্থায়ী নয় এবং এর ফলস্বরূপ সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বের পরিণতিই হলো ধ্বংস ও সমাপ্তি তাই তার থেকে তৃতীয় প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। এই স্তরে তিনি নিজের নাম রাখেন শিব। বাস্তবে তিনি একক প্রভু। তার সত্তাগত গুণ তিনটি। এর প্রত্যেকটি আবার আলাদা সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। সন্দেহ নেই যে, ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই আদিম ব্যাখ্যায় প্রভাবিত ছিল।

পোল যখন ভেতর থেকে খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন তখন এই বক্তব্যের কাছাকাছি একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন। এই বক্তব্যকে তৎকালে মানুষের সর্বশেষ চিন্তাধারা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পোল খ্রিষ্টবাদকে তাওহিদ থেকে বের করে আনার জন্য সেখানে পৌত্তলিক হিন্দুত্ববাদ প্রবেশ করান। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, খ্রিষ্টবাদ ব্যাবিলনিয়দের আকিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যারা তিন প্রভুতে বিশ্বাস করতো। এই তিন প্রভু হলেন—

১। আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রের প্রভু।

২। সূর্য ও চন্দ্রের প্রভু।

৩। ইনসাফ ও বিধিবিধানের প্রভু।

হাবিব সাইদ বলেন, এই আকিদাটি প্রাচীনকালে এবং বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে বিরাজমান ছিল। ফিনিশিয়দের প্রতিটি শহর ও প্রতিটি জনপদের আলাদা আলাদা তিন প্রভু ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ জুবাইলে এই ত্রিত্ববাদের সন্ধান পেয়েছেন।

এ পর্যায়ে আমরা পাঠক সমীপে খ্রিষ্টধর্মের পূর্বে বিভিন্ন ধর্মের ত্রিত্ববাদের ধারণা নিয়ে একটি চার্ট উপস্থাপন করছি।

ফিনিশিয়	মিসরিয়	হিন্দু	ব্যাবিলনিয়
ইল (অর্থাৎ ভাগ্য)	ওসিরিস	ব্রহ্মা[৫৯৩] (সৃষ্টিকর্তা)	আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রের দেবতা
শমুয (অর্থাৎ	আইসিস	বিষ্ণু	সূর্য ও চন্দ্রের

[৫৯৩] এটিই শুদ্ধ। কিন্তু হাবিব সাইদ বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন, ১-বুদ্ধ, ২-ব্রহ্মা ও ৩- বিষ্ণু। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হিন্দুদের আলোচনায় আসবে। এখানে হাবিব সাইদ কর্তৃক বুদ্ধ উল্লেখ কারাটা ভুল।

নেতা)		(রিজিকদাতা)	দেবতা
আওলাম (অর্থাৎ অনন্ত)	হোরাস	শিব (ধ্বংসকারী)	ইনসাফ ও বিধি-বিধানের দেবতা

ত্রিত্বের ধারণাটি চীনাদের মধ্যেও রয়েছে। তারা বিষয়টিকে একটি সমবাহু ও সমকোণী ত্রিভূজ দ্বারা প্রকাশ করে।[৫৯৪] সম্ভবত ব্যাবিলনিয়রাই প্রথম ত্রিত্বের প্রবক্তা ছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তাদের মাঝে এই বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে। ব্যাবিলনিয়রা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা এই দেবতাদেরকে তিনটি দলে ভাগ করে। প্রত্যেক দল ক্ষমতা ও অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন। প্রথম দলটি দেবতাদের শীর্ষে। এই দলে রয়েছে আকাশের দেবতা, জমিনের দেবতা ও সমুদ্রের দেবতা। দ্বিতীয় দলে রয়েছে চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতা। তৃতীয় দলে রয়েছে ইনসাফ ও বিধিবিধানের দেবতা।[৫৯৫]

ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্বের প্রফেসর জন হিক (JOHNHICK) তার *ঈসা ওয়াল আদইয়ানুল আলামিয়্যা* গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেহধারণ আকিদায় ঈসা এবং গৌতম বুদ্ধের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "গৌতম বুদ্ধকে বিবেচনা করা হয় তিনি মানব থেকে অনন্ত ঈশ্বরের দেহ ধারণ করেছেন। অথবা তিনি ঈশ্বরপুত্র। *মহাযান* গ্রন্থে মহাত্মন বুদ্ধ সদাসত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যেভাবে খ্রিষ্টধর্মে শাশ্বত পুত্র ঈশ্বরপিতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।"[৫৯৬] এরপর জন হিক বলেন, "কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, খ্রিষ্টধর্মীয় আকিদা যদি পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যে স্থানান্তর না হয়ে পূর্বে হিন্দুস্থানে বদল হতো তাহলে ঈসার ধর্মীয় গুরুত্ব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল। হিন্দু সভ্যতায় তাকে পবিত্র অবতার (AWTAR) হিসেবে গ্রহণ করা হতো।"[৫৯৭]

লেখকের বক্তব্যের সাথে আমরা এ কথা যুক্ত করতে চাই যে, হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে ঈসার (মানবাকৃতিতে ঈশ্বর) ধারণাটি বিদ্যমান আছে। যেমন বিষ্ণুর অবতার বরুণ। ফিরিশতারা তার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আকাশে তার মর্যাদার গীত গাওয়া হয়েছে। অবতার হিন্দুদের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর একটি। তাদের ভাষায় এর অর্থ হলো অবতরণ করা। এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তথা ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু কিংবা শিব মানবাকৃতিতে জমিনে নেমে আসা। এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে লিখিত আমার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করব

---

[৫৯৪] *আদইয়ানুল আলাম*, পৃষ্ঠা : ৩০৪

[৫৯৫] ড. মদকুর, *তারিখুল ফালসাফা*, পৃষ্ঠা : ৬

[৫৯৬] *ঈসা ওয়াল আদইয়ানুল আলামিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১৯

[৫৯৭] শায়খ আব্দুস সামাদ শরফুদ্দিন রচিত *উসতুরাতু তাজাসসুদিল ইলাহ*, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫ থেকে চয়নকৃত।

ইনশাআল্লাহ।[৫৯৮] হিন্দু পণ্ডিত বিহারি লাল বর্মা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, খ্রিষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৫৯৯]

সাধু 'হান্না মাক্কার আলইসসাবি' ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করা আবু উবাইদা আল-খাযরাজিকে লিখিত পত্রে বলেন, "ঈশ্বর স্বয়ং আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। কুমারি মারইয়ামের গর্ভে একীভূত হয়েছেন। আদিতে লিখিত বিধান অনুযায়ী (ঈশ্বরের) নুর তার থেকে পর্দা গ্রহণ করেছেন। কেননা সূচনাতে কালিমাই ছিলেন ঈশ্বর। তিনি দেহের দিক থেকে মাখলুক। সত্তাগতভাবে খালিক। তিনি নিজ দেহ সৃষ্টি করেছেন। নিজ মাতাকেও সৃষ্টি করেছেন। তার মাতা পূর্বে ছিলেন মানব প্রকৃতিতে। তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রকৃতিতে। তিনিই বিরাজমান ঈশ্বর। তিনিই পূর্ণাঙ্গ মানব।"[৬০০] হিন্দুদের অবতার আর এই বক্তব্য ব্যাখ্যাগতভাবে এক ও অভিন্ন।

একইভাবে গবেষকগণ মনে করেন, খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ আধুনিক প্লেটোর চিন্তাধারার ফসল। জগৎ এবং এর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে স্কুল অব আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান প্লেটো (২০৫-২৭০খ্রিষ্টাব্দ) মনে করেন, "ঈশ্বরই হলেন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। কোনো ক্ষণস্থায়ী গুণে তাকে বিশেষায়িত করা যায় না। তিনি মৌল নন এবং অমৌলও নন। তার চিন্তা আমাদের চিন্তার মতো নয়। তার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার মতো নয়। তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে গুণান্বিত। তিনি বস্তুসমূহকে অস্তিত্বের নিয়ামত দিয়েছেন। তিনি কোনো অস্তিত্ব দানকারীর মুখাপেক্ষী নন। এই সৃষ্টিকর্তা থেকে প্রথম যে জিনিসটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো "আকল"। এরপর আকল থেকে ওই রুহের উৎপত্তি যা সকল রুহের একক। এই ত্রয়ী থেকেই সকল বস্তুর প্রকাশ। এবং এই ত্রয়ী থেকেই সবকিছুর জন্ম।" নিকিয়ার মহাসভার অনেক আগে থেকেই এই মতবাদটি প্রসিদ্ধ ছিল। এটিই ছিল স্কুল অব আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক মতবাদ। নিকিয়ার মহাসভায় আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ছিলেন ত্রিত্ববাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিতার্কিক। সুতরাং আমদের এ কথা বলা আশ্চর্যের কিছু নয় যে : খ্রিষ্টানধর্মে ত্রিত্ববাদের আকিদা আধুনিক প্লেটোর দর্শন প্রভাবেই উৎপন্ন হয়েছে।

খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদের প্রভাব ও পৌত্তলিক প্রবণতা যাই হোক না কেন; এ কথা সুনিশ্চিত যে, এটি মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ছিল না। তার আকিদাও ছিল না। এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনুল করিম বলছে—

يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

---

[৫৯৮] এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড।

[৫৯৯] *বিশ্ব ধর্ম দর্শন*, পৃষ্ঠা : ২৫৭।

[৬০০] *বাইনাল ইসলাম ওয়াল মসিহিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৪

এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টো পথে চলে যাচ্ছে? [সুরা তাওবা, আয়াত : ৩০]

কিন্তু এই চিন্তাধারা খ্রিষ্টধর্মে কীভাবে স্থানান্তরিত হলো? এর সহজ জবাব হচ্ছে, পোল খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করে এটি আমদানি করেছেন। তিনি গ্রিক দর্শন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। স্কুল অব আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এই দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী। পোল খ্রিষ্টানদের দুঃখজনক অবস্থা ও পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। তাদের জন্য তিনি সুদূর পরিসরে প্রাচীন পৌত্তলিকতার আদলে নতুন কিছু চিন্তা ও তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। পৌত্তলিকতা থেকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত লোকজন এগুলো গ্রহণ করে নেয়। কোনো কোনো হাওয়ারি পোলের এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন। কিন্তু পোলের ব্যক্তিত্ব ও তার চিন্তাধারার সামনে এই প্রতিরোধ সফলতার মুখ দেখেনি।

লিও গোথিয়ার বলেন, “খ্রিষ্টধর্ম প্রচুর পরিমাণে গ্রিক দর্শনের চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিল। মসিহের ঈশ্বর হওয়ার বিষয়টিও একই উৎস থেকে গৃহীত। আর এই উৎসটি ছিল আধুনিক প্লেটোর দর্শনের আদলে গড়া। তাই আমরা উভয়ের মাঝে অনেক মিল দেখতে পাই।”[৬০১]

মসিহ আলাইহিস সালাম তার জীবদ্দশায় ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দেননি এবং কোনো ইঙ্গিতও করেননি। তিনি বলেননি : ঈশ্বর তিন সত্তার সমষ্টি। তিনি এও বলেননি যে, আমিই ঈশ্বর তোমাদের পাপ মার্জনার জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছি। বরং তিনি আল্লাহর জন্য ইবাদাত করতেন এবং নিজের জন্য ক্ষমা চাইতেন। বিদ্যমান সুসমাচারগুলোর প্রায় ষাটেরও বেশি স্থানে তিনি নিজেকে ইবনে আদম তথা আদম সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী যুগের অনেক খ্রিষ্টান লেখক অনুভব করতে পেরেছেন যে, মসিহের দাওয়াত থেকে ত্রিত্ববাদের কোনো কিছু প্রমাণ করা কঠিন। তাই আমরা তাদের অনেককেই দেখতে পাই এই আকিদা থেকে নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন এবং আকিদাটির সমালোচনা করেছেন।

এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ একজন হলেন বিংশ শতাব্দীর জার্মানপণ্ডিত প্রফেসর হারনিক (HARNIC)। জার্মানিতে খ্রিষ্টানদের মাঝে লেকচারের কারণে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। DAS WESEN DES CHRISTIANITY নামে তার এই লেকচারগুলো সংকলন করা হয় এবং WHAT IS CHRISTIANITY? নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। তিনি তার আলোচনা শুরু করেছেন এবং বারংবার এই কথা উল্লেখ করেছেন

---

[৬০১] ড. আহমদ শালবি কর্তৃক রচিত *আলমসিহিয়্যাহ* গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠা থেকে *আল-মাদখাল লিদিরাসাতিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যাহ* এর পৃষ্ঠা ৯৩ সূত্রে চয়নকৃত।

যে, মসিহ কখনো নিজের উপাসনার জন্য মানুষকে আহ্বান করেননি। বরং তিনি সর্বদা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পিতার দিকে মানুষকে ডেকেছেন। নিজেকে তার নির্দেশের অনুগামী করেছেন। তার নির্দেশ পালন করেছেন। এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নানান দুর্ভোগ ও মুসিবত ভোগ করেছেন। তিনি তাঁর নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও তাকদিরের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। এটাই হলো বাস্তবতা যা আমরা সুসমাচারগুলোতে দেখতে পাই।[৬০২]

তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ত্রিত্ববাদের আকিদাকে অস্বীকার করেছিলেন সিবেলিউস (SIBELIUS)। তার প্রসিদ্ধ উক্তি ছিল : ত্রিত্ববাদ ঈশ্বর সম্পর্কে বাস্তবসম্মত কিছু নয়। এটি একটি বহিরাগত প্রচারণা। তাই এটি ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী কিছু নয়।

এরপর চতুর্থ শতাব্দীতে আরিয়ুসের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রচার করলেন যে, একমাত্র পিতাই অবিনশ্বর। পুত্র এবং পবিত্র আত্মা উভয়ে মাখলুক। তবে অন্যান্য মাখলুকের তুলনায় তারা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এরপর পৌত্তলিক ইথানাসিয়ুস আসলেন। তিনি ত্রিত্ববাদের পক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। তার বক্তব্যকে নিকিয়ার মহাসভায় খ্রিষ্টানরা গ্রহণ করে নেয়।

খ্রিষ্টানদের মতে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা কী?

কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাসের লেখক বলেন : ঈশ্বরের প্রকৃতি হলো সমপর্যায়ের তিন সত্তার সমন্বয়। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। সৃষ্টির বিষয়টি পিতার দিকে সম্বন্ধিত। পুত্রের দিকে সম্বন্ধিত আত্মোৎসর্গ। আর পবিত্র আত্মার দিকে সম্বন্ধিত পবিত্রকরণ। তবে তিন সত্তাই পরস্পর ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ডগুলো ভাগ করে নেন। আমরা পিতা ইশ্বরের বিষয়টি বুঝলাম। কিন্তু পুত্র ইশ্বর ও পবিত্র আত্মা ইশ্বর মানে কী?

খ্রিষ্টানরা বলে—

১. প্রভুর সত্তাই হলো ইশ্বর পিতা। তিনি আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তার মৌলিক গুণাবলি হলো সৃষ্টি, ইনসাফ, উৎসর্গ ও নিষ্কৃতি।

২. যে কালিমা বা বাক্য তিনি মারইয়ামের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করেছেন তা হলো পুত্র। পুত্রের মধ্যেও পিতার ন্যায় প্রভুত্ব বিরাজমান। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম পার্থক্য নেই। কেননা তিনি আকল ও মহব্বতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

---

[৬০২] What is Christianity?, page : 147, New York, 1912

৩. প্রভুর সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইলম ও হায়াতই হলো পবিত্র আত্মা (HOLY SPIRIT)। পবিত্র আত্মার দিকে পবিত্রকরণের কাজ সম্বন্ধিত করা হয়।

এই তিন সত্তা দিয়ে এক ঈশ্বরসত্তার পরিচয় প্রদান করা হয়। একের ভিতর তিন। তিনের ভিতর এক।

১. GOD THE FATHER

২. GOD THE SON

৩. GOD THE HOLY GHOST

এখানে আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হলো, ঈশ্বর এক, বাহ্যিকভাবে তার তিন সত্তা। মথির সুসমাচারে বলা হয়েছে, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।"[৬০৩]

পিতা-পুত্রের মাধ্যমে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পুত্র উৎসর্গকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করেছেন। আর পবিত্র আত্মা অন্তর ও জীবনকে পবিত্র করেছেন। তবে তিনজনই ঐশ্বরিক সকল কাজে সমানভাবে অংশীদার।[৬০৪]

এই হলো ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যায় খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের বোধের দৌড়। বাস্তবতা এটাই যে খ্রিষ্টানদের এই ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে মানুষ অধ্যয়ন করতে শুরু করলেই প্রচণ্ডভাবে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার মতো কোনো কিছুই সে পাবে না। এজন্যই খ্রিষ্টানরা জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির উদ্ভব ঘটিয়েছে যে; 'না বুঝেই আমি বিশ্বাস করি।' আমার জানা নেই যে ধর্ম বোধগম্য নয় তার ফায়দাটাই বা কি?

যাই হোক, বাস্তবতা হলো স্বয়ং খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ নিজেরাই ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা বোধগম্য হওয়ার মতো কোনো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি, সেখানে অন্যদের কথা আর কি বলবো। তাই মসিহের ঊর্ধ্বারহণের পর থেকে আজ অবধি খ্রিষ্টধর্মের ছায়ায় থেকেও একদল গবেষক ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করছেন এবং তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করে আসছেন। যেমন হাওয়ারি বরনাবা, চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসরের আরিয়ুস, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মানির সারভিথিউস, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ইন্তেকাল করা

[৬০৩] *মথি*, অধ্যায় : ২৮, অনুচ্ছেদ : 19।

[৬০৪] *কামুসুল কিতাবিল মুকাদ্দাস*, পৃষ্ঠা : ১০৮। কেউ কেউ পবিত্র আত্মার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : ঈসা আসমানে গমনের পর মুমিনদের সাথে বসবাস করা ও মুমিনদের অন্তরে অবস্থান নেওয়ার জন্য রুহ বা আত্মা প্রেরণ করেন। এই রুহ প্রধান হাওয়ারি পিতর ও মসিহের উর্দ্ধারোহনের পর খ্রিস্টান দাবীদার পোলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তার জ্ঞান ও শিক্ষা এই রুহ থেকেই গৃহীত। এই রুহই হলেন পবিত্র আত্মা।

শিরাবরি। এভাবে হাজারো চিন্তাবিদ ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন এটি বোঝা অসম্ভব। কিন্তু তাদের এই আওয়াজ উলুবনে মুক্তো ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই হলো না। কোনো চার্চই তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেনি। কেননা, চার্চগুলো এই আওয়াজকে ভয় করতো। এতে সাধারণ জনতার দৃষ্টিতে তাদের "পবিত্রতা" ধুলোয় মিশে যাওয়ার ভয় ছিল। এটি গৃহীত হলে তাদের কাছে ক্ষমাপত্র নেওয়ার জন্য আর কেই বা যাবে?

এখানে আমি আপনাদের সামনে একজন পাদরির প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া তিন ব্যক্তির গল্প উপস্থাপন করছি। খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে বিশেষ করে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে এদের জ্ঞান ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। লোকগুলো পাদরির সান্নিধ্যে অবস্থান নিয়েছিল এবং তার প্রয়োজনীয় সেবা করে যাচ্ছিল। একদিন পাদরির এক বন্ধু তাদেরকে দেখতে এলেন। লোকগুলো খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে শুনে বন্ধুটি যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ঈমানের বিশুদ্ধতা যাচাই করে দেখতে মনস্থ করলেন। তাদের একজনকে তিনি ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলো : আমার মনিব আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে, ঈশ্বর তিনজন। একজন আকাশে। দ্বিতীয় জন মারইয়ামের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। আর এই দ্বিতীয় জনের বয়স ত্রিশ পূর্ণ হওয়ার পর তার ওপর কবুতর আকৃতিতে তৃতীয় জন অবতরণ করেছেন। জবাব শুনে পাদরি রেগে গিয়ে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত করলেন। বললেন, এ অজ্ঞ। এরপর দ্বিতীয় জনকে প্রশ্ন করা হলো। সে জবাব দিলো : আমার মনিব আমাকে শিখিয়েছেন যে, ঈশ্বর তিন জন। একজনকে শূলিতে চড়ানো হয়েছে। আর দুজন জীবিত আছেন। পাদরি রাগান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। এবার তৃতীয় জনের পালা আসল। এই ব্যক্তি ছিল বুদ্ধিমান। সে অভিশাপ ও বিতাড়িত হওয়াকে ভয় পেল। তথাপি সে ঈশ্বরের হামদ ও মসিহের প্রশংসা করে জবাব দিলো : আমার মনিব ঈশ্বর মসিহের অনুগ্রহে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ত্রিত্ববাদ মানে হলো তিনের ভেতরে এক, একের ভেতরে তিন। পাদরি খুশি হলেন। তার সফলতাও ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বেচারা জবাবের ধারাবাহিকতায় বলতে লাগল : তাদের একজনকে শূলিতে দেওয়ায় তিনি মারা গেছেন। আর ঈশ্বর তিনজনই যেহেতু এক তাই একজনের মৃত্যুতে সবাই মারা গেলেন। কেননা সকলের মৃত্যু না হলে তাদেরকে একক বলা যায় না। তখন পাদরি তার ওপরেও রেগে যান এবং বিতাড়িত করে দেন।

এই হলো ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা। যখনই আপনি এটাকে বুঝতে চেষ্টা করবেন তখনই আরও বড় সমস্যা সামনে এসে হাজির হবে। এতৎসত্ত্বেও আমি ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের বক্তব্য তুলে ধরছি।

আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ক্যাথলিকদের আকিদা

ক্যাথলিকগণ বলেন : ইশ্বর তিন জন। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। যোহনের সুসমাচারের প্রথম বাক্য "আদিতে বাক্য (কালিমা) ছিলেন" এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন কালিমা এবং তাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন উভয়ে স্বতন্ত্র। পিতা পুত্র নন। পুত্রও পিতা নন। তবে উভয়ে প্রকৃতি, সত্তা, হিকমা ও অস্তিত্বের দিক থেকে এক।

তাদের এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বুঝা যায়, মসিহ ঐশ্বরিক বিবেচনায় পিতার সমপর্যায়ের। আর মানবসত্তার বিবেচনায় পিতার চেয়ে নিচু স্তরের। এটি প্রোটেস্টান্টদেরও মতো। এদের দিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً .

আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭১]

এই তিন সত্তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা তাদের ভ্রান্ত আকিদার পক্ষে এখনো বিভিন্নভাবে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘ বিশ শতাব্দীতেও এই আকিদাটি বিজ্ঞমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। পাঠক এ পর্যায়ে 'ইলিয়াস মাক্কার' নামক একজন সাধুর আরও কিছু হাস্যকর বক্তব্য শুনুন—

১. যে ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেতে চায় তার জন্য সর্বাগ্রে ক্যাথলিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। অর্থাৎ খ্রিষ্ট চার্চের সমন্বিত সাধারণ বিশ্বাসকে।

২. এই বিশ্বাসকে অনিষ্ট থেকে যে হেফাজত করবে না নিশ্চিত সে চিরস্থায়ী ধ্বংস হবে।

৩. ক্যাথলিক বিশ্বাস হলো, আমরা ত্রিত্বের ভেতর এক এবং একত্বের ভেতর ত্রয়ীর উপাসনা করি।

৪. তিন সত্তার মিশ্রণ হয় না।

৫. পিতার আলাদা সত্তা পুত্রের আলাদা সত্তা এবং পবিত্র আত্মারও ভিন্নসত্তা।

৬. কিন্তু পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা একক সত্তা, একই সমান অস্তিত্ব এবং একসাথেই তারা চিরস্থায়ী মহিমার অধিকারী।

৭. পিতা মাখলুক নন। পুত্র মাখলুক নন। পবিত্র আত্মাও মাখলুক নন।

৮. পিতা যেমন পুত্রও তেমন, পবিত্র আত্মাও তেমনই।

৯. পিতা অসীম। পুত্র অসীম। পবিত্র আত্মা অসীম।

১০. পিতা চিরন্তন। পুত্র চিরন্তন। পবিত্র আত্মা চিরন্তন।

১১. কিন্তু এই চিরন্তন একক। আলাদা তিন চিরন্তনতা নয়।

১২. একইভাবে তিন গাইরে মাখলুক নন। একক গাইরে মাখলুক। তিন অসীম নন। একক অসীম।

১৩. পিতা সবকিছুর ধারক। পুত্র সবকিছুর ধারক। পবিত্র আত্মা সবকিছুর ধারক।

১৪. কিন্তু তিন জন ধারক নন। এক জন ধারক।

১৫. একইভাবে পিতা ঈশ্বর। পুত্র ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

১৬. কিন্তু তারা তিন ঈশ্বর নন। তিনে মিলে এক ঈশ্বর।

১৭. এভাবে পিতা পালনকর্তা। পুত্র পালনকর্তা। পবিত্র আত্মা পালনকর্তা।

১৮. কিন্তু তারা তিন পালনকর্তা নন। বরং তিনে মিলে এক পালনকর্তা।

১৯. খ্রিষ্টীয় সত্য আমাদেরকে বাধ্য করে এ কথা স্বীকার করতে যে, এই তিন সত্তার প্রত্যেকেই স্বয়ং ঈশ্বর ও পালনকর্তা।

২০. ক্যাথলিক ধর্ম আমাদেরকে তিন ঈশ্বর ও তিন পালনকর্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস থেকে নিষেধ করে।

২১. পিতা কারও থেকে প্রস্তুতকৃত নন। মাখলুক নন। কারও থেকে জন্মও নেননি।

২২. পুত্র পিতা থেকে। তবে তিনি প্রস্তুতকৃত নন। মাখলুক নন। বরং জন্মগ্রহনকারী।

২৩. পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র থেকে। তবে প্রস্তুতকৃত নন। মাখলুক নন। জন্মগ্রহণকারী নন। তবে উৎপন্ন।

২৪. সুতরাং এক পিতা। তিন পিতা নন। এক পুত্র। তিন পুত্র নন। এক পবিত্র আত্মা। তিন পবিত্র আত্মা নন।

২৫. এই ত্রয়ীর মাঝে কেউ আগেও নন, পরেও নন। কেউ বড়ও নন, ছোটও নন।

২৬. কিন্তু প্রত্যেক সত্তাই সমপর্যায়ের ও একই সাথে চিরন্তন।

২৭. যা বলা হলো তার ভিত্তিতে আমাদের ওপর কর্তব্য ত্রয়ীর মাঝে একত্বের ইবাদত করা। এবং একত্বের মাঝে ত্রয়ীর ইবাদত করা।

২৮. সুতরাং যে মুক্তি পেতে চায় তার কর্তব্য হলো ত্রয়ীর ব্যাপারে এভাবে জোরদার বিশ্বাসী হওয়া।

২৯. একইভাবে মুক্তির জন্য আমানতদারিতার সাথে আমাদের প্রভু যিশুর দেহধারণের আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৩০. কেননা, সংগত বিশ্বাস হলো, আমানতদারিতার সাথে আমাদের এই বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমাদের প্রভু যিশু ঈশ্বরের পুত্র। তিনি ঈশ্বর এবং মানুষ।

৩১. তিনি ঈশ্বর পিতার মৌল থেকে। যুগের পূর্বে তিনি জন্মেছেন। তিনি মানুষ মায়ের মৌল থেকে। এই যুগে তিনি অস্তিত্বশীল।

৩২. তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ। সত্তাগত বাকসম্পন্ন ও মানব দেহধারী।

৩৩. ঐশ্বরিক দিক থেকে পিতার সমান। মানবীয় দিক থেকে পিতার নিচে।

৩৪. তিনি যদিও ঈশ্বর এবং মানুষ তথাপি তিনি একক মসিহ। দ্বৈত নন।

৩৫. কিন্তু এমন একজন যার ঐশ্বরিক সত্তা দেহে রূপান্তরিত নয় বরং মানবীয় সত্তা ঐশ্বরিক সত্তায় গ্রহণ করে।

৩৬. সার্বিকভাবে এক। বিভিন্ন মৌলের সংমিশ্রণে নয়। বরং সত্তাগুলোর একত্বের দ্বারা।

৩৭. যেভাবে বাকসম্পন্ন আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে একজনই মানুষ একইভাবে ঈশ্বর এবং মানব মিলে একজন মসিহ।

৩৮. আমাদের মুক্তির জন্য তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন। জাহিমে[৬০৫] অবতরণ করেছেন। তৃতীয় দিন তিনি মৃতদের থেকে উত্থিত হয়েছেন।

৩৯. তিনি আসমানে উঠে গেছেন। সবকিছুর ধারক পিতার ডানপাশে তিনি উপবিষ্ট হয়েছেন।

৪০. সেখান থেকেই তিনি জীবিত ও মৃতদেরকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আগমন করবেন।

৪১. তার আগমনে সকল মানুষ স্বশরীরে উত্থিত হবে। সবাই নিজের ব্যক্তিগত আমলের হিসাব দেবে।

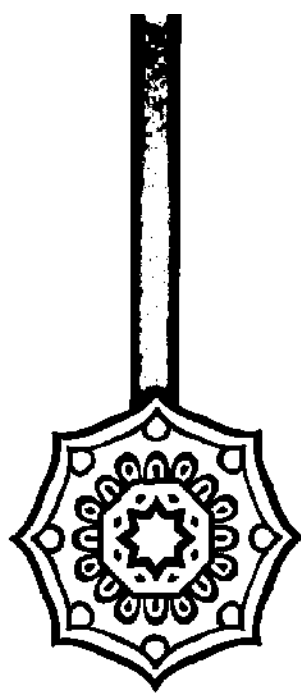
৪২. অতঃপর যারা ভালো কর্ম সম্পাদন করেছেন তারা স্থায়ী জীবনে প্রবেশ করবেন। আর যারা মন্দ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৪৩. এটাই হলো ক্যাথলিক বিশ্বাস। এর ওপর আমানত ও ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাস স্থাপন না করলে কারোরই পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।[৬০৬]



[৬০৫] অর্থাৎ রুহজগৎ অথবা হাবিয়া নামক জাহান্নাম অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত মসিহের মৃত্যুর অধীনে থাকা। এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন "আমার বিশ্বাস" গ্রন্থের লিখক।

[৬০৬] *আকানিমুন নাসারা*, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭২



আল্লাহ সম্পর্কে অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের আকিদা

তারা বলে : তিন সত্তায় ঈশ্বর এক। তাদের এই আকিদার ব্যাখ্যা হলো তিনি (ঈশ্বর) আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। নয়মাস কুমারি মারইয়ামের গর্ভে আত্মগোপন করেছেন। গর্ভে প্রবেশের সময় তিনি বীর্য ছিলেন। এরপর জমাট রক্ত। তারপর মাংসপিণ্ড। অতঃপর পূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হয়েছেন। এরপর শিশুর আকৃতিতে বের হয়েছেন তার নাম হলো ঈসা। অন্যান্য শিশুদের ন্যায় তিনিও বেড়ে উঠেছেন। তার বয়স ত্রিশে পৌঁছার পর তাকে নবুওয়ত ও রিসালাত প্রদান করা হয়। এর দুবছর কয়েক মাস পর ইহুদিরা তাকে হত্যা করে এবং শূলিতে চড়ায়। অতঃপর তাকে কবরে দাফন করা হয়। তিন দিন পর তিনি কবর থেকে উত্থিত হন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত শিষ্যদের সামনে প্রকাশিত হন। এরপর আকাশে চলে যান এবং ঈশ্বরের ডান পাশে উপবিষ্ট হন। দেহধারণের পূর্বে তিনি পিতা আর দেহধারণের পর তিনি পুত্র। তিনিই পবিত্র আত্মা। কেননা তিনি পিতা ও পুত্রের সংযোগ। সুতরাং বলা যায় এদের মতে ঈশ্বর হলেন ঈসা। এবং ঈসাই হলেন ঈশ্বর। তাদের কালিমায়ে শাহাদাত হলো—

أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له واحد أحد في أقانيم ثلاثة : الأب والابن والروح القدس له المجد والكرامة والسلطان إلى أبد الآبدين

.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। তার কোনো শরিক নেই। তিনি একক। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন সত্তার তিনি এক। অনন্ত মর্যাদা, মহত্ত্ব ও ক্ষমতা তার জন্যই নির্ধারিত।

তিমথিয়ের কাছে লিখিত প্রথম চিঠিতে পোল বলেন—

"ঈশ্বর মাংসে প্রকাশিত হইলেন
আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন
দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন
জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন
জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন
সপ্রতাপে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন।"[৬০৭]

অর্থোডক্স পণ্ডিত হাবিব জরজিস বলেন, "আমাদের মহান উৎসর্গকারী তার মর্যাদার আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। বাস্তব দেহধারণের মাধ্যমে তিন মানবের সাথে একীভূত হওয়াকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। পবিত্র আত্মার শক্তি বলে তিনি সতিসাধ্বী কুমারী মারইয়ামের গর্ভস্থ হয়েছেন। আমাদের সবকিছুই তিনি গ্রহণ করেছেন শুধু ভুল ব্যতীত (কেননা তিনি ভুল করেন না)। তিনি পবিত্রদের পবিত্রতম।"

চার্চের পোপগণ ঈশ্বরের মানবের সাথে একীভূত হওয়ার বিষয়টি একটি কাছাকাছি উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণটি হলো : মানুষ দুটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে দেহ। অপরটি হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন আত্মা। দুটি বস্তুর অস্তিত্ব এবং একীভূত হওয়ার পরও উভয়ে মিলে একক প্রকৃতির একজন মাত্র ব্যক্তি হয়। তদ্রূপ এখানেও ঐশ্বরিক সত্তা মানব সত্তার সাথে একীভূত হয়েছে। এটি বিবেকসম্পন্ন আত্মার সাথে নিবিড় একটি অংশ। উভয় সত্তা মিশ্রণ ব্যতীত একীভূত হয়ে মসিহের একক সত্তায় পরিণত হয়েছে, যা একই মৌল, একই প্রকৃতি ও একই ইচ্ছা।[৬০৮]

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসমতে ঈশ্বর মসিহের আকৃতিতে মানবদেহে রূপান্তরিত হয়েছেন। আদম সন্তানের ভুলের প্রায়শ্চিত্যের জন্য তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। মানুষের মাঝে স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। এরপর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। তাকে দাফন করা হয়েছে। এরপর তিনি কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন এবং আকাশে উঠে

[৬০৭] *তিমথিয়,* অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ১৬
[৬০৮] *খুলাসাতুল উসুলিল ইমানিয়্যাহ ফি মুতাকাদাতিল কানিসাতিল কিবতিয়্যাতিল উরছুযকসিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৮।

গেছেন। ঈশ্বর ও মসিহ একই বস্তু। তাদের প্রকৃতিও একই। তাদের ইচ্ছাও এক। খ্রিষ্টানদের এমন আকিদা থেকে আল্লাহ্ পূতঃপবিত্র।

এই মতাবলম্বীদের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا.

নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে, মসিহ্ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল যদি আল্লাহ্ মসীহ্ ইবনে মারইয়াম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে?...[সুরা মায়েদা, আয়াত : ১৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ.

তারা কাফির, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসিহ্-ই আল্লাহ্; অথচ মসিহ্ বলেন, হে বনি ইসরাইল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। ... [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭২]

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার সত্তা সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের এই বানোয়াট মিথ্যা বিষয়গুলোর খণ্ডন নানানভাবে করা যায়। যেমন :

১. এই তিন সত্তা থেকে যদি উদ্দেশ্য হয় এমন তিন অস্তিত্ব, যাদের প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহলে তা বাতিল। কেননা আল্লাহ্ এক। তিনজন নন। একইভাবে এই বিশ্বাস তাদের তাওহিদের দাবির পরিপন্থী।

২. আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তাদের একজন হলেন যাত অন্য দুজন হলেন সিফাত, তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তাহলে অন্যান্য সিফাতগুলোকে কেন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি? কুদরতকে কেন একটি সত্তা বিবেচনা করা হয়নি? ইলমকে কেন একটি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি?

৩. যদি তারা বলে, ঈশ্বর এবং মানব একীভূত হয়ে পিতা-পুত্রে পরিণত হয়েছেন তখন তাদের কাছে আপত্তি হলো, দুটি বস্তু একীভূত হলে হয়তো দুটোই অস্তিত্বশীল হবে অথবা দুটোই অস্তিত্বহীন হবে অথবা একটি অস্তিত্বশীল হবে অপরটি অস্তিত্বহীন হবে। প্রথমটা অর্থ্যাৎ দুটোই অস্তিত্বশীল হওয়া অসম্ভব। কেননা, দুই কখনো এক হয় না। আর দ্বিতীয়টা তো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং এটি বাতিল হওয়ার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আর তৃতীয়টাও বিবেকবহির্ভূত। কেননা, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কখনো একীভূত হতে পারে না।

৪. একীভূত হওয়া থেকে যদি উদ্দেশ্য হয় মিশ্রণ বা সংযোজন তাহলে এটিও অযৌক্তিক। কেননা, মিশ্রণ বা সংযোজন নিবিড় দেহের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাদের মতে তো কালিমা দেহ নয়।

৫. একীভূত হওয়া থেকে যদি উদ্দেশ্য হয় দুটি অংশের সংযোজন -যেভাবে দেহ এবং বোধসম্পন্ন আত্মার সমন্বয়ে মানুষ- তাহলে বলা হবে এ ক্ষেত্রে এক অংশের অপর অংশের প্রতি মুখাপেক্ষীতা তৈরি হয়। আর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে আল্লাহ ঈসার পূর্বে অসীম সময়ে অস্তিত্বে ছিলেন। সুতরাং তার ঐশ্বরিক সত্তার জন্য মানবসত্তার প্রয়োজন নেই।

৬. যদি একীভূত হওয়া থেকে উদ্দেশ্য হয় মোম দিয়ে পাথরের নকশার মতো; সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য যদি হয় মসিহের সত্তা হলো সৃষ্টিকর্তার উপমা তাহলে সেটাও অসম্ভব। কেননা নশ্বর দেহ অবিনশ্বর উপমা হতে পারে না। আর তারা এ থেকে (মোম দিয়ে পাথরের নকশা) যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় মসিহের এমন কিছু বিশেষত্ব অর্জিত হয়েছিল যদ্দরুন তিনি এমন সব কাজ করতে পারতেন যা অন্য কেউ করতে পারত না। তখন আমরা বলব এমন বিশেষত্ব থাকা মসিহের ঈশ্বর হওয়া বোঝায় না। কেননা, এই যুক্তিতে সকল নবি-রাসুলকেই তখন ঈশ্বর বলতে হবে।

৭. একীভূত হওয়া থেকে যদি উদ্দেশ্য হয় পিতা নিজের সত্তা থেকে পুত্রকে অস্তিত্ব দিয়েছেন তখন বলা হবে এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার সমস্যা সামনে আসবে। কেননা তখন পুত্রও আরেক পুত্রকে অস্তিত্ব দেবেন। এভাবে ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

৮. তাদেরকে বলা হবে : মসিহের আশ্চর্যজনকভাবে পিতাবিহীন জন্ম নেওয়ার কারণে যদি তোমরা তাকে ঈশ্বর সাব্যস্ত কর তাহলে আদম-হাওয়ার জন্ম তো এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক। তাদেরকে কেন ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ কর না? মসিহকে আল্লাহ আকাশে তুলে নিয়েছেন বলে যদি তাকে ঈশ্বর মান তাহলে তার পূর্বে তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নবি ইলিয়াকেও আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাকে কেন ঈশ্বর মান না? তার হাতেও অনেক মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। তার মানবসত্তায়

কোনো অনিষ্টের স্পর্শ হয়নি। কোনো মানুষের ইবাদত যদি বৈধ হতো তাহলে এ ক্ষেত্রে নবি ইলিয়া মসিহের চেয়ে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। কেননা, তোমাদের ধারণা অনুযায়ী মসিহকে বন্দি করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, শাস্তি দেওয়া হয়েছে এমনকি শূলে চড়ানো হয়েছে।

৯. তাহাদের বিকৃত সুসমাচারে মসিহকে ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। তার পূর্বে ইসরাইলকেও ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। একইভাবে সুসমাচারের লেখকগণ এরা অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরপুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।[৬০৯] মসিহ নিজেও হাওয়ারিগণকে তার ভাই বলেছেন।

ফরাসি বিজ্ঞানি চার্লস গিজেনবার্ট পুত্র শব্দটির অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : গবেষকদের গবেষণার সুনিশ্চিত ফল এটাই যে, ঈসা কখনো নিজেকে প্রতীক্ষিত মসিহ দাবি করেননি। এবং তিনি নিজেকে ঈশ্বরপুত্রও কখনো বলেননি। এটি শুধু সুস্পষ্ট আভিধানিক ভুল বৈ কিছু নয়। এবং এক ধরনের ধর্মীয় মূর্খতা। একইভাবে সুসমাচারগুলোর কোনো বাক্য আমাদেরকে ঈসাকে ঈশ্বরপুত্র বলার অনুমতি দেয় না। কেননা ওটা এমন ভাষা ছিল খ্রিষ্টানরা গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাবেই তা ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ভাষাটি ব্যবহার করেছেন সাধু পোল। একইভাবে চতুর্থ সুসমাচারের লিখকও এটি ব্যবহার করেছেন। তারা এখানে গভীর কিছু অর্থের সন্ধান পেয়েছেন। এবং তাদের দিক থেকে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল।[৬১০]

১০. জিবরাইল এসে মারইয়ামকে সন্তান জন্মদানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এ কথা বলেননি যে, তিনি ঈশ্বর জন্ম দেবেন।

১১. মসিহ নিজেও তার মানব হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং ইশ্বর হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যেমন মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে, যখন মসিহ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'সেই দিন, সেই সময় সম্পর্কে কোনো মানুষ জানে না, কোনো ফিরিশতা জানে না, পুত্রও জানে না। শুধু পিতাই জানেন।

---

[৬০৯] দেখুন : লুক, অধ্যায় :-৩; যিরমিয়, অধ্যায় : ৩১, অনুচ্ছেদ : ৯; গীত, অধ্যায় : ২৭, অনুচ্ছেদ : ৮৯; যিশাইয়, অধ্যায় : ৬৩, অনুচ্ছেদ : ১৬; ইয়োব, অধ্যায় : ৩৮, অনুচ্ছেদ : ৭; আদিপুস্তক, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : 2। আরো বিস্তারিত দেখুন ইযহারুল হক, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ২। আলজাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৬

[৬১০] আল-মসিহিয়্যাহ নাশআতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা, পৃষ্ঠা : ৩৯। লেখক বলেন : আমরা বিশ্বাস করি সম্ভবত ইসা নিজেকে আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের সামনে নিজেকে এই গুণেই পরিচয় দিয়েছেন। হিব্রু ভাষার "আবদুন" শব্দটি ইউনানি ভাষায় এমন শব্দে ব্যক্ত করা হয় যা "খাদিম" ও "শিশু" অর্থে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। এই শিশু শব্দটি কালক্রমে "পুত্র"-তে পরিবর্তিত হওয়া কঠিন কিছু নয়। সর্বোপরি ইশ্বরপুত্র হওয়ার বিষয়টি গ্রিক চিন্তা-দর্শন থেকে উৎসারিত একটি বিষয়।

১২. কীভাবে এই মানুষটি ইশ্বর হবেন তাকে তো ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া পানি দ্বারা পবিত্র করেছেন।[৬১১]

১৩. তিনি কীভাবে ঈশ্বর হবেন যিনি নামাজে বলতেন, "হে আমার পিতা! সম্ভব হলে আমাকে মুক্তি দিন। এই সময়টি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন।" ক্রুশের ওপর থেকে তিনি চিৎকার করে বলছিলেন : এলি! এলি! কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে?"

১৪. তিনি কীভাবে ঈশ্বর হবেন! তাদের ধারণামতে তিনি তো শরাব পান করেছেন। মাছ খেয়েছেন। ক্লান্ত হয়েছেন। দুর্বলতার কারণে তার গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। শয়তান তাকে ছিনতাই করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে গিয়েছে।[৬১২]

১৫. সাইদ ইবনুল বিতরিক বলেন : পিতা-পুত্রের একীভূত হওয়ার উদাহরণ হলো সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির ন্যায়। যার আলো আসমান-জমিন ভরে দেয়। কোনো ঘরে প্রবিষ্ট আলো মূল সূর্য থেকে পৃথক হওয়া ব্যতিরেকেই আলোকিত করে। অথচ এই আলো সূর্য থেকে উৎপন্ন এবং সূর্য থেকে পৃথক নয়। একইভাবে ঈশ্বর মানবসত্তার মাঝে অবস্থান নিয়েছেন পিতা থেকে পৃথক হওয়া ব্যতিরেকে। তিনি মানবের সাথে। তিনি পিতারও সাথে। এবং তিনি পবিত্র আত্মার সাথেও। তার এই বক্তব্যের জবাবে বলা হবে : এই দৃষ্টান্তকে শুদ্ধ মেনে নিলেও এটি তাদের ওই বক্তব্যের সাথে মিলে যায় যারা বলে : ইশ্বর সশরীরে সকল স্থানে বিরাজ করেন যেভাবে সূর্যের রশ্মি পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলে বিরাজ করে। খ্রিষ্টানগণ এটিকে শুধু মসিহের মানবসত্তার সাথে যুক্ত করে। অন্যান্য মানবসত্তার সাথে নয়। সুতরাং এ ধারণাটিও বাতিল। কেননা আলো ছাদের নিচে এবং ভূগর্ভে থাকে না। তা ছাড়া আরও নানা কারণে এই দৃষ্টান্তটি বাতিল বিবেচিত হয়।[৬১৩]

১৬. তিনি কীভাবে ইশ্বর হবেন! তিনি তো নিজ থেকে কিছুই করতে সক্ষম নন।[৬১৪]

১৭. তারা দাবি করে থাকে মসিহ নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি ঈশ্বরপুত্র। এমন বিষয়ে যুগের নবি কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক। যদি কোনো নবি তখন সেখানে থাকেন। আমরা দেখি সে সময়ে বনি ইসরাইলের একজন বড় নবি ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মসিহের পুত্র কিংবা ঈশ্বর

---

[৬১১] মার্ক, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ৯; লুক, অধ্যায় : ৩, অনুচ্ছেদ : ২১

[৬১২] বিস্তারিত দেখুন : *আলজাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৫

[৬১৩] বিস্তারিত দেখুন : *আলজাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৫

[৬১৪] যোহন, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ১৯-৩০

হওয়া কোনোটিরই স্বীকৃতি দেননি। অথচ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে নিজ যুগে প্রত্যেক নবিই ইশ্বরের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হয়ে থাকেন।

১৮. আল্লাহর যাত ও সিফাত শাশ্বত। স্থান, কাল ও ব্যক্তির দ্বারা এটি প্রভাবিত হয় না। ত্রিত্ববাদ যদি প্রকৃত তাওহিদ হতো তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম যার শরিয়তের উপর আগমন করেছেন সেই মুসা আলাইহিস সালাম আবশ্যিকভাবে এই ত্রিত্ববাদ ও ঈসা আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের ব্যাখ্যা দিতেন যাতে মানুষেরা কুফরি ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত না হয়।

কিন্তু পুরাতন নিয়মে আমরা এই আকিদার বিপরীত বিষয় দেখতে পাই। যেমন যাত্রাপুস্তকের বিংশ ও চৌত্রিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'কোন ভাববাদী কিংবা কোন স্বপ্নদর্শক যদি অন্য দেবতাগণের উপাসনার দিকে তোমাদিগকে ডাকে সেই ভাববাদী কিংবা সেই স্বপ্নদর্শকের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। যদিও সে বহু চিহ্ন নিয়া হাজির হয়। অনুরূপ কাহাকেও তাহার আত্মীয় কিংবা সহচর যদি ইহার (অন্য দেবতাগণের উপাসনার) প্রবৃত্তি দেয় তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। তাহার সহিত প্ররোচিতকেও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। কোনরূপ দয়া করা হইবে না।'

উক্ত পুস্তকের সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'কাহারো ব্যাপারে অন্য দেবতাগণের উপাসনা প্রমাণিত হইলে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। সে পুরুষ হউক কিংবা নারী।'

নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি।[৬১৫] অথচ যে মসিহের ব্যাপারে তারা ঈশ্বর হওয়ার দাবী করে তাকে প্রচুর মানুষ দেখেছেন। বরং তাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষেরা তাকে কষ্ট দিয়েছে এমনকি শূলিতে চড়িয়েছে। কেউ যদি বলে : মসিহকে ঈশ্বর বলাটা রূপকার্থে। তাকে বলা হবে : এই রূপক ঈশ্বর ও রূপক মানুষের ফায়েদাটা কি? আর তোমরা তো স্বীকার করে নিয়েছ যে ঈশ্বরকে কেউ দেখে না। অথচ মসিহকে মানুষেরা দেখেছে। সুতরাং তিনি ঈশ্বর নন।

১৯. তারা বলে ত্রিত্ববাদ ও তাওহিদ এক ঈশ্বরের দুটি হাকিকত। এই দুটি বিপরীত বিষয়কে একত্রিত করা অসম্ভব। কেননা তাওহিদ থাকলে ত্রিত্ব হতে পারে না। ত্রিত্ব হলে তাওহিদ হতে পারে না। ত্রিত্বের দাবিদার তাওহিদবাদী হতে পারে না। তাওহিদবাদী মুশরিক হতে পারে না।

---

[৬১৫] যোহন, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৮ ও অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৩৭; কলিসিয়, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৫; তিমথিয় ১ম, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৭; তিমথিয় ২য়, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ১৬

২০. তারা বলে : মসিহের মাঝে ঐশ্বরিক মৌল ও মানবীয় মৌল সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা বলবো : ঐশ্বরিক মৌল ও মানবীয় মৌলের সন্নিবেশ অসম্ভব। কেননা ঐশ্বরিক মৌলের হাকিকত ও মানবীয় মৌলের হাকিকত ভিন্ন। কেননা প্রথমটি হলো চিরন্তন ও অবিনশ্বর। আর দ্বিতীয়টি হলো নশ্বর। সুতরাং নশ্বর ও অবিনশ্বর একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

২১. তারা বলে : মসিহ ইশ্বরের সত্তায় প্রবেশ করেছেন। এটিও বাতিল বক্তব্য। কেননা এই প্রবেশ যদি গোলাপের মধ্যে পানি, সরিষার ভেতরে তেল কিংবা আখের ভেতর রস প্রবেশের মতো হয় তখন প্রবেশকারী এবং যাতে প্রবেশ করেছে উভয়ের জন্য দেহের প্রয়োজন হবে। আর যদি প্রবেশটি গোলাপের রংয়ের মতো হয় তখন যাতে প্রবেশ করেছে তা হবে মৌল। আর যে প্রবেশ করেছে সে হবে অমৌল। সুতরাং উভয় অবস্থায় ঈশ্বরের জন্য দেহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। আর যার দেহের প্রয়োজন সে নশ্বর। আর অমৌলের জন্য দেহের প্রয়োজন নেই। সুতরাং উভয় অবস্থাই বাতিল। কেননা সে ক্ষেত্রে বলা হবে মসিহের দেহ ছিল। আমরা যদি মসিহের দেহ থাকাটা মেনে নেই তখন তিনি নশ্বর হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। (ইশ্বর নশ্বর নন) আর যদি তার দেহকে অস্বীকার করি তাহলে প্রশ্ন আসবে কাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? কাকে শূলে চড়ানো হয়েছিল? এটা বাস্তবতার বিপরীত।

প্রায়শ্চিত্যের আকিদা ও ত্রিত্ববাদে তার প্রভাব

খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের ভিত্তি হলো প্রায়শ্চিত্যের আকিদা। আকিদাটির সারকথা হলো, পুত্র ঈশ্বর আদমসন্তানকে পাপ থেকে পবিত্র করতে নিজের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হওয়া বেছে নিয়েছেন। কেননা, ক্রুশবিদ্ধকরণ না হলে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ অপবিত্র থেকে যেত।[৬১৬]

খ্রিষ্টানরা বলে : মানুষ জন্ম থেকেই পাপী। কারণ, আল্লাহর নবি আদম আলাইহিস সালাম এবং তার স্ত্রী তথা পৃথিবীর প্রথম নারী পাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের সেই পাপ বংশপরিক্রমায় প্রত্যেক মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। আর নেক আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, আল্লাহ তার বান্দাকে নেক আমলের উসিলায় রহম করলে তার রহমতের গুণ ইনসাফের ওপর প্রাধান্য পায়। আর ইনসাফ মানে হলো আদমের

[৬১৬] এটি খ্রিষ্টানদের মাঝে একটি নবউদ্ভাবিত চিন্তাধারা। এডলফ হেনরিক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পুস্তকেই ক্রুশ, প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ নেই। তিনি তার *তারিখুল আকিদা* গ্রন্থে এমনটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভুলের কারণে সকল আদম সন্তানের হিসাবের মুখোমুখি করা। মূলত বীর্যের মাধ্যমে এই পাপ বংশানুক্রমিক স্থানান্তরিত হয়।

তারা আরও বলে : ইনসাফ ও রহম এই দুই গুণ একত্রিত হতে পারে না। তাই আল্লাহ নিজেকে মসিহের আকৃতিতে মারইয়ামের পেট থেকে জন্ম দিলেন। যেহেতু বীর্যের মাধ্যমে এই পাপ স্থানান্তরিত হয় তাই তিনি বীর্য ছাড়া নিষ্পাপ জন্ম নিতে চাইলেন। অতঃপর তিনি তার মায়ের সাথে কোনো পুরুষের সঙ্গম ব্যতিরেকেই নিষ্পাপ জন্ম নিলেন। এরপর বনি আদমের মুক্তির জন্য নিজেকে তিনি উৎসর্গের জন্য পেশ করলেন। সুতরাং তাদের কাছে দ্বিতীয় ঈশ্বর –পুত্রঈশ্বর- মানবজাতির জন্য এমন কাজ করলেন যা পিতা ঈশ্বর করেননি।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার লেখক প্রায়শ্চিত্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : খ্রিষ্টানদের মতে প্রায়শ্চিত্যের উদ্দেশ্য হলো, বনি আদমের মুক্তির জন্য মসিহ কর্তৃক উৎসর্গ ও কুরবানি। আদম কর্তৃক কৃত পাপের কারণে মানুষ ঈশ্বরের রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ আবার ঈশ্বরের রহমতের নিকটবর্তী হতে পারে। তাই ঈশ্বরের কালাম আকৃতি ধারণ করেছেন। নতুনভাবে মানুষকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করতে পুত্র মানবের আকৃতি বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে এই আকিদার খণ্ডন করতে পারি। যেমন :

১. খ্রিষ্টানরা মনে করে আদম থেকে নিয়ে মসিহ পর্যন্ত এবং মসিহ পরবর্তী সকল মানুষ পাপী। কিন্তু কিতাবুল মুকাদ্দাস এই মিথ্যা দাবি খণ্ডন করে। কিতাবুল মুকাদ্দাস নবি ইয়াহইয়া, আদমপুত্র হাবিল, নবি দানিয়েল, নবি যাকারিয়া ও তার স্ত্রী, সম্রাট যিহিস্কেল, নবি শমুয়েল প্রমুখকে নিষ্পাপ বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে তারা কখনো কোনো পাপ করেননি। সুতরাং খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই এই নবসৃষ্ট আকিদাকে খণ্ডন করে।

২. সমস্ত মানবজাতির পাপের বোঝার নিমিত্তে মসিহ ক্রুশকে বরণ করে নিয়েছেন। যে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে সে সকল পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এমনকি সে অশ্লীল ও মন্দ কাজে লিপ্ত হলেও মসিহের উপর বিশ্বাসই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। এই আকিদাটিও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। কেননা ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সুস্পষ্ট বলছে; কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। পুরাতন নিয়মের পঞ্চম পুস্তক দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, "সন্তানের জন্য পিতার,

কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপপ্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।"[৬১৭]

যিহিস্কেল গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রর অপরাধ পিতা বহন করিবে না।"[৬১৮]

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের শিক্ষাই হলো; সৎলোক তার সততার ফল পাবে। আর অসৎলোক তার অপরাধের ফল পাবে। পুরাতন নিয়মের এই সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদগুলোই তাদের দাবি খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট যারা বলে মসিহ বনি আদমের পাপের বোঝা বহন করে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

৩. আদম কর্তৃক জান্নাতে কৃত পাপ বীর্যের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক চলে আসার দাবিটি কোনোরূপ প্রমাণ ছাড়াই ভিত্তিহীন একটি দাবী। বরং এ দাবির আবশ্যিক চাহিদা হচ্ছে নারীর মাধ্যমে পাপ স্থানান্তরিত হওয়া। পুরুষের বীর্যের মাধ্যমে নয়। কেননা, তাদের কিতাবুল মুকাদ্দাস স্পষ্ট বলছে হাওয়া আদমকে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করেছে। তাহলে মসিহকে কীভাবে নিষ্পাপ বলা যায়? তিনি তো নারীর গর্ভেই জন্ম নিয়েছেন? নারীই তো ছিল পাপের প্রতি আহ্বানকারী। সুতরাং পিতাবিহীন জন্ম নেওয়ায় মসিহকে তারা নিষ্পাপ হওয়ার যে দাবি তারা করে থাকে তা অযৌক্তিক।[৬১৯]

এসব আলোচনার পর আমি অকপটে স্বীকার করতে চাই যে, তাদের এই 'একের ভেতর তিন, তিনের ভেতর এক' এর মর্ম আমার বোধগম্য নয়। বরং এটি কারোরই বোধগম্য নয়। আল্লাহ তাআলা অযৌক্তিক বিষয় বুঝতে বাধ্য করেন না। কিংবা না বুঝে বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধ্য করেন না। আমরা সকলেই যেটা বুঝি : ১+১+১=৩। কিন্তু ১+১+১=১ এই হিসাবটি কারোরই বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। আলকিমস বাসিবিলিয়ুস ইসহাক তার *আল-ইলমু বিততাসলিস* গ্রন্থে এটিকে বোধের ঊর্ধ্বে বলে অভিহিত করেছেন। *আততাসলিস ওয়াত তাওহিদ* গ্রন্থে মনসুর বলেছেন : আমাদের ক্ষুদ্র বিবেক দিয়ে এটি বোঝার চেষ্টা করা বোকামি।

আওদ শিমিয়ন তার গ্রন্থ *আল্লাহু যাতুহু ওয়া নাওউ ওয়াহদানিয়্যাতিহি* গ্রন্থে বলেন : আমরা অস্বীকার করি না যে ত্রিত্ববাদ বিবেক ও বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। অনেক দার্শনিকই কিতাবুল মুকাদ্দাসে আল্লাহর জাত সম্পর্কিত ঘোষণাগুলোর ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

---

[৬১৭] দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় : ২৪, অনুচ্ছেদ : ১৬। (মূল কিতাবে রেফারেন্সটি অধ্যায় : ৩৪, অনুচ্ছেদ : ১৬ দেওয়া আছে যা সঠিক নয়।)

[৬১৮] যিহিস্কেল, অধ্যায় : ১৮, অনুচ্ছেদ : ২০

[৬১৯] আমরা মুসলিমরাও ঈসা আলাইহিস সালামসহ সকল নবি-রাসুলকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করি। তবে ঈসা আলাইহিস সালামের নিষ্পাপ হওয়াটা পিতাবিহীন জন্ম নেয়ার কারণে নয়।—অনুবাদক

ত্রিত্বের এককত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা কোনো পথ খুঁজে পাননি। কেননা তারা তার বক্তব্য থেকে পদচ্যুত হয়েছেন। শুধু বিবেকের উপর নির্ভর করেছেন।

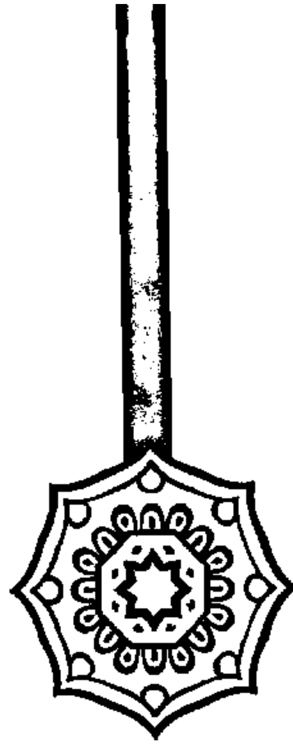
সাধু তাওফিক জাইয়িদ তার *সিররুল আযল* গ্রন্থে বলেন : ত্রিত্ব হলো রহস্য। এটি বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ত্রিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বুঝার চেষ্টা করা আর সমুদ্রের সব পানিকে হাতের তালুতে নেওয়ার চেষ্টা করা একই কথা।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি : দার্শনিক, পুরোহিত, বড় বড় প্রফেসর সকলেই যদি এই ত্রিত্ব বুঝতে অপারগ হয়ে পড়েন তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবেন? মানুষ কি তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত এক ঈশ্বরের ওপর ঈমান আনতে বাধ্য? দুর্ভোগ! শত দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা এমন বক্তব্য প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন—

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .

তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯]





খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলাম	খ্রিষ্টবাদ
১- ইসলাম আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদের দাওয়াত দেয়। ইসলাম বলে : একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ . বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। [সুরা ইখলাস, আয়াত : ১-৪]	১- খ্রিষ্টবাদ ত্রিত্ববাদের দাওয়াত দেয়। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। খ্রিষ্টবাদ বলে : তিন জনের প্রত্যেকেই ইবাদাতের উপযুক্ত।
২- মসিহ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।	২- মসিহ আল্লাহর পুত্র।

৩- মসিহ মানুষকে ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন।	৩- মসিহ মানুষকে পাপ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য এসেছেন।
৪- ইসলাম ঈমান ও আমলের দাওয়াত দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬২]	৪- খ্রিষ্টবাদ ঈশ্বরপুত্র মসিহ এবং প্রায়শ্চিত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়।
৫- মসিহ ছিলেন মায়ের প্রতি সদাচারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا এবং জননীর অনুগত করেছেন এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩২]	৫- মসিহ মায়ের প্রতি সদাচারী ছিলেন না। তিনি মায়ের মর্যাদাকে অস্বীকার করতেন। [যোহন, ২/১-৪, মথি, ১২/৪৭-৪৮]
৬- আল্লাহ তাআলা মসিহকে রুহুল কুদস তথা জিবরাইল ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ অর্থ্যাৎ, "আমি তাকে রুহুল কুদসের মাধ্যমে শক্তিদান করেছি।" [সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৭]	৬- পবিত্র আত্মা মসিহকে ক্রুশ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ধরনের সহযোগিতা করেননি।
৭- মসিহ আলাইহিস সালাম দুনিয়া ও আখেরাতে মহাসম্মানের অধিকারী। পবিত্র	৭-সৈনিকরা মসিহকে প্রহার করেছে। মুখে থুতু দিয়েছে। তারপর

কুরআনে বলা হচ্ছে, اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ তার নাম হলো মসিহ-মারইয়াম তনয় ঈসা-, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী...। [আলে ইমরান, আয়াত : ৪৫]	তাকে শূলে চড়িয়েছে।
৮- মসিহ অন্যান্য নবিগণের মতো নিষ্পাপ ছিলেন।	৮- মসিহ সৎ ছিলেন না।
৯- মসিহ পূর্ববর্তী নবিগণকে সত্যায়নকারী ছিলেন।	৯- সুসমাচারের ভাষ্যমতে মসিহ অন্যান্য নবি-রাসুলগণকে ডাকাত বিবেচনা করতেন।
১০- আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি।	১০- ইহুদিরা তাকে বেত্রাঘাত করে শূলে চড়িয়েছে।
১১- সর্বাবস্থায় মসিহের উপর সালাম বা শান্তি। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩৩]	১১- বনি আদমের পাপের কারণে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে। সুসমাচারের ভাষ্যমতে তার মৃত্যু ছিল অভিশপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর ন্যায়।
১২- হাওয়ারিগণ মসিহের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়— قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ শিষ্যবর্গ বলেছিল, আমরা আল্লাহর পথে	১২- বিপদ ও পরীক্ষার সময় হাওয়ারিরা মসিহকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল।

সাহায্যকারী। [সুরা সফ, আয়াত : ১৪]	
১৩- আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। [সুরা আনআম, আয়াত : ১২] অন্যত্র তিনি বলেন, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৬]	১৩- আল্লাহ পরাক্রমশালী। তিনি আদমের তাওবা কবুল করেননি। এমনকি তার সন্তানকে শূলে চড়িয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন।
১৪- ইবাদত কবুলের জন্য আল্লাহ তাআলা কোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।	১৪- আল্লাহ তাআলা পোপের মাধ্যমে তাওবা ও যাবতীয় ইবাদাত কবুল করে থাকেন।
১৫- ইসলামি শরিয়ত হেদায়াত ও সৌভাগ্যের উৎস।	১৫- শরিয়ত খ্রিষ্টানদের কাঁধে অভিশাপস্বরূপ।
১৬- ইসলামের দৃষ্টিতে নবি-রাসুলগণ আল্লাহর নেককার বান্দা।	১৬- পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মের ভাষ্যমতে নবি-রাসুলগণ সীমালঙ্ঘনকারীদের চেয়ে নিকৃষ্ট। তাদের অনেকে স্বীয় কন্যার সাথে ব্যভিচার করেছেন। আবার অনেকে মদ পান করতেন। কেউ কেউ মানুষের সামনে উলঙ্গও হয়েছেন।
১৭- নবিগণ নিষ্পাপ।	১৭-পোপগণ নিষ্পাপ
১৮- আল্লাহ এবং তার রাসুল ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই ইসলামের কোনো	১৮- পোপ শরিয়ত রহিত করার অধিকার রাখেন।

বিধান রহিত করার।	
১৯- কুরআন আল্লাহ্ তাআলার অলৌকিক কিতাব।	১৯- খ্রিষ্টানদের কাছে রক্ষিত সুসমাচারগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা।
২০- কুরআন মসিহের বক্তব্য তুলে ধরেছে, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮]	২০- মসিহ ফরিশি ও সাদ্দুকিদের ধ্বংস ও বরবাদির বদদুআ করেছেন।

ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মাঝে এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কীভাবে খ্রিষ্টানরা আল্লাহর নবি মসিহ আলাইহিস সালামকে নিকৃষ্টতম স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। তার ওপর আরোপিত বিভিন্ন অপবাদ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি এবং সমস্ত নবি-রাসুলগণের উপর!

স মা প্ত

'মুহাম্মদ পাবলিকেশন' থেকে প্রকাশিত

গ্রন্থের তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	ধরন	মূল্য
১	মুহাম্মদ আল ফাতিহ	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি	ইতিহাস	৩২০৳
২	উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি	ইতিহাস	৮০০৳
৩	আমাদের সোনালি অতীত	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি	ইতিহাস, ঐতিহ্য	২২০৳
৪	সুলতনা আবদুল হামিদ	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি	ইতিহাস	২৭০৳
৫	সুলতান সুলায়মান	কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক	ইতিহাস	৩৪০৳
৬	মুমিনের বিনোদন	শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ	আত্ম উন্নয়ন	২১০৳
৭	ফিলিস্তিন : বেঁচে থাকার লড়াই	ড. রাগিব সারজানি	সমকালীন ভাবনা	৩২০৳
৮	সালাফদের চোখে দুনিয়া	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.	আত্ম উন্নয়ন	৩৭৫৳
৯	শেষ বিকেলের রোদ্দুর	রৌদ্রময়ীরা	মোটিভেশন	২৬৭৳
১০	ক্রুসেড : হিংস্র যুদ্ধের ইতিহাস	ড. রাগিব সারজানি	ইতিহাস	৭৪০৳
১১	গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি	ইতিহাস, ঐতিহ্য	২২০৳
১২	প্রবৃত্তির দাসত্ব	শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ	আত্ম উন্নয়ন	১৪৭৳
১৩	জীবনের সফর	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি	আত্ম উন্নয়ন	৪৪০৳
১৪	জীবন গড়ার কথামালা	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ.	আত্ম উন্নয়ন	১৮০৳
১৫	সুরভিত জীবন	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.	আত্ম উন্নয়ন	২১০৳
১৬	মৃত্যুর ওপারে : অনন্তের পথে	ইমাম কুরতুবি রহ.	পরকাল	৪০০৳
১৭	নবিজি সা. : যাঁর আদর্শে বিমোহিত পৃথিবী	ড. রাগিব সারজানি	সিরাত	৭৪০৳
১৮	ইসলাম আমার অহংকার	শাইখ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লি শারাবি রহ.	ইসলামচিন্তা	২১৪৳
১৯	ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস	ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.	ইতিহাস	৬০০৳
২০	উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায়	ড. মুস্তফা আরমাগান	ইতিহাস	৩০০৳

‘মুহাম্মদ পাবলিকেশন’ থেকে প্রকাশিতব্য

গ্রন্থের তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	ধরন	মুল্য
১	সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি	ইতিহাস	
২	হিন্দু জাতির ইতিহাস	ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.	ইতিহাস	
৩	বয়ে যাক ঈমানি সুবাতাস	ড. খালিদ আবু শাদি	আত্ম উন্নয়ন	
৪	যে প্রেম জুড়ায় প্রাণ	ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.	আত্ম উন্নয়ন	
৫	সালাফদের চাওয়া-পাওয়া	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.	আত্ম উন্নয়ন	
৬	জীবন জিজ্ঞাসায় ইসলাম	শাইখ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লি শারাবি	আত্ম উন্নয়ন	
৭	দি ফাইনাল রোড	উসামা আবদুল আজিম	মোটিভেশন	
৮	কে আমি? নিজের মধ্যে ভ্রমণ	সালমান আল আওদা	আত্ম উন্নয়ন	
৯	দুই জান্নাত পরকালের জান্নাতে আগে দুনিয়ার জান্নাতে বাস করুন	ড. খালিদ আবু শাদি	আত্ম উন্নয়ন	
১০	বিশ্বাসের সন্ধানে	ড. খালিদ আবু শাদি	নাস্তিকতা	
১১	আমার নাস্তিক বন্ধুর সঙ্গে কথপোকথন	ড. মুস্তফা মাহমুদ	নাস্তিকতা	
১২	শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ যতক্ষণ না শয়তান আত্মসমর্পন করে...	ড. খালিদ আবু শাদি	আত্ম উন্নয়ন	
১৩	আশার ঝরনাধারা	ড. খালিদ আবু শাদি	আত্ম উন্নয়ন	
১৪	লাভ এন্ড হ্যাপিনেস	আয়িশা মুজাহিদ	সম্পর্ক	
১৫	স্পেশাল ওমেন	কারিম সাজলি	নারী	
১৬	নবিজির ছবি	আলি আব্দুল্লাহ	সমকালীন গল্প	
১৭	যে প্রেম জীবনের চেয়ে দামি	আলি আব্দুল্লাহ	সিরাত	